রাধারাণী দেবীর

রচনা-সংকলন ১

রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন ১

ভূ মি কা

নবনীতা দেবসেন

যশোধরা বাগচী

সং ক ল ক

অভিজিৎ সেন

প্রথম প্রকাশ

নভেম্বর ১৯৯৯

প্রকাশক

অনুপকুমার মাহিন্দার

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন

কলকাতা - ৯

মুদ্রক

বসু মুদ্রণ

কলকাতা - ৪

রাধারাণী দত্ত ও রাধারাণী দেবী এবং আমরা

বর্তমান রচনা-সংকলনের স্রষ্টা যিনি তাঁরই কাছে আমার সাহিত্য-চিন্তনের এবং সাহিত্যসৃজনেবও হাতে-খড়ি। তিনি কেবল সাহিত্যেই আমার পথ নির্দেশক ছিলেন না, তিনি আমার জননীও। সাহিত্যবীক্ষায় আমার নজর মায়েরই রুচিমতে গড়ে উঠেছিল একথা বলতে আমার গৌরব বোধ হয়। কিন্তু যে-মা আমাকে জীবনে ও শিল্পে দীক্ষা দিয়েছেন, যাঁর সঙ্গে আমার পঞ্চাশ বছরের ঘনিষ্ঠতা, এই রচনাসংগ্রহের মাত্র অল্প কিছু অংশেই তিনি উপস্থিত। সিংহভাগই অন্য একজনের সৃষ্টি, যিনি আমার জন্মের আগেকার মানুষ, যে তরুণীটির সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ কোনও পরিচয় ছিল না। শুধু বাড়িতে কিছু সুশ্রী রঙিন চামড়ায় বাঁধাই বই আছে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংস্করণ, শরৎচন্দ্রেব প্রথম সংস্করণ, তাতে সোনার জলে নাম লেখা, রাধারাণী দত্ত। ঐ বইয়েব মলাটের বাইরে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়নি।

১

রাধারাণী দেবীকে খুব কাছ থেকে দেখেছি অর্ধশতাব্দীরও বেশিদিন। তীক্ষ্ণ মেধার এত কাছাকাছি থাকাটা নিজের আত্মবিশ্বাসের পক্ষে কতটা ভালো জানি না, সর্বদাই মায়ের অসাধারণত্ব আমাকে মোহিত করে রাখতো। মায়ের ধীমত্তা, তাঁর সাহস, তাঁর সততা, তাঁর স্পষ্টভাষণ, তাঁর শব্দচয়ন, চিন্তাব স্বচ্ছতা ও ভাষার তীক্ষ্ণতা, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ওপরে তাঁর অসামান্য দখল—আমাকে তাঁর পদতলে মুগ্ধ ভক্ত কবে রেখেছিল। মা যা-ই বলতেন, যা-ই লিখতেন, তা হতো অন্যদের চেয়ে আলাদা, গভীর ও বিশিষ্ট চিন্তার আলোতে উজ্জ্বল। নিজস্ব ভাষার গুণে মৌলিক। ইসকুলে-কলেজে পড়েননি বলে মার সব ভাবনা-চিন্তাই ছিল নিজস্ব, সব মন্তব্যই একান্ত মৌলিক। আমাদের পরিচিতজনেরা এখনও বলে থাকেন, রাধারাণী দেবীর কাছে কিছুক্ষণ বসা মানেই ছিল নতুন কিছু শেখা, মনেব মধ্যে নতুন একটি বাতায়ন খুলে যাওয়া। মার মন সর্বক্ষণ ব্যাপৃত থাকতো জীবনভাবনায়—সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, গণমাধ্যম, সব বিষযেই তাঁর চেতনা সক্রিয় ছিল—আমি এবং আমার সতীর্থ বন্ধুরা পরম শ্রদ্ধায় এবং বিস্ময়ের সঙ্গে মাকে লক্ষ্য করতাম। জীবনের শেষ পনেরো বছর তিনি প্রায় ঘরের বাইরে বের হননি—১৯৭৫-৭৬-এ শরৎ শতবার্ষিকীর—ঐ একটা বছরে মা যেন নতুন করে জেগে উঠেছিলেন। তারপর একেবারেই অন্তরীণ জীবন। বাবার মৃত্যুর পরে থেকেই মা স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী থাকতে পছন্দ করতেন। সভাসমিতি কোনওকালেই তাঁর মনের মতো ছিল না, বাবা ছিলেন সভাসুন্দর স্বভাবের মানুষ। কিন্তু শরৎ শতবর্ষে মায়ের নানা জায়গা থেকে ডাক এসেছিল, তিনি সানন্দে সেই ডাকে সাড়াও দিয়েছিলেন। ১৯৭৫ বছরটা বিশ্বের

নারীবর্ষ ছিল, মা তাতে উদ্বুদ্ধ বোধ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র বিষয়ে এবং নারীমুক্তি বিষয়ে বিভিন্ন সভাসমিতিতে মূল্যবান বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছিলেন সেই বছর, ১৯৭৫-৭৬-এ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ছোটবড় শহরে বক্তৃতা দিয়েছেন,—লক্ষ্ণৌ, কানপুর থেকে কোচবিহারে, রায়গঞ্জে। ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত নিখিলভারত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতি হয়েছেন। কিন্তু সে-সব বক্তৃতা ধরে রাখা হয়নি। কোথায় ভেসে গিয়েছে। তার কিছু আমি শুনেছি ও বিমুগ্ধ হয়েছি। মার বাগ্মিতা ছিল অসাধারণ। ভাবনাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে তাঁর মুখে উপযুক্ত শব্দের অভাব হতো না, কেননা তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী শব্দ তৈরি করে নিতেন।

যে-মাকে আমি দেখেছি, সেই রাধারাণী দেবীর গদ্য বলতে ছিল প্রবন্ধ, বক্তৃতা। আর পুজোসংখ্যাতে দুটি-একটি মনমাতানো রূপকথা, যা আমার শৈশবকে স্বপ্নাচ্ছন্ন করে রাখতো। মার বড়দের গল্প সবই আমার জন্মের আগে লেখা, বাবার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হওয়ারও আগে।

আমি মা বলে জেনেছি কবি রাধারাণী দেবীকেই, যিনি একদা অপরাজিতা ছদ্মনামেও লিখেছেন এবং সার্থকনাম্নী হয়েছেন। গল্পকার রাধারাণীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি, গল্পকার হিসেবে তার খ্যাতি আমি শুনিনি, জ্যোতির্ময়ী দেবী, আশাপূর্ণা দেবীর মতো। কখনো নিজের গল্প নিয়ে কথা কইতেও শুনিনি তাঁকে। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে একবারও না। কিন্তু মাকে তাঁর কবিতার বইগুলি নিয়ে মাঝে মাঝে বসতে দেখেছি—'আজ লিখলে এমনি করে লিখতুম'—বলে নেহাৎ খেলাচ্ছলেই পুরনো কবিতার ভাষার অদলবদল করতেন। কিন্তু 'অপরাজিতা'র কবিতায় হাত দিতে দেখিনি। 'ও-কবিতা তো অপরাজিতা লিখেছিল, রাধারাণী কেমন করে সংশোধন করবে?'—ঠিক সেইভাবেই কি রাধারাণী দত্তের লেখা গল্পগুলিকে তিনি পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে আর পাত্তাই দেননি? গল্পগুলিকে ভুলে থাকতেই যে তিনি পছন্দ করেছিলেন, সেটা এখন আমার কাছে স্পষ্ট। তবে কি তাঁর মনে কোনোও সংশয় ছিল, 'রাধারাণী দত্তের লেখাগুলি দিয়ে রাধারাণী দেবী কী করবেন?' নেহাৎ অল্পবয়সের হাত-পাকানোর লেখা—সেইসব তরুণ ভাবনাগুলিকে মা কি পরিণত বয়সে অস্বীকার করতেই চেয়েছিলেন? সার্ত্র যেমন পরবর্তী জীবনে, বামপন্থী মননের সময়ে, 'বিইং অ্যাণ্ড নাথিংনেসে'র দায় আর বহন করতে চাননি। মায়েরও চিন্তা পরিণতি পাবার পরে, কলমের এবং জীবনের মোড় ঘুরে যাবার পরে, সেই অল্পবয়সের লেখাগুলিকে মা কি তবে মূল্য দিতে চাননি? ভাবলেই মনে খুব যন্ত্রণা হয় যে মা ৮৬ বছর পর্যন্ত সজ্ঞানে আমাদের মধ্যেই ছিলেন, অথচ মননশীল, বাক্‌পটু, সহযোগী মানুষটির কাছে আমরা কেউ কোনো প্রশ্ন নিয়েই উপস্থিত হইনি। অতি-নৈকট্যের দোষ? সন্তান বলেই কি দূরদৃষ্টিহীন ছিলুম? গল্প সংগ্রহের প্রশ্নটি মার জীবৎকালে ওঠেনি। আমার ভয়, বেঁচে থাকলে মা হয়তো এগুলি প্রকাশের অনুমতি দিতেন না। বিশ্বাসঘাতের এই কল্পিত ভীতি আমার মধ্যে এমনই প্রবল যে ক্রমান্বয়ে তাগাদা

পেয়েও আমি এই বইয়ের মুখবন্ধ লিখতে প্রকৃতপক্ষেই অপারগ হয়েছি। আমি যে শেষ পর্যন্ত ভূমিকা লিখে উঠতে পারলুম, তার জন্য কিছুটা কৃতিত্ব অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরীর। গল্পগুলির বিষয়ে তাঁর মন্তব্য এবং আগ্রহ আমাকে নতুনভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করেছে।

নিজের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে যদি তাকিয়ে দেখি রচনাগুলির দিকে—কী দেখি? কাকে দেখি? মাকে নয়। আমার মা রাধারাণী দেবীকে আমি দেখেছি সম্রাজ্ঞীর সিংহাসনে। যশস্বী প্রীয়মাণ স্বামী, ও অনুগত সন্তান-সমেত সুচারু একটি সংসার-জীবনে সম্পূর্ণ, আপন মননশীলতার গুণে সুধীমণ্ডলে সম্মানিত, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি ব্যক্তিত্ব, যাঁর প্রতিটি কথার মূল্য আছে, যাঁর প্রতিটি পদ-চারণে আত্মবিশ্বাস ঝলসে ওঠে।

এই সংকলনের প্রথম খণ্ডের প্রবন্ধ ও গল্পগুলি যিনি লিখেছিলেন সেই নিঃসঙ্গ তরুণীটি কিন্তু আমার মা নন। তিনি ১৩ বছর বয়সে বিধবা একটি অল্পবয়সী মেয়ে। যাঁর স্বামী, সন্তান, সংসার, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, উপার্জনক্ষমতা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা—কিছুই ছিল না। তাঁর হাতে ছিল কেবল একটিই ঈশ্বরদত্ত চাবি,—প্রতিভা, যেটি দিয়ে ঘরের দরজা খুলে বহির্বিশ্বে পদক্ষেপ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। লেখনীস্বরূপ সেই দৈব চাবিটিকেই তিনি ব্যবহার করতে পেরেছিলেন আজকের জীবনে এসে পৌঁছনোর জন্য। এই গল্পগুলি সেই মেয়েটির কলম-চালনার অ-আ-ক-খ। মা পরে বড়দের গল্প আর লেখেননি। গল্পকার হিসেবে মার প্রসিদ্ধি ছিল বলেও শুনিনি। কন্যা হিসেবে আমি চেয়েছিলাম লেখিকা-মায়ের শ্রেষ্ঠ, পরিণত কীর্তিটুকুই কেবল লোকচক্ষে প্রকাশিত থাক। প্রকাশ্যে সেটুকুই থাক মায়ের, মেধার শান যেখানে ঝলসে উঠেছে। কচি-কাঁচা এই লেখাতে মায়ের পরিচিত শীমন্তার ছোঁয়া আমি পাইনি।

রাধারাণী দেবী নিজেই ছিলেন তাঁর নিজের রচনার তীব্রতম সমালোচক। যে-কারণে বহুবছর তিনি সম্পূর্ণ কলম বন্ধ করে রেখেছিলেন। শরৎ-স্মৃতি-বক্তৃতামালায় নতুন করে কলম ধরলেন। সম্পূর্ণ মনোমত না হলে সেই লেখা প্রকাশ করায় তাঁর মত ছিল না। লেখা নিয়ে তিনি যারপরনাই খুতখুঁতে ছিলেন। যখন তাঁর বড় নাতনি চাকরী করছে, ছোট নাতনি বিদেশে পড়ছে তখনও, মাকে দেখেছি পুরনো বই বের করে তার ওপরেই সংশোধন করছেন, রাধারাণীর কবিতা। কোথাও তাঁর মনোমত শব্দ বসাচ্ছেন, কোথাও পুরো পংক্তি বদল করছেন, কোথাও পুরনো ক্রিয়াপদ বদলাচ্ছেন। মাকে কখনও তাঁর গল্পের প্রসঙ্গ তুলতেই শুনিনি, যদিও বিভিন্ন সময়ে নিজের পুরনো প্রবন্ধ নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। 'দুই বোন' ও 'ঘরে-বাইরে' বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ পড়ে প্রমথ চৌধুরী-রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া,

'সতীত্ব মনুষ্যত্বের সংকোচক না প্রসারক' নিয়ে পাঠকদের সমস্যা, 'অন্তঃপুরে রবীন্দ্রনাথ' নিয়ে শনিবারের চিঠির কার্টুন, 'নিরুপমা দেবীর মৃত্যুতে শরৎচন্দ্রের শ্রাদ্ধ' বিষয়ে অনুরূপা দেবীর প্রতিক্রিয়া—ইত্যাদি প্রসঙ্গে মাকে কথা কইতে শুনেছি। কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি যে আমার রূপকথা-লিখিয়ে মা যে বড়দের গল্পও লিখেছেন, তা আমি অনেক বড় হয়ে জেনেছি, যখন ডঃ অশোক মিত্র কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন মার কয়েকটি গল্পের কথা। মা নিজে কদাচ গল্পগুলির প্রসঙ্গ তোলেননি আমাদের পঞ্চাশ বছরের সান্নিধ্যের মধ্যে। তাই মা নিজের গল্পগুলিকে আর পছন্দ করতেন না মনে করলে হয়তো খুব ভুল হবে না।

কল্যাণীয় অভিজিৎ সেন মায়ের প্রকাশিত গল্প যতগুলি উদ্ধার করতে পেরেছেন, নানা পত্রপত্রিকা থেকে এবং আমার বাবার ফাইল থেকে, সবকিছুই এই বইতে সংগৃহীত হয়েছে,—নির্বাচনের চেষ্টা করা হয়নি। আমার মনে প্রবল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল, মার অল্পবয়সে লেখা কাঁচা হাতের গল্পগুলি পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন কি সত্যিই আছে? আমার বিশ্বাস, বেঁচে থাকলে মা গল্পগুলি অমনোনীত করতেন, পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দিতেন না। সেই ভেবে, বর্তমান সংকলন থেকে একসময়ে আমি চেয়েছিলাম গল্প বাদই দেওয়া হোক যদিও সম্পাদনার দায়িত্ব আমার ছিল না। যে-মাকে আমি চিনি, যাঁকে আমি দেখেছি, এইসব গল্পে তাঁকে দেখা যায় না। গল্পের লেখিকাকে আমি চিনতে পারি না। যখন আমার মন এই দ্বন্দ্বে বিচলিত, সেই সময়ে অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী অক্সফোর্ড থেকে এসেছিলেন, তিনি একবার গল্পগুলি পড়তে চাইলেন। পড়বার পরে অধ্যাপক রায়চৌধুরী আমাকে অনুরোধ করলেন অবিলম্বে গল্পগুলি প্রকাশ করতে। মধ্যবিত্ত বাঙালির সামাজিক মূল্যবোধের বিবর্তনের দিক থেকে ভাবলে ইতিহাসবিদ্ হিসেবে প্রতিটি গল্পকেই তাঁর মহার্ঘ সম্পদ মনে হয়েছে। যার একটিও হারানো উচিত নয়। এর মধ্যে তরুণী বালবিধবা লেখিকার মনের যে চেহারাটি ফুটেছে, বঙ্গসংস্কৃতির সাক্ষ্য হিসেবে সেটি নিঃসংশয়ে মূল্যবান। প্রবন্ধগুলিও প্রধানত রাধারাণী দত্তেরই রচনা। মানবীবিদ্যাচর্চার প্রয়োজনে এগুলির গুরুত্ব সংশয়াতীত।

রাধারাণী দত্ত নামের দুঃসাহসী তরুণীটির সাহিত্যজীবন সরল হয়নি, 'শনিবারের চিঠি'র অনেক আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর গল্প থেকে, 'মণি-মুক্তা' অংশে উদ্ধৃত করবার মতো আপত্তিজনক অংশ খুঁজে পেতেন সম্পাদক, যদিও বালবিধবা মেয়েটির লেখা গল্পগুলিতে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সর্বদাই প্লেটনিক। (এমন-কি প্রবন্ধেও বিদ্রূপের রসদ তাঁরা খুঁজে পেতেন। 'অন্তঃপুরে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের জন্য 'শনিবারের চিঠি' কার্টুন বের করেছিল,—রাধারাণী বসে কুটনো কুটছেন, ইজিচেয়ারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা কবি।) কিন্তু মানুষের দেহজ রিপুতাড়না ও আত্মিক প্রেমভাবকে রাধারাণী পৃথক করে দেখেছেন, দেহ ও মনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন জীবনযাপনে, রিপু জয় করাকেই মনুষ্যোচিত কাজ বলে সম্মান

দিয়েছেন। প্রেমে দেহের জিৎ তাঁর চোখে মনুষ্যত্বের পরাজয়। তাঁর নায়িকারা প্রেমে পড়ে বটে, কিন্তু তারা সনাতন সংজ্ঞায় সতী,—অনায়াসে দেহকে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে তাদের প্রেম। একের পর এক গল্পে দেখতে পাই বালবিধবা কন্যার, বা বয়স্থা কুমারীর একাকিত্বের কাহিনী। তারা সাহস করে বিদ্রোহ করে না, নিয়ম ভাঙে না, নিজেরাও ভেঙে পড়ে না। আত্মিক বলে ঋজু থাকে।

কিন্তু প্রবন্ধ লেখার সময়ে বালবিধবাটি 'সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক' এমন শীর্ষক দিতে ভয় পাননি। তাঁর বক্তব্যও যথেষ্ট বৈপ্লবিক (১৩৩১)। 'নারীর ভালোবাসা' (১৩৩২) বিশ্লেষণেও পেছপা হননি তিনি। কিন্তু সেখানেও দেখি নারীর বল আত্মত্যাগে, ও নারীত্বের চরম বিকাশ মাতৃত্বে। অর্থাৎ পুরুষতন্ত্রের শেখানো-পড়ানো বুলিটাই তিনি নিজের করে নিয়েছেন। গল্পে, প্রবন্ধে তারই প্রকাশ। (যদিও তাঁর নিজের ব্যক্তি-জীবনে, কি সৌভাগ্য, শেষ পর্যন্ত এই তথাকথিত 'আদর্শ'টি তিনি গ্রহণ করেননি।) যে 'অন্তঃপুরে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটিকে ঠাট্টা করে 'শনিবারের চিঠি'তে কার্টুন আঁকা হয়েছিল, সেই প্রবন্ধটি (১৩৩৫) যথেষ্ট জরুরি। তাতে আছে অন্তঃপুরের মেয়েদের চোখে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন।—সাধারণ পাঠিকাদের তিনি কত আপনজন, মেয়েদের জীবন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলি যে মেয়েদের কতদূর অন্তরস্পর্শী, ('অন্তঃপুরিকারা রবীন্দ্রনাথকে তাদের মর্ম্মের মানুষ বলে মনে করে') —এই প্রবন্ধে তাই আলোচিত।

'ঘরে-বাইরে'র সমালোচনাটি, 'প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নের রূপ-মাধুর্য্য', তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র পরিষদে পাঠ করেছিলেন। নতুন দৃষ্টিকোণের জন্য লেখাটি বহু-প্রশংসিত হয়েছিল, সাহসী বলেও খ্যাতি পেয়েছিল। এখানে মেজরাণীর চরিত্রের বিশ্লেষণটি বিশেষভাবে নজর কাড়ে। য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে পঠিত প্রবন্ধ 'সাহিত্যবিচারে পুরুষ-নারী ভেদ' (১৩৩৭) এখনও সমান জরুরি। দুঃখকর সত্য এই যে, ১৪০৬-তেও বাংলাসাহিত্যে সমালোচকের চোখে আজও পর্যন্ত নারী ও পুরুষ সমান গুরুত্ব পান না। জ্যোতির্ময়ী দেবী, আশাপূর্ণা দেবীর ক্ষেত্রে এটি দেখেছি। মহাশ্বেতা এখন প্রধানত আলোচিত তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ ও সমাজসেবার কর্মকাণ্ডের জন্য। রাধারাণী দেবী বলছেন : 'জীবনের ক্ষেত্রে না হোক অন্তত সাহিত্যক্ষেত্রেও কি এদেশের মেয়েরা সমালোচকের কাছে মানুষের সহজ ও সাধারণ অধিকার দাবী করতে পারেন না? এখানেও কি এ-সাম্য ও মৈত্রীটুকু সম্ভব নয়?' ভাবলে বেদনা লাগে যে—এখনও এই প্রশ্নগুলি আমরা করতে পারি। কত উৎসাহে একশো বছরের বাংলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিকের অবদান (১২৪১-১৩৪৩) নিয়ে তিনি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছেন, রাধারাণী দেবী বাংলাদেশে মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করেছেন (১৩৩৮), অথচ কোনো লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশুনোর সুযোগ তাঁর ছিল না। গবেষণার পদ্ধতিও ঘরের আড়ালে স্বশিক্ষিত এই বালিকাকে কেউ শিখিয়ে দেননি। যা করেছেন সবই আপনার

অসীম আগ্রহে। অ্যাকাডেমিক কাজে তাঁর নিজেরই আগ্রহ ছিল অসীম। বিদুষীর ছাপ তাঁর ওপরে পড়েনি বটে, কিন্তু আমার জীবনে এমন মননসর্বস্ব অস্তিত্ব আমি আর কোনো নারীরই দেখিনি। বাইরে থেকে যাঁর পড়াশুনোর, জ্ঞানচর্চার তেমন কোনো অবলম্বনই জোটেনি, সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হয়ে যৎসামান্য সুযোগের একশোভাগ ব্যবহার করে তিনি নিজস্ব অন্তর্জীবন গড়েছিলেন। একটি আবদ্ধ কাজ অপূর্ণ থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে কবির একটি জীবনী রচনার কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের অনুমতিও পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে কাজটি করে উঠতে পারেননি। এজন্য তাঁর আপশোস কোনোদিনই ঘোচেনি।

২

বর্তমান রচনাবলিতে দুটি খণ্ড মিলিয়ে মোট কুড়িটি ছোটগল্প সংকলিত হয়েছে। সবগুলিই রাধারাণী দত্তের। গল্পগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট সাধারণ সূত্র এই—যে প্রত্যেকটির কেন্দ্রেই আছে একটি বাঙালি মেয়ে। যে-মেয়েটির জীবন নানাভাবে জটিল ও অসুখী। মধ্যবিত্ত বাঙালির সমাজজীবনের ছকে মানিয়ে চলতে হলে মেয়েটির ব্যক্তিগত জীবনে কিছু অপূর্ণতা থাকতে বাধ্য। নানাদিক থেকে বিভিন্ন ধরনের চাপ আসে তার ওপরে, এই চাপগুলির চরিত্র আলাদা, কিন্তু শেষ হিসেবে জীবনে তার ফলাফল দাঁড়ায় একই। নিতান্ত পুরুষতান্ত্রিক হিন্দু সমাজব্যবস্থার ফলে ঠিক-ভুল, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য বিষয়ে মেয়েটির নিজস্ব বিশ্বাস এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে স্বেচ্ছাতেই সে-মেয়ে তার আপন জীবনকে প্রচলিত অর্থে ব্যক্তি-সুখহীন এবং নিঃসঙ্গ করে ফেলে, কিন্তু তাতেই সে মনুষ্যজীবনের সার্থকতা ও মহত্ত্বের আলো-বাতাস খুঁজে নেয়। লেখিকার হৃদয়ের তন্ত্রীও ওই একই তারে বাঁধা। তিনিও নারীর আত্মত্যাগের মধ্যেই নারীর মনুষ্যত্ব দেখেছেন, তাঁর প্রবন্ধগুলিতে তার প্রমাণ পাই। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' তাঁর নিজের আদর্শ বলেই তাঁর মূল চরিত্রদেরও আদর্শ। নির্মম সমাজ যতই চাপ সৃষ্টি করুক, অসীম আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সেই চাপ তারা ঠিকই সহ্য করে নিতে পারে। বিদ্রোহ করে না, ভেঙে পড়ে না, ভেঙে ফেলতেও চায় না। পুরুষতন্ত্রের নারীশিক্ষায় তারা প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ স্বর্ণপদক পেয়ে। তলহীন তাদের সহ্যধৈর্য, অসীম তাদের বুঝদারি। নারীত্বের বৈশিষ্ট্য আত্মত্যাগে, ও মাতৃত্বেই নারীত্বের চরম পূর্ণতা।

উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি বাল্যবিধবা কিশোরীকে জীবনে টিঁকে থাকার জন্য যে সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, রাধারাণী দত্তের গল্পের নায়িকারা ঠিক সেইভাবেই চলে।

ব্যতিক্রম মোটে দুটি-একটি। যেমন—'যমের অরুচি' (১৩৩২) গল্পের অরক্ষণীয়া মেয়েটির সহ্যশক্তি শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে। তীব্র অভিমানে সে গায়ে আগুন দেয়। সমাজের অন্যায় অবিচার ও নোংরামি, অবশ্য তাতেও থেমে থাকে না। আর 'হায়রে

হৃদয় তোমার সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়' (১৩৩৪) —এই দীর্ঘ নামের ছোটগল্পটি একটি গরিব মেয়ের গল্প, বাণী নামটি যার জীবনে বিদ্রূপ হয়ে দাঁড়ায়। 'হা-ঘরের মেয়ের আবার এত রূপ কিসের!' জঠরাগ্নির জ্বালায় এবং অত্যাচারী স্বামীর প্রতি ঘৃণায় বাণীর সহ্যশক্তি ভেঙে পড়ে। সতীত্বের চেয়ে তার কাছে বেঁচে থাকাটাই জরুরি হয়ে ওঠে। রাধারাণী দত্তের ২২ বছর ও ২৪ বছর বয়সে লেখা এই দুটি গল্প আজও লেখা যেতে পারত। যে-অত্যাচারের ছবি এতে ফুটেছে, সেই অত্যাচার ১৪০৬-এ পৌঁছেও বন্ধ হয়নি। মেয়েদের এই অসহায়তার ছবি শুধু বাংলার নয়, এ ছবি সর্বভারতীয়।

যে-মেয়েটি পাশের বাড়িতে গানের রেওয়াজ করে ('গতানুগতিক'—১৩৩৯), স্বামী তার প্রশংসা করলে বৌ হঠাৎ মুখঝামটা দিয়ে ওঠে। তারও যে কুমারীকালে গানের অভ্যাস ছিল, সংগীতের প্রতি ভালোবাসা ছিল, কিন্তু সংসারের যাঁতাকলে তা পিষে গেছে স্বামীগৃহে এসে। স্বামীটির সে-বিষয়ে সচেতনতা পর্যন্ত নেই, স্ত্রীর বিরক্তির কারণ সে বুঝতে পারে না। বৌটি ক্ষুব্ধ হয়, কেননা সে জানে পাশের বাড়ির কুমারী মেয়ের ভবিষ্যৎও একদিন তারই মতো এমনিই বেসুরো হয়ে পড়বে।

'দাবি-হারা' গল্পটি শৈলী ও থীম দু'দিক দিয়েই বিশিষ্ট। 'দাবি-হারা'-তে প্রধান প্রশ্ন—'নারীজীবনে রমণীত্ব আর মাতৃত্ব এই দুইয়ের মধ্যে কোনটায় বেশি সার্থকতা, বলতে পারো?'—উত্তর গল্পের মধ্যেই নিহিত। মাতৃত্বে। সেটি স্থির করে দিয়েছেন অবশ্য পুরুষই। 'দাবি-হারা' গল্পটি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তার আঙ্গিকের জন্যও। রাধারাণী দত্ত এখানে ড্রামাটিক মোনোলগ ব্যবহার করেন, তিনজন চরিত্রের মুখের কথায় (স্বগতোক্তি নয়, কথাবার্তা শোনার মানুষটির উপস্থিতি এখানে উহ্য আছে) গল্পটি উপস্থাপিত হয়েছে।

কাহিনী একাধিক সমস্যা ছুঁয়ে যায়—কিন্তু শুধু একটিকেই আলোচনা করে। দ্বিতীয়বার বিবাহ করাকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে এর দুটি চরিত্র—একজন নারী —যে দোজবরে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে, আরেকজন পুরুষ—যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করছে। দুজনেরই এই আদর্শ বিরুদ্ধ কাজ করবার কারণটি কিন্তু দেহ-উত্তীর্ণ, যৌনতা-মুক্ত। একটি মাতৃহীন শিশুকে মা দিতে চাওয়া। বিবাহের পর এই তরুণীর জীবনের একটিই অর্থ, একটিই উদ্দেশ্য দেখছি—একটি মা-হারা পুরুষ-শিশুর মা হওয়া। এর জন্য তাকে মূল্য দিতে হয় প্রচুর। স্বামী তার সঙ্গে পতি-পত্নীর সম্পর্ক স্থাপন করবেন না, কেননা মৃতা স্ত্রীর প্রতি তিনি চিরবিশ্বস্ত থাকতে চান। এজন্য তিনি নিজে কিঞ্চিৎ অপরাধী বোধ করছেন নববধূর প্রতি। আহা, নিরীহ মেয়েটিকে স্বামীসুখে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এটি স্বার্থপরতা হচ্ছে। আশ্চর্য এই, যে সেই উদার মাতৃহৃদয় মেয়েটি কিন্তু কিছুই মনে করছে না! বরং এই 'মহৎ হৃদয়-দেবতার দাসী' হতে পেরেই সেই নারী ধন্য!—যে তেজস্বিনী রাধারাণীকে আমি দেখেছি, তাঁর সঙ্গে এই মনোবৃত্তির একটুও মিল পাই না। কিন্তু ছবিটা কেমন চেনাচেনা। দেখিনি, কিন্তু

এর কথা আমি শুনেছি। সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েই যার সুখ ছিল। নিজের কথা ভাবতো না যে-মেয়ে।

'বিস্তীর্ণ বারিধির একটি বুদ্বুদ' (১৩৩৮) একটি অন্যরকম মেয়ের কাহিনী। বাবা যাকে আদর করে বলেন 'পাগলি' আর মা অভিশাপ দেন, 'কপালে অনেক দুর্গতি আছে'। মেধাবী মেয়ে, জেদী মেয়ে, উচ্চাশী মেয়ে, সে চায় লেখাপড়া করতে। তার চরিত্রে প্রধান দোষ: 'সব কিছুতেই পুরুষদেব সমান হতে চাওয়া।'—সংসাবে বাবা তাকে স্নেহ করলেও মায়ের মন ছিল তার প্রতি বিরূপ। মা অন্য বোনদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতেন। বিধিবদ্ধ ভাবনাচিন্তা ছিল যাদের।

মেয়েটি পড়তে চেয়েছিল বলেই বুঝি তার পড়াশুনো বন্ধ করে দেয়া হল। সে বিয়ে করতে চায়নি বলেই তার বিয়ে হয়ে গেল অকস্মাৎ। এবং বৈধব্যও এল অতি আকস্মিক। ১৯১৬-র সেই প্রসিদ্ধ এশিয়াটিক ফ্লু-তে সেই মেয়ের স্বামীর মৃত্যু হলো। মাতৃসমা বিধবা গিন্নিদের কী প্রবল উৎসাহ, কিশোরীটির সধবার সাজ ভেঙে তাকে বিধবা সাজাতে।

এ গল্প অনেকখানি রাধারাণীর নিজের জীবনের প্রতিবিম্ব, তাঁর স্বামীও ঐ বছর এশিয়াটিক ফ্লু-তে মারা যান। গল্পটি একটি উচ্চাশী, স্বপ্নদর্শী, মেধাবী মেযের ভেঙে যাওয়ার, হেবে যাওয়ার। উদার এবং কোমলচিত্ত বাবার ইচ্ছে যেখানে পবিবারে দুর্বল, অকৃতকার্য। সনাতনপন্থী, কঠোর, এবং অনুদার মায়েরই ইচ্ছের জোর অনেক বেশি। অনেকগুলি ভাইবোনের মধ্যে এই জেদি মেয়েটি মায়েব অপ্রিয়। তাকে স্ব-বশে আনা যায় না। কিন্তু জীবন তাকে স্ব-বশে রাখলো। এতদিন তাব জীবনে যা কিছু ঘটছিল, মেয়েটি ভেবে দেখেছে, 'সবগুলিই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে,. আপত্তি সত্ত্বেও এসেছে। বৈধব্যের বোঝা ঘাড়ে নিতেই হল তাকে। এবার সে শুনছে এ বোঝা নাকি স্বয়ং ভগবানের মারফৎ এসেছে।' অতএব সেই পনেরো বছব বয়স্কা সদ্যবিধবা 'নির্জলা একাদশী হবিষ্যান্ন আহার শুরু করলে, মেঘের মতো চুলের রাশ নিঃশেষে কেটে ফেললে। পরনে রইল শুধু একখানি থানধুতি মাত্র। এবার সে তার ভাগ্যপরীক্ষায় বদ্ধপরিকর। সে দেখতে চায় এবার কার ইচ্ছার জয় হয়। নিজেকে নিষ্ঠুর দণ্ড দিয়ে মনে মনে হাসে আর ভাবে, এব কর্তা কে? ভগবান না মানুষ? জীবনটা আমার নিজের, সুখদুঃখ ভোগ করব আমি, অথচ এর নিয়ন্তা আর সকলে। এর অর্থ কি? আমাব ভালোমন্দ শুভাশুভের দায়িত্ব আমার নিজের নেই কেন? কিন্তু কিছুই বলে না, না ভালো, না মন্দ। কিন্তু এই পনেরো বছর বয়সেই সমস্ত অন্তর তার যেন কারুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়। সে মানুষই হোক—ভগবানই হোক—সমাজই হোক—নিয়তিই হোক।'—বিন্দুর মনের কথাগুলি আমাদের খুব চেনা মনে হয়। তেরো বছর বয়সে বিধবা হওয়া রাধারাণী দত্তের স্বামীরও ওই এশিয়াটিক ফ্লু-তে মৃত্যু ঘটেছিল। বই-পাগল রাধারাণী তাঁর মায়ের চোখে কোনোকালে প্রিয় ছিলেন না। বৈধব্যের কঠোর নিয়মকানুন জোর করে সধবা মা-ই পালন করিয়েছিলেন

বালিকা কন্যাকে। একাদশীর দিন স্নানের সময়ে রাধারাণীর সঙ্গে স্নানঘরে একটি দাসী, কিংবা কোনো দিদিকে পাহারায় পাঠাতেন—বিধবা মেয়েটি যাতে লুকিয়ে স্নানের জল পান করে পাপকর্ম না-করে ফেলে। একাদশীর উপবাসটি নির্জলা হওয়া চাই তো? রাধারাণীর দীর্ঘ চুল কেটে ফেলে, তাকে নিরলংকার করে, থান পরানো বাপের বাড়িতেই হয়েছিল।

শ্বশুরগৃহে গিয়ে রাধারাণীর জীবনেব মোড় ঘুরল। অন্য একটি নতুন ভূমিকা হলো তাঁর। সেখানে বালিকাটির প্রতি সকলেরই অসীম মমতা। তার লেখার জন্যে টেবিলচেয়ার খাতাকলম এলো। শ্বশ্রূমাতার নির্দেশে চুলগুলি সযত্নে আবার বড় করা হলো, থানধুতি ছাড়িয়ে কালাপেড়ে শাড়ি পরানো হলো। নির্জলা উপবাস বন্ধ করা হলো। হাতে গলায় কানে সামান্য সোনা উঠলো। তার শূন্যতা ভরাতে চেয়ে সংসারের সব ব্যাপারেই রাধারাণীর সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক, অনিবার্য করে তুললেন তাঁব শ্বশুরবাড়ির মানুষরা। এমনকি সংসারের আর্থিক হিসেবরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে 'বাড়ির বড় ছেলে'র সম্মানটুকু দেওয়া হলো তার বিধবা বৌটিকে। কিন্তু সে-জীবনের মধ্যেও যে ফাঁকি ছিল, করুণা ছিল, তার ছবিও আমরা পাই 'শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে' (১৩৩৯) গল্পে। সেখানে ফুটে উঠেছে এই দ্বিতীয় ছবিটি, যখন পরিবারের এই সচেতন সম্ভ্রম ও মমতার আড়ালে প্রবাহিত করুণা, কৃপার মধ্যে নিহিত অপমান নায়িকাকে সহসা স্পর্শ করে ফেলে। সে নিজের যথাযথ স্থানটি চিনতে পারে, বুঝতে পারে তাকে 'ভুলিয়ে রাখা' হয়েছিল, মিথ্যে মায়ার ঝুমঝুমি দিয়ে। গল্পের নায়িকা বালবিধবা, কিন্তু ধনী পিতৃগৃহে সে প্রায় কুমারীর সাজসজ্জাতেই আছে। সংসারের সব কাজেই তাকে প্রয়োজন হয়, তার পরামর্শ তার অংশগ্রহণ অপরিহার্য। হঠাৎই একটি বিবাহ উৎসব উপলক্ষ্যে তার বৈধব্যজনিত অশুচিতা উন্মোচিত হয়ে পড়ে, কোনো অতিথি আত্মীয়ার অন্যমনস্কতায়। চকিতেই মেয়েটির চৈতন্য উদয় হলো।—তার বিবাহিত জীবন বা বৈধব্য তার নিজের স্মরণে যদিও নেই—কিন্তু পরিবারের সকলেই যে তাকে বিধবা ছাড়া আর কিছু ভাবে না, তা সে যে-ছদ্মবেশেই থাকুক না কেন, এই সত্য তার সামনে সহসা উদঘাটিত হয়ে যেতে, সে স্বেচ্ছায় কুমারীর সাজসজ্জা ত্যাগ করে, বৈধব্যের নিরলংকার রিক্ততার লক্ষণগুলি অঙ্গে ধারণ করল। যদিও বিবাহ ও বৈধব্য দুটিই তার কাছে সমান তাৎপর্যহীন। কিন্তু অন্যের কারুণ্যের ছায়ায় বৈধব্যকে গোপন রাখতে কুমারীর ছদ্মবেশ ধরে থাকতে তার আর রুচি হলো না।

১৩৩৪-এর কুন্তলীন পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প 'আলো—কোথায় ওরে আলো'—নামেই মনে পড়িয়ে দেয় ইব্‌সেনের 'গোস্ট' নাটকের অন্তিম মুহূর্ত। গল্পটির বিষয়বস্তু : পিতার সিফিলিস বোগের কারণে সন্তানের অন্ধতা। স্বামীর অসংযত জীবনযাত্রার বিষময় ব্যাধির ফলে একটি মেয়ে পর-পর সন্তান হারাচ্ছে। রুগ্ন ছেলের অন্ধত্বের

প্রকৃত কারণ জানতে পেরে, মায়ের অসহায় অপবাধবোধ।—গল্পটিতে সেই যন্ত্রণা, সেই আকুলতা তীব্র—'সে মূর্খ অশিক্ষিতা নারী, জননী হইবার উপযুক্ত দায়িত্বজ্ঞান যাহার নাই—সে জননী হইয়াছিল কোন ভবসায়? কোন্ স্পর্দ্ধায়? স্বামীর আদরে সোহাগে সে অন্ধ হইয়া ছিল।'

'বিমাতা' (১৩৩১) গল্পেব অনেকগুলি স্তর আছে—মাধুরী বালিকাবয়সে মাতৃহারা ছোটভাই তপনেব মা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বিবাহের পরে সেই সম্পর্কটির দায় আব সে যথাযথভাবে বহন করতে পারে না—ছোট ভাইটিকে কাছে এনে রাখার অনুমতি পায় না সে। বিবাহ হযেছে দ্বিতীয়পক্ষে—এখানে একটি সৎ-ছেলে আছে তার। শিশুটিকে আন্তবিক স্নেহ কবে মাধুরী—শিশুটিও তাকে মায়ের মতোই ভালোবাসতে চায়। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে অন্যান্য আত্মীয়াবা শিশুটিকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে চায়। সৎমা-কে বিশ্বাস করে না কেউ। উল্টে—'তোব মা ও কেন হবে? তোর মা তো স্বর্গে গেছে'—এই কুপবামর্শ দিয়ে শিশুটিকে নিরাশ্রয় করে দেয়, মা-কেও দূরে সরিযে দেয়। পবিবারে বিমাতার যে চিবাচরিত নির্মম অত্যাচারীর ভূমিকা, মাধুরীব স্বভাব তাতে খাপ খায় না, কিন্তু তাব প্রথা-ভাঙা চরিত্রটি সমাজ বুঝতেও রাজী নয়, মানতেও রাজী নয়। তাতে শিশুটিও কষ্ট পেলে পাক।

'পাতানো-মা' (১৩৩৫)-এর থীমটি ঘুরে ঘুরে আসে। নিতুর পাতানো মাকে নানা সামাজিক অপমান সহ্য করতে হয়—বামুনের ছেলে নিতু পাড়াব সহায়সম্বলহীন তরুণী বিধবা কায়স্থবধূকে 'মা' ডাকলেই সে তার ছেলে হয় নাকি? পাড়ার লোকের নানা কটুকথায় নিতু তার 'মা'-কে সান্ত্বনা দিযে বলে—মা হওয়াব জন্য অনেক দুঃখ পোহাতে হয়। দশমাস গর্ভধারণ, প্রসবযন্ত্রণাভোগ, বুকের দুধ দিয়ে বড় করা—সেসব যেহেতু অনসূয়াকে করতে হয়নি নিতুর জন্যে, তার বদলে সামাজিক তাড়নার যন্ত্রণাটা সহ্য করেই সে নিতুকে পুত্র করে নিক। অন্তরের সম্পর্ক যতই গভীব হোক, সমাজের 'তাড়না' আছেই। 'সহ্য' করতে হবে। 'সুখ' নেই। এটাই নিয়তি।

'মাসী' (১৩৩৩) গল্পে আর একটি আশ্চর্য সুন্দর সম্পর্ক দেখি। তরুণী বিধবা মাসিব মধ্যে মাতৃত্বের আত্মত্যাগের একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। এখানেও মূলমন্ত্র 'সহ্য', 'ত্যাগ'। সুখ নেই। মহত্ত্ব আছে। আর আছে ভালোবাসা। বড়ো ভালোবাসা, 'যা শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলিয়া দেয়।' রাধারাণীর গল্পে এই ভালোবাসার নানান রূপ দেখতে পাই।

'মা' গল্পটিতে (১৩৩৪) পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েরা চিরদিনই কেমনভাবে সন্তানদের ভুলত্রুটিব জন্য স্বামীর কাছে দায়ী হয়ে এসেছেন, কর্তার গঞ্জনা সহ্য কবেছেন (স্ত্রী-পুত্র সবাই তো কর্তার প্রজা!)—তার ছবি।

'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে' (১৩৩৪) এবং 'অন্তবেতে অশ্রুবাদল ঝরে' (১৩৩৪) গল্পদুটিতে নায়িকাবা বিবাহিত না হলেও, সতী-সাধ্বী। একটিতে বাগ্‌দান ভেঙে গেছে, প্রেমিকার অসুস্থতার কারণে প্রেমিকের মনবদলের ফলে। কিন্তু

প্রেমিকাব মন তাতেও বদলায়নি। সে যক্ষ্মাবোগে মারা যাবার আগে তার উদভ্রান্ত প্রেমিককে ক্ষমা কবে যাচ্ছে। অন্যটিতে সুধার বাগদান ভেঙে গেছে, বিলেত থেকে ফেরাব পথে তাব বাগদত্ত স্বামীর ইনফ্লুয়েঞ্জায় আকস্মিক মৃত্যুতে। সুধা নিজেকে বিধবা মনে কবতে শুরু করেছে। জীবনে নতুন প্রেম এলে সে তাকে অনায়াসে ফিবিযে দেয, পুবাতনেব প্রতি বিশ্বস্ততায়। এখানেও মেয়েবা অসুখী, মহৎ। চিব-নিঃসঙ্গ। একমুখী।

'পরম তৃষা' (১৩৩৫) গল্পেব আদি, মধ্য, অন্ত শীর্ষক তিনটি ভাগ আছে, এবং 'দাবি-হারা'র মতো এখানেও সন্তানলোভকে কেন্দ্র কবে তিনটি মানুষেব সম্পর্ক। সন্তানহীনা সন্তানাকাঙ্ক্ষী সুভাষিণী জোর করে নিজের স্বামীর সঙ্গে চিত্রার বিবাহ দেয়। হঠাৎ কী লোভে বাজি হলেও পরে তার স্বামী লজ্জাবোধ করে এবং সুভাকেই অভিযুক্ত কবে—'তুমি ছেলেব লোভে চিত্রার কাছে স্বামীকে বিক্রি করনি?'

'যে নদী মরুপথে হাবালো ধারা' (১৩৩৫) একটি অদ্ভুত সংস্কাবেব গল্প। —যেখানে গভীর প্রেম এবং আব সবকিছু ঠিকঠাক হওয়া সত্ত্বেও কোষ্ঠী মিলল না বলে বিয়ে হয় না। মালতীর অন্যত্র বিয়ে হযে যায। কিন্তু সন্তানের মা হবাব পরেও, মৃত্যুকালে অচৈতন্য অবস্থায় সেই সধবা মালতী তার প্রথম প্রেমিককেই খোঁজে, তারই নাম ধরে ডাকে। সতীত্বের ধারণাটি এখানে প্রচলিত ধাবণার চেয়ে ভিন্নতর। এখানে সতীত্ব বিবাহনির্ভর নয়, বরং তার বিপরীতে। অন্তবেব একটি গভীর সম্পর্কের প্রতি বিশ্বস্ততায় সতীত্বের পরিচয়।

'নিশীথ বাতের বাদলধারা' (১৩৩৪) গল্পটির মূল্য অন্যত্র। গল্পের নায়ক এক মৃত্যুপথযাত্রী যক্ষ্মাগ্রস্ত উচ্চশিক্ষিত মুসলমান পুরুষ, যে অবিকল পূর্ববর্তী গল্পগুলিব নাযিকাদের মতোই আত্মত্যাগে মহান। তরুণী স্ত্রীর ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাকে দূরে সরিয়ে বাখছে, তার কৌমার্য অটুট রাখছে, এবং এমনভাবে নিজেকে সবিযে নিচ্ছে যাতে সে অন্তর থেকেই মুক্তি পেতে পারে। লিখছেন মুসলমান দম্পতির গল্প, কিন্তু লেখিকার যেহেতু মুসলমান সমাজের সঙ্গে তেমন পরিচয নেই—কিশোরী নায়িকা আমিনা তাই হিন্দুমেয়েদের রুচি অনুকরণ করতে ভালোবাসে—এমন-কি ছোট সিঁদুবটিপ পরে পর্যন্ত। বারান্দায় বেলফুল ফুটলে তার মালা গেঁথে আনে স্বামীর জন্য, অবিকল অপরাজিতা দেবীর কবিতার প্রণয়িণী পত্নীদের মতো। আব রেগে গেলে বলে, 'মেয়েদের জীবন ক্ষণে ক্ষণে তো বদলায় না!' অসীম সংযমে, বিপুল আত্মত্যাগে, প্রবল যন্ত্রণায পুরুষটি তার প্রেমের গভীরতা প্রমাণ কবে। ভাষায়, ভাবে, কাহিনীতে মুসলমান সংস্কৃতির কোনো বৈশিষ্ট্য এখানে নেই বটে, তবু চরিত্রচয়নে মুসলমান দম্পতির কথা ভাবাটুকু মূল্যবান নিশ্চয়।

একটিমাত্র সুখী সধবা মেয়ের ছবি আছে 'ভাইফোঁটা' গল্পে (১৩৩৩)। বিবাহিত মেয়েটি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়িতে এসেছে ভাইফোঁটা দিতে। বাড়িতে স্বামী, শাশুড়ি আছেন, ফেরার তাড়া আছে, দাদা স্বদেশী করেন। ভাইবোনে খুনসুটি

অপূর্ব মধুর সম্পর্ক। গল্পটি ড্রামাটিক মোনোলগ—মেয়েটির একার জবানবন্দিতে লেখা। অবিকল এই বচনাশৈলিই রাধারাণী দেবী ব্যবহার করেছিলেন তাঁর অপরাজিতা দেবীর কবিতাগুচ্ছে। এখানে যে কৌতুক, স্নেহ, ব্যস্ততায় উচ্ছল জীবনপ্রবাহ আছে, অপরাজিতায় সেই সুরটিই ঝংকৃত। গল্পটিকে শব্দচিত্র বলাই উচিত, একটি যুগের মেয়েদের কথা ভারি সুন্দর ফুটেছে এখানে। সেলাই-ফোঁড়াই, আসন তৈরি, রান্নাবান্না, ঘর-গুছোনো, শাশুড়ি-সেবা, আর বাপের বাড়ির জন্য মন-কেমনের ফাঁকে ঘরের মেয়েদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রভাবও দেখতে পাই—সংসারের কাজের মধ্যে চরকা কাটা, খাদির ধুতি-শাড়ি বোনাও রয়েছে।

বাঙালি মেয়ের জীবনের নানাধরনের সামাজিক বিড়ম্বনার সাক্ষ্য এই গল্পগুলিতে ধরা পড়েছে। এখানে আছে দোজবরে বিয়ে হবার একাধিক কাহিনী, সৎমায়েদের স্নেহের গল্প, জননী-না-হয়ে শুধু মাতৃস্থানীয়া হবার সামাজিক সমস্যা (যেখানে স্নেহের দায় থাকে, কিন্তু সামাজিক অধিকার থাকে না)। অরক্ষণীয়া মেয়ের পরিবারের কথা, বিধবা তরুণীদের কাহিনী, সতীনঘর করার ছবি, বাগ্‌দান ভেঙে-যাওয়া মেয়েদের গল্প, বন্ধ্যা নারীর অসহায় মাতৃস্নেহ—বিভিন্ন ধরনের মর্মস্পর্শী পরিস্থিতিতে বাঙালি মেয়েদের জীবনযাপন ফুটেছে এইসব গল্পে। বিদ্রোহ নেই, সামাজিক সমাধানও নেই, আছে শুধু সমস্যাগুলির তীব্র, নগ্ন, অন্তর্ভেদী উপস্থাপনা। আর আছে, একটি বাঙালি বিধবা মেয়ের নিজস্ব চোখ।

৩

বিধবা কিশোরীর আবাল্যের শিক্ষা সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর মর্মের গভীরে, ছোটগল্পেই শুধু নয়, সাহিত্য-সমালোচনাতেও তার পরিচয় পাই। 'পতিপুত্রহীনা সংসারে সর্ব্বস্বরিক্তা নারী'র (মেজরাণীর বর্ণনা, ১৩৩৬) একমাত্র ঐশ্বর্য, আত্মত্যাগ। আর বিমলাকে তার অধঃপতন থেকে 'রক্ষা করেছে কিশোর বালক অমূল্য'—'নারীর জীবনে মোহ ও প্রেমের যথার্থ স্বরূপ চিনিয়ে দিতে পারে—তার অমূল্য মাতৃস্নেহই।'

যে-সময়ে রাধারাণী দত্ত ছোটগল্পে একক নারীর অসম্পূর্ণ জীবনচিত্র আঁকছেন বিভিন্ন দিক থেকে, সেই সময়ে তাঁর প্রবন্ধগুলিতেও তিনি তুলছেন সমাজে স্ত্রী-পুরুষের অবস্থান নিয়ে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে, নানান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

প্রমথ চৌধুরী রাধারাণী দেবীর কাছে অনুযোগ করেছিলেন, বাঙালি মেয়েদের রচিত সাহিত্যে নারীকণ্ঠ শোনা যায় না, তাঁরা পুরুষের স্বরের অনুকরণ করেন। এরই উত্তরে জন্ম হয়েছিল 'অপরাজিতা দেবী'র নারীকণ্ঠের কবিতার। রাধারাণী দত্তের এই গল্প এবং প্রবন্ধগুলি পড়তে পড়তে আমার মনে পড়ছে প্রমথ চৌধুরীর সেই কথাটি—যেহেতু এখানে উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনিত হয়েছে বাংলার নারীকণ্ঠ। প্রতিটি রচনায়

ভাষার মাধ্যমটি যদিও মেয়েলি বাংলা নয়, সমসাময়িক সাহিত্যে প্রচলিত গদ্যই। যাকে পুরুষের কলমের ভাষা বলা যায়।

'কল্লোলে' ১৩৩১-এ বেরুলো 'পুরুষ' নিবন্ধ, ১৩৩৩-এ 'নারী'। 'পুরুষ'-এর শুরু এবং সারা 'মা' মন্ত্রে। আর নারীব জগৎ জয় করার মন্ত্র 'আত্মত্যাগ'। গল্পগুলিতেও এই বাণীই পেয়েছি আমরা। এতে অবাক হবারও কিছু নেই। রাধারাণীর বালবিধবা-জীবনে সার্থকতার চাবিকাঠিটি ছিল আত্মত্যাগের মহিমায।

রাধারাণী লিখছেন : 'পুরুষ ও নারী যাঁহার মধ্যে ভালোবাসার মূল অর্থাৎ আত্মত্যাগ অধিকতর, তিনিই ভালোবাসায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।' 'নারীর ভালোবাসা' (১৩৩২) প্রবন্ধে পুনরায় ঐ একই থীম।—'নারীজীবনের পূর্ণতম বিকাশ, পরিণতি ও সার্থকতা মাতৃত্বে। (এই মাতৃত্ব যে জগতে সর্ব্বোচ্চ সম্মান ও পূজা লাভ করিয়াছে তাহা কেবলমাত্র সন্তানসৃষ্টির জন্য নহে, আত্মত্যাগ বা সত্য ভালোবাসার জন্যই।)'...'ধৈর্য, সংযম ও আত্মত্যাগ নারীর সহজাত বৃত্তি বা স্বভাবগত ধর্ম্ম।...আত্মত্যাগই নারীজীবনেব মূলমন্ত্র, প্রধান অবলম্বন এবং শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। তাই নারী যত স্বার্থত্যাগ করিতে, আত্মত্যাগ করিতে বা ভালোবাসিতে পারেন, পুরুষ তা পারেন না।'

১৩৩১-এ তিনিই বিতর্ক জুড়েছিলেন 'সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক' এই নামের প্রবন্ধে সতীত্ব শব্দের অর্থ, ও সতীর প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে ভাবনা প্রকাশ করে।—'যে বিধি হৃদয় ও মনকে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া নরকের বিভীষিকা ও সমাজের উৎপীড়নের ভয় দেখাইয়া ক্রমাগত নিজের অন্তরস্থ চিরমুক্ত স্বাধীন মানবাত্মাকে সঙ্কুচিত ও মৃতপ্রায় করিয়া তোলে, তাহা কোনওদিনই জাতি ও সমাজের কল্যাণকর হইতে পারে না।'

'শিব ও শক্তি' (১৩৪৮) প্রবন্ধে তিনি বলছেন—'ভারতবর্ষের মানুষ এখন দুটি ভাগে বিখণ্ডিত।—এক,—স্ত্রীজাতি, বা মনুষ্যবোধ-বিরহিত স্ত্রী-মনুষ্য ; যারা পুং-মনুষ্যের রুচির ও প্রয়োজনের ফলে তৈরি জীবন্ত পুতুল। এর বেশি কিছু নয়। দ্বিতীয়, পুং-মনুষ্য বা তথাকথিত পুরুষমানুষ। মনুষ্যত্ববোধ লাভের সর্বপ্রকাব অধিকার লাভ করেও যারা মনুষ্যত্ববোধ বিস্মৃত।...ভারতবর্ষের বিরাট নারীসমাজের মূক-বধির-পঙ্গু চেহারার পানে তাকিয়ে শক্তিপূজার মহোৎসবকে শোচনীয় পরিহাস বলেই মনে হয় নাকি?' এই প্রশ্নটি আধুনিক ভারতীয় নারীবাদের অতি প্রিয় প্রশ্ন। শক্তিপূজার অন্তর্নিহিত আয়রনি। বাংলাসাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাঁর এই অনুযোগ, 'সাহিত্য-বিচারে পুরুষ-নারী ভেদ' (১৩৩৭) প্রবন্ধে যে পুরুষ সমালোচকদের দৃষ্টিতে নারীর লেখা ধরাই দেয় না, যথার্থ গুরুত্ব পায় না, এ অনুযোগ আজও সত্য। রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনাতেও ('অন্তঃপুরে রবীন্দ্রনাথ'—১৩৩৫) উঠে আসে নারীচিত্ত ও নারীচরিত্র। পাঠিকাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলির বাস্তবতার প্রসঙ্গ। 'মানসী'র কবিতাগুলি—বিশেষভাবে "বধূ"—ও 'পলাতকা'র "মুক্তি" কবিতাদুটি আলোচনা করে দেখিয়েছেন সেখানে বাঙালি মেয়ের অন্তরের সত্য গভীরভাবে প্রতিফলিত।

রবীন্দ্রসাহিত্য প্রসঙ্গে আরও যে দুটি প্রবন্ধ পাচ্ছি, 'দুই বোন' ও 'ঘরে বাইরে' নিয়ে—দুটিতেই দুই ধরনের নারীর ভালোবাসার বিশ্লেষণ আছে—শর্মিলা ও ঊর্মি; মেজরাণী ও বিমলা। দুটি প্রবন্ধই সেযুগে পাঠক-সমালোচকমহলে রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছিল। এখনও তাদের গুরুত্ব যথেষ্ট। এখানে তাঁর রবীন্দ্র-সম্পর্কিত পাঁচটি প্রবন্ধেব মধ্যে তিনটির বিষয়বস্তুই নাবী।

শরৎসাহিত্য আলোচনাতেও দেখতে পাচ্ছি সেই একই নারীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি —'শবৎসাহিত্যের মেরুদণ্ড' (১৩৪০)—'একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে শরৎসাহিত্যের মেরুদণ্ড হচ্ছে নাবীচরিত্র।' এই নাবীটি হলেন: 'একটি তেজস্বিনী, আত্মপ্রত্যয়শীলা, দৃঢ়চিত্তা, সুচরিতা'—ইনিই শরৎ-মানসী, শরৎসাহিত্যের আদর্শ নারী।

শরৎচন্দ্র-বিষযক তিনটি প্রবন্ধ এবং একটি বক্তৃতামালা এখানে আছে (দ্বিতীয় খণ্ডে)। বক্তৃতামালাটি যখন 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতো তখন বাধাবাণী দেবী সত্য প্রকাশ করেন যে হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কখনো বিবাহ হয়নি। অথচ তিনি যে রোজ স্বামীর পাদোদক খেয়ে দিন শুরু কবতেন, —সেই খববও দিয়েছিলেন বাধারাণী), শরৎচন্দ্র তাঁকে জীবনসঙ্গিনী করলেও ধর্মপত্নী কবেননি, সন্তানের জননীও না। এ নিয়ে প্রবল বাদানুবাদ হয়েছিল। নানা ধরনের অপমানের সম্মুখীন হতে হযেছিল তাঁকে। এ নিয়ে আপত্তি উঠবে জেনেই মা ও-কথা লিখেছিলেন, কেননা তাঁর ভয় ছিল, তাঁদের মৃত্যুর পরে ঐ সত্যটি প্রকাশের যোগ্য মানুষ আব কেউ থাকবেন না। শবৎচন্দ্রের এই সামাজিক দুঃসাহস তিনি সর্বজনসমক্ষে আনাব প্রযোজন বোধ কবেছিলেন। সনাতনীদের তর্জনী শাসনকে ভয় করা উচিত বলে মনে কবেননি।

৪

বিধবা বালিকা বাধারাণীর বড মামাশ্বশুর সুরেন্দ্রনাথ মল্লিককে লেখা একটি চিঠি এখানে উদ্ধার করলে, এই গল্প-প্রবন্ধগুলির পটভূমি বোঝা কিছুটা সহজ হয়ে যাবে:

শ্রীচবণকমলেষু

বডমামাবাবু! আপনি কেমন আছেন? আপনি ও মামিমা আমার বিজয়ার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। আপনার শবীব পূর্ব্বাপেক্ষা একটু সারিযাছে কিনা জানাইবেন। আপনি কবে কলিকাতায আসিবেন? হাজারীবাগে এখন শীত কেমন?

মামাবাবু! তিনি স্বর্গে ভগবানেব নিকট গিযাছেন ও বেশ সুখে আছেন। আপনারা কাঁদিবেন না, মামিমাকে তাঁহাব জন্য কাঁদিতে বাবণ করিবেন। কাঁদিলে তো আব ফিবিয়া আসিবেন না। আমবা কাঁদিতেছি দেখিলে তাঁহার মনে কষ্ট হইতে পাবে। তিনি এখন তাঁর বাবা দাদাবাবু সবাইকে দেখিতে পাইতেছেন ও ভগবানের কোলে খুব সুখে আছেন। ছোটমামাবাবু বলিয়াছেন যে আবার আমরা সকলেই একদিন তাঁহার নিকট যাইব। তখন তো আব তিনি আমাদেব ছাড়িয়া পলাইতে পারিবে। না। সে ভাবী মজা হইবে। আর বড়মামাবাবু! ছোটমামাবাবু বলিয়াছেন যে আমি না কাঁদিলে

আমাকে যেমন জামাইবাবু রামপুরে আনিয়াছিলেন তেমনি ছোটমামাবাবু তাঁর কাছে দিয়া আসিবেন। আমাকেও ঐ রকম লাল কাপড় ঢাকা দিয়া ভগবানের কাছে ছোটমামাবাবু দিয়া আসিবেন। সে ভাবী মজার কথা না মামাবাবু? আমার কিন্তু মোটে আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না, শীঘ্র ২ তাঁব কাছে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে। বড়মামাবাবু, আর একটি কথা আপনাকে শুনিতেই হইবে। আপনি এখন স্বর্গে পলাইয়া যাইবেন না। ছোটমামাবাবু বলিযাছেন আমাকে স্বর্গে তাঁব কাছে পাঠাইয়া তবে যাইবেন। মামাবাবু! আপনিও তাই কবিবেন। আমাকে ফেলিয়া আগে স্বর্গে যাইবেন না। আমি বাবাকে জামাইবাবুকে মাকে সবাইকে বাবণ করিযাছি। আর মামাবাবু! আমি আপনাদের মনে কষ্ট হবে, বাবা মাব মনে কষ্ট হবে বলে ছোটমামাবাবুর কথামত আবার চুড়ী পবিযাছি, বিছানায শুই, বামুন ঠাকুরেব বান্না খাই। ও সব কবিলে আপনাদের মনে কষ্ট হবে কিনা!

আমি আর কারোও মনে কষ্ট দিব না, তা হলে ভগবান আবাব এই রকম কষ্ট দিবেন। আমি খুব লক্ষ্মী মেযে হব তবে তাঁব কাছে যেতে পাবব। আমাকে ছোটমামাবাবু আগের চেযেও খুব বেশী ২ ভালবাসেন। কলিকাতার সেই বাবাব মত। আব ভাল ২ কথা শিখান, আমাব খুব ভাল লাগে। আব বড়মামাবাবু! আপনি তো একজন বড়মামাবাবু। আবার এখানে আর একজন বড়মামাবাবু ও মামিমা হয়েছেন, তাঁবাও আমাকে খুব ভালবাসেন। আর সকলেই বলেছেন আমার ছেলে মেয়ে হবেন। আপনিও। ছোটমামাবাবু বলেন আমি সবাইকার মা হয়েছি।

আপনাবা দুঃখ কববেন না। দুঃখ কবে কি হবে? তিনি তো ভাল আছেন। আপনি ভগবানকে বলবেন তাঁকে খুব সুখে বাখেন।

এখানে সবাই ভাল আছেন। আমাকে মাঝে ২ চিঠি লিখবেন।

ইতি

আপনার স্নেহেব মেযে

বউমা।

চিঠিতে বালিকা-বধূটিব শিশুসুলভ সরলতার মর্মান্তিক বাস্তব আজকের পাঠকের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দেয়। মৃত্যুর ভয়াবহতা সম্বন্ধে তার সম্পূর্ণ অজ্ঞতার পাশাপাশি —তাকে যে চুড়ি পরানো হচ্ছে, প্রথা ভেঙে কম্বলের বদলে বিছানায় শোওয়ানো, হবিষ্যান্নের বদলে ঠাকুরের হাতের রান্না খাওয়ানো শুরু হয়েছে, সেই সুখবরটিও পাই। এবং এই সঙ্গেই স্পষ্ট হয়ে যায় মন-গড়া মাতৃত্বের মধ্যেও মেয়েটির মনে সাংসারিক গুরুত্ব লাভের, পরিতৃপ্তির বোধটিও। গুরুজনেরা—'সকলেই বলেছেন আমার ছেলে মেয়ে হবেন। আপনিও। ছোটমামাবাবু বলেন আমি সবাইকার মা হয়েছি।' এই চিঠির বছর পাঁচেকের মধ্যেই পরিণতমনস্কা রাধারাণী দত্ত পত্রপত্রিকায় গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছেন। তাঁর চিন্তায়, কলমের ভাষায় আশ্চর্য তীক্ষ্ণ পরিবর্তন লক্ষণীয়, কিন্তু পুরোনো মূল্যবোধের শিকড় নেমে গিয়েছিল অনেক গভীরে। রাধারাণী দত্তেব গল্পে-প্রবন্ধে তার ছাপ স্পষ্ট। আরও পরে রাধারাণী দেবী সেই মূল্যবোধের শৃঙ্খল-মুক্ত হয়ে স্বনির্মিত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, পরবর্তী লেখায় তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে।

এই রচনাবলীর ভূমিকা লিখতে গিয়ে যে তরুণীর সঙ্গে আমার পরিচয় হলো, এখনও আমার পক্ষে আমার মা রাধারাণী দেবীর সঙ্গে তাঁকে মেলাতে পারা শক্ত, যদিও তাঁর জীবনস্মৃতির সঙ্গে এই মেয়েটির গল্পের চরিত্রগুলির অসামান্যরকম মিল রয়েছে। গল্প এবং প্রবন্ধগুলি থেকে আরও বুঝতে পারি, যে এই মহিমাময়ী, আত্মত্যাগী, দুঃখিনী মেয়েটিকে খোলসের মতো পরিত্যাগ করে তার ভস্মাবশেষ থেকে পুনর্জাত হয়েছিলেন দ্বিতীয় জন্মের রাধারাণী দেবী। যাঁর পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যেও মহত্ত্বের, নিঃস্বার্থতার, স্নেহমমতার অভাব দেখিনি। কিন্তু এইসব প্রবন্ধ পড়বার পরে বুঝতে পারছি মাতৃত্ব তাঁর কাছে আকৈশোর কতটা জরুরি ছিল। বালিকা রাধারাণীর মনে বালবিধবা জীবনের প্রধান ব্যর্থতা, এই বাধ্যকরী বন্ধ্যাত্বের অভিশাপ। হয়তো দ্বিতীয় বিবাহটির জন্য অনেকখানি দুঃসাহস তাঁকে জুগিয়েছিল এই মাতৃত্ব অর্জনের স্বপ্নই। এবং দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি, মা হবার পর থেকেই রাধারাণী দেবীর কলম ক্রমশ স্তব্ধ হয়ে আসে। অভাব কিসের ছিল, সংসারের, সময়ের, না অন্তরের তাগিদের, আমাদের এখন আর তা জানবার উপায় নেই।

যেখানে যেটুকু পাওয়া গেছে, সবই এখানে সংগৃহীত হয়েছে। আবার অনেক কিছুই পাওয়া যায়নি। যেমন, আমি যেটি পড়ে একদা বিমুগ্ধ হয়েছিলাম—নিখিলভারত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে তাঁর মহিলাশাখার সভানেত্রীর মুদ্রিত ভাষণ ও ১৯৭৫-এ শরৎ-শতবর্ষে মূল সভানেত্রীর ভাষণ, দুটোর কোনোটাই খুঁজে পাওয়া গেল না। দুই খণ্ডে রচনাগুলিকে 'গল্প', 'প্রবন্ধ', 'চিঠিপত্র', 'বাদানুবাদ', 'পরিশিষ্ট', 'সংযোজন' এইভাবে সাজিয়েছেন কল্যাণীয় অভিজিৎ সেন। সমস্ত রচনা সংগ্রহের পরিশ্রম তাঁর। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করে গেছেন কবি নরেন্দ্র দেব। বাবার ফাইল থেকে মায়ের প্রচুর গল্প ও প্রবন্ধের কাটিং পাওয়া গেছে। অনেক ভালোবাসায়, শ্রদ্ধায়, শ্রমে ও যত্নে এই কাজটি অভিজিৎ সম্পাদন করেছেন। শ্রীমতী যশোধরা বাগচীর অসীম উৎসাহে, উদ্যোগে, শ্রীমতী মালিনী ভট্টাচার্যের গৃহিণীপনায় এবং শ্রীমতী অনুরাধা চন্দের প্রশ্রয়ে এই বই প্রকাশিত হচ্ছে। রাধারাণী-অপরাজিতা বিষয়ে যাঁর মূল্যবান কাজ আছে, সেই শ্রীমতী শর্মিলা বসু-দত্তের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার পরিমাপ নেই। গুরুতর অসুস্থতাকে অগ্রাহ্য করে তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। শ্রীঅরিজিৎ কুমার ও শ্রীসুধাংশু দে'র ধৈর্যের পরিচয়ে আমি মুগ্ধ।

নবনীতা দেবসেন

'ভালো-বাসা'
৭২, হিন্দুস্থান পার্ক
কলকাতা ৭০০ ০২৯
১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪০৬

অপরাজিতা রাধারাণী

রাধারাণী দেবী আমার মাতৃপ্রতিম মাসিমা। তাঁর সুলেখিকা কন্যা ও একমাত্র সন্তান নবনীতার বন্ধু হিসাবে ছোটবেলা থেকেই আমি তাঁর স্নেহধন্যা। তাঁর জীবনের শেষভাগে এবং আমাদের জীবনের মধ্যভাগে আবার তাঁর কাছাকাছি আসবার সুযোগ হয়েছিল। তাঁকে গান শোনাতে গিয়ে 'গানের ভিতর দিয়ে' 'ভুবন'কে দেখবার ও চেনার যে সুযোগ পেয়েছিলাম তা ভোলবার নয়। তখন এইটুকু হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল যে মনের আকৃতির সঙ্গে মেধার সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর সাহিত্য ও জীবনের বিচারবোধে। কবি রাধারাণী দেবী যখন রোগশয্যা ছেড়ে উঠে তাঁর অবিস্মরণীয় শরৎ-বক্তৃতামালা দিতে গেলেন তখন চমৎকৃত হলেও ভেতর থেকে অবাক হইনি।

কিন্তু স্বীকার করতে বাধা নেই যে, রাধারাণী দেবীর সাহিত্য ও সমাজ-চিন্তার যে দীপ্তি এই শতকের দুইয়ের এবং তিনের দশক থেকে বাংলা সাহিত্যজগৎকে আলো করে রেখেছিল, তা বেশিরভাগ বাঙালি পাঠকই ভুলে যেতে বসেছিল। এই সংকলনের সাহিত্যিক প্রয়োজনীয়তা এইখানে যে কিংবদন্তীর সুপ্তি থেকে রাধারাণী দেবীর লেখার পাঠক-পাঠিকা আবার জেগে উঠবেন।

বাংলাসাহিত্যে মানবীবিদ্যাচর্চার প্রেক্ষাপটে রাধারাণী দেবীর লেখার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাঁর গল্প ও প্রবন্ধ ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে যে যদিও রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-গুরু, কিন্তু (কিংবা হয়তো সেজন্যই) তাঁর লেখার সিংহভাগ জুড়ে আছে নারী। নারীর সামাজিক মূল্যায়ন এবং তার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নারী-লেখনীর সাহিত্যিক মূল্যায়ন—এই দুটি তাঁর লেখাতে ফিরে এসেছে বারে বারে। ইলেইন শোওয়াল্টার নামক বিখ্যাত নারীবাদী সাহিত্য সমালোচকের ভাষায় feminist (অর্থাৎ নারী-বিষয়ক লেখার সমালোচনা) এবং gynocritics (অর্থাৎ নারী-লেখনীর সমালোচনা), দুইয়ের সমাবেশ দেখা যায় রাধারাণী দেবীর লেখায়। যদিও বেশিরভাগ আত্মসচেতন মহিলা লেখকের মধ্যেই এই প্রবণতা দেখা যায় কিন্তু রাধারাণী দেবীর লেখার ক্ষেত্রে এই প্রসঙ্গটি একটু বিশেষভাবে তাৎপর্যবহ।

তার লেখার অন্তর্নিহিত রূপটি বোঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝলাম যে তাঁর সাহিত্যচর্চার মানদণ্ডগুলি সম্পর্কে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। সেখানে লেখিকাদের জন্য তিনি কোনও 'অবলা'-বান্ধবের অনুপ্রবেশে রাজী নন। তার কারণ, তিনি যতরকমভাবে মেয়েদের সাহিত্যচর্চাকে বোঝবার এবং পাঠকদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, তা আর কোনও তুলনীয় খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক করেছেন বলে আমার জানা নেই। এরই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, তাঁর ছোটগল্পের নায়িকারা বেশিরভাগই সমাজে বঞ্চিত এবং কোনও না কোনওভাবে প্রত্যাখ্যাত। সাহিত্যজগতেও মেয়েদের অনুরূপ প্রত্যাখ্যানের সম্ভাবনা তিনি উপলব্ধি করেছেন, যে কারণে তিনি তাঁর

অভেদাত্মা (কারণ, কল্পিত) সখী অপরাজিতার গলায় প্রশ্ন করেছেন সাহিত্য-বিচারে ব্যক্তি-জীবনের অনুপ্রবেশ ঘটবে কেন? মেয়ে রচনা করলে সাহিত্যকে সাহিত্যের মাপকাঠিতে বিচার কবা হবে না কেন?

২

যে কথা আমি আগেও বলেছি, এখানেও তার পুনবাবৃত্তি প্রাসঙ্গিক—উনিশ শতকের শেষে নারী-সমস্যার কোনও জাতীয়তাবাদী সমাধান হয়নি, উল্টে এই সময় দিয়েই মেয়েদের লেখাতে পরিবারকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে নানারকম অভিযোগ ও বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বাদ পড়েও সচ্ছল পরিবারের মেয়েরা পত্রপত্রিকা ও বইয়ের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষাকে হাতিয়ার করে সমাজে প্রচলিত রীতিনীতিগুলিকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তোলেন। এরও মধ্যে সবচেয়ে চোখা প্রশ্ন বেখেছেন রাধারাণী দেবী, যে প্রশ্ন আজও মানবীবিদ্যার গবেষণায় বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়। যখন তিনি প্রশ্ন রাখেন : সতীত্ব কি মনুষ্যত্বেব সঙ্কোচক না প্রসারক? বিশ্বাস করা শক্ত হয় যে, তিনি আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে এই প্রশ্ন তুলছেন, যখন তিনি অকালবিধবা এবং প্রায় অখ্যাত একুশ বছর বয়সের এক যুবতী! এই লেখাটি এবং তজ্জনিত বাদানুবাদ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রণ করা হলো। রামমোহন রায়ের আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ সালে সতীদাহ নিবারণ আইন প্রণয়ন করা হলো বটে, কিন্তু সতীত্বের মতাদর্শের ভূত আমাদের ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনার কাঁধে ভর করল। ধীবে ধীরে নারীর সতীত্ব বিশুদ্ধ ভারতীয়ত্বের প্রতীক হযে প্রায় পেছনের দরজা দিয়ে আমাদের মনোজগৎকে অধিকার করল, যাব জেব টেনে চলেছি আমরা আজও, সামাজিক বিশুদ্ধাচবণের নামে মেয়েদেব শিক্ষা ও মানবিক অধিকার লঙ্ঘন করার মধ্য দিযে। সুকুমারী ভট্টাচার্য, উমা চক্রবর্তী, ইন্দিরা চৌধুরী প্রমুখের গবেষণার আলোতে সতীত্বেব মতাদর্শের শ্রেণী-লিঙ্গভিত্তিক সমালোচনা কবে আমরা আত্মপ্রসাদবোধ করে থাকি, কিন্তু এই শতকের দ্বিতীয় দশকে কলকাতার বনেদি ঘরের অন্তঃপুরের মধ্য থেকে রাধাবাণী দত্তের পক্ষে এ প্রশ্ন জোর গলায উচ্চারণ করবার 'অসম সাহসিকতা' অনস্বীকার্য। শুধু যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করবার সাহস তিনি দেখিয়েছেন তা-ই নয়, এ নিয়ে রসিকতা করতেও তিনি পিছপা হননি। সতীত্বের মুখোশ খুলতে গিয়ে তিনি 'আদমসুমারী'র আদলে শব্দ বানিয়েছেন 'সতী-সুমারী'! সুযোগ্যা কন্যা নবনীতার 'মাতৃ-ইয়ার্কি'র পাশে মা-ই বা কম যান কিসে? মেয়েরই মতো মায়ের শব্দচয়নেরও তাত্ত্বিক ভিত্তি সুদৃঢ় :

> অন্য দেশের সহিত তুলনায় আমাদেব দেশেও সতীর সংখ্যা হযত হিসাবে শতকরা অনেক বেশী হইতে পাবে; কিন্তু সেই 'সতী-সুমারী'র অনুপাত দেখিয়া গর্ব্বে ও উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিবাব কোনও কারণ নাই; কেননা, এ কথা অস্বীকার কবিবার

> উপায় নাই যে, আমাদের সতীব সংখ্যা যেমন অন্য দেশেব তুলনায সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তেমনি এ কথাও সত্য যে, আমাদেব দেশেব সতীত্বেব মধ্যে গলদ, গোঁজামিল ও ফাঁকিও অনেক বেশী। কিন্তু এই কঠিন সত্য উচ্চারণ করিবাব স্বাধীনতা এ দেশেব লোকেব নাই। একটু ধীবভাবে বিচাব কবিলে যদিও সকলেই এ বিষযের প্রকৃত মর্ম্মাবধাবণ কবিতে পাবিবেন নিশ্চয়, কিন্তু খুব কম লোকেই তাহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকাব করিতে সাহসী হইবেন।

আজও যেমন নারীর অধিকাব রক্ষার সংগ্রামকে বিজাতীয়ত্বের দোহাই পেড়ে সমাজে অপাংক্তেয় করে রাখার অপচেষ্টা দেখা যায়, রাধারাণী দেবী যখন স্বাভাবিক মনোবৃত্তিব ওপবে আসল সতীত্বকে স্থাপন করবার কঠোরতর আদর্শের প্রস্তাব দেন, সুনীতি দেবীব প্রতিবাদেও (ভর্ৎসনা বলাই বোধ হয় সমীচীন) একই সুব শোনা যায়:

> আব তুমি হিন্দু বমণীর স্বাভাবিক মনোধর্ম্মেব অপঘাত ঘটাইযা তাহাব স্থানে বলপূর্ব্বক যে বিদেশীয় মনোধর্ম্মের আসন স্থাপন কবিযাছ, এইটা কি স্বাভাবিক?
>
> (দ্র. 'বাদানুবাদ' অংশ)।

তখনকাব যুগেও 'নবীনা'দেব প্রচলিত বক্ষণশীলতাব বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হতো। ভূদেব মুখোপাধ্যাযের পৌত্রী অনুরূপা দেবীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ সংকলিত লেখাতে প্রকাশিত হলো (দ্র. 'বাদানুবাদ' অংশ)। এছাড়া মনে পড়ে, মাসিমার মৃত্যু-বৎসরে মৈত্রেয়ী দেবীর স্মৃতিচারণা—কোনও প্রকাশ্য সভায় শুভ্রবসনা নিবাভবণা বাধারাণী প্রতিবাদ করেন অনুরূপা দেবীর হিন্দুবিবাহের আইন সংশোধনেব বিরোধিতার বিরুদ্ধে। কথাটি শুনে চমকে উঠলেও পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। এই লেখাগুলি থেকে অনেকটাই পবিষ্কার হলো।

রাধারাণী দেবীব গল্প ও প্রবন্ধগুলি পাশাপাশি রেখে পড়লে বোঝা যায, কেন তিনি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে সাহিত্য-গুরুর আসনে বসিয়েছেন। সমাজেব কৃত্রিম অনুশাসনেব চোরাবালিতে মানুষের স্বাভাবিক মনোধর্মের 'আকৃতি'ব মুক্তধাবা বাবে বারে আটকা পড়ে যায়—বাধারাণী দেবী ছিলেন সে সম্পর্কে অতিমাত্রায সচেতন। 'শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে' গল্পে সাবিত্রী বা 'বিস্তীর্ণ বারিধিব একটি বুদ্বুদ' গল্পে উচ্চবর্ণের হিন্দু-বিধবার প্রতি সামাজিক অবিচারেব বিরুদ্ধে অভিমান করে বৈধব্যের নিবাভরণ নিঃস্বতাকেই আঁকড়ে ধরে। অরক্ষণীয়া ক্ষেন্তি পিতামাতার দারিদ্র্য, যৌতুকেব জন্য চাপ ও সমাজের নিরন্তর সমালোচনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে আত্মহননেব চেষ্টা কবে। যে আদর্শবাদী যুবক তাকে মৃত্যুর কবল থেকে ফিরিয়ে আনে তাব গায়ে কুৎসার কাদা ছিটিয়ে সমাজপতিরা ছোট মেয়েটির বেঁচে ওঠাকে বলেন 'যমেব অরুচি'। কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে তাঁর এই জেহাদ তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তরুণ সাহিত্যিকদের সম্পর্কে কৃত্রিমতার অভিযোগের স্বরূপ নির্ণয়ে:

> কৃত্রিম-সাহিত্য-সৌধ-বচনা পূর্ব্বতন সাহিত্যেও চলছিল, আধুনিক সাহিত্যেও চলেছে।

মিস্ত্রী বদলের সাথে সাথে মালমশলা ও রং ঢংয়ের বদল হয়েছে এই মাত্র।...

> সামাজিক জীবনযাত্রায় আমাদের প্রাণ না থাকুক ভান আছে যথেষ্ট। সেই ভান দীর্ঘ-শতাব্দী-ব্যাপী অভ্যাসের ফলে আমরা এমনি স্বাভাবিক কবে ফেলেছি, যে, এখন এব প্রকৃত রূপটি চেনা কঠিন। সাহিত্যেও এই ছদ্ম সুনিপুণ ভানটিই ফুটে উঠেছে। এই ভানটুকুকেই আমরা আমাদেব সত্যকারের দান বলে মনে করি।

যে কৃত্রিমতার নাগপাশে সমাজ ও সাহিত্যের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, তার বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন। এই প্রতিবাদ কেবলমাত্র অনুশাসনের কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে নয়, নতুনভাবে নরনারীর সম্পর্ক রচনা করবার কাজেও লাগিয়েছেন। 'সাগর-স্বপ্ন' গল্পে সমুদ্রের ধারে দেখা হওয়ার সূত্র ধরে একটি আর্টিস্ট যুবক মুকুর ও এক অনূঢ়া তরুণী নীলিকা কীভাবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলো—কিন্তু না-বলা কথার আড়ালে এই সম্পর্কটি হারিয়ে গেল, প্রমাণ রইল শুধু এই আর্টিস্টেব আঁকা ছবিটি —যার মুখের আদলে ধরা পড়ে গেল তার মানসসুন্দরী। এই আল্‌তো কবে ছুঁয়ে যাওয়া প্রেমের গল্পটির মধ্যে আমরা সামাজিক বিন্যাসের নতুন সম্ভাবনাগুলিকে খুঁজে পাই। পশ্চিমী কথাসাহিত্যের প্রভাব একেবারে উড়িয়ে না দিয়েও বলা যায় যে নরনারীব সম্পর্কের যে নতুন বিন্যাস আমরা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, উপন্যাস এবং গানেব মধ্যে পাই, রাধারাণী দেবী সেই ধারাটিকে নিজস্ব রূপ দিয়েছেন। 'ঘরে-বাইরে', 'দুই বোন', এবং 'নাবী-প্রকৃতির দ্বিবিধ রূপ' আলোচনাতেও তিনি এই নতুন ধবনের মননের প্রক্রিয়াটিকে তুলে ধরেছেন।

স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের ফলে অন্তঃপুরে যে পাঠিকাসমাজ তৈরি হয়েছিল, তার থেকেই লেখিকারা বেরিয়ে এসেছেন। পাঠিকাকে লেখিকা বানানোর প্রক্রিয়াটিতে যে রবীন্দ্রনাথেব বিশেষ অবদান, রাধারাণী দেবী সেটি প্রকাশ করেছেন 'অন্তঃপুরে ববীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে। ১৩৩৫ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তিনি লিখছেন :

> ববীন্দ্রনাথেব কাব্য-সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করবার মতো সজাগ ও সূক্ষ্ম রসানুভূতি (intuition) এ'দেশেব অসাড়মনা শিক্ষিত সম্প্রদাযেব মধ্যে আজও সম্পূর্ণ জাগ্রত হয়নি। কাব্য-প্রীতি মানুষেব সহজ ভাল লাগা বা স্বাভাবিক বসানুভূতির উপব নির্ভব কবে। নাবীজাতির মধ্যে এই intuition বা সহজ জ্ঞান ও অনুভূতিশক্তি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং জাগ্রত। সববকম শিক্ষার উৎকর্ষ থেকে বঞ্চিতা হ'য়ে অন্তঃপুবের বান্না, ভাঁড়াব ও শোবাব ঘরেব গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে অবরোধবন্দিনী বাংলাব মেয়েবা, পরমেশ্বরের দান এই সহজ প্রত্যয় ও রসানুভূতি-শক্তি থেকে বঞ্চিতা হয়নি। তাই তাবা তাদের যৎসামান্য বিদ্যার পুঁজি সম্বল কবেও রবীন্দ্রনাথের কাব্য-অমৃতেব বিচিত্র মধুর রসাস্বাদনে সমর্থা হ'তে পেরেছে। আর সেইটেকেই তাদের অবরুদ্ধ কারা-জীবনের কর্ম্ম ও শাসন-নিষ্পেষিত দিনগুলির একমাত্র আনন্দ-ক্ষণরূপে গ্রহণ করে ধন্যা হ'য়েছে।

বাংলা সাহিত্যে নারীর মূল্যায়ন নিয়ে রাধারাণী দেবীর চিন্তাভাবনা মানবীবিদ্যাচর্চা ক্ষেত্রে আজকের দিনে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষার জগতে পুরুষের চেয়ে অনেক দেরিতে

সুযোগ পাওয়ার দরুন সাহিত্যের জগতেও তাঁদের অনুপ্রবেশ হয় দেরিতে। রাধারাণী-অপরাজিতা প্রসঙ্গে নবনীতা দেবসেনের ভূমিকা থেকে যেটি বোঝা গিয়েছিল, সেটি এখানে আরও জোরদার হলো যে ব্যক্তি-পরিচয়ের সঙ্গে সাহিত্যিক বিচাব মিশিয়ে ফেলাতে তাঁর ঘোর আপত্তি। আজকের দিনে আমরা যখন মহিলাদের লেখার ওপরে বিশেষভাবে জোর দিই তখন তাঁদের নারীত্বের সম্পর্কে একটা দায়বদ্ধতার অঙ্গীকাব থাকে। রাধারাণী দেবীর মতের সঙ্গে আমাদের কি এ-ব্যাপাবে পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে না?

নারীত্বের আদর্শের সম্পর্কে তাঁর কিছু কিছু মতামত বিষযে দ্বিমত থাকলেও সাহিত্যক্ষেত্রে নারীর মূল্য বিচারের জায়গাটিতে তাঁর প্রতি আমাদের ঋণ স্বীকার না করে উপায় নেই। নাবী-পুরুষেব লেখার বিচারেব মাপকাঠি আলাদা হওয়াব মধ্যে তিনি দেখতে পান নাবীর প্রতি সমাজের দ্বিমুখীনতাবই আব এক অভিব্যক্তি। বাংলা সাহিত্যে মেযেদের অবদান নিয়ে যে দুটি লেখা এই সংকলনেব অন্তর্ভুক্ত হলো: 'বাংলাদেশে মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (১৩৩৮) এবং 'বাঙলা সাহিত্যে নারী : এক শতাব্দীব ইতিহাস' (১৩৪৪)—সে দুটি থেকেই বোঝা যায় কতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে এই দুটি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ কবে তবে এই লেখাগুলি লিখেছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সাহিত্যে মেয়েদেব ভূমিকাব গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা বহির্জগতে মেযেদের সামাজিক মূল্যায়নের দিকে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। গোড়াব দিকেব নাবী-আন্দোলনের লক্ষ্য কেবলমাত্র মেয়েদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওযাই নয়, সার্বিকভাবে মেয়েদের আত্মসচেতনতার বিকাশও বটে। সেই অর্থে রাধারাণী দেবীকে ভাবতীয় নারী-আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি দেওযাব প্রযোজন আছে। সাহিত্যে মেয়েদের অবদানের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি তাঁব বিচারের মাপকাঠিকে রেখেছিলেন অনমনীয়। বাংলা সাহিত্যে নাবীর অবদানের এক শতাব্দীব ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন যে মেয়েদেব সাহিত্য-'সাধনা'ব যে পরিমাণ নিদর্শন তিনি পেযেছেন, তাঁদের সাহিত্য-'প্রতিভা' ততটা পাননি।

কিন্তু আমরা আগেও দেখেছি যে নারীমনের 'আকৃতি'ব সততা যদি সাহস করে কেউ প্রকাশ কবতে পারেন তাহলে তিনি সমালোচক রাধারাণী দেবীর সমর্থন পাবেন। অনেক পবে লেখা হলেও 'আশাপূর্ণার লেখা' প্রবন্ধটিতে তিনি বলেন:

> যে-সাহিত্য ভাল হয়েছে, যে-সাহিত্য যথার্থ সাহিত্যগুণসম্পন্ন, সে-সাহিত্য কেন তাব সমকালীনদেব কাছে সমাদব পাবে না? দূবকালের অনাগত সমালোচকেব অপেক্ষায তাদেব প্রতীক্ষিত থাকতে হবে।

এই প্রসঙ্গে তিনি জ্যোতির্ময়ী দেবীর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আশাপূর্ণার ট্রিলজির মধ্যে ডানা-ঝাপটানো নারী-অন্তবাত্মাব তিনটি প্রজন্মের বিবর্তনের মধ্যে তিনি যে সারা বিশ্বের ছায়া দেখতে পেযেছেন, এই বোধ কিন্তু আজকেব মেয়েদের। তিনি বলছেন:

এই বন্দী মানবাত্মাব বন্ধনমুক্তির আর্তি কোনও বিশেষ একটি ভৌগলিক কোণে ঘটলেও, এ কিন্তু সারা বিশ্বের। বিভিন্ন কালের সীমানায় এরা বিশ্বের সকল দেশে এই একইভাবে বন্ধনে যন্ত্রণা পেয়েছে, কেউ কেউ বিদ্রোহ কবেছে পাথবের পাঁচিলে মাথা ঠুকে রক্তাক্ত হযে।

আজকের নারীবাদ যদিও সার্বজনীনতার (universalism) চাইতে অস্মিতায় (ıdentity) বেশি বিশ্বাসী, কিন্তু রাধারাণী দেবীর উপরোক্ত অভিমতের সমর্থন মিলেছিল ১৯৯৩ সালে লাতিন আমেরিকার Costa Rica-তে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতীয় মানবীবিদ্যা সম্মেলনে। সেখানে ড. শিবানী ব্যানার্জি-চক্রবর্তীর লেখা আশাপূর্ণা দেবীর ট্রিলজিব ওপরে গবেষণামূলক একটি সন্দর্ভ তাঁর অনুপস্থিতিতে আমাকে পাঠ করতে হয়েছিল। পড়া শেষ হয়ে গেলে পৃথিবীর বিভিন্ন দিক থেকে আসা মহিলারা আমাকে ঘিরে ধরেছিলেন জিজ্ঞাসা করতে, কোথায় তাঁরা এই বইগুলি দেখতে পাবেন। কারণ, প্রত্যেকে নিজেদের সামাজিক সংগ্রামের ছায়া দেখেছিলেন আশাপূর্ণার লেখাতে।

পুনর্মুদ্রণেব অনুমতি দিযে নবনীতা মাতৃদাযই পালন করেনি, বাংলা সাহিত্যেব প্রতি তার ঋণ শোধ দিযেছে। এই কাজে কিঞ্চিৎ সহযোগিতার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে কবছি। 'সৃজিত-সাহিত্যে'র প্রতি বাধারাণী দেবীব পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে তিনি নির্মাতাও বটে। মানবীবিদ্যাচর্চার পূর্বসূবি বাধারাণী দেবী আজও অপরাজিতা।

মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র,
যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯৯

যশোধরা বাগচী

সংকলন প্রসঙ্গে

১৯৯৭-এর পুজোর পরে এই সংকলনের কাজটি শুরু করা হয়েছিল। আজ, ঠিক দু'বছর পরে, সেই আরব্ধ কাজের প্রথমাংশ সম্পূর্ণতা পেল। আগামী ৩০ নভেম্বর, মঙ্গলবার, রাধারাণী দেবীব ৯৬তম জন্মদিনে তাঁর (গদ্য) রচনা-সংকলনের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হতে চলেছে। সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডেব কাজ প্রায় শেষদিকে—সম্ভবত বড়দিন বা বইমেলার ঠিক আগে ঐ খণ্ডটিও প্রকাশিত হবে। বস্তুত, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর সংকলনের কাজ একরকম শেষ হল বলা যেতে পারে। দু' বছরের এই ধারাবাহিক কাজটিতে বেশ কিছু প্রাবম্ভিক বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হলেও সংশ্লিষ্ট কারোবই উৎসাহ ও আনন্দের অভাব কখনোই ঘটেনি। সময়মতো নানাজনের সহৃদয় সহায়তা ও সুপবামর্শে প্রথমদিকের বাধা পেরোনোও গেছে—এটাই স্বস্তির কথা।

বাধারাণী দত্ত/রাধারাণী দেবীর এই বিস্মৃতপ্রায় গদ্যরচনাগুলো একজায়গায় একত্রিত করে প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। ১৯৭৬ সালে শরৎশতবর্ষে 'দেশ' পত্রিকায় ধাবাবাহিকভাবে বেরোনোব পরে 'শবৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প' বইটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই গদ্যগ্রন্থটি ছাড়া বাধারাণীর বযস্কপাঠ্য গদ্যবচনার অন্য কোনো সংকলন আগে কখনো প্রকাশিত হয়নি। কেন হয়নি সে-ব্যাপারে শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী নবনীতা দেবসেন তাঁর ভূমিকায় কিছুটা অনুমানের ওপর নির্ভব করে বিস্তারিতভাবে বলেছেন। প্রথম যুগে লেখা এইসব গদ্যরচনার কোনোটাই কিন্তু 'অপ্রয়োজনীয়' নয়। পাঠক ও গবেষকরা এগুলো পাঠ করে উপকৃতই হবেন। সবরকমেব লেখাকে সংকলনভুক্ত করবাব চেষ্টা (নির্বাচন না করেই) আমবা যথাসাধ্য কবেছি। কিছু লেখা অবশ্য বাদ পড়েছে। এদেব মধ্যে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শান্তিনিকেতনে নববর্ষ-উৎসব' লেখাটি আষাঢ় ১৩৪৮ সংখ্যায় বেবিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখনও জীবিত এবং শান্তিনিকেতনেই আছেন। অন্য লেখাটি 'মন্দিবা' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ('রবীন্দ্রনাথ ও আজকের কর্ত্তব্য')। খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুব অব্যবহিত পরেই এটি লেখা। উৎসাহী পাঠকদের কৌতূহল নিবারণের জন্য অনেক চেষ্টা করেও এটি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হল না। হয়তো রচনা-সংকলনের দ্বিতীয় সংস্কবণ প্রকাশিত হলে এই বাদ-পড়ে-যাওয়া লেখাগুলো গ্রন্থভুক্ত হবে। এছাড়া সংকলনে গেল না তাঁর 'গল্পের আলপনা' (মহালয়া, ১৩৬২) বইয়ের একুশটি কিশোরপাঠ্য গল্প-কাহিনী এবং 'পাঠশালা', 'বার্ষিক শিশুসাথী', 'দেবদেউল', 'যাদুঘর', 'শারদীয় যুগান্তর', 'আহরণী' এবং অন্যান্য অনেক পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে-থাকা বিভিন্ন সময়ে লেখা তাঁর ছোটদের জন্য রূপকথা, গল্প এবং ভ্রমণকাহিনী। কোনো সংবেদনশীল প্রকাশক যদি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে রাধারাণী দেবীর কিশোর রচনার একটি সংকলন প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তবে খুবই ভালো হয়।

মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের পূর্ব-প্রকাশিত অন্যান্য রচনা-সংকলনের মতো এখানেও মূলের বানান, যতিচিহ্ন, অনুচ্ছেদ/পরিচ্ছেদ-বিভাগ সবই অক্ষত রাখা হয়েছে। গল্প বা প্রবন্ধের বানানের কোনো জায়গাতেই দ্বিত্ব বর্জন করা হয়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম 'গতানুগতিক' গল্পটি (কার্তিক, ১৩৩৯)। 'গল্পলহরী' পত্রিকায় প্রকাশের সময়ে গল্পটিতে দ্বিত্ব বর্জিত আধুনিক বানানরীতি অবলম্বন করা হয়েছিল। আমরা ঠিক সেভাবেই পুনর্মুদ্রণ করেছি। কৌতূহলী পাঠক আমাদের এই বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে যে-কোনো সাধারণ গ্রন্থাগারে গিয়ে মূলের পাঠটি দেখে নিতে পারেন। অনেক পরবর্তীকালে প্রকাশিত—শেষ তিনটি প্রবন্ধের বানানেও দ্বিত্ব বর্জিত হয়েছে ('অতি-সাম্প্রতিক কাব্য-সাহিত্য' : ১৩৬০ ; 'আশাপূর্ণার লেখা' : ১৩৮১ ; 'শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র' : ১৩৮২)। বানানে সমতা না-রাখাটা সম্পাদনার ত্রুটি হিসেবে গণ্য হতেই পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ মূলানুগ থাকার জন্যেই এ-পন্থা অবলম্বন না করে উপায় ছিল না।

রাধারাণী দেবীর গল্প ও প্রবন্ধের পটভূমি হিসেবে শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী নবনীতা দেবসেনের মুখবন্ধটি নিঃসন্দেহে এই সংকলনগ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। তাঁর নিবন্ধে যে-সব বিষয়ের ওপর তিনি আলোকসম্পাত করেছেন, এর পরে রাধারাণী দেবী বিষয়ে নতুন করে কিছু বলার সম্ভবত আর অবকাশ থাকে না।—অন্তত সে-ক্ষমতা এই সংকলকের নেই। অন্যদিকে শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী যশোধরা বাগচী গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োচিত আলোচনাটিতে তাঁর অভিমত অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে ব্যক্ত করেছেন। বিশেষ প্রয়োজনীয় এই লেখাদুটির জন্য তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। সুপরামর্শ, মূল্যবান সময় ও প্রতিনিয়ত উৎসাহ প্রদান করেছেন শ্রী সৌরীন ভট্টাচার্য, শ্রী মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী মালিনী ভট্টাচার্য, শ্রী স্বপন চক্রবর্তী এবং শ্রী অম্লান দাশগুপ্ত। শ্রীসুধাংশুশেখর দে এবং শ্রীঅরিজিৎ কুমারের স্থৈর্য ও নিষ্ঠায় আমরা অভিভূত। এঁদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। মুদ্রণের কাজ চলাকালীন যাঁদের বিশেষ সহায়তা পেয়েছি তাঁরা হলেন—শ্রীমতী মউলি মিশ্র, শ্রীমতী বুলবুলি বিশ্বাস ও শ্রীমতী অনিন্দিতা ভাদুড়ী। প্রত্যেকের প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা। সংকলনের প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত রাধারাণী দেবীর আলোকচিত্রটি শ্রদ্ধেয় শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়-কর্তৃক গৃহীত এবং তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে পেয়েছি। তাঁকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন-এর প্রথম খণ্ড এবং আসন্ন প্রকাশিতব্য দ্বিতীয় খণ্ড বাংলা বইয়েব পাঠকদের মনে যদি কিছুমাত্র সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলতে পারব। আপাতত এর বেশি কিছু বক্তব্য আমার আর নেই।

নভেম্বব, ১৯৯৯ — অভিজিৎ সেন

রাধারাণী দেবী : জীবনপঞ্জি

১৯০৩	:	কোচবিহারে জন্মগ্রহণ (৩০ নভেম্বর : ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৩১১)। পিতামাতার চোদ্দ সন্তানের মধ্যে একাদশ। পিতামহ : হরিনাভি গ্রামের জমিদার পঞ্চানন ঘোষ। পরে বেনিয়ান হন। পিতা : আশুতোষ ঘোষ (জন্ম আনুমানিক ১৮৬২)। কোচবিহারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর। পরবর্তীকালে ম্যাজিস্ট্রেট হন। মাতা : নারায়ণী। কলকাতা হাটখোলা দত্ত-পরিবারের মেয়ে।
১৯১৬	:	১৩ বছর বয়সে বিবাহ। পাত্র : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। পেশায় ইলেকট্রিকাল্ এঞ্জিনিয়ার, রামপুর স্টেটে কাজ করতেন। বিবাহের বছরেই এশিয়াটিক ফ্লু রোগে আক্রান্ত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু এবং ১৩ বছর বয়সে রাধারাণীর বৈধব্য-জীবনের শুরু। মামাশ্বশুর সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের সংসারে স্নেহপূর্ণ জীবনযাপন। সাহিত্যচর্চায় উৎসাহদান।
১৯২৭	:	নরেন্দ্র দেবের একক সম্পাদনায় সুবিপুল কাব্য-সংগ্রহগ্রন্থ 'কাব্য-দীপালি' প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা ও সংকলনে নরেন্দ্র দেবকে রাধারাণীর সক্রিয় সহযোগিতা দান।
১৯২৯	:	প্রথম কবিতার বই 'লীলাকমল' প্রকাশিত (ফাল্গুন ১৩৩৬)।
১৯৩০	:	অপরাজিতা দেবী নামে লিখিত তেরোটি কবিতার সংগ্রহ 'বুকের বীণা' প্রকাশিত।
১৯৩১	:	কবি নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে বিবাহ (৩১ মে : ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮)। নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদিত 'কাব্য-দীপালি'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।
১৯৩২	:	চৌত্রিশটি মিলনবিষয়ক সনেট-সংগ্রহ 'সীঁথি-মৌর' প্রকাশিত।
১৯৩৪	:	দশটি কবিতার সংগ্রহ 'আঙিনার ফুল' কাব্যগ্রন্থ (অপরাজিতা দেবী নামে লিখিত) প্রকাশিত।
১৯৩৫	:	আঠারোটি কবিতার সংগ্রহ 'পুরবাসিনী' কাব্যগ্রন্থ (অপরাজিতা দেবী নামে লিখিত) প্রকাশিত।
১৯৩৭	:	নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় দেব সাহিত্য কুটির থেকে ছোটদের পূজাবার্ষিকী 'সোনার কাঠি' প্রকাশিত। অপরাজিতা দেবী নামে লিখিত চতুর্থ ও শেষ কবিতা-সংকলন 'বিচিত্ররূপিণী' প্রকাশিত (তেরোটি কবিতার সংকলন)।
১৯৩৮	:	কন্যাসন্তানের জন্ম। রবীন্দ্রনাথ নাম দিলেন 'নবনীতা'। 'বনবিহগী' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৪৪ : বেদ, সংহিতা, মনুসংহিতা প্রভৃতি থেকে সংকলিত হিন্দু বিবাহমন্ত্রের কাব্যানুবাদ 'মিলনের মন্ত্রমালা' প্রকাশিত।

১৯৪৬ : নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় চোদ্দজন লেখক-লেখিকার গল্পসংগ্রহ 'কথাশিল্প' প্রকাশিত (আশ্বিন ১৩৫৩)।

১৯৪৮ : W.B. PEN-এর যুগ্ম-সম্পাদক নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী।

১৯৫০ : ইয়োরোপ-যাত্রা। PEN কনফারেন্সে স্বামী-স্ত্রীর ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব। ছ'মাস পশ্চিম ইয়োরোপের নানা জায়গায় স-কন্যা ভ্রমণ।

১৯৫৫ : পূর্ব-ইয়োরোপ ও সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ। ফিনল্যাণ্ডের পীস্-কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবীর যাত্রা। ঐ সময়ে হো-চি-মিন, আগাথা ক্রিস্টি, মিখাইল শলোকভ, ইলিয়া এরেনবুর্গ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা হয়। একুশটি কিশোরপাঠ্য গল্প-কাহিনীর সংকলন 'গল্পের আলপনা' প্রকাশিত (মহালয়া ১৩৬২)।

১৯৫৬ : ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদকপ্রাপ্তি।

১৯৫৯ : কন্যার উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশযাত্রা। কেম্ব্রিজে বিবাহের বাগ্‌দান, অমর্ত্য সেনের সঙ্গে।

১৯৬০ : কন্যার বিবাহ।

১৯৭১ : কবি নরেন্দ্র দেবের তিরোধান (১৯ এপ্রিল)। রাধারাণী দেবীর পুনর্বৈধব্য। 'সাহিত্যতীর্থ' পত্রিকায় একগুচ্ছ বিরহবিষয়ক সনেট প্রকাশিত। বই হয়ে কখনো বেরোয়নি।

১৯৭৫ : শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতামালা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প' ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশের পর ১৯৭৬-এ বই হয়ে বেরোয়।

১৯৭৬ : কন্যার বিবাহবিচ্ছেদ। রাধারাণীর শয্যাগ্রহণ।

১৯৮৩ : আশি বছরের জন্মোৎসব। 'ভালো-বাসা' বাড়িতে নক্ষত্র-সমাবেশ। 'তাঁকে লিখিত চিঠির থলে থেকে সামান্য এক গোছা তুলে নিয়ে' 'টুকরো চিঠি' প্রকাশিত (৩০ নভেম্বর : ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৯০)।

১৯৮৪ : নবনীতা দেবসেনের সম্পাদনায় 'অপরাজিতা-রচনাবলী' প্রকাশিত।

১৯৮৬ : রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্তি।

১৯৮৮ : নরেন্দ্র দেবের শতবর্ষ উদ্‌যাপন। 'ভালো-বাসা' বাড়িতে মহোৎসব। রাধারাণীর সানন্দ উপস্থিতিতে নক্ষত্র-সমাবেশ।

১৯৮৯ : ৮৬ বৎসর বয়সে তিরোধান (৯ সেপ্টেম্বর)। কন্যা নবনীতা, দুই দৌহিত্রী অন্তরা ও নন্দনাকে রেখে গেছেন।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

পুরুষ

পুরুষ যেদিন প্রথম ধরার বুকে চোখ মেলে চাইলে, দেখতে পেলে সবার প্রথমেই সে মায়ের হাসি মুখ। প্রথম যখন সে হাত বাড়িয়ে মানুষের স্পর্শ অনুভব করতে চাইলে, হাতে পড়ল তার— প্রথমেই মায়ের অমৃত-উৎস বুক। প্রথম আস্বাদন করলে সে মায়েরই বুকের সেই ক্ষীরধারা। প্রথম সে কানে শুনলে—মায়েরই মধুরকণ্ঠ-নিঃসৃত ঘুম-পাড়ানী গান।

উপরে সমগ্র সৌরজগতের দিকে একবার, নীচের বিশ্বপ্রকৃতির দিকে একবার সে অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে। তারপর যখন সে ফিরে চেয়ে দেখলে আর একবার তার মায়ের দিকে, তার সেই অকলুষ দৃষ্টিতে নারীই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ ও মহানরূপে প্রতিফলিত হল।

ভক্তিনম্র বিনতির সুর রোদনে রূপান্তরিত হয়ে পুরুষের কণ্ঠ দিয়ে প্রথম নির্গত হ'ল— প্রথম বাণী উচ্চারিত হ'ল—মা-মা-মা!

পুরুষ চলতে শিখলে, খেলতে শিখলে। বাইরের আলো ও ছায়া তখন তার শরীর ও মনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। নারীর প্রতি পুরুষ চেয়ে দেখলে। বার বার দেখে বললে—'নারী আমাদেরই সমান! আমাদের চেয়ে বড় তো নয়।'

পুরুষ যুদ্ধ করতে শিখলে। পেশী পুষ্ট, লৌহবৎ দৃঢ় দেহ, সবল বাহু। শক্তির মত্ততায় মাতাল হয়ে পুরুষ এবার নারীর প্রতি অবহেলার সঙ্গে চেয়ে দেখলে — ওঃ। অনেক নীচে—অনেক নীচে তার নারী! ছিঃ ছিঃ! কি অসহায়, কি দুর্বল ওরা!

পুরুষের প্রদীপ্ত চক্ষুদ্বয়ে অবজ্ঞার ছায়া এসে উঁকি মারতে লাগল। ঈষৎ কুঞ্চিত অধরোষ্ঠে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের মৃদু হাস্যরেখা ফুটে উঠল।

পুরুষের শক্তির জোয়ার-ভাঁটা শুরু হয়েছে। রক্তের তেজ ক্ষীণ হয়ে আসছে, উষ্ণতা ক্রমেই কমছে, পেশীসমূহ শ্লথ ও চর্ম্ম শিথিল হচ্ছে। শারীরিক ও মানসিক সম্পদের ভাণ্ডারে তার অনটনের সূত্রপাত দেখা দিয়েছে, চাইলেই সব সময়ে সবটাই ঠিকমতো পাওয়া যায় না।

নারীর দিকে পুরুষ চেয়ে দেখলে— তাই ত! এরা যে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটিই রয়েছে!... এরা যদি এইবার উঠে দাঁড়ায়? নিজের নিঃশেষিতপ্রায় শক্তির ভাণ্ডারে দৃষ্টি পড়ায় পুরুষ শঙ্কিত হয়ে উঠলে।

হাত-পা রজ্জুবদ্ধ করে, গলদেশে গুরুভার শৃঙ্খল পরিয়ে, তার কণ্ঠ রুদ্ধ করে, অন্ধকার গৃহকোণে জড়পিণ্ডবৎ নারীকে ফেলে রেখে পুরুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলে!

পুরুষের বার্ধক্য এসেছে। সে শক্তিশূন্য, জরায় অবসন্ন। তার কৃষ্ণ কেশরাশি রজতধবলে পরিণত হয়েছে। প্রখরকজ্জল চক্ষুতারকা আজ নিষ্প্রভ। নিরাশায় অবসাদে

তার বজ্রবক্ষ যেন চূর্ণ পাষাণস্তূপে পরিণত হয়েছে। হায়! তার সে অমিত তেজ, সে শক্তি আজ কোথায়? যে শক্তির নেশায়, যে শক্তির দম্ভে সে একদিন সকলই তুচ্ছ করেছিল, নারীকে দুর্বল দেখে অবহেলাভরে যে তাকে নিজের শক্তির চাপে পায়ের নীচে নিষ্পেষিত করে রেখেছিল, কোথায় আজ তার সেই শক্তি?

পুরুষ তার চারিদিকে আকুল হয়ে চেয়ে দেখলে। অন্ধকার গৃহকোণে তারই নিজের পদতলে মৃতবৎ ও কি পড়ে?... জ্যোৎস্নার ন্যায় স্নিগ্ধ অথচ রবিকরের মতো উজ্জ্বল— আবর্জনায় আবৃত মণিখণ্ডের মতো ম্লান অথচ দ্যুতিসম্পন্ন! পুরুষ বিস্মিত আগ্রহে তাকে স্পর্শ করলে। একি! শরীরের সমস্ত নির্জীবতা, জড়তা, দুর্বলতা, অবসাদ সব সরে গিয়ে এ কি নতুন সজীবতা তার সর্বাঙ্গে জেগে উঠল!

পুরুষের শক্তির নেশা, স্বার্থের নেশা, ভোগের নেশা প্রশমিত হয়েছে। তার চোখে জল! ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র শক্তি, সুখের জন্য সে তার বৃহত্তর সম্পদের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। সর্ব্বশক্তির উৎস, সর্ব্বশক্তির কেন্দ্রমুখে সে তার বিপুল অবহেলায় পাষাণভার চাপা দিয়ে শক্তির অফুরন্ত প্রবাহের গতিরোধ করেছে!

পুরুষ সে পাষাণভার অপসারিত করবার চেষ্টা করলে—একবার, দু'বার—তিনবার— বহুবার। কিন্তু আজ তার সে শক্তি নেই, যে শক্তিতে সে নিজেই একদিন এই পাথরকে ঠেলে এনেছিল! পুরুষের নীচ স্বার্থের কুটিলতা আজ সে পাষাণখণ্ডকে আরও দৃঢ়-সংলগ্ন করে দিয়েছে।

হায়! কি ভুলই সে করেছে! কিন্তু ভুল বোঝবার সঙ্গে সঙ্গেই হতভাগ্য পুরুষের দৃষ্টিপথে কালো পর্দাখানি নেমে এল! কানের কাছে পারের ঘণ্টা ঘন ঘন বেজে উঠল। মৃত্যু-বিবর্ণ পুরুষের সেই পাণ্ডুর বিকম্পিত ওষ্ঠাধর ভেদ করে তার রুদ্ধ-প্রায় কণ্ঠ হতে অতি ধীরে তখন আর একবার ধ্বনিত হল —মা—

কল্লোল, পৌষ ১৩৩১

সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক?

'সতীত্ব' কথাটা লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিপুল বাগ্-যুদ্ধ চলিতেছে বটে, কিন্তু এই 'সতীত্ব' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি এবং সতীরই বা প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা এ পর্য্যন্ত খোলাখুলিভাবে কোথাও আলোচিত হয় নাই।

দেহের অপবিত্রতা না ঘটিলেই সতীত্ব অব্যাহত থাকে, না মন অশুচি হইলেই অসতী হইতে হয়, এই সমস্যার একটা সহজ সরল সমাধান আবশ্যক। মানুষের মনের স্বাভাবিক ধর্ম্মই এই যে, যেখানে সে উদারতা, মহানুভবতা প্রভৃতি সদ্গুণের

বা দেবত্বের বিকাশ দেখে, সেইখানেই সে ভক্তি ভালবাসা কিম্বা শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়ে। সদ্‌গুণ ও সৌন্দর্য্যের প্রতি চিত্তের স্বতঃই আকৃষ্ট হওয়া মনোধর্ম্মেরই একটা দিক। সাংখ্যকার মনের এই অবস্থাকে 'আকৃতি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'আকৃতি' অনেকটা মনের Subconscious অবস্থা ; অর্থাৎ যেমন বৎসকে দুগ্ধপানার্থ অগ্রসর হইয়া আসিতে দেখিয়া পয়স্বিনী গাভীর স্তনাগ্র হইতে দুগ্ধ আপনিই ক্ষরিত হইতে থাকে, গাভী স্বেচ্ছায় দুগ্ধ ক্ষরণ করে না, বা ইচ্ছানুসারে উক্ত দুগ্ধ ক্ষরণ রোধ করিতে পারে না,—মনের সেই অবস্থাকেই 'আকৃতি' বলে। জড়পরমাণুরাশিও এই আকৃতির আক্রমণের অতীত নহে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এই বিশেষ গুণকে sympathy ও antipathy বা 'সম্বেদ-নির্বেদ' বলিয়া গিয়াছেন ; ইহাকে অনুরাগ-বিরাগও বলা যাইতে পারে। সাংখ্যকার বলেন, সূক্ষ্মতম আকাশ যে পৃথ্বীরূপে পরিণত হইয়াছে, ইহা অনুলোম-ক্রমে বায়ু, তেজ ও সলিলের মধ্য দিয়া যখন পিণ্ডীভূত হয়, তাহাও একরূপ আকৃতির প্ররোচনায়। জড়পরমাণুগুলির কয়েকটি যদি active হয়, অর্থাৎ move করে, তবে তাহাদের আশেপাশের পরমাণুগুলিও সেই movement-এ যোগ না দিয়া থাকিতে পারে না। জগতের এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা sympathy-কেই সাংখ্যকার বলিয়া গিয়াছেন 'আকৃতি'।

যেখানেই মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখে অথবা দেবোচিত ভাব উপলব্ধি করে—স্নেহ, প্রেম, করুণা, বাৎসল্য, মমতা, প্রীতি, ধৈর্য্য, ঔদার্য্য, বীর্য্য, ক্ষমা, মহত্ত্ব, তিতিক্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণ ও সদবৃত্তিগুলি যেখানে অধিকতর সুপরিস্ফুটভাবে প্রত্যক্ষ করে, সেইখানেই সে নিজের অজ্ঞাতসারে স্বতঃই অবনত হইয়া পড়ে। ইহাকেও ঐ সাংখ্যকারের উক্ত আকৃতিরই প্রবর্ত্তনা বলা যাইতে পারে। এ জিনিষ পুরুষ অথবা নারীতে বিভিন্ন বিচারে প্রবর্ত্তিত হয় না। পুরুষ পুরুষের নিকট অথবা নারী নারীর নিকট কিম্বা পুরুষ যদি নারীর নিকট উল্লিখিত স্বতঃ-চিত্তাকর্ষী সুন্দর মনোবৃত্তিগুলির প্রভাবে অবনত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বড় একটা কেহ তাহাতে আপত্তি করেন না ; কারণ, যাহা মানবের স্বভাব-ধর্ম্ম—সেই সৎ ও সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াটা তাঁহারা কেহই দূষণীয় বলিয়া মনে করেন না ; কিন্তু সেই একই কারণে নারী যদি কোনও পুরুষের নিকট নত হইয়া পড়ে, তখনই কেবল চারিদিক হইতে আপত্তির ঘোর কোলাহল শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, প্রশ্ন হইতেছে এই যে, উহাতেও কি সতীত্বের হানি হয়? অনেকে হয়ত বলিবেন যে, নারী পুরুষের সহিত সমান অধিকার পাইতে পারেন না ; কারণ, উভয়ের বাহ্যিক, এমন কি, আভ্যন্তরিক অবস্থারও প্রভেদ বা পার্থক্য অনেকখানি। সুতরাং পুরুষের পক্ষে যাহা দূষণীয় নহে অথবা শোভন, নারীর পক্ষে তাহা হয়ত অত্যন্ত দূষ্য। কাজেই উপরিউক্ত ব্যাপারে নারীর সতীত্বের হানি হয়। পুরুষেরও নারীর প্রতি কোনও সততার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে কি না, সে বিষয়ে কোনও প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া যদি মানিয়াই লওয়া যায় যে, তাঁহাদের মন্তব্যই ঠিক, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, কয়জন নারী এই

নিখিলমানবধর্ম্মগত—এই তাবৎ জীবধর্ম্মগত স্বভাবের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন? আমার বিশ্বাস, কোনও নারীই তাহা পারেন না; কারণ, যাহা স্বভাবগত ধর্ম্ম, জীবের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ও পরিণতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহা স্বতঃই উদ্বুদ্ধ ও পূর্ণত্ব লাভ করে। তবে যিনি অস্বাভাবিক উপায়ে সমগ্র ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া বহির্জগৎ হইতে, সদসতের সম্পর্ক হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, নিয়ত মনকে কঠোর শাসনে চোখ রাঙাইয়া জড়পিণ্ডে পরিণত করিবার ব্যর্থপ্রয়াসে কেবলমাত্র আত্ম-প্রবঞ্চনা বা আত্ম-প্রতারণা করেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র!

এমন কে নারী আছেন, যাঁহার মন মহত্ত্বের মহিমান্বিত চরণে প্রণত না হয়? সু-স্বভাব, সদ্‌গুণ, সুন্দর চরিত্র যাঁহার চিত্তাকর্ষণ করে না? মানব-মনের এই প্রকৃতিগত স্বভাবের ব্যতিক্রম কেহই ঘটাইতে পারেন না। অথচ, একটা ভ্রমাত্মক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সকলেই আত্ম-প্রবঞ্চনা করিয়া চলিবার ব্যর্থপ্রয়াসে জীবনপাত করতঃ, পুরুষের চক্ষে এবং সমাজের চক্ষে—আপন-আপন সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করেন মাত্র। যিনি বলেন, আমার মন কোনরূপ চিত্তাকর্ষক সদ্‌গুণ—মহত্ত্ব বা দেবত্বের নিকট অবনত হয় না, তিনি 'সতী'র প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও সম্মানের অপেক্ষা লোকের ঘৃণা ও কৃপার পাত্রী হইবারই যোগ্যা। কারণ, তিনি হৃদয়হীনা, কাষ্ঠ-প্রস্তরাদি জড় বস্তুর ন্যায় তাঁহার মনও জড়-ভাবাপন্ন! যে হৃদয় মহত্ত্ব, উদারতা প্রভৃতি উচ্চ সদ্‌গুণ দর্শনে প্রীত ও মুগ্ধ হয় না, বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট রূপ ও অনন্ত সৌন্দর্য্যও যে তাহার পাষাণ-চিত্তে কোনও কিছু রেখাপাত করিতে পারে না, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ সত্য হইয়া দাঁড়ায়। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের অতীত হইতে না পারিলে, কোনও নারীই উল্লিখিত জড়-ভাবাপন্ন হইতে পারেন না; এবং সেরূপ জড়-স্বভাবা স্ত্রীলোকের হৃদয়ে স্বামী-প্রেমের অঙ্কুরমাত্রও জন্মিতে পারে না। আবার ঐ একই কারণে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, জীবনের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের ফলে ও জ্ঞানের উৎকর্ষতার জন্য, তাঁহাদের হৃদয়ের সম্প্রসারণ ও ক্রমবিকাশ লাভও অসম্ভবে পরিণত হয়!

সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়া মানবের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। সুরঞ্জিত সুন্দর পুষ্প, সুচিত্রিত-পক্ষ বিহঙ্গ, মেঘবর্ণোজ্জ্বল আকাশ দেখিয়া কাহার চিত্ত না মুগ্ধ হয়? দুর্গন্ধময় পঙ্কিল পয়ঃপ্রণালী দর্শনে মনে যে বিকার উপস্থিত হয়, প্রভাতের অরুণালোকে উদ্ভাসিত, বিগলিত রজতধারাবৎ ফেনোচ্ছ্বলিত, কল-হাস্যময়ী নির্ম্মল পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী দৃষ্টেও কি মনে ঠিক তেমনিই ভাবের উদয় হয়? শেষোক্ত শোভা কি চিত্তকে একটুও মুগ্ধ করে না? ক্ষণকালের জন্যও কি সেই নির্ঝরিণীর নৃত্যলীলা চাহিয়া দেখিতে প্রবৃত্তি হয় না? নিশ্চয়ই হয়। মানুষ মাত্রেরই হয়। বিবেক বা ঔচিত্য-বোধ হয়ত অবস্থানুসারে তোমাকে নির্ঝরিণীর সম্মুখে আঁখি মুদ্রিত করিতে ও পঙ্কিল পয়ঃপ্রণালীতে অবহিত হইয়া অবগাহন করিতে উপদেশ দিবে। কিন্তু কেহ যদি বলে যে, আমার মন স্বতঃই পয়ঃপ্রণালীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং নির্ঝরিণীর প্রতি বিরূপ

হইয়াছিল,—আমি বিবেক বা ঔচিত্যবোধের বিন্দুমাত্র সাহায্য লই নাই, তবে কি সে বিকৃত-স্বভাব জীব অথবা মিথ্যাবাদী ও আত্ম-প্রবঞ্চক নহে?

সত্য, শিব ও সুন্দরই যখন মানুষের চিরারাধ্য বস্তু, এবং এই তিনের সমাবেশ যদি নিখিলমানবচিত্তকে অনাদিকাল হইতেই হরণ করিয়া থাকে, তবে প্রকৃত 'সতী' কে? সতীত্বের যথার্থ অর্থ কি? আমার ধারণা—'একে' অটুট নিষ্ঠার নামই সতীত্ব। 'একের' প্রতি গভীর প্রেম অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেই সতীত্বেব মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়। সেই 'এক' শব্দের অর্থ 'সত্য' ভিন্ন অন্য কিছু নহে। 'সত্য' অথবা সতের একনিষ্ঠ অনুরাগিণী যিনি, সেই নিষ্ঠাবতীই প্রকৃত 'সতী'। কিন্তু সেই 'সৎ' বা 'সত্য' —'এক' বস্তুটি কি? 'এক' বা 'সত্য' কেবল সেই অখণ্ড অব্যয় অনাদি ব্রহ্মকেই বলা যাইতে পারে। সুতরাং যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ সেই পরমব্রহ্মে অর্থাৎ ঈশ্বরে নিষ্ঠাবতী, তিনিই 'সতী'। কিন্তু গার্হস্থ্যাশ্রমে নারী মাত্রেই যদি এইভাবে 'সতী' হ'ন, অর্থাৎ কেবলমাত্র ব্রহ্মানুরাগিণীই হ'ন, তাহ'লে সৃষ্টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাই বোধ হয় নারীর পক্ষে স্বামীকে ব্রহ্মের প্রতীকং—অর্থাৎ সাকার দেবতারূপে খাড়া করা হইয়াছে। স্বামীকে সেই এক সত্য বা ঈশ্বরের বিগ্রহ-রূপ ভাবিয়া তাঁর উপর সুগভীর নিষ্ঠাযুক্ত ঐকান্তিক ভালবাসা স্থাপন করিতে পারিলে, আর ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও অববোধের উচ্চ প্রাচীর তুলিয়া সতীত্ব রক্ষার প্রয়োজন থাকে না। মনুষ্যত্বের উচ্চ বিকাশ দর্শনে বা মানুষের মহৎ গুণের নিকট মন অবনত হইলে ও তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পূজাঞ্জলি প্রদান করিলে, আত্মপ্রসারণ ও স্বীয় মনুষ্যত্বের উন্নতিই সাধিত হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস! গুণের আদর বা মহত্ত্বের পূজায় নারীর সতীত্ব যদি ক্ষুণ্ণ হয়, তবে সে সতীত্বের কোনও মূল্য নাই; যে বিধি হৃদয় ও মনকে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া নরকের বিভীষিকা ও সমাজের উৎপীড়নের ভয় দেখাইয়া ক্রমাগত নিজের অন্তরস্থ চিরমুক্ত স্বাধীন মানবাত্মাকে সঙ্কুচিত ও মৃতপ্রায় করিয়া তোলে, তাহা কোনওদিনই জাতি ও সমাজের কল্যাণকর হইতে পারে না। একটা ভ্রান্ত সংস্কারের মোহে আমরা জীবনের অনাবিল সরলতা, প্রফুল্লতা ও সজীবতা বিসর্জ্জন দিয়া, মিথ্যার কপট আবরণে আজীবন আপনাকে ও পরকে সমানভাবে প্রতারণা করিয়া যাই।

মহত্ত্ব ও সৎগুণের পূজা করিলে সতী স্ত্রীকে কোনওদিনই স্বামীর নিকট প্রত্যবায়গ্রস্তা হইতে হয় না, অর্থাৎ নারীর সতীত্বের হানি হয় না—যদি না সেই স্থলে একেবারে অভিভূতা হইয়া পড়া যায়। যেখানে রূপ গুণ বা মহত্ত্ব দর্শনে নারী অভিভূতা হইয়া পড়ে, সেইখানেই আসক্তি আসে এবং আসক্তিকেই সতীত্বের হানিকর বলা যাইতে পারে। এই অভিভূত অবস্থা ও আসক্তি হইতে সতীকে রক্ষা করে তার বিবেক; ও তদপেক্ষা অধিকতর রক্ষা করে তাহার একনিষ্ঠ সুগভীর স্বামী-প্রেম। স্বামীর প্রতি সেই সুগভীর প্রেম ও নিষ্ঠার স্থাপনা দুই প্রকারে হইয়া থাকে; এক হইতেছে—উভয়ের যথার্থ হৃদয় বিনিময়ে—অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের

রূপ গুণ ও প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া; আর এক হইতেছে—দোষগুণের বিচারবিহীন যে স্বতোৎসারিত প্রেম, অর্থাৎ স্বামী যে ব্রহ্মের প্রতীক বা ঈশ্বরের সাকার বিগ্রহ কিম্বা নারীজাতির একমাত্র ইষ্ট, ইহাতে অচল অটল সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনার দ্বারা। এই সুদৃঢ় বিশ্বাসই ভক্তি ও নিষ্ঠা আনয়ন করে; আর তাহারই পূর্ণ পরিণতি হয় প্রেমে। এইজন্যই অনেক কুৎসিত, কুরূপ, অসৎ ও অত্যাচারী স্বামীর অদৃষ্টেও সতী স্ত্রীলাভের সৌভাগ্য ঘটিতে দেখা যায়।

যে 'সতীত্ব' লইয়া আমাদের দেশে এত গর্ব্ব, এত অহঙ্কার, এত গৌরব প্রকাশ করা হয়, সে 'সতীত্ব' আজ এখানে বিধিবিধান-বহুল যন্ত্রের চাপে প্রাণহীন, চেতনাশূন্য, মৃতের ন্যায় জড় অবস্থাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই যন্ত্রনিষ্পেষিত জড় সতীত্বের অহঙ্কার করা মোটেই শোভন বলিয়া মনে হয় না। অন্য দেশের সহিত তুলনায় আমাদের দেশের সতীর সংখ্যা হয়ত হিসাবে শতকরা অনেক বেশী হইতে পারে; কিন্তু সেই 'সতী-সুমারী'র অনুপাত দেখিয়া গর্ব্বে ও উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিবার কোনও কারণ নাই; কেননা, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আমাদের সতীর সংখ্যা যেমন অন্য দেশের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তেমনি এ কথাও সত্য যে, আমাদের দেশের সতীত্বের মধ্যে গলদ, গোঁজামিল ও ফাঁকিও অনেক বেশী। কিন্তু এই কঠিন সত্য উচ্চারণ করিবার স্বাধীনতা এ দেশের লোকের নাই। একটু ধীরভাবে বিচার করিলে যদিও সকলেই এ বিষয়ের প্রকৃত মর্ম্মাবধারণ করিতে পারিবেন নিশ্চয়, কিন্তু খুব কম লোকেই তাহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে সাহসী হইবেন।

'আকৃতি' বা মনোধর্ম্মের উপরই যে আমি অধিক stress দিয়াছি, এ কথা যেন কেহ না মনে করেন। কেননা, তাহা হইলে লেখিকার উপর অবিচার করা হইবে। প্রবৃত্তিব স্রোতে 'গা-ভাসান্' দেওয়ার স্বপক্ষে আমি সে কথা বলি নাই। আকৃতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে মনের স্বাভাবিক গতি বা ক্রিয়ার কণ্ঠরোধ করতঃ উহাকে হত্যা কবিয়া অন্তরস্থ মনুষ্যত্বকে জড়ে পরিণত করা অনুচিত, ইহাই আমার বক্তব্য। হয়ত অনেক স্থলে যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি, বলিবার দোষে তাহা সুপরিস্ফুট হয় নাই। আর একটি কথা নিবেদন করিয়া আমি এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে চাই। যাহাকে প্রকৃত সত্য বলিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারা যায়, তাহা অকপট চিত্তে স্বীকার করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। আমাদের দেশে এক সম্প্রদায়ের সাধু আছেন, যাঁহারা কামরিপু জয় বা উহার উচ্ছেদ সাধনের জন্য আপনাদের পুরুষাঙ্গ পর্য্যন্ত ছেদন করেন। তাঁহাদের এই অমানুষিক কার্য্য এদেশে চিরদিন প্রশংসাই লাভ করিয়াছে; কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাতে উক্ত সাধু সম্প্রদায়ের রিপুদমনের অক্ষমতাই পরিব্যক্ত হইতেছে! তাঁহাদের 'কামজিৎ' অপেক্ষা 'কামভীত' নামেই অভিহিত করা উচিত। আমাদের দেশের সতীত্ব রক্ষাও উপস্থিত অনেকটা এই প্রণালীরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সত্যের উপর সংস্কারের

মোহ, সমাজভীতি, স্তুতি, নিন্দা, অহঙ্কার, আত্মগরিমা ইত্যাদি রাশি রাশি স্বার্থের আবরণ চাপাইয়া, অন্তরের প্রকৃত মানবত্বকে নিষ্পেষিত ও আবরিত করিয়া, মিথ্যার পতাকাকে অধিকতর মিথ্যার ঝালরে সজ্জিত করিয়া সত্যের কেতন রূপে প্রকাশপূর্ব্বক আমরা আত্মগৌরব ও আত্মপ্রসাদ লাভ করি! এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না, যিনি অন্তরের পূর্ণ সত্যকে নির্ভীক চিত্তে, অকপটে, প্রকাশ্য দিব্যলোকে; সর্ব্বলোকচক্ষের সম্মুখে সম্পূর্ণ অনাবৃতরূপে উপস্থিত করিয়া, এই কপট ভণ্ডামীর ছদ্মশোভায় সজ্জিত মিথ্যার উচ্চ পতাকার বিরুদ্ধে সোজা হইয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে পাবেন। তাই অসহায়ের মতই অন্তরের সেই অন্তরতম পুরুষের নিকট আজ সকাতরে কবীন্দ্র রবীন্দ্রের ভাষায় শুধু প্রার্থনা করি :—

এ দুর্ভাগ্য .দশ হ'তে হে মঙ্গলময়,
দূব কবে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়;
এই চিব-পেষণ যন্ত্রণা ধূলি তলে,
এই নিত্য অবনতি দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান অন্তবে বাহিবে
এই দাসত্বেব বজ্জু ত্রস্ত নত শিবে
সহস্রের পদপ্রান্ত তলে বাবম্বাব
মনুষ্য-মর্য্যাদা-গর্ব্ব চিব পবিহাব;
এ বৃহৎ লজ্জাবাশি চবণ আঘাতে
চূর্ণ কবি দূব কব। মঙ্গল প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদাব আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।

ভাবতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৩১

নারীর ভালোবাসা

ইংরাজ দার্শনিক বলিয়াছেন,—

Man's love is of man's life a thing apart,
'Tis Woman's whole existence.

'প্রেম পুরুষের জীবনের একটা স্বতন্ত্র অংশমাত্র, কিন্তু ইহা নারীর সমগ্র জীবন।' একথা পূর্ণ সত্য। প্রেমবিহীনা নারীর নারীত্বের বিকাশই হয় না। ভালোবাসাশূন্যা নারী তন্ত্রী-বিহীনা বীণার সমান।

'ভালো কে বেশি বাসে? পুরুষ না নারী?' ইহা প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই প্রশ্নের মীমাংসা বা পুরুষ ও নারীর ভালোবাসার যাচাই করিতে গেলে, সর্ব্বাগ্রে ভালোবাসার

মূলানুসন্ধান অর্থাৎ ভালোবাসার স্বরূপ কি এবং কোথা হইতে তাহার উৎপত্তি, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

যে ভালোবাসা একনিষ্ঠ অর্থাৎ অপরিবর্তনীয়, তাহাই সত্য ভালোবাসা। সুখী হইবার অপেক্ষা সুখী করিবার ইচ্ছা যেখানে যত প্রবল, ভালোবাসা সেখানে তত অকৃত্রিম এবং স্থায়ী হয়। প্রকৃত ভালোবাসার উৎপত্তি আত্মত্যাগ হইতে। পৃথিবীতে প্রকৃত সুখ ত্যাগেই, সুতরাং সত্য ভালোবাসায় অপ্রাপ্তির দুঃখ নৈরাশ্যের জ্বালা অতৃপ্তির বেদনা এসবের বালাই নাই। সেখানে অনাবিল সুখ শান্তি ও পরিতৃপ্তি বিরাজিত। ভালোবাসার বিনিময়ে পাইবার স্পৃহা বা ভালোবাসার পাত্রকে নিজস্ব করিয়া ভোগ করিবার একান্ত ইচ্ছা, আত্মসুখ লালসা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সংসারে সাধারণত এই ভালোবাসারই প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ইহা 'ভালোবাসা' নামেই অভিহিত হয় বটে, কিন্তু ইহা ভালোবাসার কৃত্রিম রংকরা আত্মসুখানুসন্ধান মোহ বা অস্থায়ী চিত্তচাপল্যমাত্র। ইহা হইতে উৎপন্ন হয় অশান্তি, হাহাকার, অশুভ, অশ্রুজল, দুঃখ, জ্বালা এবং কোনো কোনো বিষম-স্থলে ইহার শেষ পরিণতি প্রতিহিংসা।

প্রকৃত ভালোবাসার সার্থকতা ভালোবাসিয়া। সে কিছুই বিনিময় চাহে না, কতখানি দিয়াছে এবং কতখানি পাইয়াছে কিংবা পাইবে তাহার হিসাব-নিকাশ রাখে না, সে দিয়াই তৃপ্ত, দিয়াই সুখী, দিয়াই সার্থক। প্রকৃত ভালোবাসা তাহাকেই বলা চলে যে-ভালোবাসা তন্ময়। তৎ+ময়, তদ্‌শব্দ+ময়ট্—অর্থাৎ তদাত্মক। তদগতভাবে, অর্থাৎ যাহাতে সে ভিন্ন আর মনে কিছু থাকে না, সেই ভালোবাসাটি তন্ময় ভালোবাসা। আপনার সুখ, আপনার শুভ, আপনার স্বার্থ, সমস্ত ভুলিয়া, আপনাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহারই সুখ, তাহারই শুভ, তাহারই স্বার্থ নিজস্ব করিয়া লইতে পারে যে প্রেম —সেই তন্ময় বা আত্মবিস্মৃত প্রেমই অপবিবর্তনীয় এবং একনিষ্ঠ, সুতরাং তাহাই সত্য প্রেম। তাহা অটুট অক্ষয় ও অবিনশ্বর।

আত্মত্যাগ হইতেই খাঁটি ভালোবাসার উৎপত্তি ইহা নির্ণীত হইল; আর আত্মবিস্মৃত তন্ময়-ভালোবাসাই সত্য ভালোবাসা, মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান গেল। এখন পুরুষ এবং নারী যাঁহার মধ্যে ভালোবাসার মূল অর্থাৎ আত্মত্যাগ অধিকতর, তিনিই ভালোবাসায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।

নারীজীবনের পূর্ণতম বিকাশ পরিণতি ও সার্থকতা মাতৃত্বে। এই মাতৃত্ব জগতে যে সর্ব্বোচ্চ সম্মান ও পূজা-লাভ করিয়াছে তাহা কেবলমাত্র সন্তান-সৃষ্টির জন্য নহে, আত্মত্যাগ বা সত্য ভালোবাসার জন্যই। মাতা যদি সন্তানকে প্রসবের পরেই ত্যাগ করিয়া নিজের সুখভোগের সন্ধানে ব্যাপৃতা হইতেন, তাহা হইলে মাতৃত্ব কখনো এত উচ্চ পূজা লাভ করিতে সমর্থ হইত না। মায়ের ভালোবাসা কোনোদিন যাচাই করিবার ও তর্ক দ্বারা মীমাংসা করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। তাহার কারণ, সত্য ভালোবাসার মূল-সম্পদ আত্মত্যাগ এখানে এতই উজ্জ্বলতর রূপে স্বতঃ-প্রস্ফুট যে সমস্ত জগৎ বিনা দ্বন্দ্বে দ্বিধায় তাঁহার চরণে মস্তক নমিত করিয়াছে।

নারীকে সৃষ্টি করার ভার দেওয়া হইয়াছে। মাতৃজাতি করিয়া গড়া হইয়াছে। ত্যাগ নহিলে সৃষ্টি হয় না, 'মা' হওয়া চলে না, আত্মসুখপরায়ণতা বা স্বার্থপরতা যদি পুরুষদের সম-পরিমাণে তিনি নারীর মধ্যেও দিতেন, তাহা হইলে সৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

ধৈর্য, সংযম ও আত্মত্যাগ নারীর সহজাত বৃত্তি বা স্বভাবগত ধর্ম্ম। ইহা তাঁহাদের শিখাইতে বা শিখিতে হয় না। নারীত্বের ক্রমবিকাশের সহিত আপনা-আপনিই ইহা স্বতোস্ফুটিত হইয়া উঠে। আত্মত্যাগই নারীজীবনের মূলমন্ত্র, প্রধান অবলম্বন এবং শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। তাই নারী যত স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগ করিতে বা ভালোবাসিতে পারেন, পুরুষ তা পারেন না। অতএব—Love is woman's whole existence.

রূপ ও রঙ্গ, ২ শ্রাবণ ১৩৩২

নারী

পুরুষ সমস্ত জীবন ধ'রে নারীকে শতরূপে দেখেও যখন তার সমস্তটুকু নিঃশেষে বুঝে উঠতে পারলে না, নারীর অনেকটা অংশ যখন সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন ও রহস্যময় থেকে গেল পুরুষের কাছে—তখন তার নারীকে জানবার বাসনা, নারীকে বুঝবার আগ্রহ আরও তীব্র—আরও উদ্দাম হ'য়ে উঠলো।

দিশেহারা পুরুষ ছুটে এল নারীরই কাছে তার নারী-হৃদয়ের গোপন তথ্যটুকু জানতে।

চিরাভ্যস্ত আদেশের কণ্ঠে সনির্ব্বন্ধ অনুনয়ের সুর ঢেলে পুরুষ বললে, নারী, আজ তোমায় বলতেই হবে তোমার গোপন রহস্য কথাটুকু; আমি জান্‌তে চাই তুমি কি-ই? তোমারই নিজের মুখে আজ শুন্‌তে চাই আমি,—কী সে তোমার রহস্য যা পুরুষের জ্ঞানের অতীত—দেবতারও বুদ্ধির অগোচর? আমি শুনবোই সে কথা, তুমি কি-ই নারী? বলো তুমি কি—ওগো—কী তুমি?...

শুচিস্মিত আননখানি নারীর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল স্নিগ্ধ নির্ম্মল হাস্যে।

নারী উত্তর করলে, আমি নারী; আমি সেবিকা, আমি কন্যা, আমি ভগ্নী, আমি পত্নী, আমি মাতা।—এই আমার পরিচয়।

অধীর হয়ে উঠে পুরুষ বললে, জানি জানি, তোমার ও-রূপ, নারী, আমি চাই আজ তোমার অন্তরের পরিচয়; পুষ্প-পেলব-কোমলা হয়েও কিসে তোমরা এই লৌহকঠিন পুরুষকে, শক্তিশালী যোদ্ধাকে তোমার দুর্ব্বল ক্ষীণ শক্তির আয়ত্তে নমিত রেখেছ? শৌর্য্যে বীর্য্যে সুদৃঢ় পুরুষ তার সমস্ত শক্তি, দম্ভ, বিচার, অহঙ্কার লুটিয়ে

দিয়ে তোমার পায়ে নতশির হয়ে পড়ে যাতে—কী সে তোমার মোহিনীমায়া, নারী? কোন সে তোমার কুহক মন্ত্র?

শুভ্রজ্যোৎস্নার মতো পবিত্রতা ঝরে এলো নারীর সন্ধ্যাতারাতুল্য স্নিগ্ধোজ্জ্বল আঁখিদুটি হ'তে।

শান্তস্বরে সে বললে, শোন তবে। স্রষ্টা নিজহাতে মনের মত করে গড়ে তুললেন তাঁর এই সাধের জগৎ। অভিনব সৌন্দর্য্যে, নব নব বৈচিত্র্যে সৃষ্টির নানা আভরণে সুন্দরতররূপে সাজিয়ে দিলেন তাঁর মানসী তনয়া এই ধরা রাণীকে! সর্ব্ববিধ সৃষ্টির পর স্রষ্টার সৃষ্টিকার্য্যের পূর্ণতম বিকাশ হল এই মানব!

সৃজনলীলার জন্য বিধাতা তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পরিণতি মানবকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করলেন—নর ও নারী। কিন্তু তাদের মানবসত্তা মূলতঃ রইল একই। স্রষ্টা নারীর অন্তরে কোমলতা দিলেন অধিক কিন্তু তা সহ্য ও সংযমে সুদৃঢ়, আর পুরুষের অন্তরে কাঠিন্য দিলেন অধিক, কিন্তু অসংযমে সে ভগ্নপ্রবণ!

পুরুষ পেলে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেব বিপুল শক্তি,—তার সর্ব্ব অবয়বে সেই শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ সতেজে ফুটে উঠল!—আর স্নিগ্ধসুষমাময়ী নাবী—সে যে আনন্দস্বরূপিণী, অনন্ত প্রাণশক্তি! তার অন্তরের অন্তঃস্তল দিয়ে সেই শক্তির ধারা বেয়ে চলল অফুরন্ত অক্ষয় প্রবাহে!

গর্ব্বে গৌরবে আনন্দিত বিধাতার মনে হল নর ও নারীর এই বিপরীত শক্তি-সমন্বয়ে তাঁর বিশ্ব-সৃষ্টি সার্থক হ'য়ে উঠবে!

পুরুষ আসুরিকতার অনুশীলন করতে করতে তার দৈহিকশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির অপব্যবহার করে ফেললে। সে নারীর প্রতি অন্যায় করলে, অনাচার করলে, 'দুর্ব্বলা' ব'লে ঘৃণায় অবহেলার দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে অবজ্ঞার হাসি হাস্‌লে!

...দিন যায়...দিন যায়...উৎপীড়িতা নারী অত্যাচারে কাতর হ'য়ে বিধাতার ধর্ম্মাধিকরণে এসে দাঁড়াল পুরুষের বিরুদ্ধে তার পুঞ্জীভূত অভিযোগ নিয়ে!

বিধাতা দুঃখিত হলেন, উন্মনাচিত্তে কি যেন ভাবলেন, তারপর মৌনহাস্যে নারীর প্রতি ব্যথিত দৃষ্টি মেলে ক্ষণেক চেয়ে রইলেন। বুঝলেন, মূঢ় নর এই নারীকে দলিত ক'রে শক্তি-উৎসের মুখ্য-পথ রুদ্ধ করতে চায় তার অস্থায়ী নশ্বর শক্তির ক্ষণোত্তেজিত বলের সাহায্যে। তার এই শক্তি-দম্ভ চূর্ণ করতে না পারলে নারীর চেয়ে তার নিজেরই অমঙ্গল যে অধিকতর হবে, শুধু তাই নয়, সৃষ্টিরও মহা অকল্যাণ সাধিত হবে যে!

নারীকে সস্নেহে আহ্বান ক'রে বিধাতা বললেন, নির্ব্বোধ নরের শক্তির গর্ব্ব এমনভাবে খর্ব্ব করা চাই, নারী, যাতে সে নিজেই সব চেয়ে বেশী বিস্ময়ে ও লজ্জায় অধোমুখ হয়ে যায়—এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তার সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি ব্যয় করেও তার কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম না হয়।

দাম্ভিক পুরুষের অপরিমিত শারীরিক শক্তির গর্ব্ব নিমেষে নাশ ক'রে তাকে

বিনা অস্ত্রে জয় করবার যাদুমন্ত্র আমি লিখে দিচ্ছি তোমার ওই ললিত বুকে। সেই মন্ত্র প্রভাবে যে মাধুর্য্য বিকশিত হয়ে উঠবে তোমার লাঞ্ছিত হৃদয়ে—পুরুষের দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টির শাণিত তরবারী, তার লৌহকবচ বেষ্টিত বলিষ্ঠ অঙ্গের সকল শক্তি, সকল দম্ভ, সর্ব্ব বিজয় ব্যর্থ হ'য়ে গিয়ে তার গর্ব্বোদ্ধত মস্তক তোমার ওই রাতুল চরণতলে লুটিয়ে পড়বে আপনিই।

নারী বক্ষ চিরে হৃদয়ের শোণিত দিয়ে অন্তরের অন্তঃস্তলে চিরজাগ্রত অক্ষয় উজ্জ্বলাক্ষরে বিধাতার যাদুমন্ত্রটি লিখে নিয়ে নরের সামনে দাঁড়াল এসে বিজয়িনীর বেশে মৃদু হেসে!

উদ্ধত বীর নর ত্রিভুবন জয় ক'রে এসেও পারলে না এবার শুধু ঐ নারীর বুকের মাধুর্য্যমণ্ডিত ফুলের পরশটুকুকে জয় করতে! সেদিন থেকে যুগে যুগে জন্মে জন্মে পরাস্ত হয়ে আসছে পুরুষ নারীর সেই কুসুম-কোমল হৃদয়মাধুর্য্যের কাছে।

নারী চুপ করলে।

বাক্যহীন বিস্মিত পুরুষ স্বপ্নমুগ্ধের ন্যায় নারীর এই গোপন রহস্য শুনে যাচ্ছিল। নারী নির্ব্বাক্ হতেই অধীর আগ্রহে তার কিশলয় কোমল হাত দু'খানি আপনার উভয় হস্তে চেপে ধ'রে ব্যগ্রকণ্ঠে ব'লে উঠল, বল, বল, কী সে মন্ত্র? বল নারী, কী সে ওই হৃদয়ের মধু-উৎস—যার বলে আমাদের সব শক্তি, সমস্ত শৌর্য্য, বীর্য্য, দম্ভ, অহঙ্কার, ধূলায় লুটিয়ে দাও তোমরা?

ধীর উদাত্তকণ্ঠে উত্তর দিলে নারী : আত্মত্যাগ সে মন্ত্রের নাম। স্বয়ং ধাতার দীক্ষিত সে মন্ত্র নারী-বক্ষের মাঝে অক্ষরে অক্ষরে উৎকীর্ণ হয়ে গেছে অনন্তকালের জন্যে! এই 'আত্মত্যাগ' মন্ত্র প্রভাবেই নারী-হৃদয়ে যে মাধুর্য্য-পুষ্প বিকশিত হয়ে ওঠে তারই নাম জেনো ভালবাসা! এই 'ভালবাসা'র নাগপাশের জোরেই নারী আজ বিশ্ববিজয়িনী!...এই তার মায়ামন্ত্র—এই তার কুহক, ওগো, একেই তোমরা নিখিল পুরুষ অসীম রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় নামে অভিহিত করেছো!

বিস্ময়বিমুগ্ধ বিহ্বল পুরুষ পুলকাঞ্চিত হৃদয়ে মহিয়সী নারীর জ্যোতিঃস্মিত আননের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অপলক নেত্রে!

কল্লোল, আষাঢ় ১৩৩৩

বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ

প্রকৃতির ষড়রূপের মধ্যে এলায়িত ঘন-মেঘ-কুন্তলা দীপ্ত-বিদ্যুৎ-চর্চ্চিতা স্নিগ্ধশ্যামাঙ্গিনী বর্ষা সুন্দরীই আমাদের কবিকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ ক'রেছে বলে মনে হয়।

চূত-মুকুল-গন্ধ-উতলা দক্ষিণ-সমীর-উত্তরী-চঞ্চল বসন্তের অপরূপ সৌন্দর্য্য, রজত মেঘ-কিরীটিনী শেফালি-সুশোভনা শারদ লক্ষ্মীর আলোক-বীণার অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা এই প্রকৃতি-প্রেম-বিহ্বল কবিকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে বটে, কিন্তু এই কাজল কালো সজল-নয়না প্রাবৃষা সুন্দরীর নব নব কাজরী গুঞ্জনের বিচিত্র রাগিণী তাঁকে যেন একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলেছে!

প্রকৃতির সঙ্গে আপন একাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে প্রাকৃতিক রূপ-বৈচিত্র্য ও রসলীলার মধ্যে আপনাকে নিগূঢ়ভাবে মিশিয়ে দিয়ে কাব্য সৃষ্টি করা রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব।

এই সুন্দরী প্রকৃতির বিচিত্র-সৌন্দর্য্য সম্ভারকে কেন্দ্র করেই তাঁর কবিত্বের রসধারা উৎসারিত হ'য়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবির অন্তরের অখণ্ড গভীর যোগ তাঁর সমস্ত কাব্যের মধ্যেই মূলসূত্রের ন্যায় গ্রথিত রয়েছে। প্রকৃতিকে বিচিত্ররূপে প্রত্যক্ষ করবার, পরিপূর্ণ রসে অনুভব করবার ক্ষমতা তাঁর জন্মগত বা সহজাত শক্তি ও শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে।

বর্ষচক্রের বিজয় রথে চড়ে' ধরণীবক্ষে পরের পর আসা ছয়টি ঋতুকেই এই রূপদক্ষ রসশিল্পী তাঁর অসাধারণ ভাব-নৈপুণ্যে ও অভিব্যক্তি-পটুতায় জয় ক'রে নিয়ে ভারতীয় কাব্য-নিকুঞ্জে বন্দী ক'রে রেখেছেন। সকল ঋতুই কবির মন্ত্রময় বাঁশীর সুরে তাঁর কাব্য-কাননে নিজেদের মূর্ত্তরূপে ধরা দিয়ে সার্থক হ'য়েছে, কিন্তু বর্ষা যেন উল্লাসে বিষাদে চাঞ্চল্যে গাম্ভীর্য্যে, ঔদাস্যে উৎসাহে, হাসি-কান্নায় নৃত্য-গীতে ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র হ'য়ে বারে বারেই এই কবিকে ভুলিয়ে তার গোপন অন্তঃপুরের মধ্যে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে গেছে।

জগতের সকল কবিই ষড়ঋতুর মধ্যে ঋতুরাজ বসন্তকেই বিশেষভাবে স্তুতি ক'রে গিয়েছেন এবং শরতের প্রতিও তাঁদের পক্ষপাতিত্ব কতকটা দেখা গিয়েছে। কিন্তু বর্ষার জয়গান একমাত্র বৈষ্ণব-কবিগণের রচনার মধ্যে ছাড়া অন্যত্র বিরল। অবশ্য মহাকবি কালিদাসের 'মেঘ-দূত' বিশ্ব-সাহিত্য ভাণ্ডারে বর্ষার সৌন্দর্য্যরস-পরিবেশনে যথেষ্ট দৌত্য করেছে।

বর্ষা কেবল একটিমাত্র রূপ নিয়েই ধরণীর দ্বারে এসে দেখা দেয় না। সে নিত্য-নূতন-ভাবে সুসজ্জিতা হ'য়ে নব নব সৌন্দর্য্যশ্রীতে উদ্ভাসিতা হ'য়ে দেখা দেয়। সে আসে কখনও উন্মুক্ত-মেঘ জটা বিদ্যুৎ-ভ্রূকুটী-নয়না ঝঞ্ঝা-ক্রোধ-দীপ্তা রুদ্র-ত্রিশূল-হস্তা ভৈরবী-রূপে, কখনও প্রেমাবিষ্ট-নয়না বিহ্বল-আত্মবিস্মৃতা মনোমোহিনী রূপে, কখনও প্রিয়-বিরহাতুরা ম্লানমুখী বেদন-কাতরা বিষাদিনী বেশে, কখনও দীর্ঘ-বিরহান্তে

মিলন-পুলকমগ্না তরুণীর হাসি ও অশ্রুর মিলিত-লীলা সমন্বয়ে স্নিগ্ধ-মধুর সুষমা-মণ্ডিতা হ'য়ে। প্রতি মুহূর্ত্তে তার সেই অভিনব রূপের বিচিত্র-সৌন্দর্য্য আমাদের নয়নাগ্রে প্রতিফলিত হ'য়ে—অন্তরের গোপন তারে এক অননুভূতপূর্ব্ব ব্যথা ও পুলকের মূর্চ্ছনা জাগিয়ে তোলে। সমস্ত ধরণী ও আকাশ-পরিব্যাপ্ত বর্ষার সেই সুর, নিখিল-মানবচিত্তের মধ্যে যা' অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনায় তরঙ্গায়িত হ'য়ে ওঠে, কবির কাব্য ও সঙ্গীতে আমরা যেন তারই প্রাণের স্পন্দন আবার নূতন ক'রে অন্তরঙ্গভাবে অনুভব ক'রতে পারি।

পূর্ব্বেই বলেছি প্রকৃতির ষড় রূপই এই পরম রসিক কবির সূক্ষ্ম অনুভূতির ঘন আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছে, এবং কবিও প্রত্যেক রূপটিকেই যোগ্য সমাদরে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এই নব-ঘন-বসনা বর্ষাসুন্দরীর সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ়-চিত্রজল্পতা দর্শনে সহজেই সন্দেহ হয় যে তিনি এর প্রেমে একটু বিশেষভাবে আকৃষ্ট হ'য়েছেন! এই মধুর পক্ষপাতিত্ব-টুকু দ্রুপদ-দুহিতা কৃষ্ণার অন্তরে ফাল্গুনীর প্রতিষ্ঠার ন্যায় মোহন-বিশেষত্বে মণ্ডিত এবং অতি উপভোগ্য। প্রাবৃষার প্রতি কবির এই অতিরিক্ত মুগ্ধ অনুরাগ, তাঁর অসংখ্য স্তবগানে ব্যক্ত হ'য়ে পড়েছে দেখা যায়।

আসন্ন আষাঢ়ের 'নবীন-মেঘ-ঘনিমা' হ'তে আরম্ভ ক'রে 'মাহ ভাদরে'র ক্ষান্ত-বর্ষণ প্রাতের অশ্রু-ধৌত স্নিগ্ধ-রৌদ্ররেখার আনন্দ-হাসিটুকু পর্য্যন্ত—বর্ষা সুন্দরীর সর্ব্ব অবয়বের প্রতিচ্ছবি, লীলায়িত-অঙ্গের প্রত্যেকটি তনুরেখা, বেশবাসের বহু বিচিত্রতা, তার অপূর্ব্ব কণ্ঠের সমস্ত সুর, তাল, লয়, রাগ, তার রত্নালঙ্কারের মধুর শিঞ্জনধ্বনি, —হাসি-অশ্রু মৌন-মুখরতা—তার সর্ব্ব-লীলারস কবি যেন নিঃশেষে আপন অন্তরপুটে অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে নিয়েছেন, এবং নব নব ছন্দহারে তাকে কাব্যে রূপায়িত ক'রে বর্ষার প্রেম-তর্পণ ক'রেছেন।

প্রথম ধারাপাতে সিক্ত ধরণীর উদগত-মৃৎ-সৌরভে কেতকী-কুঞ্জের মোহ-মদির সুগন্ধে যুথী-কাননের করুণ সুমিষ্ট বাসে, ভুঁই-চাঁপাদের নিঃশব্দ-কটাক্ষে, মেঘ-ছায়াঙ্কিত সবুজের বুকে কবি কত অভিনব বিস্মৃত-বার্ত্তাবাহী-লিপিকা—কত বিস্ময়-ঘন অশ্রুত-কাহিনী পাঠ ক'রে চলেছেন, তার অপূর্ব্ব দুর্লভ ইতিহাস—তার রোমাঞ্চকর অনুভূতি সমস্ত লিপিবদ্ধ হ'য়ে আছে কবির কাব্যের প্রতি ছন্দে ও ছত্রে।

আজ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমরাও আমাদের বহিশ্চক্ষু ও অন্তর্চক্ষু মেলে বর্ষাকে আর তার কেবল একটিমাত্র রূপেই দেখতে পাচ্ছিনে; প্রাবৃষার প্রতিক্ষণের পাদ-বিক্ষেপে তার নব নব রূপ আমাদের দৃষ্টিপথে প্রতিফলিত হ'য়ে উঠছে—নূতন নূতন রস আমাদের অন্তরের ভাব-পাত্রে রসায়িত হচ্ছে! আমরা বর্ষাকে আজ অনেকটা অন্তরঙ্গরূপে স্পষ্টভাবে ধরতে পারছি।

সঙ্গীতে এবং কাব্যে রবীন্দ্রনাথের বর্ষা প্রশস্তি অফুরন্ত হ'লেও আমি তারই ভিতর হ'তে কতকগুলি গান ও কবিতার পুনরাবৃত্তি ক'রে এই গগন-সঞ্চারিণী চির-স্বাধীনা বিচিত্রা বর্ষাকে, কবি তাঁর কাব্যের মধ্যে কেমন প্রগাঢ় প্রেমে ও নিগূঢ়

সৌন্দর্য্যে বন্দিনী করেছেন, তার একটু পরিচয় দেবার চেষ্টা ক'রবো।

এই সব গান, এই সব কবিতা এমন হৃদয়গ্রাহী, মর্ম্মস্পর্শী, ভাব-সৌন্দর্য্য ও সত্যানুভূতি তার ছত্রে ছত্রে এমনভাবে প্রতিফলিত যে, কোনও অংশ বাদ দিয়ে খণ্ডভাবে উদ্ধৃত করা কঠিন। এর একটি ছত্রও ছাড়তে মন সরে না। কিন্তু এই নিবন্ধের সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যে সেরূপভাবে পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয় ব'লে আমি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবেই পরিচয় দিতে চেষ্টা ক'রবো।

কবির বর্ষার গান ও কবিতাগুলিকে আমি চার ভাগে বিভক্ত ক'রে নিয়েছি। আসন্ন-বর্ষা, নববর্ষা, ঘনবর্ষা ও ক্ষান্তবর্ষা ;—এই চারটি রূপের মধ্যে যে বিভিন্নতর সৌন্দর্য্য এবং রস-সমাবেশ আছে—সেগুলিকে পাশাপাশি পৃথকভাবে রেখে দেখলে তা' অনেকটা স্পষ্টতররূপে হৃদয়ঙ্গম হবে।

আসন্ন বর্ষা

ধূলায় ধূসর রুক্ষ-উড্ডিন-পিঙ্গল-জটাজাল, রক্ত-চক্ষু রুদ্র নিদাঘের দাব-দগ্ধ দিগন্তে ছায়া-ঘন মেঘের গুরু-গুরু গরজনে বরষার স্নিগ্ধ-আভাস ধরণীর তৃষিত প্রাণকে কতখানি যে উন্মুখ ও ব্যগ্র করে' তোলে, কবি তাঁর নিজের হৃদয় দিয়ে সেটি অনুভব করেছেন ; তাই তৃষ্ণা কাতর-নেত্র উর্দ্ধে মেলে উদগ্রীব-কণ্ঠে তাকে আহ্বান করেছেন—

এসো এসো হে তৃষ্ণার জল, কলকল্ ছলছল্—
ভেদ কর কঠিনের ক্রূর বক্ষতল কলকল্ ছলছল্।।

শুভাগমন বার্ত্তা নিয়ে ঝঞ্ঝা-দূত ধরণীর বুকে নেমে আস্‌চে। বর্ষা-রাণীর ঝলসিত বিবর্ণ আকাশের আপিঙ্গল নেত্রে কোন্ বিস্মৃত স্বপ্ন ছায়ার কালো আভাস ঘনিয়ে আস্‌ছে—তার জ্বলন্ত দৃষ্টি কার আকুল প্রতীক্ষায় স্নিগ্ধ ও উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে।

বুকে তার আনন্দের ঝড় উঠলো। এ 'কাল-বৈশাখী'র উদ্দাম তাণ্ডব নয়, আসন্ন-বর্ষার আভাসে পুলকিত বাতাসের উল্লাস-কম্পিত নৃত্য! বর্ষণ-প্রতীক্ষু অশান্ত-হাওয়ার সঙ্গে কবির চিত্তও অশান্ত হ'য়ে উঠেছে। উতলা-বাতাসের সুরে সুর-মিলিয়ে কবি ডাকছেন—

হাঁকিছে অশান্ত বায়
'আয় আয় আয়।' সে তোমায় খুঁজে যায়।
তাহার মৃদঙ্গ-রবে করতালি দিতে হবে,
এস হে চঞ্চল, কলকল্ ছলছল্।।...
ভেঙে ফেলে দিয়ে কারা এসো বন্ধহীন ধারা,
এসো হে প্রবল, কলকল্ ছলছল্।।

'লোলুপ চিতাগ্নি শিখা লেহি লেহি বিরাট-অম্বর' এবার নূতন মেঘস্তূপে দ্রুত-আচ্ছন্ন হ'য়ে চলেছে। জ্যৈষ্ঠ-অন্তে বিদগ্ধ-আকাশ-পটে নব-মেঘোদ্‌গমের স্নিগ্ধ-ছবিতে কবি হর্ষোৎসাহিত কণ্ঠে আহ্বান ক'রছেন—

হে নূতন এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে,
ব্যাপ্ত করি লুপ্ত করি স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘন-ঘোর স্তূপে।

নিদাঘ-তাপিতা ধরণী তীব্র তৃষ্ণায় এত কাতর যে বর্ষাকে কবি বিপুলতর বেগে ঝাঁপিয়ে আসতে ডাকছেন। শিথিল মৃদু চরণপাতে অলস গুরু গুরু রবে এলে এ পিপাসার নিবৃত্তি হবে না, এ জ্বালা স্নিগ্ধ হবে না,—ভৈরবী ভীমা মূর্ত্তিতে বিজয়িনীর বেশে, ত্বরিত গতিতে ঝাঁপিয়ে আসা চাই। তাই বলছেন—

তোমার ইঙ্গিত যেন ঘন-গূঢ় ভ্রূকুটীব তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,
তোমার সঙ্গীত যেন গগনের শত ছিদ্র মুখে
বায়ু গর্জ্জে' আসে,
তোমার বর্ষণ যেন পিপাসার তীব্র তীক্ষ্ণ বেগে
বিদ্ধ করি' হাসে—

তারপরে আমরা গগন-অঙ্গনে সমাগত মেঘদলের ঘন-সমারোহ দেখতে পাই। এই নবীন মেঘের উৎসবে নিদাঘ-বিবর্ণ আকাশের জ্বলন্ত বক্ষ কাজল-কালো প্রলেপে স্নিগ্ধ হওয়ার ছবি,—যা' কোনও এক আষাঢ়ের প্রথম দিবসে মহাকবি কালিদাসের অন্তরে বিপুল বিরহ-বেদনা জাগ্রত করে সেই অকথিত বিরহ-ব্যথাকে মেঘ-দূতের বিরহী চক্ষে রূপান্তরিত করে' তুলেছিল,—সেই নব মেঘসৌন্দর্য্য আমাদের কবিকে কোনো অজানার আকর্ষণে, অকারণ বিরহব্যথায় উন্মনা করে' তুলেছে দেখতে পাই। তাই আসন্ন বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন দিনখানি তাঁর কণ্ঠে অলস উদাস রাগিণী ঝঙ্কৃত করে' তুলেছে—

মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে।।

আজ এই মৃদু-দেয়া-গরজিত মেঘলা-দিনে তিনি ব'সে আছেন তাঁর কোনও পরম প্রার্থিতের প্রতীক্ষায়। বৎসরের অন্য কতদিন নানা কাজের বিভিন্ন প্রয়োজন নিয়ে এসেছে—তাঁর কাছ হ'তে কাজ নিয়ে গেছে ও কাজ দিয়ে গেছে—কিন্তু—

আজ আমি যে বসে আছি তোমারি আশ্বাসে।।

আজ এই মেঘ-ঢাকা দিনে প্রকৃতির গভীর আন্তরিকতা সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে, —প্রকৃতির সেই গভীরতা কবি তাঁর অন্তরে নিবিড়রূপে অনুভব করতে পেরেছেন। তাই আজ তাঁর কাছে 'কাজের প্রয়োজন' নেহাৎ তুচ্ছ ও অনাবশ্যক হ'য়ে গেছে। আজ তিনি অকারণ-প্রতীক্ষায় কোন্ গভীর গোপন অতলের আসা পথ পানে আঁখি মেলে বসে আছেন।

এই অকারণ-প্রতীক্ষার উদ্বেগ, এই অকারণ পুলক-বেদনায় বক্ষ-দোলন, এই তো আজিকার মেঘাচ্ছন্ন দিনের সত্য বস্তু, আর সবই মিথ্যা—সবই তুচ্ছ।

মেঘলোকে আত্মহারা কবির মন আজ আঁধার গগন পথে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করেছে। উতলা-প্রাণ তাঁর মেঘলা হাওয়ার ব্যথিত নিঃশ্বাসের সাথে আকুল হ'য়ে কেঁদে ফিরছে।

দূরের পানে মেলে আঁখি কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পবান আমাব কেঁদে বেড়ায দুবন্ত বাতাসে।।

আসন্ন বরষার মেঘ-সমাগম কবির চিত্তকে ক্রমশঃই অধিকতর দোলা দিয়ে সচঞ্চল করে তুলছে। নীল-নভতলে তারই ঘনায়মান আবির্ভাবের দিকে চেয়ে তিনি উদ্বেল-সুরে ব'লছেন—

একি গভীর বাণী এল ঘন মেঘেব আডাল ধ'বে
সকল আকাশ আকুল ক'বে।।
সেই বাণীর পরশ লাগে, নবীন প্রাণেব বাণী জাগে,
হঠাৎ দিকে দিগন্তবে ধবাব হৃদয ওঠে ভবে।।

মেঘের ঘন ঘন ডাক কবিকে ঘরের বাইবে টেনে আনছে। তাঁব ভাবনা আজ উতলা হ'য়ে উঠেছে 'অকারণে'ব প্রেরণায়। তিনি মেঘাবিষ্ট-নয়নে বিহ্বল-কণ্ঠে গান ধরেছেন—

আজ নবীন মেঘেব সুর লেগেছে আমাব মনে।
আমাব ভাবনা যত উতল হল অকাবণে।।
কেমন ক'বে যায যে ডেকে, বাহিব করে ঘবের থেকে
ছাযাতে চোখ ফেলে ছেঁযে ক্ষণে ক্ষণে।।

এই বিচিত্রা বর্ষাসুন্দরীকে আমরা সকলেই মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত এমন নিবিড় ও সুস্পষ্টরূপে ধরতে পারি না কেন? তার কারণ আমাদের দেখার সঙ্গে এই পবম রসগ্রাহী ভাব-শিল্পীকবির দেখার পার্থক্য আছে। আমাদের চক্ষে অতি শীঘ্র পুরাতনের ছোপ লেগে যায়। এই পুরাতন-লাগা' বা বৈচিত্র্যহীনতার অঞ্জনে আমাদের দৃষ্টি এত সহজে ঘোলা হ'য়ে ওঠে যে, এই পত্রপুষ্পাচ্ছন্না, নদী গিরি নির্ঝর অলঙ্কৃতা, সুন্দরী ধরিত্রীর অঙ্গন দিয়ে, প্রভাত-সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না-রৌদ্রের যে ঘুরে ফিরে নিত্য-যাতায়াত চলেছে, তার মধুর সৌন্দর্য্য আমরা নিবিড়ভাবে দেখতে পাই না, কারণ আমাদের দৃষ্টি বৈচিত্র্যহীনতার আবরণে ঢাকা বয়েছে, এবং চিত্তের রসগ্রাহিতা-শক্তি, জীবনের দৈনন্দিন সাংসারিক ও দৈহিক প্রয়োজনের গুরু-ভারে শুষ্ক ও শীর্ণ হ'য়ে পড়েছে।

এই বিহগ কাকলি-মুখর পুষ্প-বিকাশ সমারোহ-লগ্ন চির নবীন প্রভাতের শুভ্র স্নিগ্ধ-আলোক ধারার প্রেম-সম্ভাষণ আমরা স্পষ্ট শুনতে পাইনে,—হঠাৎ কখনও কখনও তার ঈষৎ আভাস পাই মাত্র।

সিন্দূর-চর্চ্চিতা লাজ বিনম্রা শান্ত সন্ধ্যার স্নিগ্ধরূপশ্রী আমাদিগকে প্রতিদিনই বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে না। পশ্চিমের অলস মেঘস্তবকের উপর গোধূলির বিচিত্র বর্ণ-চাতুর্য্য-লীলা আমাদিগকে ক্ষণতরে বিমোহিত ক'রলেও, বিস্ময়ে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে সেই বর্ণ তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে আমরা প্রতিদিন নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারি না। তার কারণ আমাদের সঙ্কীর্ণদৃষ্টি নিত্যই একই বস্তু দেখে ; সে তার মধ্যে নূতনত্বের আনন্দ-আস্বাদ পায় না, তাই তার সকল সৌন্দর্য্য সকল বিচিত্রতা আমাদের কাছে অস্পষ্ট হ'য়ে যায়। অফুরন্ত শোভা-সম্পদময়ী বিচিত্রা প্রকৃতি আমাদের দৃষ্টির সামনে তাব চির-তারুণ্যের চির-নবীনতার পসরা বিকশিত ক'রে ধ'বে থাকলেও আমরা তা' দেখতে পাইনে। বর্ষা তাই আমাদের কাছে বর্ষে বর্ষে নূতন প্রহরে প্রহরে বিচিত্র হ'য়ে ওঠে না।

কবিব দৃষ্টি চির-নবীনতার শ্যাম-অঞ্জনে বিরঞ্জিত। এই যে ভোবের আলো, এ প্রতিদিন আমাদেব দৃষ্টির সামনে আসে—কিন্তু সেই একই রূপে নয়, প্রতিদিনই সে নূতন হ'য়ে আসে। যে কোনওদিন পুরাতন নয়, তাই সে চির সুন্দর। আমরা আমাদেব রুগ্ন দুর্ব্বল দৃষ্টি দিয়েই তাকে পুরাতন ক'রে ফেলি। সে কিন্তু প্রতি-নিশান্তে পবিপূর্ণ নবীনত্বে মণ্ডিত হ'য়ে এসে ফুলের কুঁড়ির ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়, বিহঙ্গমেব নিঃশব্দ-নীড়গুলি মুখর ক'রে তোলে, সুপ্তা ধরণীর শ্রবণে দিবসের পায়েব নূপুব-ঝঙ্কার পৌঁছে দেয়। এই প্রভাত-আলোরই মতো রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি চির নূতনত্বের কোমল দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তিনি প্রতিদিনই নবীন দৃষ্টি নিয়ে আঁখি মেলে চান—তাই এই সুন্দরী পৃথিবীর নিত্য নব সৌন্দর্য্য তাঁর নয়নে স্পষ্ট প্রতিফলিত হ'য়ে উঠেছে।

ধরণীর কোলে নবাগত শিশু আকাশের পানে যে বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকায়, আজন্ম-অন্ধ প্রথম নব দৃষ্টি লাভ করে রূপসী-ধরার পানে যে বিপুল বিস্ময়-মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে চায়,—চেয়ে চেয়ে অপরিসীম আনন্দে অভিভূত হ'য়ে পড়ে, এই পরম-রসিক কবির দৃষ্টি সেই প্রথম দেখারই নূতনত্বে নিত্য-বিমণ্ডিত। পৃথিবীকে প্রতিদিনই নবীন দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখেন বলে, প্রকৃতির কোনও সুগোপন সৌন্দর্য্য ও রসমাধুর্য্য তাঁর নিকটে লুকিয়ে থাকতে পারেনি।—ষড় ঋতু প্রতিবর্ষে কবির চির-নবীন দৃষ্টির সামনে অফুরন্ত রূপ-উৎস উৎসারিত ক'রে নৃত্যে গীতে শোভায় সম্পদে নেমে আসে।

বর্ষাকে তিনি প্রতিবর্ষেই এমন নূতন দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে দেখেন, যেন—এই দেখাই তাঁর প্রথম-দেখা,—এর পূর্ব্বে বর্ষার সৌন্দর্য্যের আভাস মাত্র যেন তাঁর জানা ছিল না।

কবির কাব্য ও সঙ্গীত এ কথা আজ আমাদের সকলকে জানিয়ে দিয়েছে যে বর্ষার মধ্যে প্রকৃতই অভিনব রূপ ও রসের লীলা-চাতুর্য্যের অন্ত নেই। সে কখনও রোষোদ্দীপ্তা, কখনও বিষাদ-মগনা, কখনও পুলক-বিহ্বলা, কখনও শোকোম্মাদিনী,

কখনও উদাসিনী, কখনও হাস্য-চঞ্চলা।

নিদাঘ-দগ্ধ আকাশতলে বাদল-ছায়া নেমে আসার স্নিগ্ধ ছবি কবির নয়নে কোনও নীলনয়নার কাজল-আঁকা চ'খের সজল-করুণ চাউনিরূপে প্রতিভাত হ'য়েছে।

হেরিয়া শ্যামল-ঘন নীল গগনে
সেই সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।।
অধরে করুণা-মাখা, মিনতিবেদনা-আঁকা,
নীরবে চাহিয়া থাকা বিদায়খনে।।

* * *

আজ সকালে মেঘের ছায়া লুটিয়ে পড়ে বনে,
জল ভ'বেছে ওই গগনেব নীল-নয়নের কোণে!
আজকে এলে নতুন বেশে
তালের বনে মাঠের শেষে
অমনি ফিরে যেওনাক' গোপন সঞ্চারে ;—
দাঁড়িয়ে আমার মেঘলা-গানে বাদল অন্ধকারে।

এইবার দেখতে পাই সমাগত মেঘ-সৈন্যদল ঘন-গুরু-গর্জ্জনে রণশঙ্খ মন্দ্রিত ক'রে নিদাঘের বিরুদ্ধে জয়যাত্রার আয়োজন ক'রছে।

ধরণী তার পরম-প্রার্থিত অতিথির 'দুরু দুরু', গুরু গুরু' আহ্বানের উত্তর দিতে ভোলেনি। এই মেঘের ডাকের প্রত্যুত্তর ধরার বুকের মূক-ভাষায় নীরব-ইশারায় যা' ফুটে উঠ্ছে,—কবির চির-উৎকর্ণ শ্রবণে তা' বেজেছে! কবির কানকে সে এড়াতে পারেনি। কবি শুনতে পাচ্ছেন—

আকাশতলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যায়
'আয় আয় আয়'।।
জামের বনে আমের বনে বব উঠেছে তাই—
'যাই যাই যাই'।
উড়ে যাওয়াব সাধ জাগে তার পুলক-ভরা ডালে
পাতায় পাতায়।।
নদীর ধারে বারে বারে মেঘ যে ডেকে যায়
'আয় আয় আয়'।
কাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে রব উঠেছে তাই—
'যাই যাই যাই'।
মেঘের গানে তরীগুলি তান মিলিয়ে চলে
পাল-তোলা পাখায়।।

এই মেঘ-সমারোহ ক্রমশঃ ঘন হ'তে ঘনতর হ'য়ে উঠ্ছে। বিদ্যুতের তীব্র-কশাঘাতে আকাশের আর্ত্ত নিনাদ, বজ্রধ্বনিতে দিক্ প্রকম্পিত করে' তুল্ছে। গগনতলে এক প্রকাণ্ড যুদ্ধ-আয়োজনের বিপুল-ব্যস্ততা-চিহ্ন ফুটে উঠেছে!

আজ দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরু গুরু,
ডমরু-রব ওই হ'য়েছে সুরু!
তাই শুনে আজ গগন-তলে
পলে পলে দলে দলে
অগ্নি-বরন নাগ নাগিনী
ছুটেছে উদাসী।

আসন্ন বর্ষার ছবি আমাদের চিত্তে যেন সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠ্ছে। আকাশ-পটে আগন্তুক মেঘ-পুঞ্জের বিরাট শোভাযাত্রার বিপুল ব্যস্ততা, কবিকে আনন্দে দিশাহারা ক'রে দিয়েছে। ক্ষ্যাপা মেঘ-করীদলের দ্রুত-চলার পানে তাকিয়ে তাঁর হৃদয় বালকের ন্যায় উচ্ছ্বসিত-আনন্দে দু'হাত তুলে নৃত্য করে' উঠেছে—

পথিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণগগন-অঙ্গনে
মন বে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে।।

সব আয়োজন প্রস্তুত। ধারা নামলেই হয়। আনন্দে ঝোড়ো হাওয়া বেণুর কুঞ্জে মেতে উঠেছে, আমলকী বন কাঁপিয়ে, ঝাউয়ের শাখায় লুটোপুটি খেয়ে আম-জাম-দেবদারু-পিয়াল-তমালে আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ছে। তার বিপুল-আনন্দ আজ নদীর জলে ফেণা হ'য়ে উপ্ছে উঠেছে।

কবি আনন্দ-মাতাল বর্ষা হাওয়ার অশ্রু করুণ অথচ উদ্দাম-মধুর বিচিত্র রাগিণীকে সাপুড়িয়ার বংশীতানের সঙ্গে উপমিত করেছেন। যে সুর করুণ অথচ অদ্ভুত, মধুর এবং মোহমন্ত্র ভরা, যে মন্ত্রময়-রাগিণীতে অতি ক্রূর বিষধরের হৃদয়ও বিগলিত এবং বশীভূত হয়, সেই বাঁশী-সুরের সঙ্গে এই বাতাসের সুরের তুলনা, কবির অতুলনীয় অনুভূতির অভিব্যক্তি!

পুব-সাগবের পাব হতে কোন্ এল পরবাসী—
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন হাওয়ায় হাওয়ায সন সন
সাপ খেলাবার বাঁশি।।

এই সাপ খেলাবার বাঁশীর সুরেই মেঘান্ধকার আকাশে চপলার চপল বিকাশকে কবি 'অগ্নিবরন নাগ-নাগিনী'র মতোই দেখেছেন। এ দৃষ্টি সাধারণের পক্ষে দুর্লভ। এ শুধু কবিরই সম্পদ!

এবার সম্ভাবিত মিলনের আবেগ আর হৃদয়-পাত্রে ধ'রে রাখা যাচ্ছে না। আজ শিশু-চিত্তের উচ্ছল আনন্দ কবিকে মাতাল করে' তুলেছে! তিনি বিপুল খুশিতে করতালি দিয়ে কল-কণ্ঠে গেয়ে উঠেছেন—

হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে, দে রে—
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে।।

* * * * * * *

আসন্ন-বরষার ঘনায়মান মেঘ-সৌন্দর্য্য মানব-অন্তরের গোপন-অন্তঃপুরের চিররুদ্ধ-

দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত দিয়ে সুপ্ত-অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে চায়। মূকমর্ম্ম তখন কি জানি কোন্ না-বলা কথা বলবার জন্য ব্যাকুল চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। মানুষের অন্তরের যে মধুর বসধারা, শুষ্ক কঠিন বস্তুরাশির পেষণে বিশুষ্ক হ'য়ে যাচ্ছে, যে অনুভূতি-শক্তি যন্ত্রময়-কর্ম্ম-জগতের বিপুল চাপে অসাড় হয়ে আসছে, এই 'ছেড়ে দে রে' বাণী, আসন্ন বর্ষা'র মোহাঞ্জন স্পর্শজনিত তাদেরই চিরন্তনী ক্ষণ-ব্যাকুলতা!

প্রকৃতির সঙ্গে আমাদেব হৃদয়ের সম্বন্ধ যে কতখানি নিবিড়, মেঘান্ধকার দিনের অকারণ ব্যথা উদ্বেলিত প্রাণ দিয়ে, শ্রাবণ-ঘননিশীথ-রাতেব বর্ষণ ধাবায় হৃদয়ের বিরহানুভূতিতে,—ফাল্গুনের জ্যোৎস্না-রজনীতে চঞ্চল প্রাণের উদাস প্রেমিকতায়,—অনেক সময়ে ধরা পড়ে যায়। এই অনুভূতি-শক্তি আমরা নিজেরাই অবহেলায় নষ্ট করে' ফেলি।

বর্ষা বর্ষে বর্ষে আমাদের সেই কারাবরুদ্ধ নষ্ট-প্রায় অনুভূতিশক্তিকে তাব বিচিত্র ঝুলন-হিল্লোলে কাজরী গানে নাড়া দিয়ে দুলিয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল' ও 'শেষ বর্ষণে'র বিচিত্র সুর ও শব্দ-ঝঙ্কৃত, সুন্দরতম ভাব-সম্বলিত গানগুলি—নব আষাঢ়ের মেঘচ্ছায়ার মতোই আমাদেব অন্তব আচ্ছন্ন করে ফেলেচে।

'শেষ-বর্ষণে'র গান-গাওয়ার প্রারম্ভে কবি 'নটরাজে'র মুখ দিয়ে বলিযেছেন, —ঘন-মেঘে তাঁর চরণ পড়েছে। শ্রাবণ-ধাবায় তাঁর বাণী, কদম্বেব বনে তাঁর গন্ধেব অদৃশ্য-উত্তরীয়। গানের আসনে তাঁকে বসাও, সুরে তিনি রূপ ধরুন, হৃদয়ে তাঁর সভা জমুক। ডাকো—

> এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে, এসো কবো স্নান নবধাবাজলে।।
> দাও আকুলিযা ঘন কালো কেশ, পবো দেহ ঘেবি মেঘনীল বেশ—
> কাজলনযনে, যূথীমালা গলে; এসো নীপবনে ছাযাবীথিতলে।।

জল স্থল শূন্য ও সমগ্র মানব হৃদয় মথিত করে' তীব্র আকাঙ্ক্ষা ঊর্দ্ধপানে ছুটে চলেছে। শস্য-বিরল বিদগ্ধ ক্ষেত্র বিশুষ্ক-বক্ষ নদী নির্ঝরিণী, তাপ-বিবর্ণ ম্রিয়মান-অরণ্যানী, নিদাঘ-তপ্ত প্রাণীদলসহ তৃষিতা ধরিত্রী বর্ষণ প্রতীক্ষায ব্যাকুল স্বরে আহ্বান করছে,—

> এসো হে এসো সজল ঘন বাদলবরিষনে—
> বিপুল তব শ্যামল-স্নেহে এসো হে এ জীবনে।।
> এসো হে গিরিশিখর চুমি ছায়ায় ঘিরি কাননভূমি,
> গগন ছেয়ে এসো হে তুমি, গভীর গরজনে।।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও মর্ম্মবীণায় তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তৃষিত রাগিণী রণিয়া ওঠে না কি?—

> এসো হে এসো হৃদয়-ভরা, এসো হে এসো পিপাসাহরা,
> এসো হে আঁখি-শীতল-করা, ঘনায়ে এসো মনে।।

২

নববর্ষা

আবাব এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে,
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।

আবার এসেছে আষাঢ়—দিগ্‌দিগন্ত প্রাবৃত করে' আকাশতল আচ্ছন্ন ক'রে, ধরণী শ্যামান্ধকার করে' মানব হৃদয়ে চিরন্তন সুচির-বিরহ জাগবিত করে।

মুগ্ধ কবির আবেশ-বিহ্বল কণ্ঠ আবেগে কাঁপছে। তিনি বৃষ্টির সুবাসাক্রান্ত বাতাসে অধীর উতলা চিত্তে ঘনাবৃত গগনের পানে পুলকিত-দৃষ্টি প্রসারিত কবে ব'লছেন—

এই পুবাতন হৃদয় আমাব আজি
পুলকে দুলিযা উঠিছে আবাব বাজি
নূতন মেঘেব ঘনিমাব পানে চেয়ে।।

তাঁব নিদাঘ-পুরাতন হৃদয় নূতন মেঘেব ঘনিমায় নবীন হ'য়ে দুলে উঠেছে,— নয়ন নব মেঘবসে মদির হয়ে উঠেছে। আত্মবিস্মৃত কবি বিভোব-কণ্ঠে গেযেছেন—

নযনে আমাব সজল মেঘেব
নীল-অঞ্জন লেগেছে,
নযনে লেগেছে।
নব-তৃণ-বনে ঘন-বনছাযে
হবষ আমাব দিযেছি বিছাযে
বিকশিত নীপ-নিকুঞ্জে আজি।
হবষিত-প্রাণ জেগেছে।

আজ তাঁব চিত্তের গভীর হর্ষ, নববর্ষার গাঢ়-ছায়াচ্ছন্ন উৎসবাঙ্গনে কদম্বকাননের শিহবনেব সাথে পুলকাঞ্চিত হ'য়ে উঠছে! কেতকীকুঞ্জের গন্ধ মহোৎসবে চঞ্চল হ'যে উঠছে; মেঘছায়াঙ্কিত নবীন তৃণাঙ্গনের সবুজ-বুকে তাঁর মনের খুশী, পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় স্তবকে স্তবকে বিকশিত হ'য়ে উঠছে! নব বর্ষাব আনন্দোৎসবে নবীন-বৃষ্টি-ধারায় তাঁব হৃদয বিপুল-পুলকে নৃত্য করছে! কবি'র আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে গীত ধ্বনিত হ'য়ে উঠল—

বরষা আইল অই ঘন ঘোব-মেঘে
দশদিক তিমিরে আঁধাবি,
আকুল-হৃদয অধীর-আবেগে
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারি।

আকাশের চারিদিক হ'তে সজল ঘন মেঘরাশি পুঞ্জে পুঞ্জে সমবেত হ'চ্ছে। নূতন বর্ষার এই নবীন মেঘ-মাধুরী অতি নীরস মানব-চিত্তকেও ক্ষণতবে কাজ ভুলিয়ে তার মুগ্ধ নেত্র আকাশ পানে প্রসারিত ক'রতে বাধ্য করে।

কবি এবার যেন অকথিত আনন্দের দোল্‌নায় শিশুর মত দুল্‌তে দুল্‌তে

ঊর্দ্ধপানে তর্জ্জনী-নির্দ্দেশ ক'রে গান ধরেছেন :

> ওই-যে ঝড়েব মেঘের কোলে
> বৃষ্টি আসে মুক্তকেশে আঁচলখানি দোলে।।
> ওরই গানের তালে তালে আমে জামে শিরীষ শালে
> নাচন লাগে পাতায় পাতায় আকুল কল্লোলে।।

এই উদ্বেলিত আনন্দ পরমুহূর্ত্তেই আবার কারণহীন বেদনায় পরিবর্ত্তিত হ'য়ে অজানার বিরহে চঞ্চল বিধুর ক'রে তুলেছে। তাই গানের প্রথমার্দ্ধভাগ আনন্দ-চঞ্চল নৃত্য-বিভঙ্গে তরঙ্গিত হ'লেও, শেষার্দ্ধভাগে সেই আনন্দ, উদাস করুণ হয়ে উঠেছে —বাদল-হাওয়ার হা হা রবে তাঁর কোন চিরন্তন গোপন-সাথী তাঁকে ডেকে ডেকে ফিরছে,—সেই পরিচিত আকুল-আহ্বানের অশ্রুত-ধ্বনি অনুভব ক'রে!

> আমার দুই আঁখি ওই সুরে
> যায় হারিয়ে সজল ধারায়।
> ওই ছায়াময়-দূরে।
> ভিজে হাওয়ায় থেকে থেকে কোন্ সাথি মোর যায় যে ডেকে,
> একলা দিনের বুকের ভিতর ব্যথাব তুফান তোলে।।

প্রথম-বর্ষণের মেঘান্ধকার দিনখানি কবির নয়ানে সুদীর্ঘ-বিরহান্তে মিলন-মুহূর্ত্তে তরুণী-প্রিয়ার নীলাম্বরীর লজ্জাবগুণ্ঠনের ন্যায় মধুর অথচ রহস্যপূর্ণ প্রতিভাত হ'য়েছে।

তিমিরবসনা নববর্ষা সুন্দরী মেঘাবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে ধরার বুকে নেমে এল। বর্ষণ-ঝরঝর ধারা গীত-গুঞ্জরণের সাথে কণ্ঠসুর মিশিয়ে দিয়ে, ভুবনের প্রতিভূরূপে কবি বিস্ময়ানন্দ-বিমিশ্রস্বরে প্রশ্ন ক'রলেন—

> তিমির-অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি
> কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী।।
> আজি সঘন শর্বরী, মেঘমগন তারা,
> নদীর জলে ঝর্ঝরি ঝরিছে জলধারা,
> তমালবন মর্মরি পবন চলে হাঁকি।।
> কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী।

বরষার স্নিগ্ধ পরশ মানব-চিত্তে পুঞ্জ পুঞ্জ ভাবরাশি মুকুলিত ক'রে তুললো; মর্ম্মকুহরে গভীর রহস্যময় বিচিত্রবাণী পৌঁছিয়ে দিল; সেই রহস্য-গভীর বাণীর উত্তর-দানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা চিত্ততল মথিত ক'রে তুলেছে। কবি ব'লছেন—

> যে কথা মম অন্তরে আনিছ তুমি টানি
> জানি না কোন্ মন্তরে তাহারে দিব বাণী।

তার পরের ছত্রগুলিতে কবি বলেছেন—তিনি বাধা বন্ধনে বদ্ধ আছেন, সকল বাধা ছিন্ন করে' বাইরে যাবেন, কেননা—তাঁর এই বাদল-ঝরা রাত্রি 'বৃথা-ক্রন্দনে' কেটে গিয়ে পরম সার্থক হয় এই তাঁর সাধ। তিনি সকল বাধা লঙ্ঘন করবেন তাঁর বাঞ্ছিতার

অশ্রুধারা' গুঞ্জনের সাথে, কারণ-হারা গভীর কান্না কাঁদবার বিপুল প্রলোভনে।

নববর্ষা'র স্নিগ্ধ-ঘনমেঘ শুধু সবুজ মাঠ, শ্যামল অরণ্যানীর উপরে কাজল ছায়া বিস্তৃত ক'রে মনোমদ ক'রে তোলে না, মানবের চিরপিপাসিত বুভুক্ষু চিত্তের উপরেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তৃত করে। কবি কালিদাস বলেছেন—'মেঘালোকে ভবতি সুখীনোহপন্যথাবৃত্তিচেতঃ'—মেঘ দর্শনে সুখী মানুষেরও চিত্ত উন্মনা উদাস হ'য়ে ওঠে। নবমেঘ-মায়া-জনিত হৃদয়ের এই শূন্যতানুভূতি কবিকে ব্যথাতুর করে' তুলেছে দেখতে পাই ;—

আজ কিছুতেই যায় না মনেব ভার,
দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার—হায় রে।।
মনে ছিল আসবে বুঝি, আমায় সে কি পায় নি খুঁজি—
না-বলা তাব কথাখানি জাগায় হাহাকার।।
সজল হাওয়ায বারে বাবে
সারা আকাশ ডাকে তারে।
বাদল-দিনের দীর্ঘশ্বাসে জানায় আমায় ফিববে না সে—
বুক ভরে সে নিযে গেল বিফল-অভিসার।।

নববর্ষাকে কবি প্রতিক্ষণে নব নব রূপে নব নব বেশে অভিনব লীলা ভঙ্গিমায় সৌন্দর্য্যায়িত হ'তে দেখছেন। 'আবির্ভাব' কবিতাটির মধ্যে তিনি বর্ষাকে জল-স্থল-গগন-পরিব্যাপ্তা বিপুল গৌরবন্বিতা মহামহিমময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা করিয়েছেন।

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছে আমারে তোমার ছায়ায়
সঘন সজল বিশাল মায়ায়,
আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে
হৃদয়সাগর উপকূল ;...

বনফুল জড়িত-চরণা এলায়িত-ঘন-কুন্তলা বর্ষার মহা মহিমময়ী মূর্ত্তি আমাদের মানস-নেত্রপটে যেন এক অপূর্ব্ব নূতন সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটিত করে' দেয়।

নববর্ষার সমাগমে যে-হর্ষ আজ দগ্ধ মাঠের বিবর্ণ বক্ষ নয়ন ভুলানো স্নিগ্ধ-সবুজে সুরঞ্জিত করেছে যূথীবনের, কেয়া-ঝোপের, কদম্বকুঞ্জের গোপন আনন্দ, গন্ধরূপে উৎসারিত হ'য়ে পড়েছে, ধরণীর বক্ষতল হ'তে শিলীন্ধ্রপুঞ্জ ঘাসের বুকে জেগে উঠেছে, নিবিড় মেঘের কাজল বুকে বলাকার শুভ্র মালা দুলেছে—চারিদিকে তৃপ্তির চিহ্ন, তৃষা-হরণের চিহ্ন, অনুরাগের আভাস স্ফুরিত হ'য়ে উঠেছে—সেই নিবিড় ঘন বিপুল হর্ষ আজ ধারা-গুঞ্জরিত মেঘান্ধকার দিনে কবির চিত্ত-শিখাকে পুলকিত নৃত্যে চঞ্চল করে' তুলেছে! তাঁর ভাবোচ্ছ্বসিত হৃদয় হ'তে প্রাণময়ী কবিতাধারা উৎসারিত হ'য়ে এসেছে—

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে।
শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপের মতো কবেছে বিকাশ,
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে।।

নববর্ষায় মানব-হৃদয়ের এর চেয়ে সুন্দরতব ভাবাভিব্যক্তি আর কোথাও আছে কিনা জানি না।

শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপেব মতো করেছে বিকাশ,

এই ক্ষুদ্র দুইটি ছত্রে কবি বর্ষাগমে ব্যাকুল মানবহৃদয়ের অপূর্ব্ব আনন্দ-উদ্বেলতাব সুন্দব প্রতীকাশ দিয়েছেন। তাঁর অন্তরের বিপুল হর্ষ, অনন্ত বিস্ময়, অফুবন্ত আনন্দ মর্ম্মপাত্র ছাপিয়ে মেঘছায়াঙ্কিত শ্যামদভাবাচ্ছন্ন ধবিত্রীব বুকে,—বাদল-মাদল-মুখব আঁধাব আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে—তারই নিদর্শন এই ছোট দু'টি ছত্রে ফুটে উঠেছে।

ঘনোপল-বর্ষিতা ঝঞ্ঝাবাহিনী বরষার উন্মত্ততার সঙ্গে সঙ্গে কবিব উচ্ছ্বসিত ভাব-তরঙ্গও ক্রমশঃ উদ্দাম এবং প্রমত্ত হ'যে উঠ্ছে। নববর্ষাব জয-রথচক্রের গম্ভীর নির্ঘোষ এবং তার গগনপ্রাবৃত ভৈববী মূর্ত্তি, যা' প্রচণ্ড ভযঙ্কর অথচ স্নিগ্ধ মোহন, কবি তাঁর কাব্যপটে সেই রুদ্র মধুব ব্যঞ্জনা'র অতি সুন্দর প্রতিচ্ছবি তুলে নিয়েছেন।—

ওই আসে ওই অতি ভৈরব হবষে,
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভবভসে
ঘনগৌববে নবযৌবনা ববষা
শ্যামগম্ভীর সবসা।
গুরু গর্জনে নীল অবণ্য শিহবে,
উতলা কলাপী কেকাকলববে বিহবে—
নিখিলচিত্তহবষা,
ঘনগৌববে আসিছে মত্ত ববষা।।

নব বরষার ভৈরব-হরষে কবির অন্তরের সমস্ত অর্গল উন্মুক্ত হ'য়ে গেছে। তিনি সেই গুরু গরজন ও ঘনবরিষণের গম্ভীর বিরাট মহোৎসবে মুক্ত হৃদয়ে যোগ দিয়ে উন্মুক্ত কণ্ঠে গেয়েছেন—

আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি গম্ভীর, অতি গম্ভীব নীল অম্ববে ডম্বরু বাজে,
যেন রে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে।
কবে গর্জন নির্ঝবিণী সঘনে,
হেবো ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়ালতমালবিতানে
উঠে বব ভৈরবতানে।
পবন মল্লারগীত গাহিছে আঁধার রাতে,
উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে অম্বরতলে।
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা, ঝরঝর রসধারা।।

রুদ্রা ভৈরবী বর্ষার আনন্দোম্মত্তা মূর্ত্তি আমরা বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলেম। এইবার কবি এই লীলা-লাস্যপরায়ণার ক্ষণ-অভিমানিনী, ক্ষণ-গম্ভীরা, ক্ষণ-হাস্যচঞ্চলা, ক্ষণ-ক্রন্দনশীলা মূর্ত্তিখানি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে চিত্রিত করে' আমাদের নয়ন ও মানসকে মুগ্ধ করেছেন। কিন্তু তার পূর্ব্বে কবি-কর্ত্তৃক স্বাগত-সঙ্গীতে বর্ষারাণীর সাদর-বরণটুকুর উল্লেখ না করে' আমি অগ্রসর হ'তে পারছি না। কবি এইভাবে বর্ষাকে বরণ করেছেন—

আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা—
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটিরে অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জপাতায় নবগীত করো রচনা
মেঘমল্লাররাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী।।
*　　*　　*　　*
এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা।
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
গীতিময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।...

বর্ষা এসেছে। অতীতের বহুশত যুগের বিস্মৃত হাসি-কান্নার সৌরভ মেখে বর্ষা এসেছে। শত যুগের শত শত কবি আজ যেন ওই মর্ম্মরায়মান বৃক্ষপল্লবের করুণ ধ্বনিতে সিক্ত বাতাসের ব্যথিত নিঃশ্বাসে তাদের শত যুগের রচিত কাজরী-গান পাঠিয়ে দিয়েছে!

কবি ভিজে মাটীর গন্ধে, সিক্ত শাখার মর্ম্মর-ক্রন্দনে, বারিবিন্দু ঝরার টুপটাপ্ শব্দে কোন এক মৌন বেদনার নীরব ইঙ্গিত—কি যেন এক ব্যথিত রহস্যের গোপন আভাস পাচ্ছেন। কবি তাই বলেছেন—

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে বাজে কার কামনা।।
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে—
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা।।

নববর্ষার মন্ত্রস্পর্শে এই কারণ-হারা দুঃখের বেদনাপ্রচ্ছন্ন করুণ সুর—এর মাধুর্য্য,

এর নিবিড়তা অনুভূতিগ্রাহ্য বস্তু।

ক্রন্দনের কোমল-আবরণে যার হাসি আবরিত, তারই হাসি সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে গভীর ও মর্ম্মস্পর্শী। বিষাদের করুণ ছায়ায় যার আনন্দ-সম্ভোগ তারই আনন্দ সার্থক। করুণ বেদনার ছদ্মে অশ্রুপদ্মের আড়ালে যে-হাসির হরষ ফুটে ওঠে সেই হাসিই সবচেয়ে মনোজ্ঞ, সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী। যে হাসিতে কারুণ্য-সমাবেশ নেই সে হাসি গভীর নয়, ক্ষণস্থায়ী, ওষ্ঠাধরে ফুটে ওষ্ঠাধরেই ঝরে' পড়ে যায়। অশ্রুর মাঝে যে-হাসি বিকশিত হ'য়ে ওঠে, সে মুখ হ'তে ফোটে না, বুক হ'তে উৎসারিত হ'য়ে আসে, তাই যাঁদের অন্তর গভীর, তাঁরা সেই বক্ষোৎসারিত অশ্রুঢাকা হাসিরই বেশী অনুরাগী।

বর্ষার মধ্যে বিষাদের শ্যামচ্ছায়া, বেদনার করুণ রাগিণী, অশ্রুর মধুর সমাবেশ আছে বলেই বোধ হয় সে আমাদের এই পরম রসবেত্তা কবির হৃদয়খানি এমন নিবিড়ভাবে স্পর্শ করতে পেরেছে!

কবি কতখানি গভীরভাবে বর্ষাকে অনুভব করেছেন, তার অফুরন্ত নিদর্শন বর্ত্তমান র'য়েছে। আমি তার মধ্য হ'তে একটি সর্ব্বজন-বিদিত ও সর্ব্বজন-প্রিয় বর্ষা-সঙ্গীতের উল্লেখ ক'রছি। এই গানটির মধ্যে বোঝা যায়—কী সুগভীর ঘন অনুভূতি দিয়ে কবি বর্ষাকে উপভোগ করেছেন!—

আমার নিশীথবাতের বাদলধারা, এসো হে গোপনে,—
আমাব স্বপনলোকে দিশাহারা।।
ওগো অন্ধকারের অন্তরধন, দাও ঢেকে মোব পবানমন—
আমি চাই নে তপন চাই নে তাবা।।

এরপরে বরষার শান্ত সৌন্দর্য্য কবি অতি শান্ততমভাবে বর্ণিত করেছেন।

নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো, তোরা আজ যাস নে ঘরের বাহিরে।।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরো-ঝরো, আউষের ক্ষেত জলে ভরো-ভরো,
কালিমাখা মেঘে ও পারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ্ চাহি রে।।
* * *

ছায়া ঘনাইছে বনে বনে, গগনে গগনে ডাকে দেয়া।
কবে নবঘন-বরিষণে গোপনে গোপনে এলি কেয়া।।
* * *

বহু যুগের ও পার হতে আষাঢ় এল আমার মনে,
কোন্ সে কবির ছন্দ বাজে ঝরো ঝরো বরিষণে ।।
যে মিলনের মালাগুলি ধূলায় মিশে হল ধূলি
গন্ধ তারি ভেসে আসে আজি সজল সমীরণে।।

এই শান্ত মধুর গানগুলির মধ্যে কেমন-যেন একটি অতি প্রচ্ছন্ন গোপন বেদনার রেশ ঝঙ্কৃত,—তাই এই গানগুলির সাহায্যে অনেক সময়ে, নববর্ষার ছোঁয়া-লাগা

অকারণ ব্যথায় উতলা প্রাণকে অনেকখানি যেন শান্ত ও আনন্দিত ক'রতে পারি।

বর্ষার দিনে এই গানগুলি, আজ এখানে ঘরে ঘরে কিশোর ও তরুণ নর-নারীর কণ্ঠে সুরে ও বেসুরে গুঞ্জরিত হ'য়ে ফেরে; আমরা আমাদের ভাষাহারা মর্ম্মের রুদ্ধ বাণীকে এই সকল গানগুলির মধ্যে প্রকাশ ক'বতে পেরে অনেকখানি তৃপ্তি অনুভব করি। সার্থকতার আনন্দে তখন আমরা গাই—

কখন বাদল-ছোঁওয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি সবুজ মেঘে মেঘে।।
ওই ঘাসেব ঘনঘোরে
ধরণীতল হল শীতল চিকন আভায় ভ'রে—
ওরা হঠাৎ-গাওয়া গানের মতো এলো প্রাণেব বেগে।।

তখনই আমরা স্পষ্ট অনুভব করতে পারি এবং তখনই স্বীকার করি—

ওরা যে এই প্রাণের রণে মরুজয়ের সেনা,
ওদের সাথে আমাব প্রাণের প্রথম যুগের চেনা—
তাই এমন গভীর স্বরে
আমার আঁখি নিল ডাকি ওদের খেলাঘরে—
ওদের, দোল দেখে আজ প্রাণে আমার দোলা ওঠে জেগে।।

সুনীল-বসনা সজল কাজল-নয়না মেঘমল্লার-নিমগ্ন প্রাবৃট-সুন্দরীর রূপ, কবির লেখনীমুখে অনন্ত সৌন্দর্য্যে উৎসারিত হ'য়েছে, বিচিত্রবর্ণে সুচিত্রিত হ'য়েছে। নব-বর্ষার একখানি স্নিগ্ধ-মধুর ছবি এখানে তুলছি—

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী,
গাঢ়চ্ছায়া সারাদিন মধ্যাহ্ন তপন-হীন
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম-বনশ্রেণী।

এই তপনহীন ছায়া-ঘন দিবসে, ঘন-কালো অরণ্যানীপুঞ্জের মৌন গাম্ভীর্য্যের গভীর সমাবেশে আজ কী মনে পড়ে? না—

আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে।
সেই দিবা-অভিসার পাগলিনী-রাধিকার,
না জানি সে কবেকার দূর-বৃন্দাবনে।

বর্ষা নিখিল মানব-চিত্তে যে উদাস-ব্যাকুলতা, কারণ-হারা বিরহ-বেদনা জাগ্রত করে, এর কারণ অন্বেষণ করা মিথ্যা। যেহেতু বাস্তবের সঙ্গে এ' বিরহানুভূতির বিশেষ সম্পর্ক নেই। হয়তো বাস্তবের মধ্যেই এ' বেদনা তার আশ্রয় বা কেন্দ্র খুঁজে কেঁদে ফেরে, কিন্তু বস্তুতঃ অন্তর-ধনের জন্যেই অন্তরের এ' আকুলতা!

ভাব-রসিক অন্তরের বরষার মেঘমায়ায় এই 'কি জানি-কি-না-পাওয়া'র ব্যথা, 'কি-জানি কি-হারানো'র দুঃখ, আষাঢ়ে ঘনাবির্ভাবের মত, নিশাগমে নিদ্রাবির্ভাবের মত, আপনা-হ'তে বক্ষমাঝে আবির্ভূত হ'য়ে থাকে। সিন্ধু-তরঙ্গের মত সে কখনও

নিষ্ফল-আবেগে ফুলে ফুলে ওঠে, কখনও ব্যাকুল বেদনায় আছড়ে আছড়ে পড়ে, কখনও করুণ ব্যথায় লুটিয়ে লুটিয়ে ফেরে।

এই চিরন্তনী-বেদনার মধুর অমৃত, অনাদিকাল হ'তে মানুষের মর্ম্ম-কমলে জাগরূক রয়েছে। যে সনাতন সুমিষ্ট রসধারায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে বৈষ্ণব কবিগণের কল্পনাপুঞ্জ সুমধুব ভাবঘন বৈষ্ণব কাব্যে 'বিরহরস'রূপ অমূল্য ও অপূর্ব্ব বস্তু গড়ে' তুলেছে। এই পরম বিচিত্র, পরম গভীর, নিবিড়-মধুর বিরহবসকে কেন্দ্র ক'রেই বৃন্দাবনের 'কিশোর কিশোরী'র মধুর প্রেমলীলা অবলম্বনে, মানবের ভাবজগতে এক দুর্লভ-সম্পদ বা পরম উপভোগ্য রস সৃষ্ট হ'তে পেরেছে!

কবি নববর্ষায় সেই চিরন্তনী বিরহ-ব্যথার সুচিরবিকাশ স্পষ্ট অনুভব করেছেন, তাই তিনি বলেছেন—

আজও আছে বৃন্দাবন মানবেব মনে।
শবতেব পূর্ণিমায়
শ্রাবণেব ববিষায়
উঠে বিবহেব গাথা বনে উপবনে।
নূতনও সে বাঁশী বাজে যমুনাব তীবে।
এখনও প্রেমের খেলা
সাবাদিন সাবা বেলা
এখনও কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটিবে।

৩

ঘন-বর্ষা

শেষবর্ষণে পরম-রসিক 'নটরাজের' মুখে আমরা শুনেছি—'শ্রাবণ ঘর-ছাড়া উদাসী। আলুথালু তার জটা, চোখে তার বিদ্যুৎ। অশ্রান্ত-ধারার একতারায় একই সুর সে বাজিয়ে বাজিয়ে সারা হ'ল। পথহারা তার সব-কথা ব'লে শেষ ক'রতে পারলে না।'

বর্ষাকে গীতমুখর ভাব-রস-মত্ত বাউলের সঙ্গে কবি উপমিত করেছেন :—

বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা—
সারা বেলা ধ'রে ঝরোঝরো ঝরো ধারা।।
জামের বনে ধানের ক্ষেতে আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হল সারা।।

তারপরেই গানখানির ভাব এবং সুর ঘন-খাদে নেমে এসেছে,—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখে এবং মনেও বাদল ঘনিয়ে উঠ্‌ছে :—

ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ-মাঝে

তারপরেই ভাব ও সুর যেন একত্রে চঞ্চল লীলা-লাস্যে ঈষৎ উঁচুতে উঠেছে—

পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুব বাজে।

আবার তাব পবের সুর আবও উচ্চতর পর্দ্দাতেই উঠেছে, কিন্তু যেন তাব উদাস-বেদনা প্রচ্ছন্ন ভাবটুকু বেশ ধবা পড়ে' গিয়েছে :—

ঘব-ছাড়ানো আকুল সুবে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুবে
পুবে হাওয়া গৃহহারা।

কবির এই অনবদ্য বর্ষা-সঙ্গীতগুলি যে শুধু ভাব-সম্পদে শব্দ-ঝঙ্কারে প্রতীকাশ-ঐশ্বর্য্যে মধুর ও মহামূল্য—তাই নয়,—গানগুলি রচয়িতার আপন কণ্ঠ-নিঃসৃত ভাব ও কথার সাথে একান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ বিচিত্র সুন্দর সুরে সজ্জিত হ'য়ে আরও মঞ্জুল হ'য়েছে।

শ্রাবণ-ধারা ধরণীর সঙ্গে গগনের মিলন ঘটিয়ে দেয়। অবিচ্ছিন্ন-বর্ষণের অবগুণ্ঠন টেনে দিয়ে গগনেব সহিত পৃথিবীর বিশ্রম্ভালাপ শুরু হয়। ঘন বরিষণের অবসরে দিগন্ত-প্রান্ত যখন বিরহ-শীর্ণা ধরণীর করতল-চুম্বনচ্ছলে অধবপুট আনমিত ক'রে নিয়ে আসে, উচ্ছ্বসিত বিপুল বারিধারা তখন জলস্থল ও আকাশ-বাতাস একাকার ক'রে দিযে, সেই মিলন পিয়াসীদ্বয়ের মধ্যেব সকল বাধা-ব্যবধান দূব ক'বে দেয়। কবি এই বিরাট-মিলনের মঙ্গল-সঙ্গীত রচনা কবেছেন :—

ধবণীব গগনেব মিলনেব ছন্দে
বাদলবাতাস মাতে মালতীব গন্ধে।।
উৎসবসভা-মাঝে শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহবে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে।।
দুই কূল আকুলিযা অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তবঙ্গে।
কাঁপিছে বনেব হিযা ববষনে মুখরিয়া
বিজলী ঝলিযা উঠে নবঘনমন্দ্রে।

আবার দেখি, কবি 'শ্রাবণে'র মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর রূপে দেখ্‌ছেন। তার ধারা-প্লাবিত মূর্ত্তির আড়ালে অনলের অস্তিত্ব টের পাচ্ছেন। শ্রাবণের বুকে এই গোপন অগ্নি-সমাবেশের সংবাদটি আজ জগতের কাছে এক অশ্রুত-পূর্ব্ব নূতন বার্ত্তা!

এই শ্রাবণেব বুকের ভিতব আগুন আছে।
সেই আগুনের কালোরূপ যে আমার চোখেব 'পরে নাচে।।
ও তাব শিখার জটা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে ওই দিগন্তবে,
তাব, কালো আভাব কাঁপন দেখো তালবনেব ওই গাছে গাছে।
বাদল-হাওযা পাগল হল সেই আগুনেব হুহুঙ্কারে।
দুন্দুভি তার বাজিযে বেড়ায় মাঠ হ'তে কোন্ মাঠের পারে।
ওরে, সেই আগুনের পুলক ফুটে কদম্ববন রঙিয়ে উঠে,
সেই আগুনের বেগ লাগে আজ আমার গানের পাখাব পাছে।।

আবার অন্য মুহূর্ত্তে বর্ষার ধারা-প্লাবন মূর্ত্তি, ধরণীর সঙ্গে মানবের চিত্ত-তলও

প্লাবিত ক'রে দিয়েছে দেখা যায় ।—

আজি, বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে।
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা
কোথায় না ধরে।

বাদল-ঋতুর ঝঞ্ঝা উদ্দাম ঘন-বর্ষণোম্মত্ত দিনখানি এই গানটির মধ্যে যেন মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে :—

শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের 'পরে।
আজি, মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে!

এমনতর দিনে ভাবুক-জনের অন্তরের অবস্থা কবি বিজ্ঞাপিত ক'রেছেন। বাইরের উম্মাদ মাতামাতির সঙ্গে অন্তরের মধ্যেও মহা বিপ্লব শুরু হ'য়েছে।—

ওরে, বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন
লুটেছে এই ঝড়ে,
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে!
অন্তরের আজ কী কলরোল,
দ্বারে দ্বারে ভাঙ্‌ল আগল,
হৃদয় মাঝে জাগ্‌ল পাগল,
আজি ভাদরে!
আজ, এমন ক'রে কে মেতেছে
বাহিরে ঘরে!

এর পরে আমরা কোমল ও কঠোরের মিলন-ছবি দেখতে পাই। বাদলের এই উভয়রূপের সমন্বয় বেশ চিত্তগ্রাহী :—

বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ় তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরই জ্বালা।।
তোমার মন্ত্রবলে পাষাণ গলে, ফসল ফলে—
মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা।।
মরোমরো পাতায় পাতায় ঝরোঝরো বারির রবে
গুরুগুরু মেঘের মাদল বাজে তোমাব কী উৎসবে।
সবুজ সুধার ধারায় প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ঙ্করী বন্যা মবণ-ঢালা।।

বর্ষার মায়ামন্ত্র-পরশে মানব-চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র ভাবরসে মগ্ন হয়, কখনও

সে কার যেন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে, কখনও সে কোন অজানা বাঞ্ছিতা প্রিয়তমাকে বুকের ভিতর লাভ ক'রে অপূর্ব্ব মিলন-পুলকে নিমগ্ন হয়, কখনও লক্ষ্যহীন অর্থহারা বিপুল বিরহ-ব্যথায় কাতর হ'য়ে লুটিয়ে পড়ে।

আবার কখনও শ্রাবণকেই সে তার 'চাওয়ার ধন' ব'লে তার রূপে রসে বিভোর হ'য়ে তারই প্রেম-স্তুতি গাইতে থাকে ; যেমন :—

শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে,
মেঘ-আঁচলে নিলে ঘিরে।।
সূর্য হারায়, হারায় তারা আঁধারে পথ হয়-যে হারা,
ঢেউ দিয়েছে নদীর নীরে।
সকল আকাশ, সকল ধরা, বর্ষণেরই-বাণী-ভরা,
ঝরো ঝরো ধারায় মাতি বাজে আমার আঁধার রাতি,
বাজে আমার শিরে শিরে।।

* * * *

বাদল-মেঘে মাদল বাজে গুরুগুরু গগন-মাঝে।
তারি গভীর রোলে আমার হৃদয় দোলে,
আপন সুরে আপনি ভোলে।।
কোথায় ছিল গহন প্রাণে গোপন ব্যথা গোপন গানে—
আজি সজল বায়ে শ্যামল বনের ছায়ে
ছড়িয়ে গেল সকলখানে গানে গানে।।

* *

আজ আকাশের মনের কথা ঝরো ঝরো বাজে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।
দীঘির কালো জলের 'পরে মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে,
বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।।
আঁধার বাতায়নে
একলা আমার কানাকানি ওই আকাশের সনে।
ম্লানস্মৃতির বাণী যত পল্লবমর্মরের মতো
সজল সুরে ওঠে জেগে ঝিল্লিমুখর সাঁঝে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।

বর্ষার সাথে মানব হৃদয়ের নিবিড় যোগের পরিচয় পাওয়া গেল। এখন, ঘন-বর্ষায় চিত্ত কোন্ অজানার তরে অকারণ-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ওঠে? তার অভিব্যক্তি কিরূপ? তারই একটু সন্ধান নেওয়া যাক্। এই ব্যাকুল-প্রতীক্ষায় পথ-চাওয়া ভাবটি রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বর্ষা-কবিতায় মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে।

এই শ্রাবণ-বেলা বাদল-ঝরা যূথীবনের গন্ধে ভরা।।
কোন্ ভোলা দিনের বিরহিণী, যেন তারে চিনি, চিনি—

ঘন-বনের কোণে কোণে ফেরে ছায়ার-ঘোম্‌টা-পরা।
কেন বিজন বাটের পানে তাকিয়ে আছি কে তা জানে।
যেন হঠাৎ কখন অজানা সে আসবে আমার দ্বারের পাশে,
বাদল-সাঁঝের আঁধার-মাঝে গান গাবে প্রাণ-পাগল-করা।।

গগন তল গিয়েছে মেঘে ভরি
বাদল-জল পড়িছে ঝরি-ঝরি।
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরাণ মম সহসা জাগি'
এমন কেন করিছে মবি মবি!
বেদনা-দূতী গাহিছে—'ওরে প্রাণ।
তোমার লাগি জাগেন ভগবান
নিশীথে ঘন-অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে
দুঃখ দিয়া রাখেন তোর মান।'

* * * *

ভেবেছিলেম আসবে ফিরে,
তাই ফাগুনশেষে দিলেম বিদায়।
তুমি গেলে ভাসি নয়ননীবে
এখন শ্রাবণদিনে মরি দ্বিধায়।।
এখন বাদল-সাঁজেব অন্ধকারে আপনি কাঁদাই আপনাবে.
একা ঝবো ঝবো বারিধারে ভাবি, কী ডাকে ফিরাবো তোমায়।।

এর পরে আর একটি ভাব ফুটে উঠেছে। এটি হ'চ্ছে মিলনের পুলক। এর বস অফুরন্ত, চিত্ত-বিহ্বলকারী। ঐ পাওয়ার সুখ যে কী গভীরতর তা' শুধু উপলব্ধির বস্তু। এই পুলকিত মিলন-বিহ্বলতা কবি তাঁর গীত-পুষ্পের প্রতি পেলব পাপ্‌ড়িতে তার স্নিগ্ধ-বর্ণে ও মধুগন্ধে ফুটিয়ে তুলেছেন।

উতল-ধারা বাদল ঝরে। সকাল বেলা একা ঘরে।।
সজল-হাওয়া বহে বেগে, পাগল নদী উঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে, তমালবনে আঁধার করে।।
ওগো বঁধূ দিনের শেষে এলে তুমি কেমন বেশে—
আঁচল দিয়ে শুকাব জল, মুছাব পা আকুল কেশে।।

* * *

শ্রাবণ-ঘন-গহন মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়িয়ে এলে।

* * * *

আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদলসাঁঝে
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে।
বনের ছায়ার জলছলছল সুরে
হৃদয় আমার কানায় কানায় পূরে।
খনে খনে ঐ গুরুগুরু তালে তালে
গগনে গগনে গভীর মৃদঙ বাজে।।
কোন্ দূরের মানুষ এলো যেন আজ কাছে,
তিমির-আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দোলে তার বিরহব্যথার মালা,
গোপন-মিলন-অমৃতগন্ধ ঢালা।
মনে হয় তার চবণের ধ্বনি জানি—
হার মানি তার অজানা জনের সাজে।

এই যে 'দূরের মানুষ এলো যেন আজ কাছে' এই অনুভূতি আমাদের সব কষ্ট বেদনা সংসারের নীরস ভ্রূকুটীর দুঃখ ভুলিয়ে দেয়।

'সংসার' ও 'সমাজ' নামে যে দু'টি বস্তুকে একদিন আমরা আমাদের বিশৃঙ্খল অনিয়মিত জীবনকে নিয়মিত ও সংযত করে' কল্যাণ আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ ক'রবার উপায়-স্বরূপে স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করেছিলেম, এবং যে-পর্য্যন্ত 'মানুষ'কে তার প্রভু রেখে—সেই সমাজের নিয়মাধীন থেকেছি, ততদিন পর্য্যন্ত ওদের কাছ থেকে আমরা প্রচুর সুফল ও উন্নতি লাভ করেছি;—কিন্তু আজ সেই মানুষের সৃষ্ট সমাজে 'সংস্কার' এবং 'লোকাচার'ই একাধিপত্যে রাজা হ'য়ে 'প্রয়োজনীয়তা' ও 'কল্যাণে'র কণ্ঠরোধ করে' মানুষের উপর প্রভুত্ব ক'রছে। আমরা এখন 'সমাজ' অর্থাৎ 'সংস্কার ও লোকাচারে'রই ক্রীতদাস! তাই দুর্ব্বল আমরা নির্ব্বিচারে তাদের শাসন মেনে নিয়ে বিবেক, বুদ্ধি, স্ফূর্ত্তি, আনন্দ, কল্যাণ, জীবনের বিচিত্র-মাধুর্য্য সমস্তই নষ্ট করে' ফেলতে দ্বিধা করি না। জীবনের প্রাণরস-ধারা শুষ্ক এবং রুদ্ধ করে', সৌন্দর্য্য এবং জীবনের সত্যকে আবৃত করে' এক একটি 'সামাজিক-যন্ত্র' ও 'সংসার-কীট' হ'য়ে ওঠাই যেন আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও পরম সার্থকতা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

হৃদয়ের সুকোমল-বৃত্তিগুলির প্রভাবকে, অন্তরের মাধুর্য্য-রসকে আমরা 'অসার-ভাবপ্রবণতা' বলে' উপহাস করে' থাকি। নির্ব্বিচারে ও নির্ব্বিরোধে আবৃত-নয়নে সমাজের ঘানি-যন্ত্রের অনুবর্ত্তিতা ও অর্থ সংগ্রহ-প্রচেষ্টাকেই আজ আমরা মানব-জীবনে সাব ও শ্রেষ্ঠ বলে' মেনে নিয়েছি।

সমাজ ও সংসারের এই যে প্রচণ্ড প্রভাব আমাদের জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে নাগপাশে আবদ্ধ করে' রেখেছে—কোন্ সময়ে আমরা এর প্রভাব হ'তে মুক্ত হ'তে পারি? ক্ষণকালের তরে এর কঠিন বেদনা-বন্ধন শিথিল হ'য়ে পড়ে কোন্ মুহূর্ত্তে? সামাজিক-জীব মানুষ কখন নির্ভয়ে প্রাণ খুলে স্পষ্ট স্বীকার ক'রতে পারে?—

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ' জীবনের কলরব।

অতিবড় মহাকর্ম্মী, অতিবড় স্বার্থপর অর্থলোলুপ বা জীবিকা-চিন্তন-কাতর দীন দুঃখী মানবও তাদের কঠিন কর্ম্মভার, বিষয় বাসনা ও সংসার-চিন্তার বিপুল আক্রমণ হ'তে ক্ষণতরে যেন ছুটী পেয়ে আপনার কর্ম্মক্লান্ত চিন্তা-কাতর শুষ্ক অন্তরটি কবির এই গানের সুরে মিশিয়ে দিয়ে একটিবার বলতে চা'ন্—

যে কথা এ' জীবনে
রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘন-ঘোব বরিষায়।

আজকের দিনটিতে মানুষ মুহূর্ত্ততরে, কোন্ অজ্ঞাত-প্রেরণায়—'সমাজে'র চেয়ে 'প্রাণ'কে বড় ব'লে স্বীকার ক'রে ফেলে,—এবং এক নিমেষের তরে, বিদ্রোহের-স্বরে প্রশ্ন করে :—

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কা'র,
নামাতে পারি যদি মনোভার?
শ্রাবণ-বরিষণে একদা গৃহকোণে
দু'কথা বলি যদি কাছে তা'র
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার?

আজ সে বুঝেছে, আজ সে তার ব্যাকুলপ্রাণ দিয়ে বুঝতে পেরেছে,—এ-দিনখানি শুধু—

কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয়ে দিয়ে হৃদি অনুভব

ক'রবার জন্যই সৃষ্ট হ'য়েছে। তাই কবির সঙ্গে তাদেরও প্রাণ কেঁদে বলে :

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজলী থেকে থেকে চমকায়।
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝর ঝরে
তপনহীন ঘন-তমসায়,—
সে কথা আজি যেন বলা যায়।

এই যে বাদলের পরশ—এই যে শ্রাবণের ধারা—এ যে কত স্নিগ্ধ-শীতল-মধুর, কত আকুল বাঞ্ছার ধন, এর মাঝে যে কী সঞ্জীবনী-সুধা সঞ্চিত আছে, কবি তার আভাস দিয়েছেন—

যে শাখায় ফুল ফোটে না ফল ধরে না একেবারে,
তোমার ঐ বাদল-বায়ে দিক জাগায়ে সেই শাখারে
যা' কিছু জীর্ণ আমার দীর্ণ আমার জীবন-হারা,
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে' সুরের ধারা।

নিশিদিন এই জীবনের তৃষার পরে ভুখের পরে
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে' পড়ুক ঝরে'।

এবার 'ক্ষান্ত-বর্ষা' বা শেষ-বর্ষার সামান্য নিদর্শন দিয়ে বিদায় নেব। কবি রূপ ও রূপকের সাহায্যে এই সকল বিচিত্র লীলাকে কাব্যলোকে মূর্ত্ত করে রেখেছেন। তার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয়। সম্যকরূপে নিখুঁত পরিচয় দিতে হ'লে, একটিমাত্র গানকে নিয়েই সুদীর্ঘ একটি বেলা কেটে যায়,—তবুও মনে হয় তার সবটুকু পরিচয় দেওয়া হ'ল না,—আরও অনেক বাক্য র'য়ে গেল।

৪

ক্ষান্ত-বর্ষা

শরৎলক্ষ্মী স্বর্ণ-আলোর দূত পাঠাচ্ছেন—'যাবো যাবো—', কাজল শ্রাবণ বিপুল অশ্রুরাশি সম্বরণ কর্‌তে করতে বলছে—'যাই যাই'।

শরতের ঝিকিমিকি সোনালী আলোর স্নিগ্ধ মধুর সম্পাতে, সাশ্রুনয়ন ঘন-শ্রাবণের বিদায়-নেওয়ার মাধুর্য্যটি, এত মোহন সুন্দর অথচ বেদনা-করুণ হ'য়ে উঠেছে যে, সে ছবি আমাদের শুধু বিমুগ্ধ করে না, ব্যথিতও করে। এ যেন পরম বাঞ্ছিত সুপাত্রের হাতে প্রাণাধিকা তনয়াকে অর্পণ ক'রে পুলকিত পিতামাতার বিদায়-মুহূর্ত্তে সাশ্রুনয়না কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে আকুল ক্রন্দন! এর সুখের পরিমাণ বেশী, কিম্বা দুঃখের পরিমাণ বেশী—নির্দ্দেশ করা কঠিন।

বিদায়োন্মুখী বর্ষার মোহন-করুণ ছবি আমাদের মর্ম্মের কোমলতম তারটি স্পর্শ করে। যেমন,—

ক

আজ, বর্ষা রাতের শেষে—
সজল মেঘেব কোমল কালোয় অরুণ আলো মেশে।
বেণুবনের মাথায় মাথায় বঙ লেগেছে পাতায় পাতায়,
রঙের ধারায় হৃদয় হারায়, কোথা যে যায় ভেসে।
এই ঘাসের ঝিলিমিলি,
তার সাথে মোব প্রাণেব কাঁপন এক তালে যায় মিলি।
মাটির প্রেমে আলোর রাগে
বক্তে আমার পুলক লাগে—
বনের সাথে মন যে মাতে, ওঠে আকুল হেসে।

খ

শ্রাবণমেঘের আধেক দুয়ার ওই খোলা,
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্ পথ-ভোলা।
ওই-যে পুরব-গগন জুড়ে উত্তরী তার যায় রে উড়ে,
সজল-হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দোলা।।

লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কেই জানে—
আকাশে কি ধরায় বাসা কোন্‌খানে।
নানা বেশে ক্ষণে ক্ষণে, ওই তো আমার লাগায় মনে
পরশখানি নানা-সুবের-ঢেউ-তোলা।।

গ

ভোর হ'ল যেই শ্রাবণশর্বরী,
তোমার বেড়ায় উঠল ফুটে হেনাব মঞ্জরী...

ঘ

শ্রাবণবরিষন পাব হ'য়ে কি বাণী আসে ওই রয়ে বযে।।
গোপন কেতকীর পরিমলে, সিক্ত বকুলের বনতলে,
দূরের আঁখিজল বয়ে বয়ে। কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে। ইত্যাদি।

ঙ

বৃষ্টিশেষের হাওয়া কিসের খোঁজে বইছে ধীরে ধীরে!
গুঞ্জরিয়া কেন বেড়ায় ও যে বুকের শিরে শিরে।...
ঋতুর পবে ঋতু ফিরে আসে বসুন্ধবার কূলে।
চিহ্ন পড়ে বনের ঘাসে ঘাসে ফুলের পবে ফুলে।
গানেব পরে গানে তারি সাথে কত সুরের কত যে হাব গাঁথে— এই হাওয়া
ধরাব কণ্ঠ বাণীব ববণমালায় সাজায় ঘিবে ঘিরে।।

আকাশের এক চোখে হাসি, এক চোখে কান্না। ওষ্ঠে আনন্দ, অধবে বেদনা। আধ-কালো আধ-সোনার মধুর সমন্বয়ে কবি তাঁর উদাস রাগিণী ধরেছেন—

একলা বসে বাদল-শেষে শুনি কত কী—
এবাব আমার গেল বেলা বলে কেতকী।।
বৃষ্টি-সারা মেঘ যে তারে ডেকে গেল আকাশপারে,
তাই তো সে যে উদাস হল—নইলে যেত কি?

বাদলের বিদায় যতই এগিয়ে আসছে, চিত্ত যেন ততই চঞ্চল হ'য়ে উঠছে। তাকে ছেড়ে দিতে মন চাইছে না, তাকে ধ'রে রাখবার জন্য,—যে থাকবার অনুরোধ প্রাণে ঘনিয়ে উঠেছে,—তার উত্তর কবি 'পূব-হাওয়া' ও 'শরৎ'-এর মুখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। 'পূব-হাওয়া' ও 'শরতে'র আলাপে বরষার বিদায়-মাধুর্য্যটি অতি স্বচ্ছ হ'য়ে উঠেছে।—

শ্যামল শোভন শ্রাবণ, তুমি নাই বা গেলে
সজল বিলোল আঁচল মেলে।
পুব-হাওয়া কয়, 'ওর যে সময় গেল চলে।'
শরৎ বলে, 'ভয় কি সময় গেল ব'লে,
বিনা কাজে আকাশ-মাঝে কাটবে বেলা অসময়ের খেলা খেলে।'
কালো মেঘের আর কি আছে দিন।

ও যে হ'ল সাথিহীন।
পূব-হাওয়া কয়, 'কালোর এবার যাওয়াই ভালো।'
শরৎ বলে, 'মিলবে যুগল কালোয় আলো,
সাজবে বাদল সোনার সাজে আকাশ মাঝে কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে।'

বোঝা গেল ওকে রাখা যাবে না, ও যাবেই যাবে। এবার তাই কবি ব্যাকুল সুরে যেন তার হাত দু'খানি ধ'রে আট্‌কে রাখতে চাইছেন—ওগো প্রিয়া, ওগো প্রিয়তমা, তুমি যেও না, আমার গাওয়া যে এখনও শেষ হয়নি! সব কথা যে এখনও বলা হয়নি, সকল কথা শোনা হয়নি—

যেতে দাও যেতে দাও গেল যাবা।
তুমি যেয়ো না, তুমি যেয়ো না
আমার বাদলেব গান হয নি সাবা।।
যেতে দাও গেল যারা,—তুমি যেও না যেও না যেও না,
আমাব বাদলেব গান হয়নি সাবা।

কিন্তু অশ্রু-সিঞ্চিত করুণ রৌদ্রের কোমল হাসি হেসে, বাদল তার সজল চাহনির মাঝে শেষ মেলানি মাগ্‌ল। কবি এবার তাঁর গোপন ব্যথার গন্ধ-সুরভিত করুণ সুরের ছন্দ-গুচ্ছখানি তার হাতে তুলে দিলেন।—

ওগো আমাব শ্রাবণমেঘেব খেয়াতরীর মাঝি,
অশ্রুভরা পুরব হাওযায পাল তুলে দাও আজি।
উদাস হৃদয় তাকায়ে রয়, বোঝা তাহাব নয় ভাবী নয়;
পুলক-লাগা এই কদম্বের একটি কেবল সাজি।।
ভোরবেলা যে খেলার সাথি ছিল আমার কাছে,
মনে ভাবি, তাব ঠিকানা তোমার জানা আছে।
তাই তোমাবি সারিগানে সেই আঁখি তার মনে আনে,
আকাশ-ভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি।

নদীর তীরে শারদ-লক্ষ্মীর কাশের আঁচল উড়ে এসে পড়েছে। শিউলীতলার সবুজ আঙিনায় শিশির-ধোয়া সাদা ফুলের আল্‌পনা আঁকা হচ্ছে। আকাশের গণ্ড হ'তে অশ্রুব কালির চিহ্ন মুছে যাচ্ছে,—নবীন আনন্দের আভাসে তার নয়ন স্বচ্ছ নীল হ'য়ে উঠ্‌ছে। কবি গান ধরেছেন—

ছাড়্‌ল খেয়া ওপার হ'তে
ভাদ্র দিনের ভরা স্রোতে,
দুলছে তরী নদীর পথে তরঙ্গ-বন্ধুব।
কদম-কেশর ঢেকেছে আজ বনপথের ধূলি,
মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভুলি।
অরণ্যে আজ স্তব্ধ-হাওয়া,
আকাশ আজি শিশির-ছাওয়া,

আলোতে আজ স্মৃতির আভাস
বৃষ্টির বিন্দুর।

বর্ষার কালো আভাস একেবারেই ফিকে হ'য়ে এসেছে। ধাবাযন্ত্রের গুঞ্জরণ বন্ধ হ'য়ে গেছে। কবি এবার তল্পী-তল্পা গুটিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছেন; তাঁর বিদায়বিধুর কণ্ঠে বাদলের শেষ গানখানি গুঞ্জরিত হ'য়ে ফিরছে,—

বাদল-ধারা হল সারা, বাজে বিদায়-সুব।
গানের পালা শেষ ক'রে দে রে, যাবি অনেক দূর।।

বিচিত্রা, আষাঢ়-আশ্বিন ১৩৩৫

অন্তঃপুরে রবীন্দ্রনাথ

কূজন-হীন কানন-ভূমি দুয়ার দেওয়া সকল ঘবে
একেলা কোন পথিক তুমি পথিকহীন পথেব 'পরে—

বাংলা'র অসূর্য্যম্পশ্য অন্তঃপুরের পথিকহীন চিত্তপথে একলা-পথিক ববীন্দ্রনাথ।

সতর্ক-রক্ষিত অন্তঃপুরের প্রাচীর-চতুঃসীমান্তরালে যে সকল স্থানে সৌররবির রশ্মিরেখা আজও প্রবেশের পথ পায়নি, কবি রবির কাব্য-কিরণ-ধারা তথায় অনায়াসে আপন দীপ্তিচ্ছটা বিকীরণে সমর্থ হ'য়েছে।

বাঙলার অন্তঃপুরে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কিরণ-সম্পাত আজ এই নূতন নয়। যেদিন দেশের দাম্ভিক পুরুষরা রবীন্দ্রনাথের রচনার তীব্র সমালোচনা করে' বহু বিরুদ্ধ মত প্রকাশ ক'রতেন, কেউ কেউ বা তরুণ কবির বালারুণবৎ প্রতিভা-বশ্মির প্রতি দারুণ অবজ্ঞা প্রদর্শন ও নিন্দাবাদ করে' নিজেদের পাণ্ডিত্য প্রমাণ ক'রতে কুণ্ঠিত হ'তেন না,—তখনকার দিনে বাংলার নারী-সমাজে যাঁরা শিক্ষালাভের অল্প-বিস্তর সুযোগ পেয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা, সঙ্গীত, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস প্রভৃতি প'ড়বার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, সেই সব মেয়েরা প্রত্যেকেই, ভক্তির স্রক্-চন্দনে, শ্রদ্ধার পুষ্পদলে, বিস্ময়-বিমুগ্ধতার অগুরু-সৌরভে রবীন্দ্রনাথকে নিঃশব্দ-বন্দনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির প্রাপ্য সম্মান ও মর্য্যাদা নিবেদন করে' দিতে কুণ্ঠিতা হয়নি!

সেদিন থেকে আজও বাংলার প্রতি ঘরে-ঘরে, মেয়েদের প্রত্যেকের অন্তরে সর্ব্বাপেক্ষা নিবিড় আন্তরিকতার বেদীর উপর রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা-দর্ভাসনখানি সযত্নে বিস্তৃত র'য়েছে। এ আসন তা'রা 'শেলি' 'গ্যেটে' প্রমুখ য়ুরোপীয় কবিগণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে তুলনার মানদণ্ডে ওজন করে', কিম্বা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সভ্য জগতের

মতামত সূক্ষ্মভাবে বিচার করে' ধীর মন্থর গতিতে সতর্ক-সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হ'য়ে, বহু চিন্তা ও বিতর্কের পর বিস্তৃত করেনি। বাংলার অন্তঃপুর সেই প্রথম অরুণোদয়েই আনন্দোৎফুল্লা হ'য়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার প্রতি, তার পুলকিত মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেছে! সেদিন দেশের শুভ্রকেশ প্রবীণের দল ও শিক্ষাভিমানী যুবক-সম্প্রদায় সেই নিতান্ত তরুণ কবির অসাধারণ কবি-প্রতিভায় একান্ত মুগ্ধ হ'লেও, তা' প্রাণপণে অস্বীকার ক'রতেন। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষতাচরণ করাটাকেই তাঁরা তখন বিজ্ঞজনোচিত কার্য্য বলে' বিবেচনা ক'রতেন!

বহুকাল আগে 'মানসী'র কবিতাগুলি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-অন্তঃপুর রবীন্দ্রনাথকে তাদের আনন্দ-বিহ্বল অন্তরের বিপুল শ্রদ্ধা প্রীতির Nobel-prize নীরবে নিবেদন করে' দিয়েছে।

অন্তঃপুরিকাদের ভাষা নেই। অভিভাবকদের অনুগ্রহে তাদের শিক্ষাও অতি অল্প। সমাজ তাদের কঠিন বাঁধন-পাশে বন্দিনী করে' মূক করে' রেখেছে। তাই আজও তারা প্রকাশ করে' কিছু বলতে পারেনি। উপায় নেই, তাই তারা তাদের নিবিড় শ্রদ্ধার পাত্র এই দরদী অন্তর্যামী কবিকে আপনাদের অন্তরের গভীর-ভাব-সচন্দন পুষ্পের দ্বারা অভিনন্দিত ক'রতে সমর্থা হয়নি।

আজ বাংলার অন্তঃপুরের মর্ম্মবীণায় ব্যথার মীড়ে রবীন্দ্রনাথের গান ঝঙ্কৃত হ'চ্ছে—

আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি,
আমি, শুনব বসে আঁধার-ভবা গভীব বাণী।।
আমার এ দেহ-মন মিলায়ে যাক নিশীথরাতে,
আমার লুকিয়ে-ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে
থাক-না ঢাকা মোর বেদনার গন্ধখানি।।

অন্তঃপুরের অন্তরের এই 'বেদনা-গন্ধখানি' ঢাকাই আছে চিরদিন।

বাংলার অন্তঃপুরের প্রাচীরান্তরালে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর মানুষ ন'ন্, অন্য লোকের। অন্তঃপুরিকারা রবীন্দ্রনাথকে তা'দের মর্ম্মের মানুষ বলে' মনে করে। আর্কিমিডিস্ বলেছিলেন—'আমায় যদি পৃথিবীর বাইরে একটু স্থান দিতে পার, আমি পৃথিবীটাকে উল্টে ফেলে দিতে পারি।' যে সকল প্রতিভাশালী মহামানব স্বীয় প্রতিভা-শক্তি-বলে পৃথিবীটাকে নাড়া দিয়ে দুলিয়ে দেন, তাঁদের আসন যে পৃথিবীর মধ্যে থেকেও পৃথিবীর বাইরে তা'তে আর সন্দেহ নেই।

বাংলার কবি, ভারতের কবি, এশিয়ার কবি, বিশ্বের কবি, জগদ্বরেণ্য রবীন্দ্রনাথকে আজ নিখিল লোক পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারটি সিংহদ্বার দিয়ে বিজয়-শঙ্খ-নিনাদে বরণ করে' নিয়েছে; প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের শ্বেত ও রক্ত-চন্দনের বিজয় তিলকে তাঁর প্রতিভা-প্রদীপ্ত ললাট ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে। জননী

ভারতী বিশ্বজন-সমক্ষে আপন কণ্ঠের অম্লান কমল-মাল্যখানি কবির শিরে পরিয়ে দিয়ে তাঁকে আপন বরপুত্ররূপে সাদরে ও সগৌরবে অভিষেক করে' নিয়েছেন।

যা' পরম সত্য তা' আপন দীপ্তিতেই স্বপ্রকাশিত হয়, এইটেই প্রকৃতির রীতি। বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব-প্রতিভার স্বতঃ-উচ্ছ্বাস আজ তাই দেশের নীচ নিন্দুক বিদ্বেষপরায়ণ সমালোচক-দলের সকল বিরুদ্ধবাদিতাই বন্যামুখে তৃণরাশির ন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে পৃথিবীর সাহিত্যজগৎকে সুসমৃদ্ধ করে' তুলেছে!

বিদেশের সাহিত্য-রসিক সমাজে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এতখানি সমাদৃত হয়েছে, এর কারণ তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য বুদ্ধির দ্বারা বিচার না ক'রে অনুভবের দ্বারা বোঝবার চেষ্টা করেছেন। কাব্য বুদ্ধি দ্বারা সৃষ্ট হয় না, ভাব থেকেই সৃষ্ট হয়। অন্তরের ভাব-সাগরে যখন সহজ-প্রেরণার তরঙ্গ ওঠে, সেই প্রেরণা উর্ম্মি সংঘাতে কল্পনার কমল-বন বিকশিত হ'তে থাকে! কবি শুধু মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকেন। তাঁর অপূর্ব্ব লেখনী-মুখে নানা বর্ণের নানা গন্ধের ফুল ফুটিয়ে তুলতে থাকে তাঁর অন্তরের ভাব-সাগরের সেই ব্যাকুল প্রেরণা! যে বস্তু বুদ্ধি দ্বারা সৃজিত নয়, তা' বুদ্ধি দ্বারা বিচার্য্যও নয়, কবিতা ভাব-সঞ্জাত বস্তু, সুতরাং অনুভবনীয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৌন্দর্য্য উপলব্ধি ক'রবার মতো সজাগ ও সূক্ষ্ম রসানুভূতি (intuition) এ'দেশের অসাড়মনা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও সম্পূর্ণ জাগ্রত হয়নি। কাব্য-প্রীতি মানুষের সহজ ভাল লাগা বা স্বাভাবিক রসানুভূতির উপর নির্ভর করে। নারীজাতির মধ্যে এই intuition বা সহজ জ্ঞান ও অনুভূতিশক্তি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং জাগ্রত। সবরকম শিক্ষার ঔৎকর্ষ থেকে বঞ্চিতা হ'য়ে অন্তঃপুরের রান্না, ভাঁড়ার ও শোবার ঘরের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে অবরোধ-বন্দিনী বাংলার মেয়েরা, পরমেশ্বরের দান এই সহজ প্রত্যয় ও রসানুভূতি-শক্তি থেকে বঞ্চিতা হয়নি। তাই তারা তাদের যৎসামান্য বিদ্যার পুঁজি সম্বল করেও রবীন্দ্রনাথের কাব্য-অমৃতের বিচিত্র মধুর রসাস্বাদনে সমর্থা হ'তে পেরেছে। আর সেইটেকেই তাদের অবরুদ্ধ কারা-জীবনের কর্ম্ম ও শাসন-নিষ্পেষিত দিনগুলির একমাত্র আনন্দ-ক্ষণরূপে গ্রহণ করে' ধন্যা হ'য়েছে।

সমাজ তাদের শাসন-নিষ্পেষিত মনোবৃত্তিকে সহজ সুন্দরভাবে সচেতন অবস্থায় বাড়তে দিতে চায়নি। একমাত্র গৃহস্থালীর কাজেই তার সমস্তটা ভরিয়ে রাখবার চেষ্টা হ'য়েছে, যা'তে সে অন্য কোনও কাজ বা চিন্তার মধ্যে নিজেকে নিযুক্ত ক'রতে না পারে! তা'দের ক্ষুধিত-তৃষিত চিত্তকে কোনওরকম স্নিগ্ধ-মধুর আহার্য্য বা পানীয় দেওয়া হয়নি ; প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারের অফুরন্ত মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য, এমন কি প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম দান আলো আর বাতাস, তাও প্রাণধারণের পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশী পেলে পাছে তারা একটু সজীব হ'য়ে ওঠে, সেই ভয়ে অবাধ প্রচুর হাওয়া আলো থেকে তাদের দূরে রাখা হ'য়েছে। এইসব মৌন মূক শুষ্ক শীর্ণ চিত্তগুলি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সুধা আস্বাদনে মাঝে মাঝে নিজেদের দাবদগ্ধ জ্বালা স্নিগ্ধ করে'

অনেকটা সঞ্জীবিত বোধ কবে। সমাজ এদেব প্রাণপণ যত্নে গৃহকর্ম্ম সম্পাদনেব ও লোক-বৃদ্ধিব যন্ত্র কবে বাখলেও, প্রকৃতিব দান বস-সৌন্দর্য্যানুভূতি-জনিত আনন্দ-পিপাসা নাবীব স্বভাবগত বৃত্তি। বাইবেব জীবন তাদেব অতিমাত্রায নীবস কবে' বাখায, অন্তবেব বস-পিযাসা তাদেব মর্ম্মেব অতি গভীবতম প্রদেশে সকলেব দৃষ্টি-অন্তবালে অন্তঃসলিলা-ৰূপে প্রবাহিত।

বাঙলাব অন্তঃপুব কবিব 'Nobel-prize'-এব মূল্যই হযতো জানে না,—চীনেব নিমন্ত্রণ, ইতালীব আবাহন, যুবোপেব বিপুল সম্বর্দ্ধনা, তাকে তাব এই একান্ত আপন কবিব প্রতি অধিকতব শ্রদ্ধা কবতে শেখাযনি। সে প্রাণ দিযে শুধু কবিব কাব্য-সৌবভ অনুভব কবতে পাবে; কিন্তু সে অনুভূতি প্রকাশ ক'বতে জানে না। ববীন্দ্রনাথেব পবিবেশিত অমৃতে সে তৃপ্ত, কৃতজ্ঞ, আনন্দিত, মুগ্ধ, বসবিহ্বল—এই মাত্র।

বাঙলাব অন্তঃপুবিকাবা ববীন্দ্রনাথেব কাব্য-কমলেব বর্ণ, আযতন, ঔজ্জ্বল্য, তাব বৈজ্ঞানিক, বাসাযনিক বা দার্শনিক তথ্য ও তুলনামূলক আলোচনায অনভিজ্ঞ,—কাবণ, তা'বা এ-সকল দিকে কোনওদিন দৃষ্টিপাত ক'ববাব প্রযোজন অনুভব কবেনি এবং এ'ভাবে দেখবাব শক্তিও তা'দেব নেই। তাবা কমলেব মর্ম্মপুটেব মধুস্বাদে মাতোযাবা হ'যেছে, সুন্দব সৌবভে বিহ্বলা হ'যেছে। তাদেব কাউকে ববীন্দ্র-কাব্য-কমলেব পবাগ-বেণুব পবিমাণ কিম্বা পাপডিব দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বা গঠন সম্বন্ধে প্রশ্ন কবলে হতাশ হতে হবে,—তাবা কেবল এইটুকু মাত্রই প্রকাশ ক'বতে পাববে যে—ববীন্দ্রনাথেব বচনা বড সুমিষ্ট—বড মধুব—বডই সুবভিময।

তা'বা দেখেছে, তাদেব প্রাচীব-ঘেবা জীবনেব সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনাব ঘাত-প্রতিঘাতে,—সন্তর্পণে আববিত গোপন-চিত্তটিব বর্ণ-বৈচিত্র্যেব সকল বংটুকুই এই অন্তর্যামী কবিব ইন্দ্রজাল-লেখনী তুলিকায অপূর্ব্ব ববণে প্রতিফলিত হ'যে উঠেছে, কোনওখানে কোনও বং একটু গাঢ বা একটু ফিকে হযনি। ববীন্দ্রনাথেব কাব্যে ও গদ্য-সাহিত্যে হৃদযেব অবিকল প্রতিবিম্ব দর্শন কবে', আপন অন্তবে' সমস্ত সুবগুলিব প্রতিধ্বনি শুনে, তাবা মুগ্ধা, বিস্মিতা, অবনতা হ'যে পডেছে।

আমাব মনে হয 'মানসী'তে কেবলমাত্র 'বধূ' কবিতাটি প্রকাশ হ'বাব পব ববীন্দ্রনাথ যদি অন্তঃপুবিকাদেব সম্বন্ধে আব কোনও কিছুই না লিখতেন, বাংলাব অন্তঃপুবে ঐ একটিমাত্র কবিতাতেই তাঁব চিব-প্রতিষ্ঠা হ'যে যেত। বঙ্গবধূগণ এই কবিকে তা'দেব আত্মীযগণেব চেযেও ব্যথাব ব্যথী দবদী বলে' দ্বিধাহীন চিত্তে অন্তবে স্বীকাব কবে' নিত।

—কে যেন চাবি দিকে দাঁডিযে আছে,
খুলিতে নাবি মন, শুনিবে পাছে।
হেথায় বৃথা কাঁদা দেযালে পেয়ে বাধা
কাদন ফিবে আসে আপন-কাছে।।

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা।
ইঁটের 'পরে ইঁট মাঝে মানুষ-কীট
নাইকো ভালবাসা, নাইকো খেলা।।

অন্তঃপুরের আবদ্ধা মেয়েদের গোপন-মর্ম্মের নীরব-বেদনা-বাণী কবি স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছেন। তা'দের অন্তরের ব্যাকুল কান্না চারিদিকের পাষাণ-প্রাচীরে আহত হ'য়ে নিজেদেরই বক্ষে দ্বিগুণ আঘাতে ফিরে আসে! তাই তা'রা নীরবে জীবন কাটিয়ে দিলেও,—অন্তর তা'দের নিঃসঙ্গ, উদাস, কান্না-ভরা,—সবার মাঝে একেলা। শাসন-শূল-ভীতা সঙ্কুচিতা বঙ্গবধূর অকারণ ভীতি-সন্ত্রস্ততাটুকু কবির দৃষ্টির অন্তরাল হ'তে পারেনি!—

—কে যেন চারি দিকে দাঁড়িয়ে আছে;
খুলিতে নারি মন, শুনিবে পাছে।

অন্তর-বাহির, শরীর ও মন আপাদমস্তক বিধি-নিয়ম-নিগড়বদ্ধ অন্তঃপুরিকা তরুণীর শাসন-সঙ্কুচিত বেদনা-কাতর গোপন অন্তরখানি এই দুইটি মাত্র ছত্রের মধ্যে স্পষ্ট রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে! কবির সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর অনুভূতি-শক্তির নিবিড় পরিচয় এই দু'টি ছত্রেই স্পষ্ট পাওয়া যায়।

রাজধানীর সুরম্য হর্ম্ম্যান্তরালে, পল্লী-নীড়-বর্দ্ধিতা মাতৃ-ক্রোড়হারা বালিকা বধূর যে ব্যাকুল বেদনা কবি অঙ্কিত করেছেন, গভীর করুণ-মধুর রস-সমাবেশে তা' অপূর্ব্ব!

হায় রে রাজধানী পাষাণকায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে
ব্যাকুল বালিকারে নাহিকো মায়া!
কোথা সে খোলা মাঠ উদার পথঘাট—
পাখির গান কই, বনের ছায়া।

* * * *

আমার আঁখিজল কেহ না বোঝে।
অবাক হয়ে সবে কারণ খোঁজে।
'কিছুতে নাহি তোষ এ তো বিষম দোষ,
গ্রাম্য বালিকার স্বভাব ও যে!
স্বজন প্রতিবেশী এত যে মেশামেশি,
ও কেন কোণে ব'সে নয়ন বোজে?'

কারণ খোঁজাই অধিকাংশ লোকের স্বভাব। সুতরাং তা'দের কাছে 'বাঁধা-ঘাট' 'অশথতল' বাঁশ-বন ঘেরা ঘাটের পথ'-হারা গ্রাম্য বালিকা 'স্বজন-প্রতিবেশীর মেশামিশি'র আদর-সোহাগ সত্ত্বেও 'কেন কোণে বসে' নয়ন বোজে?' নিতান্তই কারণ-শূন্য।

সাংসারিক বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সব জিনিষেরই স্পষ্ট কারণ এবং সুস্পষ্টতর অর্থ অন্বেষণ করেন। যেখানেই তাঁরা অস্পষ্টকে স্থূল ও সুস্পষ্টরূপে ধর'তে না পারেন, সেইখানেই বিমুখ হ'ন্ এবং ব্যাপারটা নিতান্ত নিরর্থক কিম্বা হেঁয়ালী বলেই সিদ্ধান্ত করে' ফেলেন।

বালিকা বধূর অশ্রান্ত ক্রন্দন যখন সহরের সুরম্য প্রাসাদের ঐশ্বর্য্য, সাজ-সজ্জা ও বিলাসোপকরণ-প্রাচুর্য্যের মধ্যেও শান্ত হ'তে চাইছে না,—তখন ওটা অর্থহীন কান্না —'গ্রাম্য বালিকারই স্বভাব-দোষ', এ'ছাড়া সহরবাসী বিলাস-পালিত সৌখীন নরনারীরা এর কোনও সুস্পষ্ট কারণ নির্দ্দেশ ক'রতে পারে না!

নগরের সুরম্য হর্ম্মে্য প্রচুর ঐশ্বর্য্য-সমাবেশের মধ্যেও কেউ যে তৃণকুটীরখানি এবং বাঁশঝাড়-ঘেরা পথের অশথ-তলের পুরানো বাঁধা-ঘাটটির জন্য কাঁদতে পারে, আজন্ম সহরের ঐশ্বর্য্য-লালিত বিলাস-প্রিয় সহানুভূতি-শূন্য ব্যক্তির পক্ষে এটা ধারণা করা অসম্ভব।

কেহ বা দেখে মুখ, কেহ বা দেহ—
কেহ বা ভালো বলে, বলে না কেহ।
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি—
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।।

বঙ্গবধূরা সবাই এই পরখ-করার দুঃখ হাড়ে-হাড়ে ভোগ করে! জীবনের প্রথম ঊষা থেকে মৃত্যুর শেষ-সন্ধ্যাক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের উপর শুধু এই ভালো-মন্দর পরখই চলতে থাকে। তা'রা কতটুকু সুন্দর, কতটুকু কুৎসিত, তাদের কতটুকু সুলক্ষণ এবং অলক্ষণ, তা'রা কতখানি ধৈর্য্যশীলা, সেবাপরায়ণা, কর্ম্মিষ্ঠা, সুশীলা, নিরীহ, শুধু এই পরিমাপই চ'লতে থাকে! তা'দের নিজের যে কিছু ভাল-মন্দ লাগতে পারে কিম্বা ইচ্ছা-অনুভূতি, এমন কি সত্তা পর্য্যন্ত যে আছে, এ প্রশ্ন বা আলোচনাও কোনওদিন ওঠে না। সুতরাং 'ফুলের মালাগাছি'র ন্যায় পণ্য-বস্তু নারীর স্নেহ-তৃষা মেটাবার জন্য কেউ তা'কে স্নেহ করে না,—তা'র রূপ গুণ ও প্রয়োজনীয়তা হিসাবেই স্নেহ করে। বধূ যতটুকু সৌভাগ্যবতী সুলক্ষণাক্রান্তা, সুন্দরী, সুশ্রী, সহিষ্ণু, শান্ত ভালমানুষ, সকলকার ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রিতা, ততটুকু পরিমাণেই সে সংসারের আপন-জনের কাছে স্নেহের আশা ক'রতে পারে!

অন্তঃপুরিকা বঙ্গবধূর এই দারুণ বেদনার অপ্রকাশিত নীরব ইতিহাস, যা' তাদের নিকটতম আত্মীয়ও কখনও উপলব্ধি ক'রতে পারে না,—তারই সম্যক অনুভূতির অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ 'বধূ'র প্রতি ছত্রে-ছত্রে মর্ম্মাশ্রু দিয়ে লিখে রেখেছেন।

সংসারের হৃদয়-হীনতার ও সংসাব কর্ত্তৃক বঙ্গবধূর অপমানের দুঃখ ও তার মর্ম্মন্তুদ বেদনা এতখানি দরদ্ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে আর কেউ অনুভব ক'রতে পারেনি। তাই বঙ্গবধূরা রবীন্দ্রনাথকে তাদের দরদী মরমী কবি ব'লে জানে।

স্বল্প-বিদুষী জ্ঞানোৎকর্ষ-হীনা বাঙালীর ঘরের মেয়েরা অনেকেই রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র গভীর নিগূঢ় রস সম্যক্ উপলব্ধি ক'রতে হয়তো আজও পারে না। 'বলাকা'র 'চঞ্চলা'র মধ্যে যে অসীমত্বের বিরাট-গম্ভীর ঔদার্য্য, বিশ্বলীলানুভূতির যে মহান আনন্দরস, তারই মধ্যে প্রবেশ করে তারা কেউ হয়তো প্রশান্ত আনন্দে স্তম্ভিতা নির্ব্বাক হ'য়ে যেতে পারে না; কিন্তু তারা 'বলাকা'কে স্থূল ও স্পষ্টানুরাগী এ'দেশের বহু বিজ্ঞ সমালোচকের মত একেবারে অর্থশূন্য কিম্বা হেঁয়ালী বলে' মনে ক'রতে পারে না। কারণ 'বলাকা'র যে কবিতাগুলি তাদের ক্ষুদ্র বোধ-জ্ঞানের অতীত, তার প্রত্যেকটি শব্দ ও ভাবের অস্পষ্ট আভাস তাদের হৃদয়-বীণার তন্ত্রীগুলিকে কখনও ব্যাকুল সুরে, কখনও গভীর সুরে, কখনও অজানা অকথিত সুরে রণিত করে' তোলে। তা'রা তাই কবির 'কৈশোরক' 'প্রভাত-সঙ্গীত' প্রভৃতি থেকে আরম্ভ ক'রে—'বলাকা' 'পলাতকা' 'পূরবী' 'প্রবাহিণী' পর্য্যন্ত প্রত্যেক বইখানির পাতায় পাতায় অকপট আনন্দ-বেদনার অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি না দিয়ে থাকতে পারে না।

এমন একটিও অন্তঃপুরিকা নেই যিনি 'পলাতকা'র 'মুক্তি' পড়ে' না ব'লবেন—এই 'মুক্তি' কবিতাটির সঙ্গে তাঁর মূক-মর্ম্মের কোনও মিল নেই! অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে অকথিত মৌন-বেদনা অহরহ গুম্‌রে কাঁদ্‌ছে, ভিতরে বাহিরে চারিদিকে যে কঠিন বাঁধন তাঁদের নিরন্তর বেদনা-পীড়িত করে' এই যন্ত্রবৎ মন ও যন্ত্রবৎ জীবন থেকে মুক্তিব জন্য ব্যাকুল করে' মৃত্যুকে শ্রেষ্ঠ বরেণ্যরূপে গ্রহণ করিয়েছে, সদা-সঙ্কুচিতা ভীতি-সন্ত্রস্তা অবগুণ্ঠিতা নির্ব্বাক-প্রকৃতি অন্তঃপুরিকাদের সেই চিরন্তনী গোপন-বেদনার সুস্পষ্ট-সুন্দর প্রকাশ আমরা 'পলাতকা' কাব্যের 'মুক্তি' কবিতাটির সেই মৃত্যুপথ-যাত্রিনীর মুখে শুনতে পেয়েছি।—

এইটে ভালো ওইটে মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে
নামিয়ে চক্ষু মাথায় ঘোমটা টেনে
বাইশ বছর কাটিযে দিলেম এই তোমাদের ঘরে।
তাই তো ঘরে পরে
সবাই আমায় বললে—লক্ষ্মী সতী,
ভালো মানুষ অতি।।

এ সংসারে এসেছিলেম ন-বছবের মেয়ে,
তাব পরে এই পরিবারেব দীর্ঘ গলি বেয়ে,
দশেব-ইচ্ছা-বোঝাই-কবা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে;
সুখের দুখের কথা
একটুখানি ভাবব, এমন সময় ছিল কোথা?
এই জীবনটা ভালো কিম্বা মন্দ যা-হোক-একটা কিছু,
সে কথাটা বুঝব কখন, দেখবো কখন ভেবে আগুপিছু!

একটানা এক ক্লান্ত-সুরে
কাজের চাকা চলছে ঘুরে ঘুরে!
বাইশ বছর রয়েছি সেই এক চাকাতেই বাঁধা,
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা।
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি,
রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পবে রাঁধা—
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।
মনে হচ্ছে সেই চাকাটা—ওই-যে থামল যেন—
থামুক তবে। আবার ওষুধ কেন?

* * * *

বাইশ বছর ধ'রে
মনে ছিল, বন্দী আমি অনন্তকাল তোমাদেব এই ঘরে।
দুঃখ তবু ছিল না তার তরে—
অসাড মনে দিন কেটেছে, আরো কাটত আরো বাঁচলে পরে।
যেথায যত জ্ঞাতি
লক্ষ্মী বলে করে আমার খ্যাতি ;
এই জীবনেব সেই যেন মোব পবম সার্থকতা—
ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কথা
আজকে কখন মোর
কাটল বাঁধন-ডোর।
জনম মবণ এক হয়েছে ওই-যে অকূল বিরাট-মোহানায়,
ঐ অতলে কোথায় মিলে যায়
ভাঁড়াব-ঘরের দেয়াল যত
একটু ফেণার মতো।।

আমাদের নিজেদের বহিঃজীবন এবং আভ্যন্তরিক জীবনের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি এর চেয়ে স্পষ্ট ও সুন্দর আর কোনওখানে দেখেছি বলে মনে হয় না।

আমার কোনও একটি বান্ধবীর যৌবন উষাক্ষণেই মৃত্যুদূত যক্ষ্মার লিপিতে পরপারের আহ্বান লিখে এনেছিল। করাল ব্যাধি যখন তার সর্ব্বাঙ্গ থেকে তরুণ যৌবনশ্রী নিশ্চিহ্ন করে মুছে শয্যাতলে ক্ষীণ তনু ক্ষীণতম করে মিশিয়ে আন্‌ছিল, আমি প্রায়ই সেই পরপার-যাত্রিনীকে দেখতে যেতাম। সে আমাকে 'পলাতকা' খুলে 'মুক্তি' কবিতাটি পাঠ করে শোনাতে অনুরোধ ক'রত! তার নিকট বহুবার পাঠ করে 'মুক্তি' আমার মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিল। যখন প'ড়তেম,—

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ-পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যাতারা-ওঠা,
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল-ফোটা।।

সেই মৃত্যু-প্রতীক্ষিতার রোগ-পাণ্ডুর শীর্ণ মুখমণ্ডলে কেমন যেন একটা অপূর্ব্ব তৃপ্তি আনন্দ ও গৌরবের সুখব্যঞ্জক অভিব্যক্তি ফুটে উঠ্‌ত,—তার বড় বড় কালো চোখদু'টির বেদনাতুর ক্লান্ত দৃষ্টি গভীর রসাবেশে অতলস্পর্শী হ'য়ে উঠ্‌ত। সেই রক্তহীন ম্লান বিবর্ণ মুখের গভীর আনন্দ-ঔজ্জ্বল্য এবং নিষ্প্রভ চোখদু'টির মধ্যে নিবিড় আবেশ-ছায়া ঘনিয়ে ওঠা, আমি নিস্তব্ধ হ'য়ে দেখতাম! সে কোনও কোনও সময়ে নিমীলিত নেত্রে গভীর মৃদুস্বরে আপনা-আপনি আবৃত্তি করত,—

এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশী বিশ্ব-আকাশ-মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরেব কোণেব ধূলায় পড়ে থাক্।
মরণ-বাসব-ঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক
দ্বাবে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু—
হেলা আমায় করবে না সে কভু।
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে।

শহরের ইষ্টক-পিঞ্জরে আজন্ম-বদ্ধা সেই অষ্টাদশী তরুণীটি জীবন-প্রভাতেই সমাজের জুয়ায় ভাগ্যকে জিতে' নিতে না পারায় সংসার ও সমাজ-কর্তৃক নিপীড়িতা হ'য়ে—মৃত্যুকেই মনে মনে বরণীয়রূপে আহ্বান ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিল ; এবং মৃত্যুও তার নীরব কাতর আহ্বানে সত্বর সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনার সময় ব্যতীত মৃত্যুর পূর্ব্বে অন্য কোনও সময়ে তার মুখে তৃপ্তি বা আনন্দের চিহ্ন দেখিনি।—'অত চুপি চুপি কেন কথা কও মরণ হে মোর মবণ' 'তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছো মৃত্যুর মাধুরী' 'পরাণ কহিছে ধীরে—"হে-মৃত্যু মধুর"—' 'ঐ মরণের সাগব-পারে চুপে চুপে চুপে—' প্রভৃতি কবিতা ও গানগুলি সে নীথর অঙ্গে মুদিত নয়নে শ্রবণ ক'রত—তার সেই বিশীর্ণ লতার মত শুষ্ক ক্ষীণ তনুখানির প্রত্যেকটি রোমকূপ ব্যাকুল 'হ'য়ে যেন সেই কাব্য-ধারা পান ক'রত! প্রাণ দিয়ে কবিতা অনুভব করা, সে যে কি বস্তু, আমি প্রথম তার মধ্যেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ক'রেছি। সে আমায় বলেছিল—'রবীন্দ্রনাথ যদি কেবল 'মুক্তি' (পলাতকা) কবিতাটি লিখে, আর কোনও কবিতা না লিখ্‌তেন, তা' হ'লেও আমি

তাঁকে 'কবীশ্বর' বলে' পূজা ক'রতাম। আমাদের নিজের কথা, যা' চেষ্টা সত্ত্বেও কোনওদিন মুখ ফুটে প্রকাশ ক'রতে সমর্থা হইনি,—অব্যক্ত বাণীর অভিব্যক্তির অসমর্থতায়—কেবল ব্যাকুল বেদনায় ছট্‌ফট্ ক'রেছি মাত্র—রবিবাবু সেই অকথিত বাণীকে রূপ দিয়ে প্রকাশ করে' আমাদের যে কত উপকার করেছেন, কত শান্তি দিয়েছেন,—সে শুধু আমারই মতো অভাগিনীরা ভিন্ন আর কেউ বুঝবে না।'

সেই মরণ-পথ-যাত্রিনীর কথাগুলি আমি আজও ভুলতে পারিনি! 'পলাতকা'র 'মুক্তি'র রস আমার চেয়েও সে গভীরতর রূপে উপলব্ধি ক'রতে পেরেছিল। গভীর সংসার-অরণ্যের অন্তরালে এমনধারা কতই-না কুসুম নীরবে বিকশিত হ'য়ে নির্জ্জনে গন্ধ বিলিয়ে নিঃশব্দে ঝরে প'ড়ছে—কেউ হয়তো তার অস্তিত্বই জানে না। বাংলার অন্তঃপুরে রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য পূজা-অর্ঘ্য একান্ত নীরবে নিঃশব্দে—গভীর গোপনে প্রস্তুত হ'য়েছে ও হ'চ্ছে! ঐ যেন সেই—

> বনেব ভালোবাসা আঁধাবে বসি
> কুসুমে আপনাবে বিকাশে,
> তাবকা নিজ হিয়া তুলিছে উজলিয়া
> আপন-আলো দিয়া লিখা সে।

অন্তঃপুরের মর্ম্মকুহরে রবীন্দ্রনাথের গান প্রবেশ করেছে পুষ্প-সুরভিবাহী স্নিগ্ধ সমীরণেরই মতো। তেমনি নিঃশব্দে গোপন সঞ্চারে! সমীরণেরই মত আজ সে অন্তঃপুরের একান্ত প্রিয় এবং প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠেছে অন্তঃপুরিকাদেব প্রাণ-ধারণার্থে। তার স্নিগ্ধতা অবর্ণনীয়, তার স্নেহ অফুরন্ত, সেবা ও সহানুভূতি সুস্পষ্টরূপে আমাদের স্পর্শ করে।

অন্তঃপুরিকার এই নীরব পূজার ধূপের গন্ধ হয়ত জগতেব অন্য কোথাও আব কারুর কাছে পৌঁছুতে পারে না,—কিন্তু যাঁর সর্ব্বদর্শী দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম অনুভূতির কাছে গোলাপ, কমল, চম্পা, চামেলি, কববী, কাঞ্চন, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজের বিপুল জনতা ও উচ্ছ্বসিত সৌরভেব মধ্যেও 'সাঁঝের আঁধারে পথের পাশে দীনা আকন্দে'র সঙ্কুচিত অবস্থিতি ও 'করুণ-ভীরু-গন্ধ'-টুকুও এড়িয়ে যায়নি,—তাঁর নিকট অন্তঃপুরের অন্তরালে অবস্থিত বঙ্গবধূর অন্তর-ধূপের এই 'করুণ-ভীরু-গন্ধ'টুকুও পৌঁছাতে বাধা পায়নি নিশ্চয়! আকন্দ-কুসুমের সঙ্গে সঙ্গে তারাও যে কবির আশ্বাসভরা স্নেহ বাণী শুনেছে—

> দেখা হয নাই তোমা সনে
> প্রাসাদের কুসুম-কাননে
> জনতাব প্রগল্‌ভ-আদরে।
> নিদ্রাহীন প্রদীপ-আলোকে
> প'ড়োনি অশান্ত মোর চোখে
> প্রমোদের মুখর-বাসরে।
> অবজ্ঞাব নির্জনতা তোমারে দিয়াছে কাছে আনি'
> সন্ধ্যার প্রথম তারা জানে তাহা, আব আমি জানি।।

আজ অন্তঃপুরের অন্তরের 'স্বভাষী' কবি রবীন্দ্রনাথ অন্তঃপুরের 'পক্ষ-হীনতা'র কথা, পথ-অভাবে'র কথা পথ-না-জানার কথা ভুলিয়ে দিয়ে তাকে 'সুদূর-প্রয়াসী' 'উম্মনা' করে' তুলেছেন। অন্তঃপুরের অন্তর-বীণায় সুদূরের কবির গান আজ নিকটতম হ'য়ে ঝঙ্কার দিচ্ছে—

ওগো সুদূব, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল-বাঁশরি—
কক্ষে আমাব রুদ্ধ-দুযাব সে কথা যে যাই পাশরি।।

ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩৫

প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নের রূপ-মাধুর্য

(*ঘরে-বাইরে* : রবীন্দ্রনাথ)

'ঘরে-বাইরে' বইখানিব চবিত্র ক'টি সত্যদ্রষ্টা ঋষি রবীন্দ্রনাথেব সৃষ্টি। কবি ববীন্দ্রনাথের নয়।

মানবের মনস্তত্ত্ব ও তার নিগূঢ় অন্তঃপ্রকৃতির রসাভিব্যঞ্জনায 'ঘরে-বাইবে'ব সমান আসন গ্রহণ করতে পারে, বাংলা ভাষায় এমন কথাসাহিত্য অল্পই আছে।

মানুষেব ঐতিহ্যমুক্ত মনের বিভিন্নতর রূপাভিব্যক্তি—'ঘরে-বাইরে' বইখানির মূলতত্ত্ব। কিন্তু এই 'ঘরে-বাইরে'বই মধ্যে—ঐতিহ্যপাশে আবদ্ধ বুদ্ধি ও মন,—একটি নারী হৃদয়ের নিঃশব্দ সহজ বিকাশও আমাদের চিত্ত স্পর্শ করে। রামায়ণে 'ঊর্মিলা' 'কাদম্বরী' 'পত্রলেখা' আমাদের অন্তরের মমতাকরুণ সহানুভূতি, নির্মল শ্রদ্ধার স্নিগ্ধস্পর্শটুকু কখন যে এসে গ্রহণ করে, আমরা তা জানতে পারি না। আমাদের সারা চিত্ত যখন সীতার দুঃখ সুখ, কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার প্রিয়বিচ্ছেদ-মিলনের আনন্দ-বিষাদে একান্ত নিমগ্ন অভিভূত হয়ে থাকে, তখন ঐ নিঃশব্দপ্রকৃতির নারীদের সুখ দুঃখের কোনো অভিব্যক্তি বা সুস্পষ্ট রূপ আমরা লক্ষ্য করার অবকাশ পাই না এবং প্রয়োজনও বোধ করি না। কিন্তু তবুও, এরা কখন যে গোপন পদসঞ্চারে নীরবে এসে আমাদের অন্তরের অন্তরতম-স্থলটিতে নিঃশব্দ-ব্যথার সুবর্ণ-কাঠিটি ছুঁইয়ে রেখে চলে যায়—তা কেউ টের পাইনে।

'ঘরে-বাইরে'র মধ্যে ঘরের নিভৃত কোণে, সবার আড়ালে নিঃশব্দে, সহজ-বিকাশে-বিকচ নারী-অন্তরটির পরিচয় আমি এই প্রবন্ধে সবার শেষে দেবার চেষ্টা করব।

মানব-সভ্যতার সবচেয়ে বড় সৃষ্টি—সমাজ। সভ্য মানুষ আজ তার স্ব-সৃষ্ট সমাজের

সর্ব্বতোমুখী প্রভাবজালে নিজের অন্তর-বাহির, মন, বুদ্ধি, চিন্তা, সংস্কার, এমনকী তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি প্রেমকে পর্যন্ত এমন অচ্ছেদ্য পাশে জড়িয়ে ফেলেছে যে আজ তার আর একটা নাম হয়েছে—সামাজিক জীব।

বর্তমান সভ্য জগতের স্বাধীন ভাবধারার উৎকর্ষ-প্রাপ্ত, অনুসন্ধিৎসু মানবমনের ঐতিহ্য-বিরহিত চিন্তার দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত দিক 'ঘরে-বাইরে'র সন্দীপ ও নিখিলেশে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

মানব-চিত্তের অন্তর্গূঢ়লোকে শ্রেয়ব ও প্রেয়'র,—প্রেম ও মোহের যে চিরন্তন দ্বৈরথ সমর চলেছে—তারই প্রতীক—শ্রীমতী বিমলা।

বিশ্বের ক্রম-বিবর্তনে মানুষ তার আবিষ্কারশক্তি, সৃষ্টিশক্তি, গ্রহণশক্তি, মন, বুদ্ধি, বিবেক, চিন্তা,—সব কিছুরই উৎকর্ষসাধনে দ্রুত উন্নত হয়ে চলেছে। বর্তমান যুগের মানুষের মধ্যে একটা প্রবল তৃষ্ণা জাগ্রত হয়েছে—সকল তত্ত্বের মূল তথ্যানুসন্ধান।

নিজের জীবনে খুব বড় পরিধি দান করে, সে, যে-সকল বস্তু গ্রহণ করতে চায়, তার স্বরূপেব যথার্থতা জানবার জন্য—জীবনে বৃহত্তর দুঃখ ও চরম ক্ষতি মূল্য ধরে দিতে প্রস্তুত হয়েছে। রূপের স্বরূপ-অনুসন্ধানে তাই সে বাস্তবের ধূলা-মাটি ছাড়িয়ে, বাস্তবাতীত অসীমে তার চিন্তা ও কল্পনার পাখা মেলে দিয়েছে। মানস-লোকে অন্তঃপ্রকৃতির অতল তলে নেমে গিয়ে, জাগ্রত-চৈতন্য (conscious) ও মগ্ন-চৈতন্যের (subconscious) সদর অন্দরের রুদ্ধ গোপন কুঠুরিগুলিও খানা-তল্লাস করতে পশ্চাৎপদ হয়নি।

'ঘরে-বাইরে'র নিখিলেশ,—মানুষের এই শুভ্র নির্ম্মুক্ত সত্যস্পৃহা বা সত্যসাধনার উজ্জ্বল প্রতীক।

নিখিলেশ ব্যাপক ও নিরঙ্কুশ প্রেম-তীর্থের তীর্থ-যাত্রী। স্থূল-কামনা-রূপ সন্দীপ তার বাঁশীর সুর বুঝতে পারে না। স্থূল-ভোগের চেয়ে সূক্ষ্ম ভোগের রসাস্বাদ কত যে গভীর-মধুর, ফাঁকিভরা অসম্পূর্ণ পাওয়ার চেয়ে, অকৃত্রিম সত্যে সম্পূর্ণ না-পাওয়াব মধ্যে যে সার্থকতা নিহিত, তার স্বাদ ও তত্ত্ব, অবিমিশ্র বাস্তববাদী সন্দীপের বুঝতে পাবা সম্ভব নয়।

নিখিলেশ ও বিমলা তৃতীয় ব্যক্তিদের মধ্যবর্তিতায়, অর্থাৎ সামাজিক বিবাহবন্ধনের মধ্য দিয়েই পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছিল। তারা প্রেমের মধ্যবর্তিতায় ও ব্যক্তিত্বের গৌরবানুকূল্যে মেলবার সুযোগ পায়নি।

ভালো তারা বেসেছিল পরস্পরকে—ছায়াস্নিগ্ধ নিরাপদ গৃহনীড়ের নির্জন কোণটিতে।

নিখিলেশ সেই স্বল্প-পরিসর গৃহকোণের অবগুণ্ঠিত প্রেমে পূর্ণ তৃপ্ত হতে পারেনি; তাই সে বিমলার ভালোবাসা বাইরের উম্মুক্ত আলোর মধ্যে এনে, তার সত্য ও সুসম্পূর্ণ রূপটি দেখবার কঠিন নিষ্কামসাধনা করেছিল। সর্ব-আবরণমুক্ত

সত্যের অনবদ্য রূপটিই ছিল নিখিলেশের আজীবনের সাধনার বিষয়। তার জন্য সে ঘরের ভিতরে, পরিবারের সংকীর্ণায়তন গণ্ডীর মধ্যে সমাজের হাতের টীকা-পরা স্বামী হয়ে তৃপ্ত হতে পারেনি। বাহিরে সবার মধ্যে দাঁড়িয়ে, বিমলার অন্তর-লক্ষ্মীর নির্বাচন-টীকা পরে, তার স্বয়ম্বরের স্বামী হতে চেয়েছিল। নিখিলেশের প্রেম-সাধনা—

—নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার সাথে যেথায় বাহু পসাবো,—
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

হিন্দুনারী স্বামী-রূপ আইডিয়াটিকেই ভালোবাসে : 'ব্যক্তি' আইডিয়ার পিছনে আড়াল হয়ে থাকে।

অগ্নি ও শালগ্রাম-শিলার সাক্ষ্য-সাহায্যে, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত যেদিন ব্যক্তির অঙ্গে স্বামীত্ব-রূপ চাপরাশটি আজন্মের মতো অচ্ছেদ্য-পাশে এঁটে দেন—সেদিন থেকে সেই চাপরাশটির গৌরবে তথাকথিত পত্নীর ভক্তি-প্রেম-প্রীতি-উর্ব্বর হৃদয়রাজ্যে অবাধে নির্ব্বিবাদে স্বামীদের রাজত্ব করা চলে।

নিখিলেশের প্রেমাকাঙ্ক্ষা বিশ্লেষণমূলক (analytic), সংশ্লেষণ-মূলক (synthetic) নয়। সে চেয়েছিল মামুলি স্বামীত্বের নিরেট আড়াল হতে বাইরে এসে, বিমলার কাছে তার নিছক-নিখিলেশত্বটুকুর দাম পেতে।

নির্ব্যক্তিক (impersonal) স্বামী হয়ে তার মতো ব্যক্তি সার্থক হতে পারে না। তাই সে স্বামীত্বের সরকারি পরিচ্ছদটি (uniform) ঢাকা দিয়ে সাদা পোশাকে নিজের ব্যক্তিত্বটুকু মাত্র নিয়ে—বিমলার অন্তরলোকের স্বয়ম্বর-সভায় সসম্ভ্রম শিরে দাঁড়িয়েছে।

বিমলার জাগ্রত-চৈতন্যের প্রেম-পুষ্পদলে নিখিলেশের পূর্ণ-পরিতৃপ্তি ঘটেনি, —সে চেয়েছিল বিমলার মগ্ন-চৈতন্যের মানস-সরোবরে ফুটে-ওঠা প্রেমের দুষ্প্রাপ্য নীলপদ্ম। যে-পদ্ম নারী অর্পণ করে তার দেবতার ব্যক্তিত্বের চরণে। আর কাউকে নয়।

নিখিলেশের সত্যান্বেষণ-সাধনা, পরম ক্ষতি ও চরম বেদনা বয়ে আনলেও তা ব্যর্থ হয়নি। বিমলা মোহ-ঝড়ে দিশা হারিয়ে ধূলি-অন্ধ হলেও শেষ মুহূর্তে তার সত্যপ্রেমের পরম আশ্রয়টি চিনে ফিরতে পেরেছিল।

নিখিলেশ বুঝেছিল, মনুষ্যত্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠ-বরণীয় আর কিছু নেই। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এ সত্য নিখিলেশ যেমন উপলব্ধি করেছিল—আর কেউ করেনি। তাই সে বলেছে—'জীবনে মানুষ যা কিছু হারায়, তার সকলের চেয়েও মানুষ অনেক বেশী বড়—সমস্ত কান্নার সমুদ্র পেরিয়েও তার পার আছে—এই জন্যেই সে কাঁদে, নইলে কাঁদতও না।'

নিখিলেশ শুধু বিমলার প্রেমই যাচাই করেনি, নিজের প্রেমেরও করেছে। তার এ গভীর প্রেমের কঠোর তপস্যা ব্যর্থ হয়নি।

বিমলা যখন আকুলচিত্তে দু'হাত দিয়ে নিখিলেশের পা দু'খানি জড়িয়ে ধরে অশ্রুধৌত মুখে বার বার তার পা দু'খানিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগল —তখন নিখিলেশ সঙ্কুচিত হলেও বাধা দিতে পারেনি। তখন তাকে নিজেকে নিজে উত্তর দিতে হয়েছিল—'এ পূজায় বাধা দেবার আমি কে! যে পূজা সত্য সে পূজার দেবতাও সত্য—সে দেবতা কি আমি যে আমি সংকোচ করব?'

মানুষের ঐতিহ্যমুক্ত সামাজিক-মনের দুটি রূপ আছে। একটি জ্ঞান-পরিস্বচ্ছ, অসীম-অভিমুখী, নির্ম্মল-সুন্দর; সর্ব্ববস্তু এবং সর্ব্ববিষয়ের স্বরূপের সন্ধানে সে চিরকালের উদাসী-পথিক।

যা 'ঘরে-বাইরে'র নিখিলেশ।

অন্যটি ঠিক তার বিপরীত। এই ঐতিহ্যমুক্ত মনের কাছে বাস্তবই সব। যা বাস্তবে নেই, যা স্থূল ইন্দ্রিয়-গোচর নয়, তার অস্তিত্ব সে স্বীকার করে না। বাস্তব জগতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাধাহীন ভোগই তাদের শ্রেষ্ঠ সত্য, এবং সেই ভোগস্পৃহাটি নিতান্ত স্থূল রকমের লালসার মধ্যে আপনার নগ্ন মূর্তিটি প্রকট করতে সংকোচ অনুভব করে না, বরং সেটাই তাদের যৌবনের জয়যাত্রা—গৌরবের পরিচয় বলে গর্ব করে।

সভ্য-মানবের ঐতিহ্যমুক্ত মনের এই অন্য দিকটি হচ্ছে—'ঘরে-বাইরে'র সন্দীপ।

মাস্টারমশাই চন্দ্রবাবুর একটিমাত্র কথায় সন্দীপের স্বরূপটি ঠিক ফুটে উঠেছে। —'সন্দীপ অধার্মিক নয়, ও বিধার্মিক। ও অমাবস্যার চাঁদ ; চাঁদই বটে ; কিন্তু ঘটনাক্রমে পূর্ণিমার উল্টো দিকে গিয়ে পড়েছে।'

সভ্য জগতে উগ্র বাস্তবতাবাদ, স্থূল ভোগবাদের যে তীব্র অভিযান চলেছে, —যার চক্রনেমিতলে নীতি, সংস্কার, ধর্ম, সত্য, এমনকী প্রেম পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ ধূল্যবলুণ্ঠিত হচ্ছে, তারই সংহারমূর্তির রূপ-বিগ্রহ—সন্দীপ। অর্থাৎ বর্তমান যুগের সভ্যমানবের, সংস্কারমুক্ত যৌবন-মনস্তত্ত্বের ভোগ-উদ্দাম রূপটির বিরাট শক্তি-সংহত মূর্তির প্রতীক সে। ঝড়ের মতো আপন শক্তিবেগে আপনি টলটলায়মান, বিক্ষুব্ধ। জীবনকে নিতান্ত স্থূলভাবে ভোগ করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনে বিশ্বে এমন কিছু নেই, যা সে অবলীলাক্রমে ছুঁড়তে, ছুঁড়ে ফেলতে, ভাঙতে, দলতে বা নষ্ট করতে না পারে। সংসাবে সে চাওয়া এবং পাওয়ার আনন্দকেই মানে। 'দেওয়া'র মধ্যে আনন্দ বা সার্থকতার অস্তিত্ব জানতে চায় না এবং খুঁজতে জানে না।

মুগ্ধতা যার কাছে উপেক্ষণীয় এবং মত্ততাই প্রার্থনার বস্তু, সৃষ্টির আনন্দের চেয়ে বিনাশের আনন্দই তাকে বেশি আকর্ষণ করে।

ঐতিহ্য-কারা হতে মুক্তি অর্জন করে নিখিলেশ পেয়েছিল, আত্মার স্বাধীনতা। পরিস্বচ্ছজ্ঞানে আত্ম-কর্তৃত্ব লাভ করে সে প্রকৃত 'স্ব' অর্থাৎ আত্মার অধীন হয়ে —সত্যকে লাভ করেছিল।

মাস্টারমশাইয়ের কথায়—'পূর্ণিমার চাঁদ'।

সন্দীপ ঐতিহ্য-কারা হতে মুক্ত হয়ে—পেয়েছিল কামনার স্বেচ্ছাচারিতা। তার নির্ব্বিচার প্রবৃত্তি তাকে যে পথে পরিচালিত করেছে সে জেনেশুনে স্বেচ্ছাচারবশে সেই বিনাশ-পথের উদ্দাম-পথিক হয়েছে। মিথ্যাকে সত্য করে গড়ে তোলাতেই ছিল তার সৃষ্টির আনন্দ। —সে চাঁদই, কিন্তু পূর্ণিমার নয়, —অমাবস্যার।

সন্দীপ বুঝেছিল—'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। এই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শভরা সুন্দরী পৃথিবী চিরকাল শক্তিমানেরই ভোগের সামগ্রী! সে জেনেছিল সত্য ও মিথ্যার মূলতত্ত্ব কিছুই নেই। সত্য কিংবা মিথ্যার স্বরূপ আবিষ্কার করার চেষ্টা—পলাণ্ডুর খোসা ছাড়িয়ে বীজ আবিষ্কার-চেষ্টার মতোই ব্যর্থ। শেষ পর্যন্ত নিঃশেষে গিয়ে পৌঁছুবে তবু বীজ বা আঁটি কিছু পাওয়া যাবে না। আস্ত পলাণ্ডুটির সত্য ও অস্তিত্ব ঐ খোসার সমষ্টি নিয়েই। তাকে পৃথকভাবে খুলে ফেলে বিশ্লেষণ করতে গেলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, সবই খোসা হয়ে যাবে।

তাই 'অপরিবর্তনীয় সত্য' বা 'নিত্য-সত্য' কথাটা তার কাছে ছিল মস্তবড় ফাঁকি। সে জানত, এক যুগে যা পরম সত্য, অন্য যুগে তাইই চরম মিথ্যা। একজনেব কাছে যা নিতান্ত সত্য, অপরের কাছে তাইই একান্ত মিথ্যা।

সন্দীপ বুঝেছিল,—যে শক্তিমান, সে নিজেই নিজের প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনানুযায়ী সত্য সৃষ্টি করে নেবে। নিজের দৃঢ় প্রভাব শক্তি দ্বারা, প্রদীপ্ত পৌরুষ-জ্যোতিঃতে কুৎসিতকে পরম সুন্দর, মিথ্যাকে উজ্জ্বল সত্য করে তোলাটাই ছিল তার ব্যক্তিত্বের পৌরুষ-গৌরব।

বাস্তবে যা নিতান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলভোগ, তাকেই খুব প্রচুরভাবে—এবং মোটা রকমে পাওয়া ছিল তার সাধনা।

নিজের প্রচণ্ড পৌরুষ-শক্তির সম্মোহন-জাল রচনা করে সেই ঊর্ণনাভজালে সে অবলীলাক্রমে নারীকে আকর্ষণ করে এনে ফেলেছে, ঐশ্বর্য আকর্ষণ করে এনেছে, —দেশবাসীকে আকর্ষণ করে এনে জড়িয়ে ফেলেছে।

সে নারীকে ভালোবাসত প্রেমের জন্য নয়, নিজের জন্য। অর্থকে ভালোবাসত দেশের প্রয়োজনে বা মহৎ প্রয়োজনে নয়, নিজের প্রয়োজনে। দেশকে ভালোবাসত দেশের জন্য নয়, নিজেরই জন্য। মিথ্যা নিয়েই তার কারবার ছিল বটে, কিন্তু একটি জায়গায় সে খাঁটি ছিল। সে নিজেকে চিনত। সে নিজে যে কি, তা সকলের কাছে আবৃত থাকলেও, তার নিজের কাছে আবৃত ছিল না।

সন্দীপের মধ্যে মিথ্যা বিশেষ ছিল না, সত্যই ছিল,—কিন্তু সে সত্য—বিকৃত সত্য, কুশ্রী সত্য, অশুভময় সত্য—প্রলয়ঙ্কর সত্য।

কিন্তু এই অসুন্দর-সত্যবাদী সন্দীপেরও মাঝে একদিন সুন্দর-সত্যের রম্য আভাস ক্ষীণতররেখায় ফুটে উঠেছে। সেইদিনই কিন্তু সে আমাদের সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়েছে।

যাবার পূর্ব্বে সন্দীপের মতো মানুষকেও উপলব্ধি করতে হয়েছে—সংসারে শুধু 'নেব' ইচ্ছা করলেই হয় না,—অনিচ্ছাসত্ত্বেও একদিন কোনো একখানে রিক্ত হয়ে দিয়ে যেতেই হয়। এই চিরমুক্ত, বিনাশ-পথের উদ্দাম পথিক, ঝড়ের রাতে বিদ্যুৎগর্ভ-বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর সুন্দর মানুষটির মুখে—তার বিদায়-মুহূর্তের কথা ক'টি আমাদের একান্তই বিস্মিত করে দেয়। —...'মক্ষীরাণী, এতদিন পরে সন্দীপের নির্মল জীবনে একটা কিন্তু এসে ঢুকেছে। রাত্রি তিনটের পর জেগে উঠেই রোজ তার সঙ্গে একবার ঝুটোপুটি লড়াই করে দেখেছি, সে নিতান্ত ফাঁকি নয়, তার দেনা চুকিয়ে না দিয়ে সন্দীপেরও নিষ্কৃতি নেই।'

বিমলার অন্তরের দ্বারে নিখিল ও সন্দীপ দুজনে এসে দাঁড়িয়ে, তার অন্তরের প্রেম ও মোহ এই দুটি বৃত্তিকে দ্বৈরথে প্রবৃত্ত করিযেছে। একজন বিমলার অন্তবের নিবিড় গভীরতাকে একান্ত আহ্বান করেছে,—অন্যজন বিমলার অন্তরের দিশাহারা উন্মাদনাকে তীব্র আকর্ষণ করেছে।

নারীর স্বকীয়-সত্তা সুতীব্র, প্রগাঢ় (intense)—তাই সন্দীপের উগ্র প্রাবল্য বা পৌরুষেব প্রচণ্ডতা তাকে মোহাবিষ্টভাবে আকর্ষিত করেছে। পুরুষের স্বকীয়-সত্তা —বিস্তৃত, ব্যাপক (wide)। পুরুষের যেটি প্রকৃত সহজসত্তা—নারী ভালোবাসে তাকেই। তাই সন্দীপেব আত্যন্তিকতা ক্ষণ-উন্মাদনাবশে বিমলার ভালো লেগেছিল সত্য, কিন্তু নিখিলের নিঃশব্দ মৌন-অতল প্রেম ও অপরিসীম ঔদার্যকেও সে আপনার অজ্ঞাতেই ভালোবেসেছিল। এই ভালো-লাগার মূলে আছে মোহের প্রভাব এবং ভালোবাসার মূলে আছে প্রেমের পরম-স্পর্শ।

প্রেম—সত্য শিব সুন্দর ঈশ্বরেরই প্রতীক। সাধনার মধ্য দিয়ে তপস্যার মধ্য দিয়ে তবে তার (প্রেমের) স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

নিখিলকে আপন প্রেমের স্বরূপ-উপলব্ধির কঠিনতব তপস্যা করতে হয়েছে। বিমলাকে অগ্নি-পবীক্ষার মধ্য দিয়ে আপন-প্রেমের স্বরূপ চিনতে হয়েছে।

'হৃদা মনীষা মনসাভিকলিপ্ত'—'হৃদয়ের সহিত নিঃসংশয় বুদ্ধির যোগে, মনের আলোচনা দ্বারা তাঁর অভিপ্রকাশ ঘটে।'

'ঘরে-বাইরে'র প্রেম-সাধনার মূল তত্ত্ব ঐ—'হৃদা মনীষা মনসাভিকলিপ্ত'। নিখিল ও বিমলা উভয়েই এই তত্ত্বের মধ্য দিয়ে আপন অন্তরস্থ প্রেমেব স্বরূপ-নির্ণয়ে সমর্থ হয়েছে, আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ প্রেমের স্পর্শ লাভ করতে পেরেছে।

বিমলাকেই সইতে হয়েছে বড় ভয়ঙ্কর। সন্দীপের উগ্র-আকর্ষণের অনলকুণ্ডে তার প্রেমের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেছে। এ ভীষণ কঠিন অগ্নিকুণ্ডের দাহ হতে তাকে নিখিলের নিষ্কাম প্রেমও ঠিক রক্ষা করতে পারেনি ;—রক্ষা করেছে তার নারী-অন্তরেব বিগলিত মাতৃস্নেহের স্নিগ্ধ অমৃতধারা। রক্ষা করেছে কিশোর-বালক অমূল্য।

প্রেমের সাথেই তো মোহের চিরন্তন দ্বন্দ্ব। প্রেমকে আচ্ছন্ন করে, প্রেমকে হতচৈতন্য করে—তারই আসন অধিকার করার প্রবণতা—মোহের সহজ প্রকৃতি। তাই

প্রেমকে পরাজিত করেও নারীজীবনে মোহকে অধিক সক্রিয় শক্তিশালী হতে দেখা যায়,—কিন্তু মোহ অনেক সময় পূর্ণ পরাজিত হয়ে থাকে,—নারীর মাতৃস্নেহের অমৃত-চন্দ্রালোকের কাছে। এই মাতৃস্নেহের পীযূষধারায় নারীর মোহাচ্ছন্ন প্রেম, বিস্মৃত প্রেম, এমনকী মৃতপ্রায় প্রেমও উজ্জ্বল, দীপ্ত ও স্বপ্রকাশ হয়ে ওঠে।

নারীর জীবনে মোহ ও প্রেমের যথার্থ স্বরূপ চিনিয়ে দিতে পারে,—তার অমূল্য মাতৃস্নেহই।

যে তিনটি চবিত্র নিয়ে এ পর্যন্ত আলোচনা করলাম—'ঘরে-বাইরে'র এই প্রধান চরিত্র তিনটি তাদের আপন আপন স্ব-উক্তি দ্বারা—পুস্তকখানির মধ্যে বেশ সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠতে পেরেছে। এদের চরিত্র-বিশ্লেষণ করতে সমালোচকের সূক্ষ্ম-রসবোধ ও গ্রহণশক্তিকে খুব বেশি সচেতন ও সক্রিয় করে তোলার তেমন প্রয়োজন হয় না ; যেহেতু, এরা নিজেরাই নিজেদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে গিয়েছে। তাদের চিন্তা এবং ভাবধারার বিকাশ, বর্ধন ও পরিণতি তারা নিজের মুখেই প্রকাশ করায় চরিত্রগুলি স্বতঃই সুপরিস্ফুট হয়েছে।

এর মধ্যে আরো দুটি বিশেষ চরিত্র আছে। একটি মাস্টারমশাই চন্দ্রবাবু ; —অন্যটি নিখিলেশের বিধবা ভ্রাতৃজায়া মেজরানী।

মাস্টারমশাইয়ের প্রকৃতি ও চরিত্র এত বেশি স্বচ্ছ ও সুপরিব্যক্ত যে, তাঁর সম্বন্ধেও আমাদের চিন্তা বা পরিকল্পনাকে বেশি পরিশ্রম করতে হয় না। কারণ, তিনি যা,—তাই হয়ে সুস্পষ্টতার মধ্য দিয়ে নীরবে শান্ত সৌন্দর্যে ফুটে উঠেছেন। দ্বিতীয় চরিত্র মেজরানীর মধ্যেই একটু বিশেষত্ব আছে।

মেজরানীর এই বিশেষত্বটুকু তার নিতান্ত সহজত্বের আড়ালে এমনই আত্মগোপন করে রয়েছে যে তা সহজে কারুর চোখে পড়ে না। এইজন্যই যেন এর মাধুর্য আরো বেশি হয়ে উঠেছে। বনের ভিতরে ঘন পাতার আড়ালে ঢাকা অজানা অনামা ফুলটির মতো, এই সুন্দর শুভ্র মধুর নারী-অন্তরটি এমনই সহজ নীরবতায় অনাড়ম্বরে ফুটেছে যে, তার মনোরম মাধুর্য-সুরভি আমাদের মর্ম্মের মর্ম্মতলে একটি বেদনা-করুণ ভাববাষ্প পুঞ্জীভূত করে তোলে। তখন আমরা এই নারী-অন্তরটিকে সহানুভূতি কবব না শ্রদ্ধা করব—ঠিক করে উঠতে পারিনে।

সংসারে এমন অনেক বস্তু ও বিষয় আছে যা সদা-সর্ব্বদাই আমাদের দৃষ্টির সামনে নিতান্ত সহজ হয়ে রয়েছে,—তার মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্যটুকু হয়তো আমাদের কাছে চিরদিনই প্রচ্ছন্ন এবং অজ্ঞাতই থেকে যায়।

সাগর-বেলায় লক্ষ লক্ষ শূন্যগর্ভ শুক্তির সাথে মুক্তাগর্ভ শুক্তিটিরই মতো সে বৈশিষ্ট্যশূন্য নিতান্ত সাধারণ, সহজ। যা পায়ে ঠেকলেও পথিক একবার মাত্র হয়তো অন্যমনস্ক দৃষ্টিস্পর্শ করে নিরুদ্বেগেই চলে যায়। কোনো ঔৎসুক্য জাগে না, লক্ষ্য করবার জন্য যে, সেই অতি সাধারণ ঝিনুকটুকুর মধ্যে স্বাতী-নক্ষত্রের বারিবিন্দু

জমে রত্ন হয়ে আছে কিনা!

মেজরানীর নামটি পর্যন্ত আমরা জানি না। শুধু জানি, এই ভাগ্য-বঞ্চিতা নারীর উৎসবরাত্রির সন্ধ্যাক্ষণেই উৎসব-সমারোহ মিটে গিয়ে—রূপ-যৌবনের বাতিগুলি শূন্য সভায় সমস্ত রাত ধরে মিছে জ্বলতে থেকেছিল। কোথাও সংগীত ছিল না, শব্দ ছিল না, ছিল শুধু জ্বলা।—

কিন্তু এ জ্বলার মধ্যে একটুও দাহ'র সৃষ্টি হয়নি, কালিমা উৎপন্ন হয়নি,—আলোই বিকীরণ করেছে। হোক শূন্যসভা—হোক নিঃশব্দ আসর,—সেই নিঃশব্দ শূন্যতাকে সে আপন আলোয় সুন্দব করে তুলেছে,—নিঃশব্দতার মাঝেই অনাহতের ধ্বনি শুনেছে,—এইখানেই তার কৃতিত্ব-গৌরব।

আজীবন সর্ব্বসুখ ভোগ-বঞ্চিতা, স্বামীপুত্রহীনা বিধবা নারী—তাঁর অন্তরের সমস্তটুকু স্নেহরসসিঞ্চনে, একান্ত নিঃশব্দে যাকে ভালোবেসেছিলেন,—তাকে যে তিনি কতখানি ভালোবাসতেন, সে কথা কেউই জানবার বা চেনবার অবকাশ পায়নি। তাঁর এই ভালোবাসা শুক্তিগর্ভে, মমতাময়ী মায়ের কোমল প্রাণখানি, স্নেহময়ী অগ্রজার স্নিগ্ধ হৃদ্যতা ও অকৃত্রিম বন্ধুর নিঃস্বার্থ প্রীতি-মাধুর্যটুকু—স্বাতী-বারিবিন্দুর মতো পুঞ্জীভূত হয়ে জমাট বেঁধে মুক্তা-রত্ন সৃষ্টি করেছে। নিখিলেশের প্রতি মেজরানীর মমতাব্যাকুল ভালোবাসা—মুক্তারই মতো শুভ্র, উজ্জ্বল, সুন্দর। কোথায়ও ম্লানতা-লেশ নেই,—প্রাণের অতল সমুদ্রতলে মবমের শুক্তিগর্ভে গভীর গোপন তার অস্তিত্ব।

জীবনের বিরাট ব্যর্থতা, কেঁদে কাটিয়ে দেওয়া কঠিন নয়, হেসে কাটিয়ে দেওয়াই কঠিন। এই কঠিনের সাধনায় মেজরানী সহজ সিদ্ধি লাভ করেছেন।—চতুষ্পার্শ্বে ঐশ্বর্য ও ভোগেব উৎসব-সমারোহের মধ্যে, এই সর্ব্বসুখবঞ্চিত যুবতীকে একদিনের তরেও বিষণ্ণা বা ম্রিয়মানা দেখা যায়নি। নিজের জীবনের দুঃখ ও ব্যর্থতার বেদনামেঘ একদিনও বাইরে ফুটে উঠতে কেউ দেখেনি। হাসি ও রহস্যের কিরণ-ঝিলিমিল—স্বচ্ছ অথচ গুরু আবরণে তাঁর অন্তরের রূপটি চিরদিনই প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে।

মেজবানী তাঁর বড় জায়ের মতো বৈরাগ্যের ফাঁকিতে জীবনের ব্যর্থতা-লজ্জা ঢাকতে চাননি। তাঁর অন্তরের সহজ সত্যের রূপটিকে কোনোখানে, বাইরের রঙ মাখিয়ে বিচিত্র ও মহৎ করে তুলবার প্রয়াস তাঁর আদৌ ছিল না। এইজন্য তিনি বিমলার অন্তরে শ্রদ্ধার আসন গ্রহণ করতে পারেননি,—পাঠকদের কাছেও হয়তো উপযুক্ত শ্রদ্ধা হারিয়েছেন।

বিধবা বড়রানীর সাথে মেজরানী-প্রকৃতির তাই সম্পূর্ণ পার্থক্য ছিল। মেজরানী—'সাত্ত্বিকতার ভড়ং করতেন না। বরং তাঁর কথাবার্তায় হাসিঠাট্টায় কিছু রসের বিকার ছিল।'

মেজরানী সাবান-মাখার অভ্যাস ছাড়তে পারেননি। সদা সর্ব্বক্ষণ তাঁর জিহ্বাগ্রে রহস্য বিদ্রূপ ঠাট্টা তামাশা লেগেই আছে,—কথায় কথায় মধুর রসের সংগীত কলি কণ্ঠে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে।

স্বামীকে তিনি পাননি—সন্তানের স্নেহাস্বাদ তাঁর জীবনে ঘটেনি। নারীজীবনে স্নেহ, প্রেম, মমতা, সাধ, আকাঙ্ক্ষা সবকিছুই অপূর্ণ ও অতৃপ্ত ছিল—অথচ তাদের তৃপ্ত ও সার্থক করে তোলার উপাদান ছিল না। নিখিলেশের মাঝেই তাঁর সমস্ত অন্তরের স্নেহ ও প্রীতি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

নিখিলের কাছে অনর্গল বকুনিচ্ছলে কথা কয়ে—তারই মাঝে তাঁর অন্তরের একান্ত পরম সত্যকে সযত্নে আড়াল করে রেখেছেন,—কিন্তু তবুও তাবই মাঝে কখনও কখনও সেই সত্যের জ্যোতিস্ফুলিঙ্গ একটু-আধটু প্রকাশ হয়ে পড়েছে। —'তোমারই যদি চুরি যায় সে কি আমাকে বাজবে না? পোড়া বিধাতা সব কেড়ে নিয়ে আমার যে লক্ষ্মণ দেওরটি রেখেছেন তার মূল্য বুঝি আমি বুঝি নে? আমি ভাই, তোমাদের বড়োরানীব মতো দিনরাত্রি দেবতা নিয়ে ভুলে থাকতে পারি নে; দেবতা আমাকে যা দিয়েছেন সেই আমার দেবতার চেয়েও বেশি।'

মেজরানীর ভালোবাসার বিশেষত্ব হচ্ছে—নিখিলেশকে তিনি বাইরের সামাজিক জীবনে যে রূপে পেয়েছিলেন,—সে রূপ থেকে নিজের অন্তর-বাহির কোনোখানেই বিভিন্ন মূর্তি করে গড়ে তোলেননি। দেবরের স্নেহের মধ্যেই তাঁর নারী-অন্তরের অপূর্ণ মাতৃস্নেহ, অতৃপ্ত প্রীতি মমতা আত্মত্যাগ—যা কিছু—সবই দানা বেঁধে উঠেছিল।

ছ'বছরের দেবর নিখিলেশের সাথে ন'বছরের ভ্রাতৃজায়া মেজরানীর পুতুল খেলায়,—কাঁচা আমের অপথ্য আচার তৈরির মধ্য দিয়ে যে,—স্নেহ-সান্দ্র অপূর্ব্ব প্রীতি নিজেদের অলক্ষ্যে অন্তরতলে ঘনিয়ে উঠেছিল,—জীবনের ক্রমবিবর্তনে নিখিল তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক দূরে সরে গেলেও—এই প্রিয়জনহীন সংসাবে একান্ত একাকিনী ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীটির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তাঁর মৌন ভালোবাসা নিঃশব্দেই তাঁর আশৈশবের স্নেহাস্পদটিকে মর্ম্মের তলে তলে গভীর পাকে জড়িয়ে উঠেছে—একান্ত নিঃস্বার্থ স্নেহরসে তাকে পুষ্ট করে তুলেছে। বাহিরে তাঁর ভালোবাসার রূপটি ছিল নিতান্ত লঘু, সামান্য ও কৃত্রিমতাপূর্ণ। বৈষয়িক স্বার্থের প্রয়োজনেই যেন মেজরানী নিখিলেশের সাথে স্নেহভিনয় করেন। তার মনস্তুষ্টির জন্য, হীন কপটতা ও কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতেও যেন তাঁর দ্বিধা নেই বলে মনে হয়!

তাই বিনা আহ্বানে বিনা অনুরোধে নিখিল-বিমলার সাথে কলিকাতা-যাত্রায় প্রস্তুত মেজরানীর প্রতি নিখিলেশ অত্যন্ত বিস্ময়ানুভব করায়,—সেই একটি দিন মাত্র মেজরানীকে তাঁর সদা-রহস্য ছলনা-লিপ্ত লঘু-হাস্যের বোরকাখানি নামিয়ে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতে শুনেছি—'ঠাকুরপো, তোমরা পুরুষমানুষ, মুক্তি তোমাদের জন্যে। আমরা মেয়েরা বাঁধতে চাই, বাঁধা পড়তে চাই—...আমাদের বোঝা হচ্ছে ছোটো জিনিসের বোঝা। যাকেই বাদ দিতে যাবে সেই বলবে, আমি সামান্য, আমার ভার কতটুকুই বা। এমনি করে হালকা জিনিস দিয়েই আমরা তোমাদের মোট ভারী করি।—'

বিমলাকে মেজরানী যে খুব ভালোবাসত তা নয়। বরং তার প্রতি ঈষৎ ঈর্ষার

ভাবই ছিল। ভালোবাসার এই স্বাভাবিক ঈর্ষাটুকু তাঁর ভালোবাসার সংকীর্ণতা প্রমাণ করে না, বরং তাঁর ভালোবাসার গভীরত্বেরই পরিমাপ করে। এ ঈর্ষাটুকুর মধ্যে কলুষ নেই, কালি নেই। কারণ তাহলে মেজরানী সন্দীপের সাথে বিমলার অবাধ দেখা-সাক্ষাতে অন্তরে অন্তরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতেন না—এবং দরোয়ানকে বৈঠকখানার দ্বারে দাঁড়াবার হুকুম দিয়ে গোলযোগের সৃষ্টি করে আসন্ন-অশুভের যাতে পরিসমাপ্তি ঘটে তার চেষ্টা করতে চাইতেন না। সন্দীপের সাথে বিমলার নির্জন-আলাপে উৎপাত ঘটাবার জন্য ইচ্ছা করে ক্ষেমা ও থাকো দাসীর মধ্যে কলহ বাধিয়ে দিয়ে, বৈঠকখানায় বিমলার কাছে নালিশ করতে পাঠাবার প্রয়োজন হতো না।

কিন্তু এই প্রচ্ছন্ন-গভীর শুভকামনা, এই কল্যাণ-চেষ্টা তাঁর,—নিখিলেশের প্রতিই শঙ্কা-ব্যাকুল স্নেহ হতে প্রবুদ্ধ হয়ে উঠেছে, —বিমলার প্রতি নিঃস্বার্থ স্নেহে নয় তা অবশ্য মানতে হবে।

নিখিল যে বিমলাকে কত ভালোবাসে—মেজবানী তা জানতেন। তাই তিনি মোহাকর্ষিতা বিমলাকে নিখিলের পানে ফিরাতে চাইতেন। যেহেতু,—বিমলার উপরেই যে তাঁর পরমপ্রিয় স্নেহাস্পদটির জীবনের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা অনেকখানিই নির্ভর করছে।

মেজরানীর ভালোবাসা কতখানি যে নিঃস্বার্থ ও প্রচ্ছন্ন, সেইদিনই নিখিলেশের কাছে কতকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যেদিন বিধবা মেজরানী তাঁব ন'বছব বয়সে প্রবেশ-করা শ্বশুর-স্বামীর ভিটা ত্যাগ করে—দেবর ও জায়ের কলিকাতা-যাত্রারূপ অজানার উদ্দেশে ভাসানো তরীতে উঠবার জন্য প্রস্তুত হয়ে, বিনা-নিমন্ত্রণে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন। অথচ তার কারণটি কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে বা ইঙ্গিতেও জানাতে চাইলেন না! তুচ্ছ ছুতো, মিথ্যা কৈফিয়তে তাঁর সেই পরম বেদনার একান্ত গভীর কথাটি ঢাকা দিয়ে রাখতে চাইলেন।

মা-বাপের ক্রোড় ছেড়ে বালিকা-বয়সে যে আশ্রয়নীড়ে এসে, তারপর এই সুদীর্ঘকাল যে বাড়ির বাইরে তিনি একটি দিন কখনো কাটাননি, সেই চির-অভ্যাসের অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা, জীবনের সকল সুখ-দুঃখের স্মৃতি-সুরভি-জড়ানো, গৃহকর্ত্রীর সম্মানিত আসন পাতা—আপন অধিকারের গৌরবময় স্থানটি—সংস্কার ও সুবিধার আকর্ষণ কাটিয়ে—ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত হওয়া,—সে যে কতখানি পরম বস্তুর বিনিময়ে সম্ভব হতে পারে,—নিখিলেশ ও বিমলার সেদিন আর বুঝতে ভুল হলো না।

সেইদিন তাঁর ঘরময় ছড়ানো বাক্স-পুঁটুলির মধ্যে দণ্ডায়মান নিখিলেশের কাছে এই সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠলে যে,—এই ভাগ্য-কর্তৃক বঞ্চিতা পতিপুত্রহীনা নারী সংসারের মধ্যে কেবল একটিমাত্র যে সম্বন্ধকে নিজের হৃদয়ের সঞ্চিত অমৃত দিয়ে পালন করেছেন, তার বেদনা কত গভীর! টাকাকড়ি, ঘর-দুয়ারের ভাগ, সামান্য সাংসারিক খুঁটিনাটি নিয়ে বিমলা ও নিখিলেশের সঙ্গে তাঁর যে বার-বার ঝগড়া

হয়ে গেছে, তার কারণ বৈষয়িকতা নয়। তার কারণ, তাঁর জীবনের এই একটিমাত্র সম্বন্ধের উপরে তাঁর দাবি প্রবল করতে পারেননি।

নিখিলেশের উপরে মেজরানীর দাবি যে, কেবলমাত্র সামাজিকতার দাবি নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর—এ কথা বিমলাও বুঝেছিল। তাই ওদের সম্বন্ধটির প্রতি বিমলারও প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার অস্তিত্ব ছিল।

সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী—মেজরানীর কপট অভিনয় বা কৃত্রিম উপায়ে নিখিলেশের মনোরঞ্জন-প্রচেষ্টা।

এই মধুর ছলনাটুকু তাঁর অন্তরের স্বর্গীয় স্নেহের অপূর্ব্ব আভাস আরো সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছে। যেহেতু স্বার্থাভিসিদ্ধির ঘৃণ্য কুটিল মনোবৃত্তি হতে এ-ছলনার উদ্ভব নয়।

মেজরানী দেবরের কাছে হাঁপিয়ে গিয়ে নবাবিষ্কৃত দেশী সাবান চেয়ে-চিন্তে নেন,—নিজে গায়ে মাখবেন বলে। কিন্তু পরোক্ষে তাতে কাপড় কাচাই চলে,—গায়ে মাখেন পূর্ব্বেকার বিলাতী সাবানই। মাথার দিব্য দিয়ে অনুরোধ করে দেবরের কাছ থেকে দেশী কলম বনাম দাঁতন কাঠির বাণ্ডিল আনিয়ে নেন, —কিন্তু লেখবার দরকার হলে বাক্সর ভিতর হতে হাতির দাঁতেব শৌখিন কলমটি বের করে লেখেন। ঠাকুরপোর সামনে তাঁর দিশী কাঁচির নামে জিভে জল পড়ে,—অথচ সেলাইয়ের বেলায় বিলাতী কাঁচিই চলে। এ প্রতারণা, এ কপট ছলনার জন্য বিমলা তাঁকে ঘৃণা করলেও নিখিলেশ তা পারেনি। কারণ, এব অন্তর্নিহিত মূল-সত্যের পরম রসটি বিমলা স্পর্শ করতে না পাবলেও নিখিলেশের কাছে তা অস্পষ্ট ছিল না। এই প্রতারণা, এই ছলনাব মূলে—একটি মমতা-উদ্বেল হৃদয়ের কতখানি প্রগাঢ় স্নেহরস গোপনসঞ্চিত রয়েছে, —সমস্তটুকু না বুঝতে পাবলেও, কতকটা বোধ হয় নিখিলেশ বুঝত।

এই ছলনার মূলে তাঁর, নিজেকে নিখিলেশের সুদৃষ্টিভূত করবার মনস্তত্ত্ব ছিল না,—নিখিলেশকে সুখী করবার—নিখিলেশের মুখে ক্ষণিকের তরেও উৎসাহ-দীপ্তি, সানন্দ হাসিটুকু দেখবার তৃপ্তিটুকুই এর মূল মনস্তত্ত্ব।

নারী যাকে ভালোবাসে, তাকে সুখী করবার জন্য, তৃপ্ত ও আনন্দিত করবার জন্য যে মধুর ছলনাটুকু করে,—সে ছলনা, ছলনা হলেও ক্ষেত্রবিশেষে সত্যের চেয়েও শ্রদ্ধেয় ও সুন্দর। যেহেতু তার মূলে রসসিঞ্চন করছে—নারীর অন্তর্নিহিত পরম সত্য—প্রেম, স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা। তাতে প্রিয়জনকে সুখী করবার পরিতৃপ্ত করবার স্বতঃপ্রবণতা ছাড়া অন্য কোনো কলুষ-কামনা বা গোপন স্বার্থাভিপ্রায় নেই। ললনার ছলনা তখনই হয়ে ওঠে ঘৃণ্য, কুশ্রী,—যখন ছলনা অন্তরের গভীর প্রেম-সুধা হতে অমৃতরূপে উৎসারিত না হয়ে—মিথ্যা হতে, গোপন-স্বার্থাভিসন্ধি হতে উদ্ভূত হয়ে আসে।

তাই বিমলা যখন অশ্রদ্ধাভরে স্পষ্ট করেই বলেছে, 'যাই বলো, পেটে এক, মুখে আর ভালো নয়,' মেজরানী তখন অকুণ্ঠচিত্তেই বলেছেন—'তাতে দোষ হয়েছে

কি? কত খুশি হয় বল্ দেখি! ছোটবেলা থেকে ওর সঙ্গে যে একসঙ্গে বেড়েছি, তোদের মতো ওকে আমি হাসিমুখে কষ্ট দিতে পারি নে।'

নিখিলেশ প্রজাবিদ্রোহ-অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—মেজরানী ছুটে এসে বিমলার ঘরে ঢুকে বিমলাকে গাল দিচ্ছেন—'রাক্ষুসী! সর্বনাশী! নিজে মরলি নে, ঠাকুরপোকে মরতে পাঠালি!' সে মুহূর্তে তাঁর আশৈশবের অভ্যস্ত লজ্জা, সম্ভ্রম বোধ—সমস্তই অনায়াসে খসে পড়েছে। দেওয়ানবাবুর সামনে বেরিয়ে নিজের মুখে বলছেন—'মহারাজকে ফিরিয়ে আনতে শিগগির সওয়ার পাঠাও। ...তাঁকে বলে পাঠাও, মেজোরানীর ওলাউঠো হয়েছে, তাঁর মরণকাল আসন্ন।'

পতিপুত্রহীনা সংসারের সর্ব্বস্বরিক্তা নারীর অন্তর্নিগূঢ় বিশ্বাস-শতদল আজ বিপদের মুহূর্তে বাইরে বিকচ হয়ে উঠল। মেজরানীর ওলাউঠো হয়েছে—মৃত্যুকাল আসন্ন জানলে,—সংসারে এমন একজন আছে যে সব কাজ ফেলে তৎক্ষণাৎ ছুটে আসবেই।

সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি-রেখাটিও মিলিয়ে এল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছে।

বিমলা পথের ধারে জানালায় বসে তার ভাগ্যের শেষ সন্ধিক্ষণে পৌঁছে—রুদ্ধ নিশ্বাসে নিখিলেশের প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষা করছে।

এই ভাগ্য-প্রতীক্ষা ছেড়ে উঠে গিয়ে বাক্স খুলে অমূল্যর দেওয়া ভাইফোঁটার প্রণামীটিও হাতে করে নিয়ে এসে বসে থাকতে তার শক্তি নেই। ...তখন ঠাকুরঘর থেকে সন্ধ্যার শঙ্খ-ঘণ্টা বেজে উঠেছে। বিমলা জানে—এই চরম বিপদের মুহূর্তে মেজরানী জানালায় বসে বিমলার মতো ভাগ্যের প্রতীক্ষা করছেন না,—ঠাকুরঘরে বসে জোড়হাতে মুদিত নয়নে তপস্যা করছেন।*

কল্লোল, বৈশাখ ১৩৩৬

আমাদের সমাজ ও সাহিত্য

সমালোচকরা কেউ কেউ বলছেন, বাংলা সাহিত্যে প্রাণহীন, কৃত্রিমতাপূর্ণ সৃষ্টি প্রাচুর্য্য বেড়ে চলেছে।

কথাটি সর্ব্বতোভাবে সত্য নয় এবং সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে প্রাণহীন ফাঁকা বস্তুর প্রাচুর্য্য দেখা দিয়েছে সত্য, কিন্তু এটা নতুন সত্য নয়। যেহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যকেও ঠিক এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা যেতে পারে।

---

* প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র-পরিষদের পঞ্চম অধিবেশনে লেখিকা-কর্তৃক পঠিত।

প্রাক্-আধুনিক সাহিত্যে, ভাষার বৈচিত্র্য, ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য এবং বাস্তবতাবাদ ও দুঃখবাদের কৃত্রিম অনুভূতি ছিল না সত্য,—কিন্তু অকৃত্রিম প্রাণস্পর্শতা, অনাবিষ্ট উন্মুক্ত দৃষ্টিশক্তি এবং গভীর-অনুভূতি-সঞ্জাত সুন্দর রস-সৃষ্টির দিক্ দিয়ে, সে সাহিত্যও যে খুব বড় আসন নিতে পেরেছিল, এ কথা বলা চলে না।

পূর্ব্বতন সাহিত্য, অতি অল্পদিন আগে পর্য্যন্ত, নির্ব্বিশেষে, অবিমিশ্রভাবে আদর্শবাদ, নীতিবাদ, এই দুটি মাত্র উপাদানকে একান্ত আশ্রয় করে চরিত্র-সৃষ্টি ও রস-সৃষ্টি করে গিয়েছে। সেইজন্য সে সাহিত্য অধিকাংশ স্থলেই, রস-সৃষ্টির দিক্ দিয়ে স্বচ্ছন্দোৎসারিত, সার্থক এবং প্রাণগতিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। চরিত্রগুলি প্রায় সবই 'বইয়ের জীব'ই হয়েছে। বহির্জগতে কিম্বা মনোজগতে প্রায়শঃ ক্ষেত্রেই তারা অচল।

তৎসাময়িক জনসমাজে সে সাহিত্য আদৃত হলেও, সেই ফাঁকা নীতিবাদের নকল জরীর উজ্জ্বল দীপ্তি আজকের দিনে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। তার যথার্থ মূল্য কতটুকু রসবেত্তা সমাজে সে তথ্য আর অবিদিত থাকছে না। কালের নিকষে কৃত্রিম ও অকৃত্রিমের মূল্য, একদিন-না-একদিন প্রমাণিত হয়ই। পুরাতন মাত্রেরই একটা মূল্য আছে মনে করে আমবা অত্যন্ত ভুল করি। যার মূল্য আছে, তা কোনওদিনই পুরাতন হয় না। তা সাহিত্যজগতে আভিজাত্যের মর্যাদা নিয়ে 'ক্ল্যাসিক' হয়ে বেঁচে থাকে। যেমন,—বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শেক্সপীয়ার, শেলি, গ্যয়টে, কীটস্ বেঁচে আছেন এবং থাকবেন। কারণ, সর্ব্বকালের সাহিত্য-সভায় এঁরা চিরন্তন আসন গ্রহণ কবেছেন। আমাদের দেশে, বর্ত্তমান শতাব্দীব সাহিত্যে, চিরন্তন প্রাণগঙ্গা অবতরণ করিয়েছেন—বিশ্ব-স্তুত কবি রবীন্দ্রনাথ ও অপূর্ব্ব কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র।

বর্ত্তমান কালের তরুণ সাহিত্যে যেমন কৃত্রিম দরদ, কৃত্রিম অনুভূতি, কৃত্রিম দুঃখ-সুখের বাস্তব স্বপ্ন-রচনার প্রাবল্য দেখা দিয়েছে,—ভঙ্গীর কারু-কৌশল, ভাষার অভিনবত্ব ইত্যাদি বাহ্যিক বিচিত্র সৌষ্ঠবে এরা যেমন প্রাণবস্তুর দৈন্য ঢেকে রাখতে সচেষ্ট,—প্রাক্-আধুনিক সাহিত্যও ঠিক এইরকম কৃত্রিমতারই কারবার করে গেছে। তাই, সে সাহিত্যে কোনওদিন, রূপের মধ্য দিয়ে জীবনের সত্য আবেদনটি শিল্পীর অনাবিষ্ট অনুরাগের বর্ণে আরঞ্জিত, প্রাণ-দ্যোতনা-পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। পূর্ব্বতন-সাহিত্যও, রচনার মধ্যে, প্রাণাভিব্যঞ্জনার বিশেষ প্রচেষ্টা না করে সামাজিক নীতিবাদ ও বৃহৎ আদর্শবাদের সাড়ম্বর ফানুষে সেই জীবনাভিব্যক্তির দৈন্য এবং ত্রুটি আবৃত রাখতে যত্ন নিয়েছেন। যে ত্রুটিব অভিযোগে আধুনিক সাহিত্যের স্থূল ইন্দ্রিয়বাদ ও প্রাণহীন উগ্র বাস্তবতাবাদ অভিযুক্ত হচ্ছে,—পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যেরও ত্রুটি আর এক দিক থেকে তাব চেয়ে একটু কম নয়। মোটের উপরে আমাদের সাহিত্যে, প্রাণ-অভিদ্যোতক, সত্য-চেতনাযুক্ত, সার্থক বস্তুর অভাব প্রথম থেকেই রয়েছে। পরিবর্ত্তন হয়েছে তার দৈন্য-আবরণের উপাদান-পুঞ্জের।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে বাদ দিয়েও এই উভয় যুগ-সাহিত্যের মধ্যে, এমন কয়েকজন প্রতিভাশালী, সার্থক স্রষ্টা আছেন, যাঁদের সৃষ্টির মধ্যে প্রাণের সাড়া ও রসের আস্বাদ অঙ্গাঙ্গীরূপে বর্ত্তমান। পূর্ব্বতন সাহিত্যের এবং আধুনিক সাহিত্যের সেই বিশিষ্ট রচয়িতাদের সৃষ্টি অবশ্য এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়।

সাহিত্যে এই ফাঁকির বেসাতির মূল কারণ—আমাদেব অতি জীর্ণ, রক্ষণশীল সমাজ, যে এই জাতির যৌবনকে হত্যা করে তার মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত করেছে।

সামাজিক জীবন যাদের নিস্তেজ, নীরস, বৈচিত্র্যহীন, স্পন্দনশূন্য. পঙ্গু, অসাড়, —যে জাতি জীবনেব মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে তোলাকে দুঃসাহসিকতাব পরিচায়ক বলে মনে করে,—তাবা সত্য ও সজীব সাহিত্য, প্রাণ-রস-পূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করবে কেমন করে?

সামাজিক জীবনেব অভিজ্ঞতায় এবং উপলব্ধিতে যাদের সৌন্দর্য্য, শিল্প বা রসের সাথে সাক্ষাৎ-পবিচয়ের কোনও সহজ পন্থা নেই,—তাদের দ্বাবা সাহিত্যে আর্ট ও বস-সৃষ্টি—কাল্পনিক কৃত্রিম সামগ্রী ব্যতীত অন্য কিছু হওয়া সম্ভবপর নয়।

প্রচুরতর অভাব ও বিবিধ ক্ষতির অজস্র ছিদ্রে আজ আমাদের সামাজিক জীবন এমনই দৈন্যময় অচল হয়ে উঠেছে যে, আর একে চাকা দিয়ে সচল কবে নেবার উপায় নেই। বরং দারিদ্র্য লুকাবার এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা, এর দৈন্যকে যেন আরও হীনতায় মণ্ডিত করে উপহাসাস্পদ করে তুলছে। কিন্তু তবুও অতি পুরাতন সমাজ-বিধির জীর্ণ সর্ব্বাঙ্গে, অভাবের সহস্র ছিদ্রপুঞ্জ সংস্কারের প্রচেষ্টার চেয়ে ঢেকে রাখবাব প্রবণতা আমাদের দেশে এখনও বেশী রকম বর্ত্তমান। সমাজের এই নগ্ন দাবিদ্র্য যে একটুও গৌরবের পরিচায়ক নয়, বরং কুশ্রীতা ও লজ্জাহীনতারই পরিচায়ক, —এ বোধ যে পর্য্যন্ত না জাগবে এবং সমাজের জীর্ণতা-সংস্কারে যতদিন না এবা ব্রতী হবে, সে পর্য্যন্ত সাহিত্যেরও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আশা দূর-পবাহত; যেহেতু সাহিত্য ও সমাজ এ দুটি পবস্পরের মুখাপেক্ষী বস্তু। বিশেষ, জাতিব সমষ্টিগত সংস্কার, বুদ্ধি, চৈতন্য, জ্ঞান, কল্পনা, রস ও রুচি—তাদের সমাজ এবং সাহিত্যকে গড়ে তোলে। তাই এই দুটি সামগ্রীর মধ্যে বিশেষ ঐক্যসূত্র অন্তর্নিহিত আছে।

যেখানকার সমাজে যে অবস্থা, সেখানকাব সাহিত্যেও সেই অবস্থাই সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আমাদের দেশেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। এখানে, উন্নত ও সুন্দর সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য, স্রষ্টার যে সকল গুণ-উপাদান অবশ্য প্রয়োজন, তাব ত্রুটি ও অভাবের ছিদ্রগুলি ভরাট করতে সাহিত্য-স্রষ্টার তেমন প্রবণতা নেই, যেমন প্রবণতা দেখা গেছে ও দেখা যাচ্ছে—সেই ত্রুটি ও অভাবকে কৃত্রিমতার আবরণে ঢাকা দিয়ে বাখবার।

মৌলিকত্ব, ভাব-প্রাচুর্য্য, সত্যস্পর্শী অনাবিষ্ট কল্পনাশক্তি, সূক্ষ্ম-অন্তর্দৃষ্টি, ঐতিহ্যমুক্ত (Free from the influence of tradition) সুদূর-প্রসারী চিন্তাশীলতা, গভীর অভিজ্ঞতা, সহজ-অনুভূতি—সর্ব্বোপরি দেশ-কাল ও নিন্দা-স্তুতির অতীত সত্যোপলব্ধি

—এই সকল গুণ উপাদান ব্যতীত, কোনও দেশে এবং কোনও কালে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। এর জন্য প্রতিভার সহিত সাধনারও প্রয়োজন। সাধনা ব্যতীত শক্তি কিম্বা প্রতিভা কিছুই প্রবুদ্ধ ও প্রদীপ্ত হয়ে উঠতে পারে না। এই সত্য সাধনা যতদিন না সাহিত্য-স্রষ্টাদের লক্ষ্য ও আরাধনার বস্তু হবে, ততদিন বোধ হয় বঙ্গবাণীর বরাঙ্গে—গিল্টি করা সাহিত্যালঙ্কার ওঠা অনিবার্য্য। আবার এ কথাও স্বীকার করতেই হবে, যে, তেমন সাধক ও সাধনা সম্ভব হয় দেশ-কালের অনুকূল আবহাওয়া এবং উপযোগী পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের গুণে।

কৃত্রিম-সাহিত্য-সৌধ-রচনা পূর্ব্বতন সাহিত্যেও চলছিল, আধুনিক সাহিত্যেও চলেছে। মিস্ত্রী বদলের সাথে সাথে মালমশলা ও রং ঢংয়ের বদল হয়েছে—এই মাত্র। এখনও প্রাণবন্ত সার্থক ও সুন্দর সাহিত্যের তাজমহল, তার রূপে-রসে-ব্যঞ্জনায়, সত্যে ও সুষমায় গড়ে উঠতে বাকী আছে।

সামাজিক জীবনযাত্রায় আমাদের প্রাণ না থাকুক ভান আছে যথেষ্ট। এই ভান দীর্ঘ-শতাব্দী-ব্যাপী অভ্যাসের ফলে আমরা এমনি স্বাভাবিক করে ফেলেছি, যে, এখন এর প্রকৃত রূপটি চেনা কঠিন। সাহিত্যেও এই ছদ্ম সুনিপুণ ভানটিই ফুটে উঠেছে। এই ভানটুকুকেই আমরা আমাদের সত্যকারের দান বলে মনে করি।

যা সত্য নয় বলে উপলব্ধি করি, যার মধ্যে কল্যাণ নেই, প্রাণ-স্পন্দন নেই, রসাস্বাদ নেই বলে বুঝতে পারি,—নির্ভীকতা ও নিষ্ঠার অভাবে, ঐতিহ্যের বন্ধন প্রভাবে, প্রথা-আচারের চক্ষুলজ্জায় সেই পরম মিথ্যাকে আমরা আমাদের জীবনে সত্যের আসন দান কবতে বাধ্য হই। এই তো আমাদের বৃদ্ধ-প্রপিতামহের পূর্ব্বতন আমলের সমাজবিধি-পূর্ণ বর্ত্তমান সামাজিক জীবনের সকরুণ ট্র্যাজেডি।

অকাম্যকে কাম্য বলে, পরিহার্য্যকে গ্রাহ্য বলে, অতৃপ্তিপ্রদকে তৃপ্তিকর বলে স্বীকার করাব এবং স্বীকার করাবার প্রাণান্ত প্রয়াস,—প্রাণ-সম্পর্ক-শূন্য ভানের কারবার, —এই তো আমাদের সঙ্ক্ষীয়মান-সমাজ এবং সঙ্ক্ষীয়মান সাহিত্যের স্বরূপ।

আধুনিক তরুণ সাহিত্যের বিক্ষোভ ও উচ্ছলতা, ভালো বা বড় জিনিষ না হলেও, লক্ষণ হিসাবে বিশেষ অমঙ্গলের নয়। বরং, এই উদ্দামতা, উচ্ছলতা, বিক্ষোভ চাঞ্চল্যের পরে যে পরম মুহূর্ত্তটি আসবে, সেই চেতন-জাগ্রত প্রশান্ত মুহূর্ত্তটির আভাস আমাদের মনে যেন একটু আশার সঞ্চার করছে।

কাদাই ঘাঁটুক, ধূলাই মাখুক,—এরা অন্তরে একটা তীব্র অতৃপ্তি নিয়ে, নব নব সন্ধানের পথে যে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে, তাতে ভুল নেই। এদের অন্তরের অতৃপ্তিই যে এদের সৃষ্টিকে সত্য ও সুন্দরের খোঁজে 'নেতি'র পথে এগিযে নিয়ে চলবে, —এ ভরসা হয়তো মিথ্যে না হতে পারে।

স্ব-রচিত সৃষ্টি-উপাদান ও সৃষ্টি-পদ্ধতির বর্ত্তমান রূপকে এরা চিরদিনের সত্য করে তুলে তারই মধ্যে নিজেদের বন্দী করে রাখতে স্পৃহাশীল নয়। আজ এরা যে বিষয়-বস্তু ও যে রসসৃষ্টি দ্বারা সাহিত্য-গঠনকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছে—তারই মধ্যে

সংকীর্ণ বৃতি রচনা করে স্থিতিশীল হবে না,—এ সত্য এদের যাত্রা-ভঙ্গীতেই সুপরিস্ফুট। আজকের সত্য চিরকালের অখণ্ডনীয় ও অপরিবর্ত্তনীয় সত্য নয়, তা আজকেরই সত্য,—অনাগত ভবিষ্যতে রূপান্তর ঘটতে পারে,—এ ধারণায় ও স্বীকারে যাদের নীতি ও সংস্কার বাধা দিতে পারেনি,—তাদের সৃষ্টির সত্যের মধ্যে আজ যদি কোনও কলুষ, গ্লানি বা ভ্রান্তি ফুটে উঠেই থাকে, তার জন্য আমাদের বেশী চিন্তিত হবার প্রয়োজন বোধ করি না। কারণ, তারা গতিশীল, স্থিতিশীল নয়। তারা সত্যের সন্ধানে যাত্রা করেছে,—এমন কথা বলে তাদের চলা বন্ধ করেনি যে, আমরা যা ছুঁয়েচি এর বাড়া সত্য নেই বা থাকতে পারে না।

বঙ্গসাহিত্যে যে দুজন বিরাট প্রতিভাশালী সাহিত্য-স্রষ্টা তাঁদের প্রদীপ্ত প্রতিভা-কিরণ বর্ষণ করেছেন, এঁদের সৃষ্টি-প্রতিভাব মূল তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাঁরা এই দেশ, কাল ও সমাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে, সাহিত্য-লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে যে রত্নসম্ভার দান করেছেন ও করছেন, তা অপূর্ব্ব এবং অমূল্য সামগ্রী। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের এই প্রতিভা-উন্মেষেব মূলে কি কি গুণ বর্ত্তমান আছে, তা অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ হতে পারে।

এই দুজন স্রষ্টা, স্বাধীন সত্যকে এমনই নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, সেই উপলব্ধির আনন্দ এঁদের সকল বন্ধন, সকল বাধা ছাপিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টিকে স্বতঃ-সার্থক করে তুলেছে। তাই এঁদের সৃষ্টি, দেশ-কাল-সমাজের অন্তর্বর্ত্তী থেকেও, দেশ-কাল- সমাজ-অতীত বৃহত্তর সত্যকে ব্যাপকভাবে স্পর্শ করতে পেরেছে। অর্থাৎ —এঁদের সৃষ্টির বিষয়বস্তুগুলি দেশ-কালেরই অন্তর্ভুক্ত এবং বর্ত্তমান সমাজের ক্রিয়া, চিন্তা, সমস্যা, দ্বন্দ্ব প্রভৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত;—কিন্তু তার রস এবং সত্য দেশকাল সমাজের প্রাচীরে মাথা ঠোকেনি, অবলীলাক্রমে পার হয়ে গিয়েছে। এই পার হওয়ার মধ্যে কষ্টের চিহ্ন বা প্রচেষ্টার চিহ্ন নেই—এমনই তার সহজ ব্যঞ্জনা ও স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গিমা।

সৃষ্টির রূপটিকে দেশ-কালের মধ্যে রেখে, রস ও সত্য বোধটিকে দেশ-কাল ছাপিয়ে সহজের পানে নিয়ে যাওয়াতে এঁদের সাহিত্য এত সুন্দর, সত্য ও সমগ্রভাবে সার্থক হয়ে উঠেছে।

এই দ্রষ্টাদ্বয়ের কল্পনা ঐতিহ্যমুক্ত, সত্যসন্ধানী। দৃষ্টি সূক্ষ্ম, অনাবিষ্ট ও উন্মুক্ত। তাই এঁদের কাছে এক দিক দিয়ে মানব-জীবনের অতি তুচ্ছতম ঘটনা ও ক্ষুদ্রতম বস্তুর সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার বিচিত্র বর্ণরাগের সূক্ষ্মতম রেখাটিও সুস্পষ্ট পরিদৃশ্যমান হয়ে উঠেছে; আবার অন্য দিক দিয়ে চিরন্তন বৃহত্তর সত্যে মানবাত্মার যে বিচিত্র বিকাশ ও পরিণতি তারও বিরাট স্বরূপ উজ্জ্বল রূপে প্রতিফলিত হতে বাধা পায়নি। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ত্রিতন্ত্রী বীণায় সুর বেঁধে এঁদের সৃষ্টির সুরটি সুসঙ্গতি এবং সার্থকতা লাভ করেছে।

রক্ষণশীল পঙ্গু সমাজের অটুট বন্ধন-গ্রন্থি শিথিল করতে হলে, সাহিত্যে

কল্যাণময় সুদৃঢ় সত্যের ব্যুত্থান চাই। অপর পক্ষে সাহিত্যকে সুন্দর ও সার্থকরূপে পেতে ইচ্ছা হলে সমাজকেও অন্ধত্ব ও অচলত্ব পরিহার করে উদার ও প্রশস্ত হতে হবে।

আজ সাহিত্যকে খুলতে হবে বিষ-অচেতন সমাজের সর্ব্বাঙ্গের নাগ-পাশ, —ফণীর দংশন-ভয়ে ভীত হলে চলবে না; সমাজকে খুলতে হবে সাহিত্যের কণ্ঠ হতে শ্বাস-রুদ্ধকর অগণিত কঠোর ফাঁস!—নইলে একদিন উভয়েরই মৃত্যু অবধারিত।

সেদিন ফরাসীদের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা বহন করে এনে দিয়েছিল তার সাহিত্য। আজ রুশেরও মুক্তি বহন করে নিয়ে এসেছে, রুশের গত কয়েক বৎসরের সাহিত্য।

আদর্শবাদ ও নীতিবাদ উপেক্ষনীয় বিষয় নয়, বরং সাহিত্যে ও-দুটি অপরিহার্য্য চিরন্তন সামগ্রী। তাকে অস্বীকার করা বা খাটো করা'র দুষ্প্রবৃত্তি আমার নেই। আমার মনে হয়, সাহিত্যে আদর্শবাদ ও নীতিবাদের যতটুকু ন্যায্য প্রাপ্য ছিল তার চেয়ে অনেকখানি বেশী জায়গা তাদের অন্যায়রূপে দখল করতে দেওয়া হয়েছে। সাহিত্যে এই অতিরিক্ত ফলিয়ে তোলা আদর্শবাদ ও নীতিবাদ—তার সমগ্রতার হিসাবে অসমঞ্জসভাবেই বেড়ে উঠেছিল বলে বোধ হয় বর্ত্তমান তরুণ সাহিত্যে তারই তীব্র প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠেছে।

কিন্তু তরুণ সাহিত্যও যদি এই একদিকে-ঝোঁকা অসামঞ্জস্যতার পথে চলে, —অর্থাৎ দারিদ্র্যবাদ, দৈন্যবাদ, দুঃখবাদকে স্বরূপের চেয়েও ফলাও করে তুলতে চায় —তা হলে এ সৃষ্টিও যে অনতিকালে মৃতদেহের মতই আড়ষ্ট হয়ে উঠবে, সে কথা বোধ করি বলা বাহুল্য।

উদরকে অনশনে রেখে বা বিশেষ উপেক্ষা করে হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যায়াম-চর্চ্চার, স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য এবং শৌর্য্যশক্তি অর্জ্জনের, চেষ্টা ব্যর্থই হয়। আবার দৈহিক সমস্ত অঙ্গাবয়বের যথোপযুক্ত যত্নে অমনোযোগী হয়ে কেবলমাত্র উদরের প্রতি মনোযোগী হলেও সে মানুষ শীঘ্রই অপদার্থ হয়ে পড়ে। শরীরের সকল অবয়ব-যন্ত্রের আবশ্যকানুযায়ী যত্ন ও উৎকর্ষ-চর্চ্চা, তার সহিত অন্তরের প্রফুল্লচিন্তা, নিরুদ্বেগতা, আনন্দ প্রভৃতি,—মানসিক যন্ত্রের কুশল-ক্রিয়া—নির্দ্দোষ স্বাস্থ্য ও দৈহিক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পক্ষে যেমন অপরিহার্য্য প্রযোজনীয়,—সাহিত্যকেও স্বাস্থ্য-সুন্দর সতেজ করে তুলতে হলে, অন্তর্বহিঃ সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্যতার মধ্য দিয়ে চলতে হবে। অতি-সংযমের মধ্যে যেমন সত্য পীড়িত হয়ে ওঠে, অসংযমের মধ্যে তেমনিই সে লাঞ্ছিত ও অবমানিত হয়।

মানব-মনের মানস-সরোবরেই সাহিত্যের অমল কমল বিকশিত হয়ে উঠেছে —'In the universe there is nothing greater than man, in man there is nothing greater than mind.' দার্শনিক হ্যামিল্টনের কণ্ঠের এই বাণী আজ নিখিল বিশ্ব-সাহিত্যের মর্ম্মবীণায় অনুরণিত হয়ে উঠেছে।

জগৎ এবং জীবন হতে সাহিত্যের উদ্ভব, এবং এই দুটিকেই কেন্দ্র করে সাহিত্যে

রূপ ও রসের সৃষ্টি। কামনা ও কুশ্রীতা, দুঃখ ও দৈন্য, এদের অস্তিত্ব জগতে এবং জীবনে স্ফুটতর ও অস্ফুটতরভাবে রয়েছে। যা জগতে এবং জীবনে আছে, সাহিত্যেও তার স্থান আছে। কিন্তু এরাই যে সাহিত্যে বা জীবনে সমগ্রতার পরিচায়ক বৃহত্তম সত্য, তা নয়। এর চেয়েও বৃহত্তর সত্যবস্তু যা,—সে সত্য যেন এর কাছে ছোট বা ম্লান হয়ে না যায়।

বিশ্বে আনন্দ ও দুঃখ, পুণ্য ও পাপ, ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র্য, সৌন্দর্য্য ও কুশ্রীতা, জরা ও যৌবন পাশাপাশি বর্ত্তমান। এর মধ্য হ'তে সৌন্দর্য্য, যৌবন, আনন্দ, ঐশ্বর্য্যই যে শুধু সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে—বিপরীতগুলি পারে না, তা সত্য নয়। বিশ্বের ভাল-মন্দ যা কিছু—নিপুণ সাহিত্য-শিল্পীর হাতে পড়লে সুন্দরই হয়ে ওঠে। এই সৌন্দর্য্য তার বাহ্যিক সৌষ্ঠবে বা বিষয়বস্তু-নির্ব্বাচনের উপরে নির্ভর করে না। নির্ভর করে গূঢ়ার্থ-ব্যঞ্জক প্রাণের আবেদনটি যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার উপরে। সেইজন্য পুণ্যের চিত্রও অনিপুণ শিল্পীর হাতে অসুন্দর হয়ে ওঠে, এবং, পাপের চিত্রও নিপুণ শিল্পীর তুলিতে সুন্দর হয়ে ওঠে।

যেমন বসবিদ্ কলানিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় জবার চিত্র, দারিদ্র্যের চিত্র, মরুভূমির চিত্রও পরমসুন্দর পদবী লাভ করে, এবং অনিপুণ চিত্রকরের আঁকা যৌবনের চিত্র, ঐশ্বর্য্যের চিত্র, শ্যাম-নিকুঞ্জের চিত্রও প্রাণের অভিব্যক্তির অভাবে—অন্তরস্থ ভাবরসের যথোপযুক্ত উৎসারণ-দৈন্যে—ব্যর্থ অসুন্দর প্রতীয়মান হয়ে থাকে।

'হৈ সবমেঁ সবহীতেঁ ন্যারা'—সেই পরমসুন্দর তিনি যে শুধু ঊষার সুষমায়, আকাশের নীলিমায় আছেন তা' তো নয়, নিশার আঁধারে, ধরণীর ধূলার মধ্যেও যে তিনি রয়েছেন। কোথাও তাঁর বিকাশ অধিকতর স্ফুট, কোথাও বা স্বল্প-স্ফুট কিম্বা অস্ফুটই। কিন্তু অস্তিত্ব যে তাঁর সর্ব্বত্রই ও সবেতেই আছে, তার ভুল নেই। সুন্দর অসুন্দর সকলের মাঝে—সেই প্রাণ-স্বরূপ পরমসুন্দরকে যদি চিত্রকর তুলির টানে, স্থপতি ভাস্কর-যন্ত্রের মুখে, সাহিত্যিক লেখনীর অগ্রে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তাহলে—অসুন্দর বিষয়বস্তু হতেও পরম সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়ে উঠবে।

আজ বঙ্গ-ভারতী আশা-উৎসুক নয়নে প্রতীক্ষা করছেন—সাহিত্য-মন্দির-তলে ভক্তদল পূজার সার্থক অর্ঘ্য বহন করে আনবেন।

তরুণ উপাসক আনবেন,—যৌবনের প্রাণ-পর্য্যাপ্ত সজীব সৃষ্টি। তাতে কামনার ঊর্দ্ধে প্রেম পরিস্ফুট হবে, কদর্য্যতার ঊর্দ্ধে সৌন্দর্য্য আসন নেবে, ভাঙবার শক্তির পিছনে বৃহত্তর গড়বার শক্তি অধিক চেতন-প্রবুদ্ধ সক্রিয় হয়ে উঠবে।

নারী উপাসিকা আনবেন—নারী-অন্তরের অন্তরতম বাণী বহন করে। নারী-হৃদয়ের যে-সকল বিশেষতর নিগূঢ় অনুভূতি ও পরম সত্য, তাঁদের বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির আলোয় আঁধারে বিচিত্র রশ্মি-সম্পাত করছে,—যা পুরুষের উপলব্ধির অতীত, সেই সত্যকে অন্তর্গূঢ় লোক হতে কল্যাণ-প্রদীপে পথ দেখিয়ে সাহিত্য-লোকে মূর্ত্ত করে ধরবেন।

দূরদর্শী, বয়োজ্যেষ্ঠ, ভক্ত,—সাহিত্য ও সমাজের লৌহশৃঙ্খলমোচনে সহায়তা করবেন। সাহিত্য যাতে সুসমঞ্জস, স্বাস্থ্য-সুন্দর প্রাণবন্ত ও সার্থক হয়ে ওঠে,—সমাজ যাতে জড়তা ও সংকীর্ণতামুক্ত কল্যাণে সুখে স্বাস্থ্যে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, তারই যত্ন ও দায়িত্ব নেবেন। তরুণদের ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁদের প্রশান্ত ক্ষমার স্নিগ্ধ শীলতায় যেন লজ্জিত হয়ে ওঠবার অবকাশ পায়।

ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬

সাহিত্যবিচারে পুরুষ-নারী ভেদ*

আজকের এই সাহিত্য ও সংগীতের আসরে আমি কেবলমাত্র শ্রোত্রী হয়েই যোগদান করতে পেলে খুশি হতাম বেশি—কিন্তু সেভাবে এখানে প্রবেশের 'ছাড়পত্র' কিছুতেই পাওয়া গেল না বলে অগত্যা কিছু বলবার জন্য দুঃসাহসী হয়েছি। যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে দু'চারটি কথা বলে আমি এঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে চাই মাত্র, কারণ, এরকম বিদ্বজ্জনসভাতে কিছু বলতে পারি এমনতর সম্পদ আমার নেই।

আমাদের দেশের সমালোচকদের সাহিত্য-বিচার সম্বন্ধে, একটা ক্ষোভ আমার মনে প্রায়ই জাগে। সেদিন আমার একটি তরুণী বান্ধব (যাঁর রচনা ইতিমধ্যেই সাহিত্যের আসরে বেশ আদর পেয়েছে, আমি সেই অপরাজিতা দেবীর কথা বলছি) আমাকে তাঁর একখানি চিঠিতে প্রশ্ন করেছেন যে, ' "কবি"র চেয়ে কি "ব্যক্তি" বড়? "কবিত্ব"র চেয়ে কি "ব্যক্তিত্ব"ই সাহিত্যক্ষেত্রে বেশি আদর পায়?' বান্ধবীর এই জিজ্ঞাসায়, সেই ক্ষোভটাই আমার মধ্যে আজ আবার সচেতন হয়ে উঠেছে। আমি তাই আজকের এই বাণীর আসরে সাহিত্যিক-প্রশ্নের আকারে সেই কথাটাই উত্থাপন করতে এসেছি।

সাহিত্য-বিচারে নারী-পুরুষ ভেদটা আমাদের দেশের সমালোচকদের মধ্যে খুব বেশিরকম প্রবল দেখতে পাওয়া যায়। প্রায়ই চোখে পড়ে, কেউ না কেউ লিখছেন, —'অমুক মহিলাটির রচনা মন্দ নয়, মেয়েছেলের লেখা হিসাবে বেশ ভালোই বলতে হবে—' ইত্যাদি। সাহিত্যবিচারে মেয়েদের জন্য এই যে একটা আলাদা রকম মাপকাঠির বিশেষ ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়, আমার মনে হয়, এটা মহিলা-সাহিত্যিকদের পক্ষে যতখানি অমর্যাদাকর, তার চেয়েও ঢের বেশি অমর্যাদাকর সেই সমালোচকদের পক্ষে; কারণ, সাহিত্য-বিচারে সমালোচকের দায়িত্ব গুরুতর। তাঁকে শুধু সম্যক আলোচনাই নয়, সম-আলোচনাও করতে হবে।

---

* ২৫শে জানুয়ারি কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের সারস্বত সম্মিলন সভায় পঠিত।

পৃথিবীর সকল দেশেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে একাধিক সুসাহিত্যিক পাওয়া হয়ত তত দুর্লভ নয়, যত দুর্লভ একজন খাঁটি রসগ্রাহী সত্যনিষ্ঠ নিপুণ সুসমালোচক। আমার মনে হয়, প্রত্যেক সমালোচকের প্রধানত দৃষ্টি থাকা উচিত লেখকের মূল সৃষ্টির দিকে। প্রকৃত-সমালোচকেরা লক্ষ্য রাখুন সাহিত্যের রূপ, রস, প্রাণ, লেখকের সৃষ্ট বস্তুর অন্তর্লীন সৌন্দর্য ও সেইসঙ্গে তার বহিরঙ্গরাগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিশেষত্ব ও গুণাবলীর দিকে। রচনা-মাধুর্য, প্রকাশভঙ্গির রমণীয়তা ও দীপ্তি, ভাবাভিব্যক্তির নৈপুণ্য, তার আবেদন, ব্যঞ্জনা, বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁরা যত ইচ্ছা গবেষণা করুন,—কিন্তু, লেখক বা লেখিকা পুরুষ কিংবা নারী, তাঁদের ব্যক্তিত্ব, সামাজিক প্রতিপত্তি, সাংসারিক অবস্থা, জীবনের অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন এবং সর্ব্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির সন্ধান রাখা বোধ করি উপযুক্ত সমালোচকের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। কবির জীবনী লিখতে বসবেন যিনি, তিনি হয়ত সে সব খবর রাখতে পারেন; কিন্তু যিনি তাঁর কাব্য-সমালোচনা করতে বসবেন, তিনি শুধু কবির রসসৃষ্টির বিশ্লেষণ করুন; তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর মন্দিবাভ্যন্তরেব পূজারতি ও ভোগার্চ্চনেব দোষগুণ বিচার করুন; পূজারীর শয়নকক্ষের সংবাদ জানবার তাঁর কোনো বিশেষ আবশ্যক আছে বলে মনে করি না।

নরনারীর Sex-difference বাস্তব-জগতে জীবনের ক্ষেত্রে অনেকস্থলেই না মেনে উপায় নেই;—কিন্তু, সাহিত্য-ক্ষেত্রে কাব্য-জগতে বোধ হয় এই পুরুষ-নারী-ভেদটা বিশেষভাবে স্বীকার্য নয়; কারণ, সাহিত্য-দ্রষ্টা যিনি, কবি যিনি—তিনি কখনো কোনো বিশেষ Sex-এর গণ্ডীর মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে পারেন না। তিনি তাঁর Sex-এর সীমাকে অতিক্রম করেই তবে কবি বা স্রষ্টা হতে পারেন। আমাদের দেশে 'কবি' শব্দটি উভলিঙ্গবাচক। ইংরাজিতে Poet এবং Poetess আখ্যা আছে, কিন্তু এদেশে মহিলা ও পুরুষ উভয়েই 'কবি' পদবাচ্যের সম-অধিকারী।

ফরাসী মহিলা-সাহিত্যিক শ্রীমতী (Aurore Dudevant) 'অ্যারোর দ্যুদেভান্ত' (George Sand) 'জর্জ সাঁদ' এই পুরুষের ছদ্মনাম নিয়ে সাহিত্যের আসরে নেমেছিলেন; সেদিন (Saint Beuve) 'সেণ্ট ব্যভে'র মতো প্রসিদ্ধ সমালোচকও তাঁর রচনা পড়ে তাঁকে নারী বলে ধরতে পারেননি। তিনি সেই তরুণ লেখক George Sand-এরই রচনা-শক্তির প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'This author had struck a new and original vein and was destined to go far.' কিন্তু তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইংরাজ মহিলা শ্রীমতী J. W. Cross যেদিন 'জর্জ এলিয়ট' (George Eliot) পুরুষের ছদ্ম সংজ্ঞায় সাহিত্যের আসরে নামলেন, Caro, Jules Lemaitre, Faguet প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর সমালোচকেরা সেদিন আগে হতেই তাঁব পরিচয় জানতে পেরে সমালোচনায় লিখলেন —'A woman's idea of morals and ethics and religious faith dominates all her works.' তাঁর রচনার সমালোচনা রচয়িতার নারীত্ব ভুলে নিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। তাঁরা আরও বলেছিলেন—'It seemed that she had said her whole say and that nothing but replicas could follow.' কিন্তু

জর্জ এলিয়ট তাঁদের এ মন্তব্য তাঁর পরবর্তী রচনাগুলি দ্বারা মিথ্যা সপ্রমাণ করেছিলেন।

এখানে আমার মনে আছে, কিছুদিন আগে ভাগলপুরের শ্রীমতী আশালতা দেবীর প্রবন্ধ-রচনা পড়ে অনেক সমালোচকই সে রচনাগুলি পুরুষের লিখিত বলে নিঃসন্দেহ মত প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। নারীর লেখনী এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারে, বা নারীর চিন্তাশীলতা, যুক্তিশীলতা এত গভীর হতে পারে, এ-কথা তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু যে-সকল পুরুষ নিঃসঙ্কোচে নারীর ছদ্মনাম নিয়ে একাধিক রচনা মাসিকপত্রে প্রকাশ করেন, অধিকাংশ সমালোচকেরা তাঁদের সে অপকীর্তি ধরতে পারেন না। তাই বলি যে, ভিতরে কিছু substance এবং অচলা sincerity, honesty of purpose and straight forwardness না থাকলেও কেউ কেউ হয়ত তথাকথিত কবি বা সাহিত্যিক হয়ে উঠতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত সমালোচক হবার দুরাশা যেন তাঁরা না করেন; কারণ, সু-সমালোচক হতে হলে ওই গুণগুলির অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন,—ইংরাজিতে যাকে বলে একেবারে imperatively necessary.

'মেয়ে' নামধেয় জীবগুলির প্রতি, কি সংসারে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে, এমনকি এই সাহিত্য-ক্ষেত্রেও, হয় কঠিন বিধি-নিষেধের কঠোর শাসন, নচেৎ সানুগ্রহ করুণা ও সদয় কৃপা এই দুটির একটি ব্যবস্থা দেখতে পাই। মানুষের সহজ দৃষ্টিতে এবং মানুষ হিসাবে তার ন্যায্য প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান নারীজাতি আজও পাননি। সেই যে Lady's Champion-দের যুগ থেকে পুরুষদের Chivalrous spirit, — 'Lady's honour first' বা 'For Ladies only' বলে সমাজে মেয়েদের সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ অনুগ্রহ বা কৃত্রিম আদবকায়দার ব্যবস্থা করেছিল,—তারই ভূত আজকের এই বিংশ শতাব্দীতে এদেশেব সাহিত্য-ক্ষেত্রেও মেয়েদের রচনা আলোচনা সম্পর্কে, দুর্ব্বল সমালোচকদের স্কন্ধে এসে চেপেছে। এইসকল সমালোচকরা বুঝতে পারেন না যে, পুরুষের সেই করুণার দানে, তাঁদের কৃপা-প্রদত্ত সেই কৃত্রিম-সম্মানে নারীর মানমর্যাদার চেয়ে লজ্জা ও অপমানই বেশি। পুরুষরা যখন বিশেষভাবে 'এটি মেয়েদের লেখা' বলে একটা ভিন্ন মাপকাঠিতে কাব্য বা সাহিত্যের বিচার করতে প্রবৃত্ত হন, তখনই তাঁরা সমালোচকের আসনে বসবার অযোগ্যতা সপ্রমাণ করেন না কি?

নারী-জীবনের অভিজ্ঞতা ও নারী-হৃদয়ের অনুভূতির বৈশিষ্ট্যই যদি কোনো মহিলার রচনার মধ্যে বেশি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তবে সাহিত্যের সাধারণ মাপকাঠিতে সে রচনা পুরুষের রচনার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমান আসন ও সমান মর্যাদা দাবি করতে পারবে না কেন? অপর পক্ষে যদি কোনো মহিলার রচনা একেবারে পুরুষালীও হয়, সে রচনাও সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে উৎকৃষ্ট হলে তার স্রষ্টা বা রচয়িতা পুরুষ নয় নারী, এই অপরাধে তা ব্যর্থ বা বাতিল হবে কিসের জন্য? 'বধূ' কবিতা রচনা করে রবীন্দ্রনাথ, কিংবা 'বিন্দুর ছেলে' গল্প লিখে শরৎচন্দ্র নারীর অন্তর ও চরিত্রের যে বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন, সাহিত্য-বিচারের মাপকাঠিতে পুরুষ বলে তাঁদের সে রচনা তো এ পর্যন্ত insincerity-র অখ্যাতি লাভ করেনি কোনো

সমালোচকের কাছে ; তবে নারীর রচনা-আলোচনা সম্পর্কে সে কথা উত্থাপন করেন কেন এদেশের একাধিক সমালোচকেরা, —আমি তা বুঝতে পারিনে।

সাহিত্য-বিচারে পুরুষ-নারী ভেদ না রেখে সমান উদার ও সাধারণ দৃষ্টিতে উভয়ের দৃষ্টির সৌন্দর্য ও বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করে সত্যনিষ্ঠ রসবিদ্ সমালোচক যদি নিছক নিন্দা ও ব্যর্থতার রায়ই উচ্চারণ করেন, সে নিন্দা ও ব্যর্থতার অপযশও মহিলা-সাহিত্যিকদের পক্ষে ঢের বেশি গৌরবের, তবু ঐ ভেদবুদ্ধি ও কৃপাদৃষ্টি-সঞ্জাত, কৃত্রিম-সম্মান-জ্ঞান-পরবশ স্তোক-স্তুতি এবং প্রশংসা-লাভ নারীর পক্ষে এতটুকুও সম্মানের নয়।

জীবনের ক্ষেত্রে না হোক, অন্তত সাহিত্য ক্ষেত্রেও কি এদেশেব মেয়েরা সমালোচকদের কাছে মানুষের সহজ ও সাধারণ অধিকার দাবি করতে পাবেন না? এখানেও কি এ-সাম্য ও মৈত্রীটুকু সম্ভব নয়?

ভাবতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৩৭

বাংলাদেশে মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দীকাল পূর্ব্বে বাংলাদেশে সর্ব্বপ্রথম মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময়ে বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষা সবেমাত্র শুরু হয়েছে, তখনও প্রসার লাভ করেনি,—সেই সময়ে অজস্র বাধাবিপত্তি এবং নানা সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে, চির-লজ্জাভীরু শঙ্কাতুর-হৃদয়া অন্তঃপুবিকারা সাহিত্য-তীর্থে এসে শুধু বিবিধ রচনা-বিভাগে যোগ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, সাময়িক-পত্রিকা পরিচালনার ভারও গ্রহণ করেছেন। এটা খুবই বিস্ময় ও আনন্দের বিষয় তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, এখনকাব কালের তুলনায় অর্দ্ধ শতাব্দী আগের সমাজের যে কত বেশী পার্থক্য ছিল, তা' আজকের দিনে কল্পনা করাও কঠিন।

বাংলার মেয়েরা তাঁদের শিক্ষার উৎকর্ষের গতি-অনুযায়ী সাহিত্যক্ষেত্রে যত শীঘ্র এবং যত সহজে একটা স্বাভাবিক আত্মপ্রেরণাবশে সাড়া দিয়েছেন এবং এগিযে এসেছেন, এতটা অন্য কোনও ক্ষেত্রে বোধ হয় পারেননি। যদিও দুঃখের ও লজ্জার সহিত স্বীকার ক'রতেই হবে যে, আমাদের দেশে এখনো পর্য্যন্ত এমন একটিও মহিলা-কবি বা মহিলা-লেখিকার নাম পাওয়া যায় না, যাঁর নাম আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বা কবিদের সঙ্গে একত্রে উচ্চারণ করতে পারি! তবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রগতি দেখে মনে হয়—ভবিষ্যতে হয়তো সে আশা দুরাশা না হ'তেও পাবে।

বাংলাদেশে মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল—১২৮২ সালে। শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী-সম্পাদিত 'বিনোদিনী' নামক পত্রিকাই বাংলাদেশে প্রথম মহিলা-পরিচালিত পত্রিকা, এবং স্বর্গীয়া ভুবনমোহিনী দেবীই বাংলাদেশে প্রথমা পত্রিকা-সম্পাদিকা। কিন্তু দুঃখেব বিষয় 'বিনোদিনী' দীর্ঘ-জীবন লাভ করতে পারেনি, কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তারপর ১২৯১ সালে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা-মাসিক পত্রিকার দ্বিতীয়া-সম্পাদিকারূপে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূতা হ'ন। যোগ্যতাহিসাবে প্রকৃতপক্ষে ইনিই বাংলা মাসিক পত্রিকার প্রথম মহিলা-সম্পাদিকা। কারণ, স্বর্গীয়া ভুবনমোহিনী দেবীর 'বিনোদিনী' তেমন উল্লেখযোগ্য পত্রিকা হয়ে উঠতে পারেনি এবং দীর্ঘকাল তা' জীবিতও ছিল না। কিন্তু ১২৯১ সালে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী' পত্রিকার পরিচালনকর্ম্ম হ'তে অবসর গ্রহণ করলে, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী'র ভার গ্রহণ করে কিরূপ যোগ্যতার সহিত পত্রিকাখানি সম্পাদন করেছেন, ওই সময়কার 'ভারতী'র প্রতি পাতায় পাতায় তার প্রমাণ উজ্জ্বলভাবে ব্যক্ত রয়েছে। মাসিক পত্রিকা পরিচালনায় শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী যে একজন উপযুক্ত পুরুষ সম্পাদক অপেক্ষা কোনও অংশেই অযোগ্য ছিলেন না, —'ভারতী'-সম্পাদিকাব আসনে তিনি একাধিকবার প্রতিষ্ঠিতা থেকে তার প্রমাণ দেখিয়েছেন।

১২৯২ সালে শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর মাতা) 'বালক' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেছিলেন। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের তরুণ-যৌবনের বহু রচনা 'বালকে'র বক্ষ অলঙ্কৃত করেছিল। সেই 'বালকে'ই প্রথম আমরা বালক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও বালিকা সরলাদেবীর রচনা দেখতে পাই। পরে, সেই বালক বলেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিশালী সুলেখক হ'য়ে উঠেছিলেন। দুর্ভাগা বাংলা দেশের দূরদৃষ্টবশতঃ তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। দু'বৎসর প্রকাশ হ'বার পর 'বালক' 'ভারতী'র সহিত যুক্ত হয়ে যায়।

তারপরে ১৩০২ সালে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর সুযোগ্যা কন্যাদ্বয়া স্বর্গীয়া হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী প্রসিদ্ধ 'ভারতী' পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন।

১৩০৪ সালে 'পুণ্য' নামে একখানি মহিলা-সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হয়েছিল। 'পুণ্যে'র সম্পাদিকা ছিলেন, শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। ইনি ১৩০৪ সাল থেকে ১৩০৮ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর পত্রিকাখানি পরিচালিত করেছেন।

১৩০৪ সালে আর একখানি তৎকালীন প্রসিদ্ধ মহিলা-সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হয়েছিল— নাম, 'অন্তঃপুর'। মহিলা-পরিচালিত 'অন্তঃপুর' মহিলাদের রচনা দ্বারা পরিপুষ্ট হ'য়ে সাহিত্যক্ষেত্রে মাসে মাসে দেখা দিত। 'অন্তঃপুর'-এর প্রথমা সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীমতী বনলতা দেবী। ১৩০৪ সাল থেকে ১৩০৭ পর্য্যন্ত ইনি যোগ্যতার সহিত সুচারু-শৃঙ্খলায় 'অন্তঃপুর' সম্পাদন করেছিলেন। তারপর তাঁর পরলোকগমনের পর 'অন্তঃপুরে'র সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী। ১৩০৭

থেকে ১৩১০ পর্য্যন্ত ইনি 'অন্তঃপুরে'র সম্পাদিকা ছিলেন। এঁর পরে পত্রিকাখানির ভারগ্রহণ করেন, শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র। ১৩১১ সালে এঁরই সম্পাদনায় 'অন্তঃপুর' প্রকাশ হয়েছিল। কিন্তু অর্থাভাবে কাগজখানিকে তিনি বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি।

১৩০৮ সালে প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র 'পরিচারিকা'র সম্পাদিকা হয়েছিলেন—শ্রীমতী মোহিনী দেবী। ১৩১০ সালে 'পরিচারিকা'র ভার গ্রহণ করেছিলেন—শ্রীমতী সুচারু দেবী।

১৩১২ সাল থেকে 'ভারত-মহিলা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বিশিষ্টভাবে মহিলাদেরই জন্য প্রকাশিত হয়েছিল। 'ভারত-মহিলা'র সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত। ১৩১২ থেকে ১৩২০ পর্য্যন্ত নয় বৎসর এই পত্রিকাখানি বেশ প্রশংসার সহিত চলেছিল।

১৩১৬ সালে শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র (বসু) সম্পাদিত 'সুপ্রভাত' নামক সুন্দর একখানি মাসিক পত্রিকার উদয় দেখা যায়। 'সুপ্রভাত' কুমারী কুমুদিনী মিত্রের তত্ত্বাবধানে পাঁচ বৎসরকাল জীবিত ছিল।

১৩১৮ সালে 'মাহিষ্য মহিলা' নামে কোনও এক সম্প্রদায়-বিশেষের একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ হয়েছিল। এই কাগজখানির সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী বিশ্বাস। ১৩২২ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর 'মাহিষ্য মহিলা' জীবিত ছিল। এই সময়েই মহিলা কবি স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 'জাহ্নবী' মাসিকপত্রের সম্পাদিকার আসন গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদনায় 'জাহ্নবী' দুই বৎসর প্রকাশ হয়েছিল।

১৩২৩ সাল থেকে মহিলা কবি শ্রীমতী নিরুপমা দেবী বিলুপ্ত 'পরিচারিকা' পত্রিকার নবপর্য্যায় প্রকাশ করেন। ১৩২৩ থেকে ১৩৩০ পর্য্যন্ত 'নবপর্য্যায় পরিচারিকা' শ্রীমতী নিরুপমা দেবী বেশ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করেছিলেন।

১৩২৮ সালে সুপ্রসিদ্ধ 'নব্যভারত' পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী ফুল্লনলিনী দেবী।

১৩৩১ সাল থেকে শ্রীমতী সরলাদেবী পুনরায় 'ভারতী' মাসিকের ভার গ্রহণ করেছিলেন।

১৩৩০ সাল থেকে ১৩৩৫ পর্য্যন্ত ৬ বৎসর শ্রীমতী সুরবালা দত্তকে আমরা 'মাতৃ-মন্দির' মাসিক পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদকের অন্যতমরূপে দেখতে পাই। তারপর ১৩৩৬ সাল থেকে শ্রীমতী সুশীলা নন্দী তাঁর স্থান অধিকার করেছিলেন।

১৩৩২ সাল থেকে ১৩৩৪ পর্য্যন্ত 'বঙ্গলক্ষ্মী' নামক স্ত্রীশিক্ষা ও নারীজাতির সর্ব্ববিধ উন্নতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকাখানির সম্পাদিকার আসনে শ্রীমতী কুমুদিনী বসুকে দেখতে পেয়েছি। ১৩৩৫ সালে 'বঙ্গলক্ষ্মী'র সম্পাদিকার আসনে শ্রীমতী লতিকা বসুকে দেখা যায়। তারপর ১৩৩৫ থেকে আজ পর্য্যন্ত এই নারী উন্নতি-ঔৎকর্ষক মাসিক পত্রিকাখানি শ্রীমতী হেমলতা দেবীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৩৮

নারী-প্রকৃতির দ্বিবিধ রূপ

বিশিষ্টতর দুটি ভাবকে অবলম্বন করেই সাধারণত সংসারে নারীপ্রকৃতির অভিব্যক্তি ও পরিণতি ঘটতে দেখা যায়। পুরুষের সাথে তার পার্থক্যের মূল প্রভেদ কোথায় অনুসন্ধান করতে গেলে স্ত্রীজাতির প্রকৃতিগত সেই সহজ বিশেষত্বদু'টিই আমাদের চোখে পড়ে। একটি হচ্ছে তার মাতৃরূপ, অপরটি প্রেয়সী রূপ। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেও আমরা নীলাচঞ্চলা আনন্দময়ী প্রিয়ার মোহিনীমূর্ত্তি এবং স্নেহস্নিগ্ধ মমতা-কোমলা জননীর করুণামূর্ত্তির অভিব্যক্তি দেখ্‌তে পাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'দুইবোন' শীর্ষক আখ্যানের ভূমিকাতেই নারীর এই দু'টি বিশেষ রূপকে দু'টি ঋতুবিশেষের সঙ্গে উপমিত করে তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় বলেছেন—

'মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্দ্ধলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।

আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে ঝঙ্কারের অপেক্ষায়, যে ঝঙ্কারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব্ব দেহে মনে অনির্ব্বচনীয়ের বাণী।'

প্রত্যেক নারীর মধ্যে এই দু'টি প্রকৃতিই বর্ত্তমান। কারো মাতৃভাবের প্রবণতা বেশী, কারো প্রিয়াভাবের।

রবীন্দ্রনাথের 'দুইবোন' আখ্যানের নায়ক শশাঙ্কমৌলী তার স্ত্রী শর্ম্মিলাব মধ্যে পেয়েছিল কেবলমাত্র নিত্যস্নেহসতর্ক মমতাময়ী মাতৃরূপা নারীকে। তাই তার অন্তরের যৌবন ছিল একান্ত অপরিতৃপ্ত।

স্ত্রীর শঙ্কাকুল সসতর্ক স্নেহলালনে সে যে কোনওদিন প্রসন্নতার তৃপ্তি লাভ করেনি তার প্রমাণ তাদের দাম্পত্য জীবনের গোড়াকার ছবি থেকেই পাওয়া যায়। রাত্রিকালে বন্ধুমহলে 'ব্রিজ' খেলায় মত্ত শশাঙ্ককে বাড়ি ফিরিয়ে নিতে যখন লণ্ঠন হাতে মহেশ চাকর আসে,—তখন শশাঙ্ককে প্রফুল্ল না হয়ে বিরক্ত হতেই দেখা যায়, এবং বাড়ি ফিরে এসেও স্ত্রীর কাছে প্রসন্ন কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে অপ্রসন্নতাই প্রকাশ করতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

স্ত্রীর এই অতিলালনে তাকে এমনও বলতে শোনা গেছে, '—দোহাই তোমার! চক্রবর্ত্তী-বাড়ির গিন্নীর মতো একটা ঠাকুর দেবতা আশ্রয় করো। তোমার মনোযোগ আমার একলার পক্ষে বড় বেশী। দেবতার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে পারলে সেটা সহজ হয়। যতোই বাড়াবাড়ি করো, দেবতা আপত্তি করবেন না, কিন্তু মানুষ যে দুর্ব্বল।'

শশাঙ্ক তার স্ত্রীর অনুষ্ঠিত নিজের জন্মদিনের উৎসববাসরে যোগদান কর্‌তে পারেনি। তার গৃহে তাকেই বিশেষভাবে উপলক্ষ্য করে অনুষ্ঠিত আনন্দ উৎসবের চেয়েও বিজনেসের কাজই তখন শশাঙ্কের কাছে অনেক বেশী আকর্ষণের সামগ্রী। তাই সে সংক্ষেপে বলেচে—'বিজনেস্ মৃত্যুদিন ছাড়া আর কোনো দিনের কাছে মাথা হেঁট্ করে না।' কিন্তু এ'কথাটা যে কতবড় মিথ্যা, তা সে নিজেই জান্‌তো না। যে-দিন জান্‌তে পারলে, সেদিন তার পরাজিত হৃতসর্ব্বস্ব 'বিজ্‌নেস' আপনার গর্ব্বোদ্ধত মাথা ধূলায় মিশিয়ে লুটিয়ে পড়েচে।

যাই হোক্, শশাঙ্ক তার মাতৃভাবাপন্না বন্ধ্যা স্ত্রীর অত্যধিক মনোযোগিতাপূর্ণ সস্নেহ সেবায়, তৃপ্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে যেন বিব্রতই হয়েচে বেশী, এমন দৃষ্টান্ত একাধিক দেখ্‌তে পাই। এক জায়গায় সে স্পষ্টই বলেচে, '—দেখ শর্ম্মিলা! তুমি আমাকে খেলনা বানিয়ে বিশ্বের লোক ডেকে এনে খেলা কর্‌বার চেষ্টা কোরো না।'

ছোটবোন ঊর্ম্মিমালার প্রকৃতি ছিল, বড়বোন শর্ম্মিলার বিপরীত। সে আনন্দচঞ্চলা, পরিপূর্ণ প্রাণলীলাময়ী। তার স্ফুটনোন্মুখ নারীপ্রেম আত্মবিকাশের অপেক্ষা করছিল। উদার পুরুষের স্বাধীন সুন্দর পৌরুষের পাশেই নিজেকে যে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ। সুতরাং তার প্রয়োজন ছিল এমন স্বামীর, যে পুরুষ তার জীবনের বিকাশ ক্ষেত্রে হ্‌তে পারে আনন্দসঙ্গী, অন্তরঙ্গ বন্ধু,—গুরু নয়, চালক নয়, উপদেষ্টা নয়।

যে-পুরুষ ঊর্ম্মির প্রেমের মাধুর্য্যপূর্ণ বিকাশের জন্য সাধনা কর্‌তে পারে! কর্‌তে পারে ত্যাগ ও তপস্যা, এবং পবিশেষে করে নিতে পারে তার হৃদয়কে জয়। কিন্তু নিয়তির চক্রান্তে জীবনের শুরুতেই তার ভাবীস্বামী পদে নির্ব্বাচিত হলো যে পুরুষ —সে একটি জন্মগত গুরু, উপদেষ্টা ও চালক। মানুষের প্রাণের সহজ স্ফূর্ত্তিকে স্বাভাবিক বিকাশকে খর্ব্ব করে, আপন রুচি অনুযায়ী পুতুল তৈরী করাতেই তার ঝোঁক্।

তাই ঊর্ম্মির ভাবী স্বামী নীরদ আনন্দ-চঞ্চলা ঊর্ম্মির অফুরন্ত প্রাণধারার প্রতি লক্ষ্য করেনি,—কামনা করেনি ঊর্ম্মির মধুর প্রেমের সুন্দর বিকাশ। সে চেয়েছিল অবিচল কর্ত্তব্যপরায়ণা, একান্তভাবে পতির মতাবলম্বিনী অনুগতা স্ত্রী। ঊর্ম্মির সহজ প্রাণধারার বিলোপ সাধন করে তাকে আপনার প্রয়োজনের যন্ত্র করে গড়ে তোলাই হয়েছিল তার সাধনা।

এই পুরুষকে ঊর্ম্মিমালা কেবলমাত্র উচ্চ আদর্শ দিয়ে গ্রহণ করে' অন্তরের শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রাণপণ করেচে। নিজের প্রকৃতির স্বাভাবিক স্ফুরণের গলা টিপে ধরে সে প্রস্তুত হয়েচে আত্ম-বিলোপ সাধনের জন্য। আপন অন্তঃপ্রকৃতির বিপরীতধর্ম্মী মানুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ কববার জন্য ঊর্ম্মিকে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা কর্‌তে দেখেচি আমরা। কিন্তু নিয়তির চক্রে সংসারের ঘটনাবর্ত্তে এমন একটি অবস্থার মধ্যে শশাঙ্ক ও ঊর্ম্মি একে অপরের জীবনপথে এসে পড়্‌লো যাতে করে ঘট্‌লো এই বিয়োগান্ত ঘটনা।

ঊর্ম্মি তার বাল্যকাল থেকেই শশাঙ্ককে দেখে এসেছে নিতান্ত সহজ প্রীতিতেই। শশাঙ্কও বালিকা ঊর্ম্মিকে দেখে এসেচে স্নেহেরেই দৃষ্টিতে। সম্পর্কটা ছিল রসের, —সুতরাং হাস্যকৌতুক রঙ্গরহস্যের অভাব ঘটেনি কখনও পরস্পরের মধ্যে। নির্দ্দোষ লঘু হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়ে এই ভালবাসার সম্বন্ধটি প্রীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও সেটা ছিল উভয়েরই কাছে নিতান্ত সরল সহজ স্বাভাবিক।

তাই ঊর্ম্মি বড় হয়ে ওঠার পর শশাঙ্ক ও ঊর্ম্মির পরস্পরের স্নেহ ও শ্রদ্ধা হৃদয়াবেগের তাপে গাঢ় হয়ে বন্ধুত্বে পরিণত হলেও তারা সে সম্বন্ধে লক্ষ্য করবার প্রয়োজন অনুভব করেনি। সম্পর্কের অধিকারের সীমা সম্বন্ধে উভয়েই ছিল অচেতন, —তাই কোনওদিন তারা চিন্তা করেনি তাদের এই মধুর মেলামেশা ও আনন্দ রসে দিনযাপনের মধ্যে সংযমের গণ্ডীরেখা টানারও প্রয়োজন আছে! ঊর্ম্মির বালিকা বয়সে উভয়ের মেলামেশাটা যেমন সহজ ও অবাধ ছিল, বড় হয়েও তাই তার ব্যতিক্রম ঘটলো না। শর্ম্মিলার এতে চোখ পড়লেও তার মনে হয়েচে—'ও যে আমাদের ঊর্ম্মি!' শশাঙ্কেরও তাই। কারুরই মনে হয়নি—এ ঊর্ম্মি ঠিক সেই ঊর্ম্মি নয়। সে বালিকা, এ যুবতী। পার্থক্য অনেক। ঊর্ম্মি নিজেই ছিল এ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী অচেতন।

শশাঙ্কর মনের নির্জ্জন লোকে ভিতরে ভিতরে মোহ স্পর্শ করেছিল বহুদিন আগেই। তার সামান্য প্রমাণ মেলে ঊর্ম্মি নীরদের বাগ্‌দত্তা হওয়ায়,—নীরদের প্রতি তার ঈর্ষায়। নীরদ যে ঊর্ম্মির সুযোগ্য পাত্র নয় এটাই তার একমাত্র কারণ বলে সে প্রকাশ কর্‌লেও,—এ' ঈর্ষার আর একটি অদৃশ্য হেতু ছিল, যার রূপ শশাঙ্কর নিজেরই গোচরীভূত হয়নি। তখনও!

যে বালিকা কিশোরীটির অবাধ অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্য এতদিন তাকেই ঘিরে তরঙ্গিত হয়েছে,—আজ সে তরুণী যুবতী। আজও তারা দু'জনেই বর্ত্তমান, অথচ ঊর্ম্মিমালার সেই আনন্দ-ঊর্ম্মি প্রাণোচ্ছ্বাস—সম্পূর্ণ অপর এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হিল্লোলিত হবে,—এটা চিন্তা করতে যে একটা তীক্ষ্ণ সূচীবেধের মত বেদনা বা জ্বালা—এইখানেই শশাঙ্কের মনের নির্জ্জন ক্ষেত্রে আসক্তির অঙ্কুরের অস্তিত্ব স্পর্শ কর্‌তে পারা যায়।

শশাঙ্ক বিবাহিতা পত্নীর কাছে জননীর সদাসতর্ক সস্নেহ সেবায় এবং ঊর্ম্মিমালা ভাবী স্বামীর কাছে গুরুর গুরুগম্ভীর উপদেশে যখন হাঁপিয়ে উঠেচে,—সহজ-প্রাণধারা যখন রুদ্ধ ও শুষ্কপ্রায়, ঘটনাচক্রে ঠিক সেই সময়েই ঘট্‌লো পরস্পরেব সান্নিধ্য লাভ। উভয়েই উভয়কে পেল যেন আপন অন্তঃজীবনের সমভূমিতেই। তাই জন্য কঠিন শীলায় রুদ্ধ প্রবাহ নির্ঝরের হঠাৎ মুক্তির মতোই ওদেব আনন্দলীলা হয়ে উঠলো উচ্ছল ও অবাধ।

রবীন্দ্রনাথ ভূমিকাতেই গল্পের বিষয়বস্তুর মূলতত্ত্ব নির্দ্দেশ করে তারপর শুরু করেচেন গল্প বলা। গল্পারম্ভের ভঙ্গী ভাষা ও ভাব এত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, বারবার

পড়েও তৃপ্তিলাভ হয় না। শর্ম্মিলার পরিচয় প্রসঙ্গে লেখক বলছেন—

'শশাঙ্কের স্ত্রী শর্ম্মিলা মায়ের জাত। বড়ো বড়ো শান্ত চোখ; ধীর গভীর তার চাহনি। জলভরা নব মেঘেব মতো নধর দেহ স্নিগ্ধ শ্যামল। সিঁথিতে সিঁদুরের অরুণ রেখা; সাড়ীর কালো পাড়টি প্রশস্ত; দুই হাতে মকরমুখো মোটা দুই বালা; সেই ভূষণের ভাষা প্রসাধনের ভাষা নয়, শুভসাধনের ভাষা।'

অল্প কয়েকটি মাত্র কথায় নারীর বহিঃরূপ বর্ণনার মধ্যে তার অন্তঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যকে এমন সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করে তোলা,—রবীন্দ্রনাথের মতো অসামান্য শিল্পীর পক্ষেই সম্ভবপর।

ঊর্ম্মিমালারও অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয় আমরা তার বাইরের বর্ণনা থেকেই সুন্দর বুঝে নিতে পারি। তার মধ্যে যে লীলাচঞ্চল প্রাণধারা, অফুরন্ত অবাধ আনন্দধারা বর্ত্তমান, মাতৃভাবের চেয়ে প্রিয়াভাবেই যে তার অন্তরের সহজ বিকাশ, বুঝতে পারা যায় প্রথম বর্ণনাটুকুর মধ্যেই।

'ঊর্ম্মিমালা যতটা দেখতে ভালো, তার চেয়েও তাকে দেখায় ভালো। তার চঞ্চলদেহে মনের উজ্জ্বলতা ঝলমল করে বেড়ায়। সকল বিষয়েই তার ঔৎসুক্য। সায়ান্সে যেমন তাব মন, সাহিত্যে তার চেয়ে বেশী বই কম নয়। ময়দানে ফুটবল দেখতে যেতে তাব অসীম আগ্রহ, সিনেমা দেখাটাকে সে অবজ্ঞা করে না। প্রেসিডেন্সী কলেজে বিদেশ থেকে এসেছে, ফিজিক্সের ব্যাখ্যাকর্ত্তা, সে সভাতেও সে উপস্থিত। রেডিয়োতে কান পাতে, হয়তো বলে, ছ্যাঃ, কিন্তু কৌতূহলও যথেষ্ট। বিয়ে করতে বাজনা বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে বর চলেচে, ও ছুটে আসে বারান্দায়। জুওলজিক্যালে বারে বারে বেড়িয়ে আসে, ভারী আমোদ লাগে,—বিশেষত বাঁদরের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে। বাবা যখন মাছ ধরতে যেতেন, ছিপ নিয়ে ও তাঁর পাশে গিয়ে বসত। টেনিস্ খেলে, ব্যাড্‌মিন্টন খেলায় ওস্তাদ। এ'সব দাদার কাছে শিক্ষা। তন্বী সে সঞ্চারিণী লতার মতো, একটু হাওয়াতেই দুলে ওঠে। সাজসজ্জা সহজ এবং পরিপাটী। জানে, কেমন কবে সাড়ীটাতে এখানে ওখানে অল্প একটুখানি টেনে-টুনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, টিল্ দিয়ে আঁট্ করে অঙ্গশোভা রচনা করতে হয়, অথচ তার রহস্য ভেদ করা যায় না। গান ভালো গাইতে জানে না কিন্তু সেতার বাজায়। সেই সঙ্গীত দেখবার না শোনবার কে জানে! মনে হয় ওর দুরন্ত আঙ্গুলগুলি কোলাহল করচে। কথা কবার বিষয়ের অভাব ঘটে না কখনও, হাস্‌বার জন্য সঙ্গীত করণের অপেক্ষা করতে হয় না। সঙ্গদান করবার অজস্র ক্ষমতা, যেখানে থাকে সেখানকার ফাঁক ও একলা ভরিয়ে রাখে।'

এই ঊর্ম্মিলাকে বিজ্ঞানতপস্বী নীরদ আপনার ভাবিপত্নীরূপে নিজের হাতে গড়া শুরু করে দিয়েছিল। সে গঠন প্রণালী আবার 'বৈজ্ঞানিকভাবে দৃঢ় নিয়ন্ত্রিত নিয়মে, ল্যাবরেটরীর অভ্রান্ত প্রক্রিয়ার মতো।'

তাই, নীরদ যখন ঊর্ম্মিকে বল্‌লে,—'তোমার মধ্যে শক্তি যথেষ্ট আছে! তাদের

বেঁধে তুলতে হবে তোমার জীবনের একটিমাত্র লক্ষের চারিদিকে। তা হলেই তোমার জীবনের অর্থ পাবে। বিক্ষিপ্তকে সংক্ষিপ্ত করতে হবে, একটা অভিপ্রায়ের টানে আঁট্ হয়ে উঠবে, "ডাইনামিক্" হবে, তবেই সেই একত্বকে বলা যেতে পারবে "মরাল্ অর্গানিজ্‌ম"।'

ঊর্ম্মি এ' উপদেশে হাঁপিয়ে না উঠে বরং পুলকিত হয়ে সসম্ভ্রমে সম্মতি দিয়েচে শুধু এই জন্য যে, ওদের চায়ের টেবিলে ও টেনিস্‌কোর্টে যে সকল যুবক আসে, তারা এমন ধরণের গভীরতর কথা কেউই বলে না।

আর সকলের মধ্যে সচরাচর যা' দেখা যায়, নীরদের মধ্যে তার একান্ত অভাব, —এবং তার এই অভাবের বিশিষ্টতাকেই ঊর্ম্মি অত্যন্ত সম্ভ্রম কর্‌তে শিখেছিল। তার প্রতি কথা, প্রতি মতামত, প্রত্যেক ব্যবহারের মধ্যেই আশ্চর্য্য তাৎপর্য্য খুঁজে বার করত সে; যদিও তা' তার নিজের স্বভাবের সাথে এবং প্রাণের সাথে একেবারেই খাপ্ খেতো না।

নীরদের মধ্যে যে নীরস গম্ভীর অভিনবত্ব ছিল, তাকে দূর থেকে সম্ভ্রম করা সহজ এবং সম্ভবপর; কিন্তু,—যৌবনের সুখদুঃখ আশাআকাঙ্ক্ষাপূর্ণ জীবনযাত্রার সুদীর্ঘপথে—তাকে সঙ্গীরূপে গ্রহণ করা একান্ত কঠিন। ঊর্ম্মি তার ভাবপ্রবণ স্বভাবের বশে সেদিকে লক্ষ্য না করে, উন্নত আদর্শের দোহাই দিয়ে নিজের প্রাণ-প্রবাহকে সংযত করবার সাধনা করেচে ক্রমাগত। ভাবী আদর্শ স্বামীর সুযোগ্যা পত্নীরূপে নিজেকে গড়ে তুলবার জন্য আপন স্বভাবের সহজ গতিবেগ কর্‌তে চেয়েচে রুদ্ধ, সকল আনন্দরস থেকে করেচে নিজেকে বঞ্চিত। কিন্তু যা 'হবার নয় তা' হয়নি। প্রাণের প্রকৃতিগত বৈপরীত্য যেখানে বিদ্যমান,—বুদ্ধির সাহায্যে মনকে বশীভূত করে জোর করে মনের মিল সেখানে সম্ভব নয়। নীরদেব বিবাহের সংবাদ পেয়ে তাই ঊর্ম্মি আশাহতা স্তম্ভিতা না হয়ে বরং মুক্তির আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেচে দেখতে পাই।

নীরদের সাগরপার যাত্রার অবকাশে ও শর্ম্মিলার অসুস্থতায় তার সংসারের প্রয়োজনে ঊর্ম্মিমালা যখন শশাঙ্কের গৃহে এসে অস্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিতা হল, তখন আমরা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই এই দু'টি নর-নারীর বঞ্চিত অতৃপ্তচিত্ত তাদের না পাওয়া আনন্দের সন্ধান পেয়ে পুলকে মাতোয়ারা হয়ে উঠেচে। উভয়েই যেন কঠিন বন্দীদশা থেকে আকস্মিক মুক্তিলাভ করে' বিপুল আনন্দাবেগে হয়ে পড়েচে আত্মবিস্মৃত।

শশাঙ্কর মধ্যে পুরুষ মানুষের দৃপ্ত পৌরুষ তার কর্ম্মক্ষেত্রকে অবলম্বন করে জাগ্রত ছিল। শর্ম্মিলার স্নেহার্দ্র সেবার শীতল সৈকতে সুপ্ত হয়ে পড়েনি। যৌবন তার দেহ ও মন উভয়কেই করেছিল দীপ্ত। কিন্তু অন্তরের যৌবন ছিল তার চিরদিন অপরিতৃপ্ত। সঙ্গিনী প্রেয়সী নারীর সাথে পুরুষের যৌবনমনের যে আনন্দলীলা, তা' আর তার ঘটে ওঠেনি কোনওদিন। যে নারী তার প্রিয়ার আসনে অধিষ্ঠিতা হয়েছিল,

—তার প্রকৃতি ছিল মাতৃভাবের অনুগামী। এই মাতৃপ্রকৃতির নারী শশাঙ্কের বাহিরের সকল অভাব পরিপূর্ণ করলেও স্বামীর হৃদয় মনের যৌবন-নিকুঞ্জে লীলা-সঙ্গিনীরূপে তার আনন্দতৃপ্ত তৃপ্তি করতে পারেনি। তারই ফলে দেখতে পাই, শশাঙ্কের সকল শক্তি সকল আশা আকাঙ্ক্ষা সকল প্রতিভা এবং লক্ষ্য একান্তভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েচে বাহিরের কর্ম্মজীবনে। সে জানে শর্ম্মিলার কাছে এই পুরুষ-সুলভ কর্ম্মঠতার মূল্য খুব বেশী। শর্ম্মিলা তার স্বামীর এই কর্ম্মঠতাকে সসম্ভ্রম শ্রদ্ধায় বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে দর্শন করে। তাই, যৌবনের লীলাসঙ্গিনী প্রিয়ার সাথে অবকাশের লঘুতরণীতে আনন্দ-উধাও যাত্রা ঊর্ম্মি আস্‌বার আসে পর্য্যন্ত শশাঙ্কর জীবনে সম্ভবপর হয়নি।

শশাঙ্কর সমস্ত যৌবনশক্তি তার ব্যবসায়ের কর্ম্মে যে একত্রীভূত হয়েচে তার মূলে পুরুষের আত্মাভিমানও যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েচে। চাকরী ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাবে সে শর্ম্মিলাকে বলেচে— 'চাকরী ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে কিছু নয়, তোমার জন্য ভাবি, কষ্ট হবে তোমারি।'

স্ত্রীর অর্থঋণ সে পবিশোধ করেচে সুদসমেত। তার স্বোপার্জ্জিত অর্থে নবনির্ম্মিত প্রাসাদে নিত্য নূতন আরাম ও শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করে স্ত্রীকে নব নব বিষয়ে অভিভূত করতে ত্রুটি করেনি।

শর্ম্মিলা পেয়েচে যৌবনদৃপ্ত সুস্থদেহ স্বামীর কর্ম্মশক্তিজাত ঐশ্বর্য্যের পূজার্ঘ্য, পায়নি স্বামীর মনোজগতের যৌবন চাঞ্চল্যের আনন্দ অঞ্জলি। তাই আমরা দেখি,—

'শর্ম্মিলা প্রাত্যহিক কর্ম্মধারার পারে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে চেয়ে দেখে তার পরপারে শশাঙ্কর কাজ। বহুব্যাপক তার সত্তা, ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যায় সে দূর দেশে, দূর সমুদ্রের পারে, জানা অজানা কত লোককে টেনে নিয়ে আসে আপন শাসনজালে। নিজের অদৃষ্টের সাথে পুরুষের প্রতিদিনের সংগ্রাম, তারই বন্ধুর যাত্রাপথে মেয়েদের কোমল বাহুবন্ধন যদি বাধা ঘটাতে আসে, তবে পুরুষ তাকে নির্ম্মমভাবে ছিন্ন করে যাবে বইকি। এই নির্ম্মমতাকে শর্ম্মিলা ভক্তির সঙ্গেই মেনে নিলে। মাঝে মাঝে থাক্‌তে পারে না, যেখানে অধিকাব নেই হৃদয়ের টানে সেখানেও নিয়ে আসে তার সকরুণ উৎকণ্ঠা,—আঘাত পায়, সে আঘাত প্রাপ্য বলে গণ্য করেই ব্যথিত মনে পথ ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসে।'

শর্ম্মিলা স্বামীর এই নির্ম্মমতাকে প্রাপ্য গণ্য না করে ভক্তি না করে—তার পথ ছেড়ে না দিয়ে যদি অভিযোগ করতো, প্রতিবাদ করতো, অভিমান করতো, তা'হলে হয়তো শর্ম্মিলার চেয়ে বেশী সুখী হ'ত শশাঙ্কই! কারণ তার চিত্তের যৌবনচেতনা, যা' নির্ম্মাণে প্রচ্ছন্ন ছিল, সে অপেক্ষা করছিল তার রুদ্ধ দুয়ারে প্রেয়সী নারীরই করাঘাত। কিন্তু তার ভাগ্যে তা' ঘটেনি।

স্ত্রীর কাছে কর্ম্মঠতার শ্রদ্ধামূল্য তার কর্ম্মের চাকাকে উত্তরোত্তর তীব্রতর বেগে এমনই ঘূর্ণায়মান করে তুলেছিল যে,—সে সময়ে তার পঞ্জিকায় রবিবারটা হয়ে

উঠেছিল সোমবারেরই যমজভাই। কোনও ছুটীই আর ছুটীর ছিদ্র পাচ্ছিল না আদৌ।

পরবর্ত্তীকালে যখন দেখতে পাই উর্ম্মিলার সঙ্গ-পিপাসায় সেই শশাঙ্কেরই রবিবারের অবকাশ পালনে বিশুদ্ধ খৃষ্টানের মতোই অস্খলিত নিষ্ঠা,—তখন বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না বটে, কিন্তু গভীরভাবে ভেবে দেখলে বুঝতে পারি, এটা স্বাভাবিক।

রোগশয্যায় বন্দিনী শর্ম্মিলার সুসজ্জিত সুন্দর শৃঙ্খলাপূর্ণ সংসারটির পরিচালনার ভার যখন উর্ম্মিমালা গ্রহণ করলো তখন পদে-পদে ঘট্‌তে লাগলো স্খলন, ত্রুটি ও ভুল।

শর্ম্মিলার আমলে এই সকল ত্রুটি ও বিশৃঙ্খলা ঘটলে শশাঙ্ক হয়তো বিরক্তিই অনুভব করতো,—রাগ করতে ত্রুটি করতো না; কিন্তু এখন সে রাগ তো করেই না, উপরন্তু উল্লসিতচিত্তে সেই ত্রুটিগুলি করে উপভোগ।

শর্ম্মিলার সংসার পরিচালনার মধ্যে শশাঙ্ক সুশৃঙ্খল ত্রুটিলেশহীন সস্নেহ সেবার আরাম পেয়েছে,—উর্ম্মির অনিপুণ হাতের সংসার পরিচালনার মধ্যে সে পেলো রস। তাই দেখতে পাই, সংসারের নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটার জন্য, শশাঙ্কর স্নানাহারের অনিয়ম বা তার সেবার ত্রুটির জন্য শর্ম্মিলা যখন উর্ম্মিকে ভর্ৎসনা করতে উদ্যতা হয়, শশাঙ্ক দেয় তাতে বাধা।

শশাঙ্ক মনে করে—কেন? এ তো বেশ! ঐ মন্দ কিসের? এই যে অনিয়ম, এই যে ত্রুটি, এর মধ্যে অসুবিধা হয়তো আছে, কিন্তু আনন্দের তো কম্‌তি নেই।

শর্ম্মিলার ত্রুটিলেশহীন সংসার নির্ব্বাহে শশাঙ্ক যে-রস পায়নি, সেই রস পেলো উর্ম্মির ত্রুটিপূর্ণ সংসার নির্ব্বাহে। সে তারই আস্বাদে উঠলো মেতে। তাই, পূর্ব্বেকার সমস্ত নিয়ম ভাঙাটাই হয়ে উঠলো যেন তার বিশেষ ব্রত। শর্ম্মিলার আমলে শশাঙ্কের ঠিক বিপরীতমুখী স্রোতে বহে চল্‌লো উর্ম্মির আমলের শশাঙ্ক।

আগে কর্ম্মের সাধনায় সে যেমন সংসারের সকল দিক ভুলে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, তেমনি এখন উর্ম্মির সাহচর্য্যের আনন্দ সম্ভোগে ও ঐকান্তিক একাগ্রতায় সবকিছু ভুলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েচে দেখ্‌তে পাই।

উর্ম্মি বুঝেছিল শশাঙ্কর জীবনে কাজই হচ্চে সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। কাজের দাবীর কাছে সংসারের অন্য কোনও কিছুরই দাবী—এমন-কি হৃদয়ের দাবীকেও প্রাধান্য দিতে সে নারাজ।

শশাঙ্কের সেই গর্ব্বিত কাজের দাবীকে উর্ম্মিমালার নিজের আনন্দ-লীলার দাবীর কাছে হার মানানোটাই হয়ে উঠেছিল যেন তার পণ। তারই সাধনায় সে উঠেছিল মেতে।

তাই শর্ম্মিলার মুখে যখন শশাঙ্কর ব্যবসায়ে ক্ষতির পরিমাণ উর্ম্মি শুন্‌লে, তখন স্পষ্টই বুঝতে পারলে, তার নির্জ্জান চেতনার মধ্যে শশাঙ্কর কাজটাই যেন

ছিল তার প্রতিযোগী। তারই সঙ্গে ওর আড়াআড়ি, নিজের অন্তরের রূপ দেখে তাই সে লজ্জায়-দুঃখে ও অনুশোচনায় অভিভূত হয়ে পড়েচে।

ঊর্ম্মি ও শশাঙ্ক পরস্পর পরস্পরের প্রেমের জন্য যে সাধনা করেচে,—তা আত্ম-অজ্ঞাতসারে। তাই তাদেব মধ্যে প্রেম যখন হয়ে উঠেচে জাগ্রত সুস্পষ্ট, তখন তারা উভয়েই হয়েচে ব্যথিত।

গল্পটির আদ্যোপান্ত পাঠ করলে নারী-প্রকৃতির দু'টি বিভিন্ন রূপ মানসচক্ষে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়ে উঠে।

দুঃখ হয় বন্ধ্যা শর্ম্মিলার সন্তানাভাবেব জন্য এবং আনন্দচঞ্চলা নবযৌবনা ঊর্ম্মিলার দুর্ভাগ্যের জন্য। প্রথম থেকেই তারা খুঁজে পায়নি তাদের স্ব-স্ব-নারীজীবনের সৌভাগ্যপূর্ণ সরল ও সহজ পথ।

জয়শ্রী, আশ্বিন ১৩৪০

শরৎ-সাহিত্যের মেরুদণ্ড

পূজনীয় শরৎচন্দ্রের জন্মদিন ৩১শে ভাদ্র তারিখটি ষড়ঋতুর বাৎসরিক চক্রে এবার আটান্ন সংখ্যা পরিক্রমণ করলো। এই উপলক্ষ্যে তাঁর দীর্ঘজীবন ও শুভকামনা করে —তাঁর প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা প্রীতি নিবেদন করবার জন্য যাঁরা এই সভানুষ্ঠান করেচেন তাঁদের পক্ষ থেকে আমার কাছে অনুরোধ পৌঁছুলো, শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু লিখতে হবে।

শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করা দরকার, ঐ চিন্তা বহুদিন আগে থেকেই আমার মনে জাগ্রত রয়েছে।

যদিও বাংলাদেশের বহু সুধী সমালোচকেরা শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছেন ও করছেন; আজও এর স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ সমালোচনার অন্ত নেই,—তবুও কেন এ'সম্বন্ধে আমাদের অর্থাৎ মেয়েদের লেখা উচিত বলে মনে হয়, তা' বলি।

এ'কথা বোধহয় নিঃসংশয়ে বলা চলে যে শরৎ-সাহিত্যের মেরুদণ্ড হচ্ছে 'নারীচরিত্র'।

নারীচরিত্রগুলিকে বাদ্ দিয়ে যদি শরৎ-সাহিত্যের আলোচনা করতে যাওয়া হয়, তা'হলে দেখা যাবে, আমরা মরুভূমিতে এসে পড়েচি। ইন্দ্রনাথ, জীবানন্দ, সব্যসাচী প্রভৃতি দু'চারটি মহীরুহ ছাড়া আর যা আমরা পাবো তা সুন্দর হলেও সাধারণ।

নারীচরিত্র বাদ দিলে এদের সকলকারই মূল যাবে শুকিয়ে, রং হবে বিবর্ণ। তাতে না থাক্‌বে রস, না পাওয়া যাবে জীবনের বিচিত্র বিকাশ। শরৎচন্দ্রের রচনার প্রাণই হচ্চে নারী। নারীচরিত্রের বিশিষ্টতা ও অসাধারণত্বের জন্যই শরৎ-সাহিত্য অসাধারণ হয়ে উঠতে পেরেছে বলে মনে হয়।

যে নিবিড় দরদ ও অসাধারণ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে এই রসশিল্পী নারীজাতির অন্তরের মূল পরিচয় দিয়েচেন তাঁর সাহিত্যে,—তা প্রকৃতই বিস্ময়কর। কোনোখানেই তাকে মিথ্যা বলে, কল্পিত বলে মনে হয় না, বরং মনে হয় ঐটিই নারীর আসল সত্যস্বরূপ, যা হয়তো ঢাকা পড়ে আছে জীবনের অবস্থা ও ঘটনার নানাবিধ আবরণ জালে।

সেইজন্যই বহুবার মনে হয়েচে আমার,—শরৎ-সাহিত্য মহিলাদের দ্বারা সমালোচিত হওয়ার বোধহয় বিশেষ একটি মূল্য আছে।

তিনি তাঁর সাহিত্যে এঁকেছেন যে-নারীদের, তারা এই বাংলাদেশেরই মেয়ে। গাঁয়ের মেয়ে, শহরের মেয়ে, প্রবাসিনী বাঙ্গালী মেয়ে, শিক্ষিতা, অর্দ্ধশিক্ষিতা, অশিক্ষিতা। তারা আমাদেরই মা বোন স্ত্রী কন্যা ভ্রাতৃবধূ পুত্রবধূ, খুড়ি, জ্যাঠাই, বৌদিদি, দিদি, প্রতিবেশিনী, দূরসম্পর্কীয়া, নিঃসম্পর্কীয়া। তারা কেবলমাত্র ভদ্রগৃহস্থের ও সম্ভ্রান্ত ধনীপরিবারের মেয়েই নয়। পতিতা ও দাসী প্রভৃতি নিম্নস্তরের নারীদেরও অন্তরের আনন্দ বেদনা এবং হৃদয়ের রংয়ে শরৎ-সাহিত্য অনুরঞ্জিত।

নারীর মনের গহন গোপন অন্তঃপুরের সকল মহলের যথার্থ খবর শরৎচন্দ্র তাঁর গভীর অন্তঃদৃষ্টির বলে ও অসামান্য লিপিকুশলতার গুণে এমন নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন যে, সে ছবি দেখে নারীর নিজেরই আজ বিস্ময়ের অবধি নেই।

নারীমনের স্বপ্ন ও কল্পনা, নারী অন্তরের আলোছায়ার বিচিত্র বর্ণলীলা, মনোজগতের জটিলতত্ত্ব, চরিত্রের বিভিন্ন বিকাশ, তার নানা পৃথকরূপ, তার দুর্ব্বার আকর্ষণ ও প্রভাবকে কেন্দ্র করে শরৎ-সাহিত্যের আশপাশের পুরুষ চরিত্রগুলি গড়ে উঠেচে। ষোড়শীকে বাদ্ দিয়ে জীবানন্দের মনুষ্যত্ব ফুট্‌বার অবকাশ মেলে না। তার পশুত্বটাই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। অন্নদাদিদিকে হারাবার সঙ্গে সঙ্গেই অসাধারণ বালক ইন্দ্রনাথও অদৃশ্য হয়েছে।

নারীচিত্তবৃত্তির যে বিশেষতর ভাবধারা, নারীর স্বকীয় প্রকৃতিজাত যে হৃদয়াবেগের স্ফুরণ তারই বর্ণজাল তারই চেতনারস শরৎ-সাহিত্যকে সুন্দর ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

শরৎচন্দ্র যে নারীদের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তাদের ঠিক সাধারণ নারী বলা চলে না। তারা বাইরের দিক্ থেকে যেমন অতিবাস্তব, একান্তই এই বাংলাদেশের মাটির মেয়ে, অন্তরের উৎকর্ষের দিক্ দিয়ে আবার তারা তেমনই উন্নত ও অপ্রত্যাশিত প্রকৃতির। আমাদের বাস্তব সংসারে ঠিক সে প্রকৃতির মেয়ে হয়তো সদাসর্ব্বদা চ'খে পড়ে না। কিরণময়ী, সাবিত্রী, পার্ব্বতী, চন্দ্রমুখী, অভয়া,

রাজলক্ষ্মী, সুনন্দা, কমললতা প্রভৃতিকে যেখানে সেখানে দেখ্‌তে পাওয়া সম্ভব নয়। ওরা সাধারণ মেয়ে বটে—কিন্তু ওদের প্রকৃতি অসাধারণ। সুতরাং এ কথা মানতে হবে যে শরৎচন্দ্র যে সকল নারীচরিত্র এঁকেছেন, তাদের মধ্যে দীপ্ত হয়ে উঠেছে নারীর মানস প্রকৃতির রূপ,—তার বাইরের আবরণ নয়। তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন যা তাদের একান্তই অন্তরের বস্তু। তাই তারা এমন করে আজ আমাদের অন্তর স্পর্শ করতে পেরেচে।

বাস্তব সংসারে পার্ব্বতীর মত দুর্জ্জয় সাহস হয়তো সকল মেয়ের না থাকতে পারে, কিন্তু অমনিতর গভীরভাবে ভালবাসার উপলব্ধি মেয়েরাই করতে পারে এবং করেও থাকে যেখানে সে যথার্থ ভালবাসে।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য আজ বাংলার নারীজাতিকে আত্ম-শ্রদ্ধা ও আত্মপ্রত্যয় দান করেছে। তাই তিনি আমাদের শুধু আত্মীয় নন—বন্ধুও।

সমাজে নারীর দৈহিক স্খলন ঘটলে সে যে আর কখনও কোনওদিনই মনুষ্যত্বের উন্নত মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে না, এইটাই এক সময়ে আমাদেব সাহিত্যে একান্ত সত্যবস্তু ছিল। কিন্তু শরৎসাহিত্য এসে একে শুধু অস্বীকার করেনি,—এ যে কত বড় ভ্রান্ত ধারণা তা' নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ করে দিয়েচে।

প্রথম যৌবনে জীবনের আকস্মিক ঘটনাবর্ত্তের মধ্যে বা প্রলোভনের প্রভাবে দৈহিক অশুচিতা ঘটেছিল বলেই পুরুষের সমগ্র জীবন যেমন ব্যর্থ ভস্মস্তূপে পরিণত বা দূরপনেয় কলঙ্কে পঙ্কিল হয়ে যায় না, তারুণ্যের সে অপরাধ তার সমস্ত মনুষ্যত্বকে যেমন চিরদিনের জন্য পঙ্গু ও নিষ্ফল করে দেয় না, নারীর পক্ষেও যে ঐ সত্য সমান অবিসম্বাদি,—শরৎ-সাহিত্যেই তার প্রথম সন্ধান ও প্রমাণ পেয়েচি আমরা। নারীও যে তার চরিত্রের উন্নততর বিকাশে ও ঔজ্জ্বল্যে অতীতের ত্রুটী বিচ্যুতিকে মুছে ফেলে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ আসনে বস্‌বার অধিকার অর্জ্জন করতে পারে, বাংলা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম এ সত্য ঘোষণা করতে সাহস করেচেন। তিনি দেখিয়েচেন, যে নারী তার দৈহিক বিচ্যুতিকে নিজেই সহজে ক্ষমা করতে পারে না এবং সেজন্য কঠোর সংযম দুঃখ ও সবচেয়ে বড় ত্যাগ স্বীকার করে তার মূল্য দিতেও তারা কৃপণতা করে না।

বিরাজ-বৌয়ের বেদনা আমাদের ব্যথিত করে। অচলার অচলস্পর্শী দুঃখ, আজন্ম স্নেহ-প্রেম-বঞ্চিতা কিরণময়ীর সকরুণ পরিণাম আমাদের ভীতিগ্রস্ত করলেও, কাতরও করে তোলে। সাবিত্রীর মত ঝি বাস্তব সংসারে হয়তো একান্ত দুর্লভ কিন্তু তার অন্তরের বাণী—প্রিয়ের প্রতি সত্য প্রেমনিষ্ঠ, নারী-অন্তরেরই বাণী। সাবিত্রীর মধ্য দিয়ে নারী-অন্তরের সত্য ও গভীর ভালবাসার রূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেচে।

মনোরমার মত মেয়ে শিবনাথকে ভালবাসতে পারে কিনা, তরুণী নীলিমার পক্ষে বৃদ্ধ আশুবাবুর প্রতি অনুরক্তা হওয়া সম্ভবপর কিনা, রাজলক্ষ্মীর অন্তরের ছবি আমাদের অপরিচিত, এ আলোচনা না করে আজ শুধু এই কথাই বলে আমার

বক্তব্য শেষ করতে চাই যে, শরৎ-সাহিত্যে নারী-চরিত্র বহু ও বিচিত্র হলেও, তাদের সকলের মধ্যেই আমরা একটি তেজস্বিনী আত্মপ্রত্যয়শীলা দৃঢ়চিত্তা সুচরিতা নারীকেই বিশেষভাবে দেখতে পাই। ইনিই শরৎচন্দ্রের মানসী। তাঁর সাহিত্যের আদর্শা নারী। পণ্ডিতমশায়ে কুসুম, বিরাজবৌয়ে বিরাজ, বিন্দুর ছেলের বিন্দু, নিষ্কৃতির শৈলজা, পরিণীতার ললিতা, পথনির্দ্দেশের হেমনলিনী, দেবদাসের পার্ব্বতী, দেনাপাওনার ষোড়শী, চরিত্রহীনের সাবিত্রী, শ্রীকান্তর রাজলক্ষ্মী, অভয়া, সুনন্দা, কমললতা ইত্যাদি এই যে বিশেষ ধরণের অসামান্য আত্মপ্রত্যয়-সম্পন্না নারী,—শরৎসাহিত্যের এরাই প্রাণ ও মেরুদণ্ড।*

জয়শ্রী, ফাল্গুন ১৩৪০

বাঙলা সাহিত্যে নারী : এক শতাব্দীর ইতিহাস

শিক্ষা মানুষকে গড়ে, মানুষে গড়ে সাহিত্য; কারণ, সাহিত্যই জাতিগঠনের সহায়ক —যদিও, জাতিগঠনের উদ্দেশ্যে সাহিত্যের উদ্ভব নয়। সাহিত্য মানুষের এক বৃহত্তর সৃষ্টি। মানুষের চিন্তা, কল্পনা ও অভিজ্ঞতার বিচিত্র প্রকাশ।

সাহিত্যে রূপায়িত হয়ে ওঠে মানুষের রসবোধ, সৌন্দর্যজ্ঞান, শিল্পানুরাগ ও আনন্দ-বেদনার বিচিত্র অনুভূতি। মানব-মনরাজ্যেব সকল ঐশ্বর্যই পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে তার সাহিত্য-ভাণ্ডারে।

সৃজনের যে নিবিড় আনন্দ, মানুষকে সার্থকতার চরম তৃপ্তিতে পূর্ণ করে তোলে, মানুষের অন্তরলোকের সেই স্বতোৎসারিত প্রেরণা তার সাহিত্যসৃষ্টিরও মূলে। জৈবধর্মের অন্তর্গত সহজাত সৃষ্টিপ্রবৃত্তিকে মানুষ, বিবিধ ও বিচিত্রতর সৃষ্টির আনন্দের মধ্যে সার্থক ও সুন্দর করে তুলতে পেরেছে বলেই আজ জৈবজগতে তার আসন সর্বোচ্চে।

সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত, সীবন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির উৎকর্ষ, মানুষকে ক্রমেই তার অন্ধপ্রকৃতি-নির্দিষ্ট সহজ জৈবধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডী ছিন্ন করে, এমন এক উন্নত উদার বৃহত্তর লোকে টেনে নিয়ে চলেছে, যেখানে সারা বিশ্বের সঙ্গে চলে তার আনন্দ-বেদনার বিনিময়, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চলে তার ভাব ও রসের আদানপ্রদান।

বিধাতার বিশ্বসৃষ্টি যেমন সুন্দর বিচিত্র ও স্বতঃসার্থক, মানুষের এই সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টিও তেমনই বিচিত্র সুন্দর ও স্বতঃসার্থক। প্রকৃতির সৌন্দর্যলোকে সবকিছুই যেমন চিরপুরাতন হয়েও চিরকালই চিরনূতন হয়ে দেখা দেয়, সাহিত্যলোকেও তেমনি সবকিছু চিরপুরাতনও নব নব শিল্পীর প্রতিভার আলোকে চিরনূতন হয়ে দেখা দেয়।

স্বদেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, স্বাধীনতা, নীতি, ধর্ম, প্রেম, মনুষ্যত্ব সকল দিক দিয়েই মানুষকে উপযুক্ত ও উন্নত করে তোলে তার জাতীয়-সাহিত্য। প্রগতি ও মুক্তির পথে মানুষকে চিবদিন ঠেলে নিয়ে গেছে, তার সক্রিয় সজীব প্রাণবন্ত সাহিত্য। রুশেব নবযুগেব সাহিত্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যে তাঁদের দেশ ও জাতিগঠনে কতদূর সহায়তা কবেছে, ইতিহাসে তার প্রমাণ পাওযা যায়। এ দেশেও আজ নারীকে তার বিবিধ বন্ধনদশা থেকে মুক্তি দিয়েছে আমাদের আধুনিক শতবর্ষেব সাহিত্য, তাদের স্বাধীন সত্তার অনুভূতি ও স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগ্রত কবেছে আমাদেব গতিশীল সাহিত্য। সাহিত্য-প্রীতি এদেশের নারীর মজ্জাগত প্রকৃতি।

একশো বছর আগে বাঙালীব মেয়েরা অধিকাংশই লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পেতেন না। কিন্তু নিবক্ষরা হলেও, সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রঘরের মেয়েরা রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী এবং বিবিধ ছড়া শ্লোক রূপকথা ইত্যাদি প্রায় সকলেই জানতেন, কাবণ, গ্রামে ও শহবে, সেকালে কথকতার আসরে নিয়মিত উৎসাহী ও মনোযোগী শ্রোতাব আসন মহিলা শ্রোত্রীরাই বেশিরভাগ দখল করে থাকতেন। এই সকল নিবক্ষবা পল্লীবাসিনীদেব মুখে মুখে যে-সব ব্রতকথা, উপকথা, রূপকথা, সুমিষ্ট ছড়া, গল্প, সরস শ্লোক ও সংগীত রচিত হয়েছিল, তদানীন্তনকালের সাহিত্য হিসাবে,—এবং বর্তমানেও সাহিত্যরসের বিচারক্ষেত্রে, তাব মূল্য নিতান্ত তুচ্ছ নয়। তাঁদের সেই 'মৌলিক সাহিত্য' একদিন আমাদের দেশের জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, প্রতি পরিবাবে অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে—বিশেষ করে বালক-বালিকাদেব মধ্যে হৃদযগ্রাহী সাহিত্যবসের আনন্দ পরিবেষণ করত, সে-সম্পদ আজও সাহিত্যের একটি বিভাগকে ঐশ্বর্যশালী কবে রেখেছে। তার সহজ সরল সুন্দর রূপ, মধুর প্রগাঢ় রস, সাবলীল অনাডম্বর গতিভঙ্গি এবং পরিপূর্ণ প্রাণ-বেগ, সাহিত্যরসিকমাত্রেরই মর্মস্থল স্পর্শ করে।

ছেলেভুলানো ছড়া ও ঘুমপাড়ানি গানে তাঁরা এমন একটি মধুর ভাব ও সুমিষ্ট সুবের মাঝে কথা গাঁথতেন যে সে কথাগুলি খুব সাধারণ সহজ, এমনকী কোনো-কোনোটি অর্থহীন হলেও, রসের পূর্ণতার দিক দিয়ে তার কোনোখানেই দৈন্য প্রকাশ পায় না ;—এইটিই তাদের বিশেষত্ব।

আশ্বিনে তাঁদের আগমনী আনন্দ-সংগীত, বিজয়ার বেদনা-করুণ বিদায় গান, *অগ্রহায়ণে নবান্নের ছড়া, পৌষে পৌষপার্বণ বা পোষেড়ার গীত, ফাল্গুনে দোলের* গান, চৈত্রের গাজন সংগীত ও সঙের ছড়া ; ষড়ঋতু ও বারোমাসের তেরো পার্বণকে একটি অপূর্ব রূপ দিয়ে রেখেছে। মেয়েদের রচিত লক্ষ্মীর ব্রতকথা ও ছড়াগুলি এবং মা ষষ্ঠীর ছড়া ও কাহিনীগুলিও কত বিচিত্র ও করুণ তা অনেকেই জানেন।

এই সকল ছড়া শ্লোক গল্প গীতরচনায এবং ভাষণে পাবদর্শিনী মহিলাদেব *প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব ভঙ্গি ছিল, গল্প ও ছড়াগুলির কথনের বিশিষ্ট কারুকুশলতায়* বাঙলাব বিভিন্ন জেলায় এর রূপ বিভিন্নতর হয়ে ফুটে উঠেছে।

প্রাচীনা নিরক্ষরা মহিলাদের কল্পনাশক্তি যে কতদূর সুবিস্তৃত স্বপ্নময় ও সুলীলায়িত ছিল, তার প্রমাণ বহু। সাত-সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা—তেপান্তরের মাঠে পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে রাজপুত্তুর—ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, ভোমরা-ভুমরী, সোনার কাঠি-রুপোর কাঠি দৈত্যপুরী ও সাগরবালার রূপকথার সোনার কৌটায় আজও ঝলমল করছে।

মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করতে শুরু করেছে মাত্র অর্ধ শতাব্দীকাল। খৃষ্টান মিশনারিদের চেষ্টাতেই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার পত্তন অর্থাৎ নিরক্ষতার অন্ধকার দূর হতে আরম্ভ হয়। নারীর সংখ্যানুপাতে শিক্ষিতা মহিলা এ-দেশে এখনো মুষ্টিমেয়। যেখানে শিক্ষার অবস্থা এই, সেখানে সাহিত্যের প্রগতি যে কতটা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং শতাব্দী-পূর্বের বাংলা সাহিত্যে মহিলা লেখিকাদের উল্লেখযোগ্য লিখিত রচনার সন্ধান করতে গিয়ে আমাকে যে প্রায় নিরাশ হতে হয়েছে এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। রাজা রামমোহন রায়ের যুগ থেকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তিরোভাবকাল পর্যন্ত, এদেশে মেয়েদের জ্ঞানের উন্নতি ও বিদ্যাশিক্ষার কেবল চেষ্টামাত্র চলেছিল বলা যেতে পারে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য নারীর দান প্রথম চোখে পড়ে সিপাহী বিদ্রোহের পর—অর্থাৎ আশি বৎসর পূর্বে—যদিও সে সময় শিক্ষার অভাব এবং সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতা, সাহিত্য সাধনায় মেয়েদের প্রবল প্রতিবন্ধক-স্বরূপ ছিল, তথাপি সাহিত্য মন্দিরে পূজারিণীর অভাব ঘটেনি। তাঁদের ক্ষীণ শক্তির সেই প্রথম উদ্যমগুলি আজ আমাদের চোখে একান্ত নিষ্প্রভ মনে হলেও, সেদিনের হিসাবে তাঁদের সে দান, কোনোরূপই অবহেলার সামগ্রী নয়। বিবিধ বাধা-বিঘ্ন এবং বিদ্যাশিক্ষা অনুশীলনেব একান্ত সুযোগাভাব সত্ত্বেও, স্বল্পশিক্ষিতা লজ্জা-সংকুচিতা ও ভীতি-দুর্বলা অন্তঃপুরিকাদের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের সেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এবং প্রযত্ন যথার্থই বিস্ময়ের বিষয়।

গার্হস্থ্য ধর্ম, গার্হস্থ্য কর্ম ও গার্হস্থ্য চিন্তার সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে বাঙালী মেয়েরা এত শীঘ্র ও এত সহজে অন্তঃপুরের বাহিরের আর কোনো কাজে এমন স্বতঃ-প্রেরণার উৎসাহে অপ্রবর্তিনী হননি, যেমন অগ্রসর হয়েছেন তাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে।

গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, নাটকে, সংগীতে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, ভূগোলে, জ্যোতিষে, গণিতে, জীবনকথায়, ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, অনুবাদ সাহিত্যে, শিশুপাঠ্য ও স্কুলপাঠ্য-পুস্তক রচনায়, আধ্যাত্মিকতত্ত্বমূলক ধর্মগ্রন্থে এবং ছড়াপাঁচালী প্রভৃতি প্রণয়নে শতাব্দীকালের সাহিত্যক্ষেত্রে বহু বঙ্গমহিলাই অবতীর্ণা হয়েছেন। কেবলমাত্র গ্রন্থ প্রণয়নেই নয়, সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা পরিচালনাতেও সেই নামমাত্র নারীশিক্ষা বা স্বল্পশিক্ষার যুগ থেকেই বঙ্গমহিলারা যোগ্যতা ও কৃতিত্ব দেখাতে সমর্থা হয়েছেন।

মেয়েদের শক্তির প্রতি পুরুষের অবজ্ঞা এবং সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতা-চরণের ফলে অধিকাংশ মহিলাই, বঙ্গীয় ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত, নিজ নিজ নাম গোপন রেখে সাময়িকপত্রে নানা রচনা এবং গ্রন্থ প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুতরাং, তখনকার অনেক শক্তিশালিনী লেখিকার সন্ধান পরিচয় পাবাব আজ আর কোনো উপায় নেই। বঙ্গসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালিনী লেখিকা স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম গ্রন্থ *দীপ-নির্বাণ* গোড়ায় অস্বাক্ষরিত হয়েই প্রকাশ হয়েছিল। আধুনিক কালের সর্বজন-পরিচিতা মহিলা কবি বিখ্যাত কামিনী রায়ের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ *আলো ও ছায়া*, গ্রন্থকর্ত্রী উচ্চশিক্ষিতা গ্র্যাজুয়েট হওয়া সত্ত্বেও, অস্বাক্ষরিতরূপেই প্রকাশিত হয়েছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও মানকুমারী সম্বন্ধেও ঐ একই ব্যাপার ঘটেছে।

শিক্ষার প্রসার ও সাহিত্যানুশীলনের বিস্তার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে অবরোধ প্রথার অন্যায়বিধিও ক্রমেই শিথিল হয়ে এসেছিল এবং তার ফলে সাহিত্যক্ষেত্রেও মহিলাদের সংকোচ ও ভয় অনেকটা অপসারিত হয়েছিল। মহিলা সাহিত্যিকগণের সাহিত্য-জগতে নাম গোপনের প্রয়াস আজকের দিনে যে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হয়ে উঠেছে—এ-কথা বলাই বাহুল্য।

গত ত্রয়োদশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যে নারী লেখিকাদের রচনা-পাঠে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, তদানীন্তন সামাজিক অনুশাসন ও পারিবারিক বিধি-নিষেধের কঠোর বন্ধন তাঁদের মনের উপর কঠিন প্রভাব বিস্তার করেছিল। তখনকার মহিলা কবি ও লেখিকাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার একান্ত অভাব দেখা যায়। সে অভাব আজও সম্পূর্ণ দূর হয়নি। নির্মুক্ত মনের সহজ সত্য-প্রেরণা ও স্বাধীন-চিন্তা এবং উচ্চ কল্পনাকে স্বকীয় ভঙ্গিতে বিশিষ্টরূপ দান করবার মতো শক্তি ও সাহস নিয়ে কোনো প্রতিভাশালিনী লেখিকা এখনো বঙ্গসাহিত্যে উদয় হননি। জীবনের নানা বিচিত্র অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা হয়ত প্রকাশের ব্যাকুলতা নিয়ে অন্তরের দ্বারে বারে বারে আঘাত করেছে,—কিন্তু সেকালের মেয়েদের লেখনীকে, নিন্দা ও শাসনের উদ্যত তর্জনী-সংকেত, গুরুজনের মনোমতো হবার সাধনাতেই নিয়ন্ত্রিত রেখেছিল। আজকের দিনেও কোনো মহিলার লেখনী নিরপেক্ষতা, অনাবিষ্টতা বা নির্মুক্ততার গৌরব দাবি করতে পারে না, তার কারণও ঐ নিন্দা-অখ্যাতির ভীতি এবং সুনাম ও সুযশের মোহ, তবে, আশা করা যায়, সেদিন হয়ত আসন্ন, যখন মেয়েরা তাঁদের নিজেদের জীবনের সমস্ত দুঃখসুখময় বিচিত্র অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার রঙ-তুলি নিয়ে নিজেদের অনবগুণ্ঠিত চিত্র আঁকতে পারবেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যে নারীর রচনা তাই শৃঙ্খলভারে একান্ত আড়ষ্ট। স্বচ্ছন্দ সজীবতা না থাকায়, প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেনি। বিচিত্র কল্পনা ও নিগূঢ় ভাবসম্পদে সে রচনা ঐশ্বর্যশালী নয়। অন্ধ আদর্শের অজস্র স্তুতিবাদ ছাড়া সে-যুগের মহিলাদের রচনার মধ্যে আর কোনো বস্তু বা রসের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না, বরং এঁদের

পূর্বতন কালের প্রাচীন মহিলা কবি চন্দ্রাবতী, আনন্দময়ী প্রভৃতির রচনায় রসের নিদর্শন পাওয়া যায়। বন্দী অবস্থার দুশ্ছেদ্য অধীনতা-পাশে এ-যুগের মেয়েদের স্বাধীনচিন্তার সহজ শক্তি একেবারে নষ্ট হয়েছিল মনে হয়। রামী, রসময়ী দাসী, মাধবী দাসী, আনন্দময়ী দেবী, গঙ্গামণি দেবী, তারিণী ব্রাহ্মণী, সুন্দরী দেবী, প্রভৃতিব পবিচয় আমি এই প্রবন্ধে দেবো না, কারণ তাঁরা আলোচ্য শতাব্দীকালের বাংলা সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নন—দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যের লেখিকা।

পূর্বেই বলেছি, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য নারীর রচনার সবিশেষ সন্ধান পাইনি। এখনো ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম সমাজের জনকতক শিক্ষিতা মহিলা পুরোবর্তিনী হয়ে সর্বপ্রথমে বাংলা সাহিত্যের ললাটে ছুঁইয়ে দিলেন নারীর কল্যাণ কর-স্পর্শ। মহিলা লেখিকাদের মধ্যে এ-যুগে প্রথমে নাম করা যেতে পারে শ্রীমতী রাসসুন্দরীর। ১২৫৭ সালে ইনি আত্মজীবনী লিখেছিলেন। এঁব জীবনচরিত গ্রন্থ *আমার জীবন* প্রাক-আধুনিককালের মহিলাদের সরল গদ্য রচনার সুন্দর নিদর্শন। স্বর্গীয়া রাসসুন্দরীর ভাষার অনাড়ম্বরতা ও সরল স্বচ্ছন্দতা তৎকালীন যুগের স্ত্রী-শিক্ষার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত। তারপর *সন্ধ্যা* নামক যে গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, তা মিসেস বেলোনস বচিত ১৮৫১ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ ১২৫৮ সালে প্রকাশিত। ইনি বাঙালী খৃষ্টান মহিলা কিংবা বিদেশিনী এখনো সঠিক সন্ধান পাইনি।

বঙ্গাব্দ ১২৬১ থেকে ১২৭০ সালের মধ্যেও উল্লেখযোগ্যা মহিলা লেখিকার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দেবীকে এ-যুগের প্রধানা লেখিকারূপে পাওয়া যায়। ১২৭০ সালে কৈলাসবাসিনীব 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' এবং 'হিন্দু মহিলাগণের বিদ্যাশিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় মুদ্রিত হয়।

বঙ্গাব্দ ১২৭১ সাল থেকে ১২৮০ সাল, এই দশ বৎসরের মধ্যে বাংলা সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় অনেকগুলি মহিলা সাহিত্যিকের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে কিন্তু অধিকাংশ লেখিকাই নাম গোপন রেখে লিখেছেন। যাঁদের নাম পাওয়া গেছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যা ছিলেন—রমাসুন্দরী ঘোষ, তাহেরেন্নেছা বিবি, ক্ষীরোদা দাসী, শৈলজাকুমারী দেব্যা, মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায়, মার্থা সৌদামিনী সিংহ, বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, কামিনী দত্ত, কুমারী রাধারানী লাহিড়ী, চারুবালা দেবী, ভুবনমোহিনী দেবী, কুন্দমালা দেবী, সৌদামিনী খাস্তগির, নীরদা দেবী ও বসন্তকুমারী দাসী। ১২৭২ সালে মার্থা সৌদামিনী সিংহের *নারী চরিত* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়া আরো কয়েকজন লেখিকাবও কবিতা এবং প্রবন্ধ-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। বসন্তকুমারী দাসীর কাব্যগ্রন্থ *বোগাতুরা* এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিকপত্রের যথেষ্ট প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। ১২৭১ থেকে ১২৮০ সালের মধ্যে যে পত্রিকায় মহিলাদের লেখা দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে— *বামাবোধিনী*-র নাম করা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের *বঙ্গদর্শন*-ও এই সময়ের শেষভাগে অর্থাৎ ১২৭৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। *বামাবোধিনী পত্রিকা*-য মহিলাদের রচনা যা প্রকাশিত হয়েছিল, তার অধিকাংশই কবিতা, সেগুলি যে বিশেষ উচ্চশ্রেণীর নয় এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। কবিতাগুলিব বিষয়বস্তু বেশিব ভাগই প্রায ভগবানের নিকট সকরুণ প্রার্থনা। পাপী-তাপীর, দুঃখীর, শোকার্তের, অনুতপ্তের, ভক্তিমতীর, ঈশ্বরানুরাগিনীর ভিন্ন ভিন্নভাবে ভগবৎ-সমীপে সকাতর আবেদন-নিবেদন।

গদ্য প্রবন্ধও কিছু কিছু আছে। এ-বিভাগের সংখ্যা খুব বেশি নয। যে অল্পসংখ্যক প্রবন্ধ তাঁবা লিখেছেন, তার অধিকাংশই স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক এবং নারীজাতির আদর্শ ও কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ ও আলোচনামাত্র। তাঁরা সকলেই তদানীন্তন নারী-সমাজের প্রযোজনীয কাজের কথাই বলবার চেষ্টা করেছেন।

১২৮০ সালে *বিনোদিনী* নামে একখানি সর্বপ্রথম মহিলা স্বাক্ষরে সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হযেছিল। শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবীই ছিলেন তাব সম্পাদিকা। মহিলাদেব মধ্যে শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবীই সর্বপ্রথম পত্রিকা-সম্পাদিকা রূপে দেখা দেন, কিন্তু দুঃখেব বিষয যে *বিনোদিনী* পত্রিকাখানি দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারেনি। কয়েক সংখ্যা প্রকাশেব পরই বিলুপ্ত হযেছিল।

সে যাই হোক, ১২৪০ থেকে ১২৮০ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে মহিলাদেব যে দান, তার সংখ্যা নিতান্তই অল্প এবং সাহিত্য হিসাবে তার মূল্য যৎসামান্য হলেও অন্য এক হিসাবে তার দাম আছে। কারণ, তাঁবাই ছিলেন আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে মহিলা লেখিকাদেব পথপ্রদর্শিকা, বা 'পাইওনিয়ার'। সাহিত্যক্ষেত্রে মেয়েদের যাত্রাপথ তাঁরাই প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন, যার ফলে আমরা স্বর্ণকুমাবী দেবী থেকে শুরু করে আজকের আশালতা সিংহ পর্যন্ত শক্তিশালিনী বহু লেখিকার সাক্ষাৎ পেয়েছি।

১২৮১ সাল থেকে ১৩০০ সাল পর্যন্ত এই বিশ বৎসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে একাধিক বিশিষ্ট শক্তিশালিনী লেখিকার আবির্ভাব হয়েছিল। সুতরাং, নারীরচিত সাহিত্যে নবযুগের আরম্ভ এই সময় হতেই শুরু হয়েছে নির্দেশ করা চলে:

সর্বতোমুখী শক্তিশালিনী লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী এই সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিযেছেন। বাংলা দেশের মহিলা সাহিত্যিকগণের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম গদ্যে ও পদ্যে এক নূতন সুর ঝংকৃত করে তুলেছিলেন। অপেক্ষাকৃত স্বাধীন চিন্তা, মৌলিক গবেষণা, নব নব ভাব ও কল্পনার বিচিত্র বিকাশ, মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম এঁরই রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। গানে, গল্পে, কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রহসনে, সন্দর্ভে, নিবন্ধে, পাঠ্যপুস্তকাদি প্রণযনে সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ইনি বঙ্গসাহিত্যকে মহিলা সাহিত্যিকের দানে নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট করে গেছেন। সাহিত্য সাধনায় মহিলাদের শক্তি ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে হলে এই যুগকেই তার প্রারম্ভ

বলে গ্রহণ করা উচিত। কারণ, পূর্বেই বলেছি, এর আগের মহিলাদের রচনা সাহিত্যপদবাচ্য বলে স্বীকার করতে দ্বিধা জাগে, অবশ্য আমি বঙ্গীয় দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর সংস্কৃতবিদ্যায় ব্যুৎপত্তিশালিনী অসাধারণ বিদুষী কয়েকটি মহিলার রচনার কথা বলছি না, তাঁদের সে রচনাবলীর আর কোনো গুণ থাক বা না থাক, অন্তত প্রাচীন সাহিত্য হিসাবে তা চিরদিনই আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্মানের সামগ্রী হয়ে থাকবে।

ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বের মহিলা সাহিত্যিকেরা যে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য রচনা করে যেতে পারেননি তার প্রধান কারণ, তাঁদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাব। তখনো বঙ্গ-সমাজে সাধারণভাবে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা, বাইবেলোক্ত জ্ঞানবৃক্ষের ফলের মতোই নিষিদ্ধ ছিল। শিক্ষিত অভিজাত ধনী-ঘরের মেয়েরা, হয়ত কেউ কেউ তাঁদের নিরক্ষরতা দূর করবার সুযোগ পেতেন, কিন্তু তাঁদের সে সামান্য সম্বল নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। তা নিয়ে বড়জোড় চলত,—ধোপার বাড়ির কাপড়ের খাতা লেখা, গয়লার দুধের হিসাব রাখা, মুদির দোকানের ফর্দ রচনা, চিঠিপত্র লিখতে পারা এবং অবসর সময়ে রামায়ণ-মহাভারত কিংবা বটতলার উপন্যাস পড়া। এই কারণেই বোধ হয়, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে, অর্থাৎ মুসলমান শাসনের শেষ যুগ থেকে ইংরাজ শাসনের মধ্যযুগ পর্যন্ত, আমরা বিশেষ কোনো মহিলা সাহিত্যিকের সন্ধান পাই না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই এদেশের মেয়েরা আবার উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন; সেই সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁদের অভ্যুদয় ঘটেছে, যদিও তাঁদের রচনায় বৈশিষ্ট্য ছিল না।

১২৭০ থেকে ১২৮০ সালের মহিলাদের রচনার মধ্যেও দেখা যায় সেই কৃত্তিবাসী ঢংয়ের পয়ার, ত্রিপদী এবং ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, দাশু রায় প্রভৃতির বচনাভঙ্গির অক্ষম অনুসরণ বা প্রতিধ্বনি মাত্র। তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই সাহিত্যক্ষেত্রে অবতরণ করেছিলেন—পুরুষেব দ্বারা প্রণোদিত হয়ে নয়, বরং অধিকাংশক্ষেত্রেই তাঁদের অবজ্ঞা ও বিরুদ্ধ অভিমত অগ্রাহ্য করেই মেয়েরা এ-বিভাগে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, নাম-যশ-খ্যাতি-প্রতিপত্তির প্রলোভনেও তাঁরা সাহিত্যসেবায় উদ্বুদ্ধ হননি, বরং নিছক সাহিত্যপ্রীতি বশতই যে তাঁরা সাহিত্যকে বরণ করেছিলেন, এ-কথা জোর করে বলা চলে। কারণ পূর্বেই বলেছি, এ-সময়ে অধিকাংশ মহিলারই রচনা প্রকাশিত হতো রচয়িত্রীর নাম ও পরিচয় অপ্রকাশিত রেখে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর *দীপ-নির্বাণ* উপন্যাস প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পূর্বে দুজন মহিলা লেখিকার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী এবং শ্রীমতী সুরঙ্গিনী দেবী। ১২৮১ সালে সুরঙ্গিনী দেবী *তারা-চরিত* নামে তারাবাইয়ের জীবনী রচনা করেন এবং হেমাঙ্গিনী দেবী তাঁর *মনোরমা* উপন্যাস প্রকাশ করেন।

১২৮১ সালে কালীপ্রসন্ন ঘোষের *বান্ধব* পত্রিকা প্রকাশ হয়। *বান্ধব* পত্রিকায়

পূর্ববঙ্গের তৎকালীন শিক্ষিতা মহিলাদেব বহু রচনা প্রকাশিত হতো।

১২৮২ সালে *দীপ-নির্বাণ* প্রকাশিত হওয়ার পর, স্বর্ণকুমারী দেবীর দ্বিতীয় গ্রন্থ *বসন্ত উৎসব* নাটক প্রকাশিত হয়। ১২৮৬ সালে *মালতী* উপন্যাস, ১২৮৭ সালে *গাথা* কাব্যগ্রন্থ এবং ১২৮৮ সালে *দেবকৌতুক* নাট্যগ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

এই সময়ের মধ্যেই, অর্থাৎ ১২৮৪ সালে *ভারতী* পত্রিকার প্রথম জন্ম হয়। *ভারতী*-তে স্বর্ণকুমারী দেবীর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে তাঁর সমসাময়িক আরো জনকতক মহিলা কবির উল্লেখ করা যেতে পারে, কামিনীসুন্দরী দাসী, বিরাজমোহিনী দাসী, স্নেহলতা দেবী, চারুবালা দেবী ইত্যাদি। ১২৮৩ সালে বিরাজমোহিনীর *কবিতাহার* এবং ১২৮৮ সালে কামিনীসুন্দরীর *কল্পনাকুসুম* নামে কবিতা পুস্তক মুদ্রিত হয়েছিল। ১২৮০ থেকে ১২৯০ সাল পর্যন্ত শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীই ছিলেন মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। এই সময়ের মধ্যে অন্য কোনো মহিলা সাহিত্যিককে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে দেখিনি। কিন্তু পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১২৯০ থেকে ১৩০০ সালেব মধ্যে একাধিক বিশেষ শক্তিশালিনী মহিলা সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে, যাঁদের দান বাংলার সাহিত্য সম্পদের বিভিন্ন দিককে সুসমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে।

সন ১২৯৬ সাল থেকে ১৩০০ সালের মধ্যে শ্রীমতী কামিনী সেন (পরে রায়), শ্রীমতী মানকুমারী বসু, শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী ও শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর নাম বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত।

১২৯১ সালে শ্রীমতী ষোড়শীবালা দাসীর *পুষ্পকুঞ্জ* নামে একখানি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু *পুষ্পকুঞ্জ* ষোড়শীবালার কবিখ্যাতি তেমন বিস্তৃত করতে পারেনি—যেমন, ১২৯৫ সালে *আলো ও ছায়া* প্রকাশিত হয়ে *আলো ও ছায়া* রচয়িত্রীকে যশস্বিনী করে তুলেছিল, কিংবা ১২৯৮ সালে প্রকাশিত বিনয়কুমারী বসুর কাব্যগ্রন্থ *নির্ঝর* তদানীন্তন পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছিল।

১২৯৬ সালে শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনীর *অশ্রুকণা* তাঁকে কবিখ্যাতি এনে দিয়েছিল, পরে ১২৯৭ সালে তাঁর *আভাস* নামে আর একখানি কাব্যগ্রন্থ তাঁর খ্যাতি অধিকতর বিস্তৃত করেছিল।

শ্রীমতী মানকুমারী বসু ইতিপূর্বে *প্রিয়-প্রসঙ্গ* নামে একখানি গদ্যকাব্য রচনা করে 'প্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী' নামে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। *বামাবোধিনী পত্রিকা* ও *নব্যভারত* প্রভৃতি সাময়িকপত্রে তাঁর অস্বাক্ষরিত বহু কবিতা প্রকাশ হয়েছিল। ১২৯০ সাল থেকে *নব্যভারত* প্রথম প্রকাশ শুরু হয়, ১২৯৭ সালে *সাহিত্য* পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১২৯৭ সালে শ্রীমতী মানকুমারীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *কাব্যকুসুমাঞ্জলি* প্রকাশিত হবার দু'বৎসর পূর্বে আর একজন মহিলা কবির *কবিতামালা* নামে আর একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এঁর নাম শ্রীমতী ব্রজেন্দ্রমোহিনী দাসী। *নব্যভারত* পত্রিকাতেও এঁর বহু কবিতা দেখতে পাওয়া যায়। ১২৯৩ সালে

প্রসন্নময়ী দেবী প্রণীত *নীহারিকা* কাব্যগ্রন্থও এ-যুগের উল্লেখযোগ্য পুস্তক বলা যেতে পারে।

এই দশ বৎসবের মধ্যে কেবলমাত্র সাহিত্যের কাব্যবিভাগেই মহিলাদের দান সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়। নাটক, উপন্যাস, ধর্মতত্ত্ব, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি বিভাগেও তাঁদের পুস্তক প্রকাশিত হযেছিল দেখা যায়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমাবী এ-যুগেও অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী লেখিকা হলেও, মহিলাদের রচিত আরো দশ-বারোখানি উপন্যাস এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। কুসুমকুমারী রায়ের *স্নেহলতা* বিশেষ সমাদব লাভ করেছিল। ইনি চিরদিন নাম অপ্রকাশ রেখে 'স্নেহলতা রচয়িত্রী' নামেই একাধিক গ্রন্থ রচনা কবে গেছেন। মানকুমারী বসুর *বনবাসিনী*, শতদলবাসিনী দেবীর *বিজনবাসিনী* ও *বিধবা বঙ্গললনা*, প্রসন্নমযী দেবীর *বনলতা* ও *অশোকা* এবং 'বনপ্রসূন-রচযিত্রী'র *সফল-স্বপ্ন* প্রভৃতি উপন্যাসগুলি উল্লেখযোগ্য বলা যেতে পারে। এই সময়েব মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর *মিবাররাজ*, *বিদ্রোহ*, *হুগলীব ইমামবাড়ি*, *ছিন্নমুকুল* প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল।

নাট্যসাহিত্য বিভাগে স্বর্ণকুমাবী দেবীব *দেবকৌতুক* ছাড়া, ১২৯৪ সালে প্রফুল্লনলিনী দাসীর *ষষ্ঠীবাঁটা* নামে একখানি প্রহসন এবং ১২৯৯ সালে গিবীন্দ্র-মোহিনী দাসীর নাটক *মীরাবাঈ* প্রকাশিত হয়ে তদানীন্তন নাট্যসাহিত্য বিভাগকে পুষ্ট করেছিল।

ধর্মতত্ত্ব বিভাগে,—আমবা ১২৯২ সালে মুদ্রিত শ্রীমতী নবীনকালী দেবীব *ষটচক্রভেদ* নামক গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য মনে করি।

ভ্রমণকাহিনী বিভাগে ১২৯৬ সালে প্রকাশিত শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবীর '*আর্যাবর্ত্ত*' গ্রন্থখানিও উল্লেখযোগ্য।

মাসিক-সাহিত্য সম্পাদনা বিভাগেও এই সময়ের মধ্যে একাধিক মহিলাব কীর্তি অক্ষয় হয়ে আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবসব গ্রহণের পর ১২৯১ সালে *ভারতী* পত্রিকা সম্পাদনের ভার নিয়েছিলেন শ্রীমতী স্বর্ণকুমাবী দেবী। কিরূপ সুদক্ষতার সহিত তিনি দীর্ঘকাল এই পত্রিকাব কার্যভার সুচারুরূপে পরিচালনা করেছিলেন, তৎকালীন *ভারতী*-র প্রত্যেক পাতায় তার সুন্দব প্রমাণ রয়েছে।

১২৯২ সালে শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় *বালক* নামে একখানি নূতন মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা এই *বালকে*-র পৃষ্ঠায় দেখা গিয়েছিল, এই *বালকে*-ই আমরা বালক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বালিকা সরলা দেবীর প্রথম রচনা প্রকাশ হতে দেখি। দু'বৎসর পরে *বালক* পত্রিকাখানি *ভারতী*-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

এই সময়ের মধ্যে মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় আরো অনেকগুলি মহিলা সাহিত্যিকের আবির্ভাব চোখে পড়ে। শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, প্রতিভা দেবী, সরলাবালা দাসী, অন্নদাসুন্দরী ঘোষ, লাবণ্যপ্রভা বসু, বিনয়কুমারী বসু প্রভৃতির নাম

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা কবিতা, গান, নিবন্ধ, গল্প, গাথা, সন্দর্ভ প্রভৃতি রচনা করেছেন দেখা যায়।

১৩০১ থেকে ১৩১০ সালের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের সকল বিভাগেই অসংখ্য মহিলা সাহিত্যিকের রচনা দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী, নগেন্দ্রবালা মুস্তফী সরস্বতী, অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্ত, সরোজকুমারী দেবী, লজ্জাবতী বসু, প্রমীলা নাগ, কুসুমকুমারী রায়, নিস্তারিণী দেবী, স্বর্ণলতা চৌধুরী প্রভৃতি অনেকগুলি শক্তিশালিনী লেখিকার আবির্ভাব হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে ১৩০১ সালে শ্রীমতী মৃণালিনীর *প্রতিধ্বনি*, ১৩০২ সালে *নির্ঝরিণী*, ১৩০৩ সালে *কল্লোলিনী* ও ১৩০৪ সালে *মনোবীণা* নামে তৎকালে প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩০২ সালে স্বর্ণকুমারী দেবীর *কবিতা ও গান* পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩০৩ সাল থেকে ১৩১০ সালের মধ্যে শ্রীমতী মানকুমারী বসুর কবিতার বই *কনকাঞ্জলি* ও *বীরকুমার-বধ* কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। ইনি *বীরকুমার-বধ*-রচয়িত্রী নামেও খ্যাতিলাভ করেন। এই সময়ের মধ্যে শক্তিশালিনী লেখিকা নগেন্দ্রবালা মিত্র মুস্তফী সরস্বতীর পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল—*মর্মগাথা*, *প্রেমগাথা*, *অমিয়-গাথা*, *ব্রজগাথা* ও *বসন্তগাথা*, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর *অর্ঘ্য* ও *শিখা* নামে কবিতার বই দু'খানিও এই দশ বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই দশ বৎসরের মধ্যেই অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রীতি ও পূজা*, সরোজকুমারী দেবীর প্রথম কবিতার বই *হাসি ও অশ্রু* ও দ্বিতীয় গ্রন্থ *অশোকা* প্রকাশিত হয়; ১৩০৯ সালে আর একটি মহিলা কবি ইন্দুপ্রভার দু'খানি কাব্যগ্রন্থ একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল—*বৈভ্রাজিকা* ও *শেফালিকা*। এ-ছাড়া আরো চার-পাঁচজন মহিলা কবির কাব্যগ্রন্থ এই যুগে প্রকাশ হয়েছিল, যা সাহিত্যক্ষেত্রে তেমন সমাদৃত হয়ে উঠতে পারেনি। যেমন—সরোজিনী দেবীর *সুধাময়ী* (১৩০১), তরঙ্গিনী দাসীর *বনফুলহার* (১৩০৫), কৃষ্ণভামিনী দাসীর *ভক্তি-সঙ্গীত* (১৩০৬), পরমাসুন্দরী ঘোষের *সঙ্গিনী* (১৩০৭), প্রভাবতী দেবীর *অমল প্রসূন* (১৩০৭), বিভাবতী সেনের *কনককুসুম* (১৩০৮), বসন্তকুমারী দেবীর *মঞ্জরী* (১৩০৮), ইত্যাদি। এই সময়ের মধ্যে বহু ইংরাজি ও ফরাসি রচনার অনুবাদ করেছিলেন উচ্চশিক্ষিতা বিদুষী মহিলা লজ্জাবতী বসু, প্রমীলা নাগ, সরোজকুমারী দেবী ও অপরাজিতা দাসী।

গল্প ও উপন্যাস ক্ষেত্রে কুসুমকুমারী রায় তাঁর শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এ-যুগকে উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন, যদিও কোনো পুস্তকেই তিনি নিজের নাম দেননি। এঁর *প্রেমলতা* উপন্যাসখানি ১৩০১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তদানীন্তন সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। ১৩০৫ সাল থেকে ১৩১০ সালের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর আরো দু'খানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল—*কাহাকে* ও *স্নেহলতা*।

নাট্যবিভাগে এই সময়ের মধ্যে মাত্র দু'একখানি মহিলা-রচিত নাটকের সন্ধান

পাওয়া যায়। কামিনী রায়ের *একলব্য* নাটক এবং *বিরাটনন্দিনী* নামে আর একখানি নাটক—যাতে রচয়িতার নাম কেবলমাত্র 'দুঃখমালা রচয়িত্রী' বলে উল্লেখ ছিল।

নারী-রচিত বিলাত-ভ্রমণকাহিনী এই সময়ের মধ্যেই প্রথম প্রকাশিত হয়। জগৎমোহিনী চৌধুরীর *ইংলণ্ডে সাতমাস* ১৩০৮ সালের উল্লেখযোগ্য একখানি গ্রন্থ। ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত পাঁচখানি বই এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল—কুন্দকুমারী গুপ্তার *প্রেমবিন্দু* (১৩০৩), বসন্তকুমারী বসুর *উপাসনার গুরুত্ব*, লাবণ্যপ্রভা বসুর *পৌরাণিক কাহিনী*, কামিনীসুন্দরী দেবীর *গুরুপূজা* ও নবীনকালী দেবীর *ভগবতী গীতা* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞান বিভাগে নাম করা যায়, হেমাঙ্গিনী কুলভীর *সূতিকা চিকিৎসা* এবং শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর *আমিষ ও নিরামিষ আহার*; এ-ছাড়া বিবিধ বিভাগে আরো পাঁচখানি বইয়ের নাম করা যেতে পারে—যা এই সময়ের মধ্যে প্রকাশ হয়েছিল। সেগুলি হচ্ছে—কুসুমকুমারী রায় বা *স্নেহলতা, প্রেমলতা*-রচয়িত্রীর *প্রসূনাঞ্জলি*, নগেন্দ্রবালা মিত্র মুস্তফী সরস্বতীর *নারীধর্ম*, স্বর্ণলতা চৌধুরীর *জীবনবীমা*, বিনোদিনী সেনগুপ্তার *রমণীর কার্যক্ষেত্র* এবং প্রসন্নতারা গুপ্তার *পারিবারিক জীবন*।

অনুবাদ সাহিত্যে আমরা এ-সময় দেখতে পাই লজ্জাবতী বসুর *হোমারের ইলিয়াড*, স্বর্ণলতা চৌধুরীর *স্কটের মার্মিয়ন* ও মৃণালিনী সেনের মেরী করেলির *থেলমা*, নারীদের সে-যুগের এ-প্রচেষ্টা যথার্থই প্রশংসনীয়।

এই সময়ে আর একটি বিভাগে মহিলাদের প্রবেশ একান্ত অপ্রত্যাশিত মনে হলেও শীঘ্রই তা সার্থকতায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। সেটি হচ্ছে স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ ও শিশু-সাহিত্য রচনা। ১৩০১ সালে মানকুমারী বসু *শুভসাধনা* নামে যে প্রবন্ধ-পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরে তা ম্যাট্রিক পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হয়েছিল। ১৩০৮ সালে স্বর্ণকুমারী দেবীর *বাল্য-বিনোদ* ও *সচিত্র বর্ণবোধ* নামে দু'খানি শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৩০৯ সালে সুমতি দেবীর *জ্ঞানপ্রসূন*, চারুশীলা দেবীর *ভাষাশিক্ষা* ও শৈলবালা দেবীর *পাঠশালার পাঠ লেখা* নামে স্কুলপাঠ্য বইগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

মাসিক সাহিত্য বিভাগে এই সময়ের মধ্যে একাধিক মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩০৪ সালে প্রকাশিত *অন্তঃপুর* পত্রিকাখানি বিশেষভাবে মহিলাদের দ্বারাই পরিচালিত ও মহিলা লেখিকাদের রচনায় পুষ্ট হয়েই প্রকাশ হয়েছিল দেখা যায়। *অন্তঃপুরে*-র প্রথম সম্পাদিকা ছিলেন বনলতা দেবী, ১৩০৭ সালে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটায় হেমন্তকুমারী চৌধুরানী এর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেছিলেন। ১৩১০ সালের পর ইনি লীলাবতী মিত্রের হাতে সম্পাদন-ভার অর্পণ করে অবসর নিয়েছিলেন। ১৩১১ সালে অর্থাভাবে *অন্তঃপুর* পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। ১৩০২ সালে সুপ্রসিদ্ধ *ভারতী* পত্রিকার ভার নিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবীর সুযোগ্যা কন্যাদ্বয় —হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী। ১৩০৪ সাল থেকে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সম্পাদনায়

পুণ্য নামে একখানি মাসিকপত্র ১৩০৮ সাল পর্যন্ত চলেছিল। ১৩০৮ সালে মোহিনী দেবীর সম্পাদনায় প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র *পরিচারিকা* প্রকাশ হয়েছিল।

১৩১১ সাল থেকে ১৩২০ সালের মধ্যে সাহিত্যে নারীর দান প্রায় সকল বিভাগেই ক্রমশ বেড়ে উঠেছে দেখা যায়। এই দশ বৎসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আরো কয়েকজন শক্তিশালিনী লেখিকার নবাগমন হয়েছিল। এ-যুগে বাংলা সাহিত্যের কাব্য বিভাগে মহিলাদের দান এত বেশি যে, এটিকে নারী-কবির যুগ বলা যেতে পারে। স্বর্ণকুমারী, মানকুমারী, কামিনী রায়, নগেন্দ্রবালা মুস্তফী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মৃণালিনী দেবী, অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা ছাড়া এ-যুগের নবাগতাদের মধ্যে আনন্দমোহিনী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, সরোজকুমারী দেবী, কুসুমকুমারী রায়, নিস্তারিণী দেবী, কুমুদিনী বসু, সরলা দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দত্ত, হেমন্তবালা দত্ত, হেমলতা দেবী, সুশীলমালতী দেবী, প্রফুল্লময়ী দেবী প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এই দশ বৎসরে নারী-রচিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৬৫ খানি।

গল্প ও উপন্যাস বিভাগে স্বর্ণকুমারীর দান এ-যুগের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর *গল্পসল্প, সন্ন্যাসিনী, প্রতিশোধ, ফুলের মালা, নিবেদিতা, বিচিত্র* প্রভৃতি একাধিক উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য মহিলা লেখিকাদের প্রায় তিরিশখানি উপন্যাস এই দশ বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। মহিলা কবিদের মধ্যে অনেকে এ-সময় উপন্যাস রচনাতেও ব্রতী হয়েছিলেন, যেমন অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তার *প্রভাতী, দুটি কথা, গল্প*; নগেন্দ্রবালা মুস্তফীর *সতী*; নিস্তারিণী দেবীর *হিরণ্ময়ী* ও সরোজকুমারী দেবীর *কাহিনী* প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। কথাসাহিত্যে বা উপন্যাস বিভাগে নবাগতদের মধ্যে দুইজন মহিলা লেখিকা এ-যুগে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন —শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ও শ্রীমতী অনুরূপা দেবী। নিরুপমা দেবীর *অন্নপূর্ণার মন্দির* এবং অনুরূপা দেবীর *পোষ্যপুত্র* এ-যুগের নারীদের রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে পেরেছিল। শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি. এ. (বর্তমানে মিত্র) বচিত *অমরেন্দ্র* নামক উপন্যাস ১৩২০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছিল।

নাট্যসাহিত্যে এই দশ বৎসরের মধ্যে মহিলাদের দান নিতান্ত অল্প নয়। স্বর্ণকুমারী দেবীর *পাকচক্র, রাজকন্যা* প্রভৃতি ছাড়া প্রসন্নময়ী দাসীর *বিভূতি-প্রভা*; অমলা দেবীর *ভিখারিনী* ও সরলা দেবীর *পরিণাম* নাটক এ-যুগের উল্লেখযোগ্য রচনা বলা যেতে পারে।

ধর্মতত্ত্ব বিভাগে এই দশ বৎসরের মধ্যে পাঁচখানি মহিলাদের রচিত গ্রন্থ ছিল, কিন্তু সেগুলি বিশেষ উচ্চাঙ্গের নয়; ভক্তি-সংগীত, প্রার্থনা, ভজন, কীর্তন, ব্রতকথা ও নাম-মাহাত্ম্য ইত্যাদি গতানুগতিক ব্যাপার। একমাত্র ফুলকুমারী গুপ্তার ১৩১৭ সালে প্রকাশিত *সৃষ্টিরহস্য* শীর্ষক দার্শনিক চিন্তা ও আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থখানিই উল্লেখযোগ্য।

এই সময়ের মধ্যে মহিলাদের রচিত একাধিক জীবনচরিতও প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্রের (বসু) *মেরী কার্পেণ্টারের জীবনী*, নির্মলাবালা চৌধুরানীর *সতী-শতক*, সরোজিনী দেবীর *আদর্শ জীবনী*, সরলাবালা দাসীর *নিবেদিত*, বিনোদিনী দাসীর *অমরকথা*, তিনকড়ি দাসীর *আমার জীবন*, ইন্দিরা দেবীর *আমার খাতা*, কামিনী রায়ের *শ্রাদ্ধিকী* প্রভৃতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ইতিহাস বিভাগেও মহিলারা এ-যুগে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। ১৩১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মৃণালিনী দেবীর *পলাশী লীলা*, ১৩১৬ ও ১৩১৭ সালে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল নলিনীবালা ভঞ্জ চৌধুরানীর *রুশ-জাপান যুদ্ধের ইতিহাস* এবং ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল হেমলতা দেবীর *মিবার গৌরব কথা।*

বিবিধ সাহিত্য বিভাগেও এই সময়ের মধ্যে মহিলাদের রচিত প্রায় কুড়িখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। দেখা যায়, তার মধ্যে সরোজকুমারী দেবীর *বঙ্গ-বিধবা*, নগেন্দ্রবালা মুস্তফী সরস্বতীর *গার্হস্থ্য ধর্ম*, লাবণ্যপ্রভা বসুর *গৃহের কথা*, কুমারী কনকলতা চৌধুরী প্রণীত রাজনৈতিক প্রবন্ধপূর্ণ পুস্তক *উদ্দীপনা* এবং সরলা দেবীর পুস্তিকা *বাঙালীর পিতৃধন* বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনুবাদ সাহিত্যে লজ্জাবতী বসুর শেক্সপীয়রের *টেম্পেস্ট* নাটক এবং বিমলা দাশগুপ্তার অনূদিত মহাকবি কালিদাসের *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* এ-যুগে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে।

স্কুলপাঠ্য পুস্তক ও শিশু-সাহিত্য বিভাগে এই দশ বৎসরেব মধ্যে মহিলাদের রচিত বারোখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়। স্বর্ণকুমারীর *প্রথম পাঠ্য ব্যাকবণ*, সরোজিনী দেবীর *শিশুরঞ্জন নব ধারাপাত*, মৃণালিনী দেবীর *আদর্শ হস্তলিপি*, সুখলতা রাওয়ের *গল্পের বই*, বীণাপাণি দেবীর *ঠাকুরদাদার দপ্তর*, মিসেস আর. এস. হোসেনের *মোতিচুর* এবং বিনোদিনী দেবীর *খুকুরানীর ডায়েরি* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাসিক সাহিত্য সম্পাদন বিভাগেও এ-যুগে কয়েকজন নূতন মহিলার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সরযূবালা দত্তের সম্পাদনায় ১৩১২ সালে *ভারত-মহিলা* নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩১৩ সালে কুমুদিনী মিত্রের সম্পাদনায় *সুপ্রভাত* ও ১৩১৪ সালে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর সম্পাদনায় *জাহ্নবী* মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ১৩২০ থেকে ১৩২২ সালের মধ্যে এগুলি বন্ধ হয়ে যায়। ১৩১৫ সালে *ভারতী* পত্রিকার সম্পাদন-ভার পুনরায় স্বর্ণকুমারী দেবী নিজে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ১৩২৩ সালে আবার তা শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও ঁমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

১৩২১ সাল থেকে ১৩৩০ সালের মধ্যে মহিলাদের রচনায় বাংলার কাব্য-সাহিত্য অপেক্ষা উপন্যাস ও কথাসাহিত্যই অধিকতর সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই দশ বৎসরের মহিলা রচিত সাহিত্যকে 'কথার যুগ' বলা যেতে পারে। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, ইন্দিরা দেবী, সরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলবালা ঘোষজায়া, কুমুদিনী বসু, আমোদিনী ঘোষজায়া, হেমনলিনী দেবী, সরোজকুমারী দেবী, সুনীতি

দেবী, কাঞ্চনমালা দেবী, সুরুচিবালা রায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, গিরিবালা দেবী -রত্নপ্রভা-সরস্বতী, সুবর্ণপ্রভা সোম, পূর্ণশশী দেবী, শান্তা দেবী, সীতা দেবী, প্রভৃতি শক্তিশালী সুলেখিকারা এই দশ বৎসর এবং পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে যত বেশি গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন—তার আগে আশি বৎসরেব মধ্যে সমস্ত মহিলা লেখিকার রচনা জড়ো করলেও তার সমান হয় না। ১৩২১ সাল থেকে ১৩৩০ সাল—এই দশ বৎসবের মধ্যে মহিলা লেখিকারা বাংলা সাহিত্যে প্রায় দেড়শত উপন্যাস উপহাব দিয়েছেন। একা স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা সাহিত্যে যা দিয়ে গেছেন, তার হিসাব দেখে বিস্মিত হতে হয়! তিনি উপন্যাস রচনা করে গেছেন ১৮ খানি, কবিতা ও গানের বই দিয়েছেন ১০ খানি, নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন দিয়েছেন ৮ খানি, জীবনী দিয়েছেন ১ খানি, ইতিহাস দিয়েছেন ১ খানি, ভ্রমণকাহিনী দিয়েছেন ৩ খানি, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি ৩ খানি, বিজ্ঞান বিভাগে ১ খানি, স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ ৩ খানি এবং অনুবাদ সাহিত্যে ১ খানি (স্কটের *ট্যালিসম্যান*)। কিঞ্চিদধিক অর্ধ শতাব্দীকাল অক্লান্ত উৎসাহে স্বর্ণকুমাবী বঙ্গ-ভারতীব সেবা করে গেছেন, এবং দানও করে গেছেন অপরিমেয।

কাব্য ও সংগীত বিভাগে এই দশ বৎসরের মধ্যে মহিলা-কবিরা উপহার দিয়েছেন প্রায় পঞ্চাশখানি বই। এই সময় থেকে মহিলা সাহিত্যিকদের রচনায় গদ্যে ও পদ্যে ববীন্দ্রনাথের প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে দেখতে পাওয়া যায়। পূর্বেই বলেছি, শতবর্ষেব প্রাবম্ভে প্রকাশিত মহিলা কবিদেব রচনায় ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, দাশরথি রায় প্রভৃতিব সক্ষম অনুকরণ দেখতে পাওয়া যায়। তারপর তাঁদের রচনায় হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রঙ্গলালের ভঙ্গি দেখা দিয়েছিল। পূর্ববঙ্গের মহিলা কবিদের মধ্যে গোবিন্দ দাসের প্রভাবও চোখে পড়ে, কিন্তু আধুনিক যুগের মহিলাদেব রচনা সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের ছন্দানুবর্তিনী। বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসামান্য প্রতিভাগুণে যে একটি অভিনব সুন্দব ও সহজ স্বচ্ছন্দ লীলাভঙ্গি নিয়ে এসেছেন, বাংলার নবীনা মহিলা কবিদের লেখনীমুখে এ-যুগে রবীন্দ্র-প্রবর্তিত সেই অপূর্ব নূতন সুর, নবীন ছন্দ ও বিচিত্র লীলাভঙ্গি সূচিত হয়ে উঠছে দেখা যায়। এ-যুগের মহিলা কবিদের মধ্যে *ধূপ* ও *গোধূলি* রচয়িত্রী শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, *মাধবী* রচয়িত্রী শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত, *সাহানা* রচয়িত্রী শ্রীমতী সুনীতি দেবী, *পুষ্পপবাগ* রচয়িত্রী শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী, *কিশলয়* রচয়িত্রী শ্রীমতী লীলা দেবী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমার নিজের কাব্যগ্রন্থ *লীলাকমল*-ও রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি।

পূর্বতন দশ বৎসরের মহিলা কবিদের মধ্যে ববীন্দ্রনাথেব সুর আমবা প্রথম ধ্বনিত হতে শুনি শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী ও প্রিয়ম্বদা দেবীর রচনার মধ্যে।

নাট্যসাহিত্য বিভাগে এই ১০ বৎসরের মধ্যে আমরা মহিলাদের রচিত ৫২ খানি নাটকের সন্ধান পেয়েছি। স্বর্ণকুমারী দেবীর *নিবেদিতা* ও *যুগান্ত* নাট্যকাব্য, অমলা দেবীর *শক্তি*, সরযূবালা দাশগুপ্তার *দেশোত্তর বিশ্বনাট্য*, শৈলবালা ঘোষজাযাব

মোহের প্রায়শ্চিত্ত, সরসীবালা বসুর *বাঙালী পল্টন* ও অনুরূপা দেবীর *কুমারিল ভট্ট* নাটকগুলি তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ধর্মতত্ত্ব বিভাগে এই দশ বৎসরের মধ্যে মহিলা লেখিকারা ২০ খানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তম্মধ্যে বসন্তকুমারী বসুর রচিত *জ্ঞানভক্তি ও কর্মের সামঞ্জস্য,* সরোজিনী দত্ত, এম. এ.-রচিত *মাধুরী* ও যামিনীময়ী দেবীর *সোহং সনাতন জীবন* প্রশংসনীয় রচনা বলা চলে।

ইতিহাস বিভাগে এই সময়ের মধ্যে মহিলাদের রচিত মাত্র তিনখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গেছে, এ-তিনখানি বইই সংক্ষিপ্ত ভারত-কথা। লীলাবতী ভৌমিকের *ভারত ইতিহাস,* বিভাবতী সেনের *সংক্ষিপ্ত ভারত ইতিহাস* এবং সরযূবালা দত্তের *ভারত পরিচয়।* এগুলি প্রকৃতপক্ষে স্কুলপাঠ্য ইতিহাস।

জীবনচরিত বিভাগে মহিলাদের রচিত ১৫ খানি পুস্তক এই দশ বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে সুবর্ণপ্রভা সোমের *বিবেকানন্দ মাহাত্ম্য,* মালতী দেবীর *দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন,* রানী সুনীতি দেবীর *শিশু কেশব,* বিনোদিনী মিত্রের *শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়,* হরিসুন্দরী দত্তের *শ্রীনাথ দত্ত,* মুসম্মৎ সারা তৈফুর প্রণীত *স্বর্গের জ্যোতি বা হজরৎ মহম্মদের পবিত্র জীবনী,* হেমলতা দেবীর *পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত,* নলিনীবালা দেবীর *দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন,* অণিমারানী দেবীর *মহাত্মা গান্ধীর জীবনী* এবং বিমলা দাশগুপ্তার *ত্রয়ী* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা।

ভ্রমণকাহিনী বিভাগে বিমলা দাশগুপ্তার *নরওয়ে ভ্রমণ* ও হরিপ্রভা তাকেদার *বঙ্গমহিলার জাপান-যাত্রা* প্রশংসনীয় রচনা।

স্কুলপাঠ্য ও শিশুসাহিত্য বিভাগে এই দশ বৎসরের মধ্যে মহিলা লেখিকারা ২৫ খানি বই উপহার দিয়েছেন। সাহিত্য, ইতিহাস, ব্যাকরণ, ভূগোল, জীবনী, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে, এমনকী ধারাপাত পর্যন্ত ইতিপূর্বে মহিলারা রচনা করেছেন। এবাব আমরা শরৎকামিনী সেনের *বাল্যবোধ গণিত* এবং শ্যামলতা দেবীব *শিশু গণিত* শীর্ষক দু'খানি গণিত-গ্রন্থের সন্ধান পেযেছি। স্কুলপাঠ্য ও শিশুসাহিত্য বিভাগে এই দশ বৎসবের মধ্যে একাধিক মোসলেম মহিলার রচনা চোখে পড়ে। মিসেস আর. এস. হোসেন, শ্রীমতী ফয়জুন্নেসা খাতুন, মেহেরুন্নিসা খাতুন, আমিনুন্নেসা বিবি প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে মোসলেম ভগিনীদের রচনা একেবারেই বিরল। সম্ভবত, এর কারণ তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগের অভাব এবং কঠোর অবরোধপ্রথার দুর্ভেদ্য বাধা।

শিশুসাহিত্যে এ-সময় উমা গুপ্তার *ঘুমের আগে,* প্রিয়ম্বদা দেবীর *কথা উপকথা,* ভক্তিলতা ঘোষের *ছেলেদের বঙ্কিম,* সুবর্ণপ্রভা সোমের *খোকার পড়া,* সীতা দেবীর *আজব দেশ,* শান্তা দেবীর *হুক্কাহুয়া* ও কাননবালা দেবীর *বামনের চাঁদে হাত* বইগুলি খ্যাতি অর্জন করেছিল।

অনুবাদ সাহিত্যে এ-সময় সীতা দেবীর *নিরেট গুরুর কাহিনী*, তুলসীমণি দেবীর সার রাইডার হ্যাগার্ডের *আয়েষা*, নির্মলাবালা সোমের শার্লৎ ব্রন্‌তের *জ্যেন আয়ার* অবলম্বনে রচিত *সরলা*, শান্তা দেবীর অনূদিত *স্মৃতির সৌরভ* ও ইন্দিরা দেবীর অনূদিত *সৌধ রহস্য* বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

বিবিধ সাহিত্য বিভাগেও এ-সময় মহিলাদের একাধিক উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীর *নারীর উক্তি*, প্রসন্নময়ী দেবীর *পূর্বকথা*, হেমাঙ্গিনী রায় দস্তিদারের *গৃহিণীর উপদেশ*, কামিনী রায়ের *বালিকা-শিক্ষার আদর্শ* প্রভৃতির নাম গর্বের সঙ্গে করা চলে। চারুবিজ্ঞান ও কারুকলা সম্বন্ধে মহিলাদের রচিত কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থও এ-যুগের বৈশিষ্ট্য সূচনা করে, যেমন কমলাবালা বিশ্বাসের *সচিত্র সেলাই শিক্ষা*, কিরণলেখা রায়ের *বরেন্দ্র রন্ধন*, নির্মলাবালা রায়ের *রন্ধনশিক্ষা*, অরুণা বেজবড়ুয়ার *স্বরলিপি* ও মোহিনী সেনগুপ্তার *সুরমূর্ছনা*।

মাসিক সাহিত্য সম্পাদনায় ১৩২১ ও ১৩২২ সালে *ভারতী* পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন স্বয়ং স্বর্ণকুমারী দেবী। ১৩২৩ সাল থেকে *পরিচারিকা* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কবি নিরুপমা দেবী, *সুপ্রভাত* পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন কুমুদিনী বসু, *মাহিষ্য-মহিলা* পত্রিকাখানি কৃষ্ণভামিনী বিশ্বাসের সম্পাদনায় ১৩২১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩২৮ সালে *নব্যভারত* পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেছিলেন ফুল্লনলিনী দেবী। ১৩৩০ সালে প্রকাশিত *মাতৃ-মন্দির* পত্রিকার যুক্ত-সম্পাদকের অন্যতমরূপে সুরবালা দত্তের নাম দেখতে পাই। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হচ্ছে যে, এই দশ বৎসরের মধ্যেই পত্রিকা সম্পাদনে মহিলাদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেয়েছিল এবং এর পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে কেবলমাত্র *বঙ্গলক্ষ্মী* ও *জয়শ্রী* ভিন্ন মহিলা-সম্পাদিত আর কোনো মাসিকপত্রের সন্ধানই পাওয়া যায় না।

১৩৩১ সাল থেকে ১৩৪৩ সালের মধ্যে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে আরো কয়েকটি শক্তিশালী মহিলা লেখিকার আবির্ভাব হয়েছে। বর্তমান যুগের সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই তাঁদের সঙ্গে পরিচিত, তাঁদের কথা এখানে আর না লিখলেও চলে। কিন্তু আমার এই বিবরণ হাতনাগাদ সসম্পূর্ণ করবার জন্য তাঁদের বিষয়ও আমি এ-প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করছি।

আলোচ্য দশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্যের কাব্য, সংগীত, নাটক, উপন্যাস, কথা ও কাহিনী ইত্যাদি নানা বিভাগে মহিলা লেখিকাদের মুকুটমণি স্বর্ণকুমারী স্বর্গারোহণ করেছেন। সুকবি কামিনী রায় ও প্রিয়ম্বদা দেবীকেও আমরা হারিয়েছি। *বাতায়ন*-এর তরুণী-কবি উমা দেবীকেও অকালে চলে যেতে দেখেছি, কিন্তু পেয়েছি আশালতা সিংহকে, জ্যোতির্ময়ী দেবীকে, হাসিরাশি দেবীকে, জ্যোতির্মালা দেবীকে, অপরাজিতা দেবীকে, মৈত্রেয়ী দেবীকে, নুরুন্নেছা খাতুনকে, জাহানারা বেগমকে, মাহ্‌মুদা খাতুনকে, শামসুন্নাহারকে, সুতরাং আক্ষেপের কোনো কারণ নেই।

বর্তমান ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে মহিলাদের রচিত প্রায় দুইশত উপন্যাস

প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর একখানি, নিরুপমা দেবীর পাঁচখানি, অনুরূপা দেবীর চৌদ্দখানি, শৈলবালা ঘোষজায়ার বারোখানি, ইন্দিরা দেবীর তিনখানি, প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর তেইশখানি, সীতা দেবীর দশখানি, শান্তা দেবীর সাতখানি, সরসীবালা বসুর আটখানি, লীলা দেবীর দু'খানি, নুরুন্নেছা খাতুনের তিনখানি, পূর্ণশশী দেবীর সাতখানি, সুরুচিবালা রায়ের তিনখানি, গিরিবালা দেবী সরস্বতীর তিনখানি, সরোজকুমারী দেবীর দু'খানি, প্রফুল্লময়ী দেবীর একখানি, আশালতা দেবীর পাঁচখানি, আশালতা সিংহের আটখানি, জ্যোতির্ময়ী দেবীর তিনখানি, আমোদিনী ঘোষজায়ার দু'খানি, সুরুচিবালা চৌধুরানীর একখানি, বনলতা দেবীর দু'খানি, উমা দেবীর একখানি, কাঞ্চনমালা দেবীর দু'খানি, শামসুন্নহারের একখানি উল্লেখযোগ্য রচনা।

কাব্য ও কবিতা বিভাগে মহিলাদের দান তিরিশখানি ; তার মধ্যে কবি নিরুপমা দেবীর *গোধূলি*, রাধারাণী দেবীর *লীলাকমল, সীঁথিমৌর,* কামিনী রায়ের *ধূপ ও দীপ* এবং *জীবন পথে,* মানকুমারী বসুর *বিভূতি,* প্রিয়ম্বদা দেবীর *অংশু,* উমা দেবীর *বাতায়ন,* লীলা দেবীর *কিশলয়* ও *শিঞ্জন,* সরোজিনী দেবীর *বনফুল,* বিভাবতী দেবীর *খোঁজে,* অপরাজিতা দেবীর *বুকের বীণা, আঙিনার ফুল* ও *পুরবাসিনী,* মৈত্রেয়ী দেবীর *উদিতা,* কনকলতা ঘোষের *অনুরাগ* ও *পত্রলেখা,* মাহ্‌মুদা খাতুনের *পসারিণী* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নাট্যসাহিত্য বিভাগে মহিলাদের দানের মধ্যে অনুরূপা দেবীর *বিদ্যারণ্য,* স্বর্ণকুমারী দেবীর *দিব্যকমল,* হেমলতা দেবীর *শ্রীনিবাসের ভিটা,* প্রফুল্লময়ী দেবীর *ধাত্রীপান্না* ও প্রভাময়ী মিত্রের *দেউল* বিশিষ্ট রচনা।

ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও মহিলারা এই সময়ের মধ্যে দশ-বারোখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে অনুরূপা দেবীর *ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞান*, সরলা দেবীর *কালীপূজায় বলিদান ও বর্তমানে তাহার উপযোগিতা,* সুনীতি দেবীর *অমৃতবিন্দু,* হেমলতা রায়ের *কৈলাশপতি,* ইন্দুমতী দেবীর *বঙ্গনারীর ব্রতকথা* উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাস বিভাগে কুমুদিনী দেবীর *দেশের কথা,* জ্যোতির্ময়ী দেবীর *সরল ভারত ইতিহাস,* রেণুকণা দাশগুপ্তা বি. এ. বি. টি.-র *ইংলণ্ডের ইতিহাস,* রাধারানী রায়ের *চাঁদ-সুলতানা* ও *রানী দুর্গাবতী,* নুরুন্নেছা খাতুনের *মোসলেম বিক্রম* বিশিষ্ট রচনা।

জীবনচরিত বিভাগে এ-সময় মোক্ষদায়িনী দেবীর *কল্যাণ প্রদীপ,* সুমতি দেবী বি. এ. বি. টি.-র *হেলেন কেলার,* প্রীতিলতা দত্তজায়ার *রানী দুর্গাবতী,* শামসুন্নাহার বি. এ.-র *পুণ্যময়ী* ও *বেগম মহল* উল্লেখযোগ্য রচনা।

ভ্রমণকাহিনী বিভাগে এ-সময়ের মধ্যে বিশিষ্ট রচনা বলা যেতে পারে—নলিনী দাসীর *কামাখ্যা যাত্রা,* সরোজনলিনী দত্তের *জাপানে বঙ্গনারী,* ননীবালা ঘোষের *আর্যাবর্ত্ত ভ্রমণ,* লতিকা দেবীর *কাশী,* রাজলক্ষ্মী দেবীর *কেদার-বদরী ভ্রমণ,* রত্নবালা দেবীর *হিমালয় পরিভ্রমণ,* অমলা নন্দীর *শতসাগরের পারে।*

বিজ্ঞান বিভাগে এই ত্রয়োদশ বৎসরে একাধিক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মহিলারা রচনা

করেছেন। এটা অত্যন্ত আশা ও আনন্দের কথা। ডাক্তার শ্রীমতী যামিনী সেনের *প্রসূতিতত্ত্ব*, ডাক্তার হিরণ্ময়ী সেন এম. বি.-র *সরল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা*, সুখলতা রাওয়ের *স্বাস্থ্য*, অনুরূপা দেবীর *শিশুমঙ্গল*, প্রবোধশশী দেবীর *সহজ বুনন শিক্ষা*, তুষারবালা দেবীর *সীবন ও কাটিং শিক্ষা*, সুলেখা দেবীর *সূচী-রেখা*, সুরমা দেবীর *রূপরেখা*, উমা দেবীর *সনাতন পাকপ্রণালী*, সাহানা দেবীর স্বরলিপিগ্রন্থ *মালিকা*, প্রেমলতা দেবীর *সংগীত-সুধা* প্রভৃতি নারীর পক্ষে প্রশংসনীয় ও গৌরবজনক দান।

বিবিধ-সাহিত্য-বিভাগে উমা দেবীর *বাঙ্গালী জীবন*, সুষমা সেনগুপ্তা এম. এ.-র *ঘরকরণা*, কনকলতা ঘোষের *পাঞ্চজন্য*, সরযূবালা দাশগুপ্তার *ত্রিবেণী সঙ্গমে*, এবং সুষমা দেবীর *নারী জাগরণ* উল্লেখযোগ্য রচনা।

স্কুলপাঠ্য ও শিশুসাহিত্য বিভাগেও এই ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশখানি বই মহিলারা রচনা করেছেন। ইতিপূর্বে স্কুলপাঠ্য পুস্তকের মধ্যে সাহিত্য ছাড়াও মহিলাদের রচিত ব্যাকরণ, ধারাপাত, গণিত ও বিজ্ঞানের পুস্তকের সন্ধান পাওযা গেছে। আলোচ্য সময়ের মধ্যে কুমারী রাণী রায় ছেলেমেয়েদের জন্য *অভিনব ভূগোল* রচনা করেছেন। কথাসাহিত্যের মধ্যে নির্মলা রায়ের *সাঁওতালি উপকথা* ও কমলবাসিনী দেবীর *মায়াপুরী* উপভোগ্য রচনা।

এই ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে মাসিক সাহিত্যে আমরা সরলা দেবীকে আবার কিছুদিনের জন্য *ভারতী* পত্রিকার সম্পাদিকারূপে দেখতে পেয়েছিলেম; তারপর *ভারতী* পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়েছে। ১৩৩২ সাল থেকে সরোজনলিনী নারীশিক্ষা সমিতির মুখপত্র স্বরূপ *বঙ্গলক্ষ্মী* নামে একখানি মাসিকপত্র প্রথমে কুমুদিনী বসু বি. এ.-র সম্পাদনায় প্রকাশ হতে শুরু হয়। ১৩৩৪ সাল থেকে *বঙ্গলক্ষ্মী*-র সম্পাদন ভার গ্রহণ করেছেন শ্রীমতী হেমলতা দেবী। এই সময়ের মধ্যেই ঢাকা থেকে লীলা নাগ এম. এ.-র সম্পাদনায় *জয়শ্রী* নামে একখানি সম্পূর্ণ মহিলাদের পরিচালিত ও মহিলা লেখিকাদের রচনাপুষ্ট নারী সম্প্রদায়ের মাসিকপত্র প্রকাশ হতে শুরু হয়েছে। *জয়শ্রী*-র সাহায্যে আমরা বহু নবীনা নারী লেখিকার উৎকৃষ্ট রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। তাছাড়া চিত্রকলায় নারী-শিল্পীরা যে কত বেশি উন্নতিলাভ করেছেন, *জয়শ্রী* আমাদের প্রতিমাসেই তার পরিচয় দিয়েছেন। লীলাবতী নাগের পর শকুন্তলা রায় বি. এ. ও বীণাপাণি রায় বি. এ., পর পর *জয়শ্রী* সম্পাদনার ভার নিয়েছেন। অধুনা-বিলুপ্ত *মাতৃ-মন্দির* পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদকের অন্যতমরূপে এ-সময় আমরা শ্রীমতী সুরবালা দত্তের নাম পাই। বিভিন্ন মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় লেখিকারূপে আজ আমরা অসংখ্য মহিলার সাক্ষাৎ পাচ্ছি যাঁরা উপযুক্ত সাধনা ও অনুশীলনের গুণে অদূর ভবিষ্যতে যশস্বিনী লেখিকা হয়ে উঠতে পারবেন বলে আশা হয়। তাছাড়া আর একটা অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, এই ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি মোসলেম মহিলা সাহিত্যক্ষেত্রে উদয় হয়েছেন। *রূপরেখা* ও *বর্ষবাণী* নামে কয়েকবার কয়েকখানি উচ্চাঙ্গের 'বার্ষিকী' পত্রিকা যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা

করে কুমারী জাহানারা চৌধুরী যশস্বিনী হয়েছেন। নবীনা মোসলেম রচয়িত্রীদের মধ্যে কাব্য-প্রতিভার উচ্চ প্রকাশ দেখে বিস্মিত হতে হয়। অধুনা-বিলুপ্ত *নওশের, সওগাত* ও জীবিত মোসলেম পত্রিকা *মহম্মদী, বুলবুল* প্রভৃতির পৃষ্ঠায় অনেক মোসলেম মহিলা লেখিকাদের নব নব রচনা-পাঠে আশা হয় বঙ্গ-সাহিত্যকে তাঁরাও অদূর ভবিষ্যতে সুসমৃদ্ধ করে তুলবেন।

মহিলা মজলিস নামে আটজন মহিলা লেখিকার রচিত একখানি বারোয়ারি উপন্যাস এ-যুগের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বঙ্গাব্দ ১২৪১ থেকে ১৩৪৩ সাল পর্যন্ত এই শতাব্দীকালের বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের দান সম্বন্ধে যে সামান্য একটু পরিচয় দেবার চেষ্টা করলেম, এর মধ্যে অনেক অসম্পূর্ণতা ও ভুলচুক হয়ত রয়ে গেল, কিন্তু, এ-থেকে একটা কথা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, শিক্ষা ও সাহিত্যানুশীলন নারীজাতির ক্রমোন্নতির পক্ষে কতখানি সাহায্য করেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হতে বাংলা দেশে নারীদের মধ্যে উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই সময় থেকেই মহিলারাও পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ., এম. এ. প্রভৃতি ডিগ্রি লাভ করতে সমর্থা হয়েছেন। সে-যুগে 'নারীর অধিকার' দাবি করে যে-সকল মহিলা লেখনী ধারণ করেছিলেন, সংখ্যায় তাঁরা অসংখ্য না হলেও সেই অল্প কয়েকজনের সাধনা ও আন্তরিক ইচ্ছা আজ জয়যুক্ত হয়েছে। আজ বাংলা দেশের জেলায় জেলায় স্কুল, কলেজ, সমিতি, সংঘ, লাইব্রেরি, ক্লাব, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষামন্দির ও আশ্রম ইত্যাদি নারী শিক্ষা, নারী-প্রগতি, নারী কল্যাণ ও উন্নতির প্রবর্তক বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে।

ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে অধুনা স্বল্পবিত্ত গৃহস্থ-কন্যারা, শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী, টাইপিস্ট, শুশ্রূষাকারিণী, ক্যানভাসার, ইনশিওরেন্স এজেন্ট প্রভৃতি নানা স্বাধীন কাজে সম্ভ্রমের সঙ্গে জীবিকা অর্জন করে নিজের ও পরিবারবর্গের ব্যয় নির্বাহে সাহায্য করছেন। আজ মহিলা ডাক্তার, উকিল, এডভোকেট ও ব্যারিস্টারের অভাব নেই। পঞ্চাশ বৎসর আগে কেউ কল্পনাও করতে পারত না যে বাঙালীর মেয়ে একদিন এ-দেশে অখিল ভারত জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের সভানেত্রী হয়ে বসবেন, নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভানেত্রীর আসন অলংকৃতা করবেন, স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দিয়ে হাসিমুখে কারাবরণ করবেন, নাগরিক সভা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হবেন, সরকারী বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শিকা নিযুক্ত হবেন, রাষ্ট্রীয় পরিষদে সাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরূপে গিয়ে দাঁড়াবেন।

সেদিন যা ছিল অসম্ভব ও অভাবনীয়, আজ তা সহজ ও প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে উঠছে।

সাহিত্যের সকল বিভাগেই আজ বঙ্গমহিলারা এসে সোৎসাহে যোগ দিয়েছেন। শিক্ষিতা নারীর সংখ্যার অনুপাতে সাহিত্যের ভাণ্ডারে আজ তাঁদের দানের পরিমাণ

দেখলে শতাব্দীকালের মহিলাদের কেবলমাত্র সাধনাই আমরা দেখেছি। কোনো কোনো স্থলে হয়তো বা শক্তিরও কিছু নিদর্শন দেখা গেছে। কিন্তু আজও পর্যন্ত প্রতিভার সাক্ষাৎ পাইনি। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের আগমন ঘটেছে মাত্র, আজও পর্যন্ত আবির্ভাব ঘটেনি। তবে আশা করা যায়, এই আন্তরিক প্রচেষ্টা বা সাধনাই একদিন তাঁদের জয়যুক্ত করে তুলবে। বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের লেখনীর মধ্যে আমরা কেবলমাত্র সাধনারই পরিচয় পাব না—প্রতিভারও পরিচয় পাব।

শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৪৪

শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দিকে শোকসভা ও স্মৃতিসভার সাড়ম্বর সমারোহে মনকে সান্ত্বনার পরিবর্তে যেন বেদনাই দিচ্চে। এ যেন তাঁর চলে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে নিজেদেরই প্রচার করা। বিশেষ করে যাঁরা তাঁর সাথে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য পেয়ে তাঁর সংশ্রবে ছিলেন, তাঁরাও যখন তাঁর মহাযাত্রার সপ্তাহকাল অতিক্রান্ত না হতেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধপাঠ ও বড় বড় কবিতা লিখে জনসভায় উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতে প্রবৃত্ত হলেন, তখন মন সত্যসত্যই দুঃখে ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লো। স্বর্গগত আত্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদনের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তারও উপযুক্ত স্থান কাল আছে মনে হয়।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বলবার লিখবার সমস্ত ভাবী কাল তো সম্মুখে পড়ে রয়েছে। আজকের দিনে আমার বারে বারে কেবলমাত্র এই একটি কথাই মনকে নিরতিশয় বেদনার্ত করে তুলেচে যে, তিনি সত্যই চিরদিনের মতো আমাদের মধ্য হতে চলে গিয়েছেন। আর কখনও কোনোদিনই ফিরে আসবেন না। সুখে দুঃখে, আনন্দে উৎসবে, আপদে বিপদে তাঁর অকৃত্রিম আত্মীয়তা আর পাওয়া যাবে না।

সেই খামখেয়ালি আত্মভোলা এলোমেলো মানুষটির মধ্যে অতিশয় কোমল এবং অত্যন্ত সেণ্টিমেণ্টাল একটি অন্তর ছিল, যা সহজে বাহিরের লোকের কাছে প্রকাশিত হতো না; বরং শুষ্কতার আবরণে সংযুক্ত থাকত। যতখানি তিনি গভীর ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন, ততখানিই ছিল তাঁর ঈশ্বর সম্বন্ধে মুখে উপেক্ষা। 'আমি তো একটি মহা নাস্তিক'—এ-কথা তাঁর মুখে বহুবার শুনলেও যাঁরা তাঁকে চিনতেন তাঁরা জানতেন এই মৌখিক কথার মূল্য কতটুকু ছিল তাঁর জীবনে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি তাঁর সাহিত্যগুরু বলে মনে মনে পূজা করতেন, কিন্তু সেও তাঁর ঐ নাস্তিকতার আবরণে

* শরৎচন্দ্রের অষ্ট-পঞ্চাশৎ জন্মদিন উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনা-সভায় হাওড়া টাউনহলে পঠিত।

আবৃত গভীর আস্তিক্য বুদ্ধির মতোই ছিল একান্ত সঙ্গোপন। যাঁদের কাছে মন খুলে তিনি এ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, তাঁরা জানেন, কী নিবিড়তম শ্রদ্ধাই ছিল তাঁর রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি।

তিনি বলতেন—'বাংলা সাহিত্য বলতে আর অন্য কিছু আছে কি ? বাংলা পড়তে হলে একমাত্র রবিবাবুই তো সম্বল।' বহুবার তাঁকে দুঃখ করে বলতে শুনেচি —'বাংলা দেশে প্রকৃত রসিক সাহিত্য সমজদার এখনও বেশি জন্মেনি। রবীন্দ্র সাহিত্যের সম্যক রস গ্রহণ করতে পারে এমন সমজদার শিক্ষিত লোকের মধ্যেও কম।

'অধিকাংশ লোকই দেখি বুঝুক না বুঝুক ফ্যাশানের খাতিরে বুঝদারের ভান করে। কিন্তু চেপে ধরলে আবার তারাই দেখি রবীন্দ্র সাহিত্যের দুর্বোধ্যতার অপবাদ দেয় সবচেয়ে বেশি। এদের সাথে একটু বিপরীত সুরে কথা কয়ে দেখেচি এরা প্রাণ খুলে রবীন্দ্রনাথের নিন্দা ও ত্রুটির তালিকা দিতে শুরু করে দেয় এবং আমাকেও ওদেরই দলের একজন ঠাউরে নিয়ে খুশি হয়ে ওঠে। ঐ সকল লোকেরাই যখন আমার রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমারই সামনে আরম্ভ করে, তখন হাসি পায়, দুঃখও হয়। আমি অনেক লোকের পরেই এই সূত্রে শ্রদ্ধা হারিয়েছি। আমার এ পরীক্ষায় দু'চারজনকে মাত্র উত্তীর্ণ হতে দেখেছি।'

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই শরৎচন্দ্রের কণ্ঠস্থ ছিল; 'বলাকা' ছিল তাঁব সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাব্য। 'বলাকা'র প্রত্যেকটি কবিতা তিনি অনর্গল আবৃত্তি করে যেতেন; স্মরণশক্তি ছিল তাঁব অসাধারণ তীক্ষ্ণ !—কোনোখানে আটকাত না বা ভুল হতো না। তাঁব সাথে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনায় যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। বহু দীর্ঘ সন্ধ্যা রাত্রিতে পরিণত হয়েছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেছে আমাদেব কাব্য সাহিত্য আলোচনায।

কতবার তিনি হেসে বলেচেন—সংসারে খাঁটি ভক্ত মেলা ভার, রাধু ! রবিবাবুর সামনে যাবা নিজেদেব পরম ভক্ত বলে প্রমাণ করে থাকে, তাদেরও নেড়েচেড়ে দেখেছি ভিতরে ফাঁকি ভরা। আমার সামনে যারা আমার স্তুতিবাদ করে, তারা আড়ালে যে আমার নিন্দাই করবে এ তো স্বাভাবিকই !

তাঁর দ্বিতলের পাঠকক্ষে যাঁরা যাবার অধিকার পেয়েছিলেন তাঁরা দেখে থাকবেন, ববীন্দ্রনাথের সমস্ত পূর্বতন ও আধুনিক গ্রন্থ ছিল তাঁর সর্বক্ষণের প্রিয়সঙ্গী। তাঁর মুখে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার গুটিকয়েক পংক্তি প্রায়ই শোনা যেত, অনেকে নিশ্চয় শুনেও থাকবেন। আজকের দিনে আমার সবচেয়ে মনে পড়চে শরৎচন্দ্রের কণ্ঠে বারংবার শোনা রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার লাইন ক'টি :

বাঁশি যখন থামবে ঘরে, নিভবে দীপেব শিখা,
এই জনমের লীলার 'পরে পড়বে যবনিকা;
তখন যেন আমাব তরে
ভিড় না জমে সভার ঘরে

হয় না যেন উচ্চস্বরে
শোকের সমারোহ;
সভাপতি থাকুন বাসায়,
কাটান বেলা তাসে পাশায়,
নাই বা হোলো নানা ভাষায়
আহা উহু ওহো।
নাই ঘনালো দল-বেদলের
কোলাহলেব মোহ।

শরৎচন্দ্র স্বভাবত আত্মগোপনশীল মানুষ ছিলেন। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত করা ছিল তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তাঁর চরিত্রের মধ্যে একাধিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর গভীর ও বহুবিচিত্র। অনেক আশ্চর্য কাহিনীই তাঁর মুখে বহুবার শুনেছি। এই সকল ঘটনা নিয়ে তাঁকে আত্মজীবনী লিখবার অনুরোধ করলে তিনি হেসে বলতেন—'জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলিকে অবিকল অপরিবর্তিত অবস্থায় সাহিত্যে রূপ দেওয়া চলে না। সেই অভিজ্ঞতার ফল একমাত্র সত্যকার সাহিত্যসৃষ্টি করার কাজে লাগতে পারে।'

তাঁর বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের ইতিহাস নানা বিচিত্র বেদনা ও আনন্দের নিবিড় রসে পরিপূর্ণ। জীবনকে তিনি অবাধ মুক্তির মধ্য দিয়েই চালনা করে নিয়ে এসেছেন। কখনো কোনো বন্ধন জীবনে গ্রহণ করেননি বা মানেননি। সংসারে একটিমাত্র বন্ধনকে তিনি স্বীকার করতেন এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও তা মেনে নিয়েছেন—সে বন্ধন অকৃত্রিম ভালোবাসার। এই বস্তুটির জন্য তিনি সমস্ত কিছুই অবহেলা করতে পারতেন। তাঁর একাধিক উপন্যাসের নানা স্থানে তাঁর কৈশোর ও যৌবনকালের জীবনের ছায়া সুস্পষ্ট হয়ে তাই ফুটে উঠেছে। আপনার জীবনে গভীরতর দুঃখের মধ্য দিয়ে তিনি জীবনকে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন, সে দুঃখ তাঁর হৃদয়কে খাঁটি সোনা করে তুলেছিল। অন্তর বেদনার এমনতর পরম অভিজ্ঞতা না থাকলে হয়তো এরূপ গভীর রসসৃষ্টি করা তাঁর ঘটে উঠত না। শরৎসাহিত্যের বিশেষত্বই হচ্চে, জীবনের কঠোর বাস্তবতার সাথে সুষমা-স্নিগ্ধ কল্পনার অপূর্ব সুসঙ্গতি।

শরৎচন্দ্রের সেই পরদুঃখকাতব কোমল অন্তঃকরণটির সাথে পরিচয় যাদের ঘনিষ্ঠভাবে ঘটেছিল, তাঁর আন্তরিক অকৃত্রিম স্নেহ যারা নির্বারিত ধারায় লাভ করেছে —আজ সাহিত্যস্রষ্টা শরৎচন্দ্রের চেয়ে মানুষ শরৎচন্দ্রকে হারানোর বেদনাই তাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে এবং উঠবে। সেই নিরভিমানী স্নেহপ্রবণ শুভ্রকেশ মানুষটির প্রসন্ন হাস্যস্মিত মুখ আর যে তাদের ঘরে সময়ে অসময়ে দেখা দেবে না, রোগের দিনে আপদ বিপদের দিনে আত্মীয়েরই মতো অকৃত্রিম উৎকণ্ঠায় আন্তরিক সহানুভূতি দান করবে না, বিরামের ক্ষণ তাঁর সাহচর্যে নানা আলাপ আলোচনায় রঙ্গ-রসিকতায় গল্পে-কাব্যালোচনায় সুন্দর মধুর হয়ে উঠবে না—এই ক্ষতিটাই এখন সবচেয়ে বাস্তব হয়ে কঠিন বেদনায় বুকের মধ্যে বাজছে। স্রষ্টা ও শিল্পী শরৎচন্দ্রের মৃত্যু নেই,

তিনি অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেন তাঁর সৃষ্টিরই মধ্যে। কিন্তু মানুষ শরৎচন্দ্র যে আর নেই এ ক্ষতির দুঃখ তারা ভুলবে কেমন করে—যারা তাঁর সেই স্নেহস্নিগ্ধ অন্তরের দুর্লভ মমতাস্পর্শ পেয়েছিল?

ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৪৪

রবি-জিজ্ঞাসা

আজকের যুগে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কোনো কিছু বলার প্রকৃত মূল্য যে কতটুকু, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। কারণ, আমরা রবীন্দ্রযুগের মানুষ। আজও রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বর্তমান। আজও তাঁর দিৎসা ক্লান্ত হয়নি; দানের অপূর্বতা সমভাবেই দীপ্যমান।

শৈশবে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বিস্তৃত হতে শুরু হয়েচে আমাদের জীবনে। অক্ষর চিনবার আগেই পরিচয় হয়েচে রবীন্দ্রনাথের গান ও সরল পদ্য বা ছড়ার সঙ্গে। তারপর বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথকে চিনতে লাগলাম শ্রেণীর পর শ্রেণীতে গদ্যে ও পদ্যে। নিম্নতম থেকে উচ্চতম পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীরই মনের ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযুক্ত স্বাদু সুপথ্য আমরা পাঠ, আবৃত্তি, গান মুখস্থ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাঁর কাছ থেকে লাভ করেচি।

আমাদের জীবনে আলো বাতাসেরই মতো একান্ত প্রত্যক্ষ অথচ অগোচরে তিনি আমাদের মনঃপ্রকৃতির গঠন ও পুষ্টিসাধন করেছেন। আজ আমরা যে-রুচি, যে-মন, যে-রসবোধ নিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যকে বিচার করতে বসব, সে-মন যে তাঁরই রুচির আলোয় দৃষ্টিসম্পন্ন। সুতরাং লবণপুত্তলীর সমুদ্র মাপতে যাওয়ার মতো আমাদেরও সহজেই মিশিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রবীন্দ্রসাহিত্যের পারাবারে।

তাই মনে হয়, রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ের কাজ ভাবীকালের, বর্তমানের নয়। কারণ, এখনও আমরা তাঁর দানের প্লাবনে প্লাবিত, বিস্ময়ের পর বিস্ময়ে আচ্ছন্ন অভিভূত।

বর্তমান কালের কর্তব্য তাঁর সার্বত্রিক সাহিত্যকে সযত্নে ও সাবধানে বিচয়ন করা। যে-কাজ ভবিষ্যৎকালের দ্বারা সম্ভব নয়।

'সার্বত্রিক' শব্দটি আমি যে অর্থে ব্যবহার করতে চেয়েছি, খুলে বলি। সার্বত্রিক সাহিত্য বা সর্বত্রব্যাপী সাহিত্য অর্থে বলতে চেয়েছি, বিশ্বভারতীর মুদ্রাযন্ত্রের বাহিরেও তাঁর যে মহামূল্য বিপুল দান ছড়িয়ে হারিয়ে গিয়েছে ও যাচ্ছে, তাদের বিচয়ন (অর্থাৎ—অনুসন্ধান, সংগ্রহ, একত্রকরণ ও সঞ্চয়) করে সাহিত্যলক্ষ্মীর ডালায় সাজিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল বর্তমান কালের। যেমন, তাঁর অননুকরণীয় স্বকীয়তাপূর্ণ

কথোপকথন, আলাপ আলোচনা। সুমধুর অথচ সুতীক্ষ্ণ, স্বচ্ছ অথচ দ্ব্যর্থক রহস্যালাপ। জীবনের বিচিত্র অনুস্মৃতির মৌখিক ব্যঞ্জনা। বিভিন্ন মনীষী, শিল্পী, বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রনেতা, নারী, ছাত্র, যন্ত্রী, সমাজকর্মী, বন্ধু, প্রার্থী, জিজ্ঞাসু, দর্শনার্থী প্রভৃতির সঙ্গে তত্তদ্ বিষয়ে আশ্চর্য মেধা-প্রদীপ্ত সুন্দর আলোচনা ও আচরণ।

তাঁর দেশ দেশান্তরে যাত্রার ছোট বড় সমস্ত ঘটনা; দেশবিদেশের নানা গুণী, জ্ঞানী, মনীষী, রাষ্ট্রনেতা, সমাজনেতা, রাজ্যাধিপতিদের সঙ্গে তাঁর মিলন ও আলাপের সুস্পষ্ট অনুলিপি। সমগ্র পৃথিবীর নানা সমাজের নানা জাতীয় মানুষদের কাছে যে কত রকমে সম্মান ও আদর পেয়েছেন, দেশে দেশে কত রকমই যে তুচ্ছ ও বৃহৎ বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে তাঁর জীবনে, তার সামান্য অংশমাত্রই ভবিষ্যৎ কালের জন্য লিপিবদ্ধ করা আছে। তিনি নিজে যেটুকু চিঠিপত্রে ডায়েরিতে বা অন্য রচনার মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন, তার বেশি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। কিন্তু নিজের বিপুল সম্মান সমারোহ ও সমাদর সম্বন্ধে ছোটখাটো ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিতে তাঁর স্বাভাবিক সংকোচের বাধা ঘটেছে, সুতরাং যতটুকু মাত্র তাঁব নিজের মুখে সংক্ষিপ্ত প্রকাশ শোভন, তদতিরিক্ত সুসম্পূর্ণ বিবরণ ও প্রমাণ বাদ পড়ে গেছে। এইগুলি ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োজনে বর্তমান কালের সদ্য-সদ্য অনুস্যূত করার দায়িত্ব ছিল। আজও আছে।

তাঁর সাহিত্যের স্বরূপ নির্ধারণ বর্তমানের পক্ষে সুকঠিন। নিকট-ভবিষ্যৎও এ পারবে বলে মনে হয় না। এ কাজে সমর্থ হবে দূর ভবিষ্যৎ।

•

রবীন্দ্রনাথকে সম্যক্‌রূপে জানা অনায়াসসাধ্য নয়। তাঁর মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। বহুমুখীনতার অন্ত নেই। রবীন্দ্রনাথ মাত্র একজন ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর মধ্যে এক বিশাল মানবগোষ্ঠী বিদ্যমান। যাদের সমন্বয় এক বিরাট সংস্কৃতিকে মূর্ত করে তুলেছে। সেই বহুবিচিত্র জনতার উৎসব-অঙ্গনে আমরা কার দেখা না পাই? আছেন তার মধ্যে উদার জ্ঞানীপুরুষ, যাঁর জ্ঞান গভীরতায় অতল, ব্যাপকতায় যুগযুগান্ত পরিব্যাপ্ত। আছে চির সুকুমার কলভাষী শিশু, যার উল্লাস-কাকলিতে অপরিসীম আনন্দ উচ্ছ্বসিত কিন্তু অর্থ বা সংগতির দিকে খেয়াল নেই। তার মধ্যে আছেন প্রশান্ত ঋষি, যাঁর দৃষ্টিপথে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ত্রিকাল উদ্ভাসিত। আছে বলদৃপ্ত চিরনবীন যুবা, যার উদ্দীপনা ও অগ্রবেগের আজও বিরাম নেই। আছে কৌতূহলী চঞ্চল কিশোর বালক। তার মধ্যে আছে নব নব চারুকারুশিল্পী, আশ্চর্য প্রতিভাশালী নট, অসামান্য গায়ক, অপূর্ব সুরস্রষ্টা, অদ্ভুত রূপকার। তার মধ্যে বিদ্যমান বিচিত্ররূপিণী নারীপ্রকৃতি, যাদের দেখা পেয়েছি তাঁর কাব্যে, নাট্যে, গল্পে, গানে, উপন্যাসে। এই জনতারই মধ্যে স্থির আত্মসংস্থায় অটল রয়েছেন এক নিঃস্বার্থ রাজনীতিক। যাঁর লক্ষ্য সামান্যে নিবদ্ধ নয়, বিস্তীর্ণ ভবিষ্যৎপ্রসারী। কোনো কারণেই যিনি সুদূর পরিণাম বিস্মৃত নন এবং বর্তমানের ক্ষণিক উত্তেজনায় যাঁর স্নায়ু কখনই সাময়িক চঞ্চল হয় না। এই জনসমারোহে আছেন অকৃত্রিম দেশসেবক, সমাজ সংস্কারক, পল্লীউন্নয়নকারী

গণসেবক। আছেন অনলস অক্লান্ত কর্মী পুরুষ,—আছেন ঘর-পালানোমনা স্বপ্নলোকবিহারী কবি। আছেন অপরিণতমনা বালককুলের উপযুক্ত শিক্ষক; আছেন শিক্ষিত জ্ঞানপ্রার্থী ছাত্রদলের আচার্য। এই বিস্ময়কর জনকল্লোলের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এক উদাসী বৈরাগী বাউল। এঁর কোনো কামনা বাসনা নেই, গৃহের বন্ধন, সমাজের শাসন নেই, পথে পথে ষড়ঋতুর তালে তালে আনন্দের গান গেয়ে বেড়ানোই একমাত্র কর্ম। মনের মানুষ খুঁজে খুঁজে, হেসে কেঁদে নেচে গেয়ে ফেরে এই ক্ষ্যাপা বাউল। বাংলার আকাশ বাতাস অনুরণিত হয়ে উঠেছে এর স্বকীয় গানে গানে আর নিজস্ব ভঙ্গির সুরে সুরে।

শুধু এরাই নয়, আজও এই অশীতিতম বয়সেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একদল ছাত্র, তাদের অপরিসীম জ্ঞানস্পৃহা নিয়ে অধ্যয়ন করে চলেছে। যাদের কেউ পাঠ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান, কেউ পাঠ করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শনশাস্ত্র, কেউ পাঠ করে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, আবার কেউ বা অধ্যয়ন করছে একান্ত অভিনিবেশে হোমিওপ্যাথি বাইওকেমিক চিকিৎসাশাস্ত্র। যে ছাত্রদলের মধ্যে ভাষাতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বের ছাত্রদের পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যায় ভূতত্ত্ব বা কৃষিতত্ত্বের ছাত্রকে।

একজন কবির মধ্যে এই বিভিন্ন জ্ঞানপিপাসু ছাত্রমণ্ডলী দেখে সত্যই আশ্চর্য অভিভূত হতে হয়। মনে হয়, বিশ্বভারতী কবির কেবলমাত্র কল্পনারই সৃষ্টি নয়, অন্তরের প্রতিচ্ছবি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এবং অন্তর্লোকও যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। যেখানে বিশ্বজগতের নানা বিষয় নিয়ে অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলীর অধ্যয়ন অধ্যাপনার বিরাট দৃশ্যে বিস্ময়বিমুগ্ধ মানুষ নতশির না হয়ে থাকতে পারে না।

এই মহান জনতীর্থে আমরা দর্শন পেয়েছি, ধ্যানী মানবের, জ্ঞানী মানবের, কর্মযোগী মানবের, প্রেমিক মানবের, বিপ্লবী মানবের। দেখেছি রাজাধিরাজোচিত ভোগী, দেখেছি সর্বস্বত্যাগী অনাসক্ত পুরুষ। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, আমরা পাই প্রকৃত অকৃত্রিম আভিজাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ—আবার তারই পাশেই দেখেচি একজন নিরভিমান, ভিক্ষাপাত্রহস্ত, পথচারী মহাভিক্ষু।

ব্যষ্টি মানুষের মধ্যে মানবপ্রকৃতির সমষ্টিরূপের এমন সাংস্কৃতিক সুন্দর প্রকাশ এর আগে বোধ হয় আর কোথাও দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনে প্রাচ্যের অতলস্পর্শী জ্ঞানের এবং পাশ্চাত্যের বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। আর তারই ফলে জীবন হয়ে উঠেছে তাঁর এক আশ্চর্য মহামূল্য সামগ্রী।

আমরা পরম সৌভাগ্যশালী মানব, আমরা রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্মেছি, রবীন্দ্রনাথের ভাষাই আমাদের ভাষা, সর্বোপরি, রবীন্দ্রনাথকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। আগামীকালের রবীন্দ্রানুরাগী দিদৃক্ষু মানবদের কাছে আমরা সশ্রদ্ধ-সবিস্ময় ঈর্ষার পাত্র।

প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৮

শিব ও শক্তি

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা স্ত্রী-জাতিকে স্বীকার করেছে শক্তিরূপে। যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা—শ্লোকটি অতিশয়োক্তি নয়। কেননা, জীবজগৎ তাদের অস্থি মজ্জা রক্ত মাংস সহ জীবনীশক্তি লাভ করে feminine sex-এর কাছে। সমস্ত জীবজগতের অস্তিত্বকে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠার শক্তিদান করে মাতৃশক্তি। স্ত্রী-জাতি মাতৃশক্তির আধার।

আশ্চর্য ঠেকে, যে-দেশে নির্মুক্ত স্বচ্ছবুদ্ধির অনাবিষ্ট বিচারে স্ত্রী-জাতির এমন মর্যাদাসূচক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কেমন করে সে দেশের নারীজাতির এই বিপুল মূঢ়তা, জড়ত্ব এবং মনুষ্যত্ববোধ-বিস্মৃতি সম্ভবপর হলো।

ভারতে স্ত্রী-জাতি বারবার শক্তিরূপে বর্ণিত হয়েছেন। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, প্রভৃতির মধ্যে এককালে যে আদর্শ অভিব্যক্ত হয়েছিল, সম্ভবত সে পুঁথিগত আদর্শমাত্র। জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে কোনোখানে এ আদর্শের সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বৈদিক যুগের এবং পরবর্তী আমলের, আঙুলে গোণা যায় এমন কয়েকটি মহিলার জ্ঞান ও শিক্ষার প্রমাণ দেওয়া হয়। বিরাট ভারতীয় মানবসভ্যতার পরিমাপে তাঁদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে, তাঁদেরকে ব্যতিক্রম (exception) বলে ধরা উচিত। তাঁদের নাম নিয়ে কেবলমাত্র এইটুকুই সপ্রমাণ করা যায়, স্ত্রী-জাতির মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা, বিদ্যাস্পৃহা, অধ্যাত্মস্পৃহা সম্ভব। সুযোগ ও অধিকার পেলে পুরুষেরই মতো তারা মানসিক উৎকর্ষে সার্থকতা লাভ করতে পারে। কিন্তু তাঁদেব দ্বারা তৎকালীন সমগ্র নারী-সমাজের সাংস্কৃতিক সুন্দর চেহারা প্রমাণিত করার চেষ্টা ভুল।

অতীতের পাতা উল্টালে দেখতে পাই, ভারতবর্ষের নারীশক্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শবরূপিণী মাত্র। তার চিৎশক্তিশূন্য নিষ্ক্রিয় দেহ যুগের পর যুগ পড়ে আছে। নেই আত্মচেতনা, নেই প্রাণস্পন্দন। এই নিশ্চল লাশ অভিচারীর আসন মাত্র।

কথাটা আর একটু স্পষ্ট করি।

নিশ্চিহ্নিত কোনো সুদূর অতীত হতে পুরুষের দৃষ্টি সংকীর্ণভাবে আত্মকেন্দ্রাতিগ হয়ে পড়েছে। তারই পবিণতির ফল, পুরুষজাতির মনুষ্যত্ব মর্যাদা-বিস্মৃতি আর স্ত্রী-জাতির মনুষ্যত্ববোধের অপমৃত্যু।

সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি আত্মকেন্দ্রীভূত হওয়ার অনিবার্য পরিণাম—কল্যাণবুদ্ধির বিলোপ বা বৃহত্তর স্বার্থ সম্বন্ধে দৃষ্টিহীনতা।

মনঃসমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, অতিরিক্ত স্বার্থচেতনা বা অত্যধিক আত্মপরতন্ত্রতা ক্রমশ বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে দায়িত্ব বিস্মৃত করে। নিজের সংকীর্ণ স্বার্থসঞ্জাত যে কয়েকটি বিশেষ প্রবণতা বা ইচ্ছা থাকে, সেই কয়টিকে কেন্দ্র করে তখন তার সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি,

চিন্তা ও যুক্তি আবর্তিত হতে থাকে। দেশের, সমাজের ও পরিবারের প্রতি ছোট-বড় বিবিধ কর্তব্য ও আচার-ব্যবহারের দায়িত্ব বহন করতে মস্তিষ্ক অপারগ হয়ে পড়ে। কেবল নিজের ব্যক্তিগত মনের কোণের কয়েকটিমাত্র অভিরুচিই তার একমাত্র চিন্তনীয় হয়ে ওঠে। মানসিক সেই অসামঞ্জস্যময় অবস্থাকে মানসিক বিকৃতি বা monomania বলা হয়ে থাকে।

ইংরাজিতে উন্মত্ততাকে বলে insanity। ইংরাজি sanity শব্দের বাংলা—কর্তব্যজ্ঞান। Insanity-র শব্দগত অর্থ—কর্তব্যবোধের অভাব।

ভারতবর্ষের মানুষ এখন দুটি ভাগে বিখণ্ডিত—আর দুটি অবস্থাপ্রাপ্ত। এক, স্ত্রী-জাতি বা মনুষ্যত্ববোধ বিরহিত স্ত্রী-মনুষ্য; যারা পুংমনুষ্যের রুচির ও প্রয়োজনের কলে তৈরি জীবন্ত পুতুল। এর বেশি কিছু নয়।

দ্বিতীয়, পুংমনুষ্য বা তথাকথিত পুরুষ মানুষ। মনুষ্যত্ববোধ লাভের সর্বপ্রকার অধিকার লাভ করেও যারা মনুষ্যত্ববোধবিস্মৃত।

মানবতার পরিমিতিতে বিচার করলে দেখা যায়, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে কর্তব্যবোধহীনতার প্রমাণ যথেষ্ট। সুতরাং অসমঞ্জস্ স্বার্থপরতন্ত্রতা ও তার অবশ্য পরিণাম কর্তব্যবোধ বিস্মৃতির দায়ে এঁদের বিকৃতবুদ্ধি মানব (Insane) বললে অপরাধ নাও হতে পারে।

আগে তাই বলেছি,—কোনো এককালে এদেশেরই মানুষের মননশীলতার উৎকর্ষে —শিব ও শক্তির আবির্ভাব হয়েছিল। আজ আর তা নেই। আছে নারীমানবের শব। আর, তাকেই শবাসন করেছেন অভিচারী পুরুষ-মানব।

যিনি তুচ্ছ সংকীর্ণ স্বার্থের সিদ্ধি আকাঙ্ক্ষায় স্বাতন্ত্র্য প্রক্রিয়ায় নিরত। যদিও সে প্রক্রিয়া তাঁর নিজেরই বৃহত্তর স্বার্থকে প্রতিমুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, কিন্তু সে বুঝবার মতো সুস্থ কল্যাণ-বুদ্ধি তার অবলুপ্ত।

ভারতবর্ষের বিরাট নারীসমাজের মূক-বধির-পঙ্গু চেহারার পানে তাকিয়ে—শক্তিপূজার মহোৎসবকে শোচনীয় পরিহাস বলেই মনে হয় না কি?

যুগান্তর, শারদীয় সংখ্যা ১৩৪৮

নিরুপমা দেবীর মৃত্যুতে শরৎচন্দ্রের শ্রাদ্ধ !

আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে—'ধান ভানতে শিবের গীত'। সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা নিরুপমা দেবীর মৃত্যুতে স্বর্গগত শরৎচন্দ্রের আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করেছেন 'কথাসাহিত্য' মাসিকপত্র। শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য করেছেন, মাননীয়া অনুরূপা দেবী।

বাল্যসখীর মৃত্যুতে তিনি গভীর শোকার্তা। তাঁর কাছে আমরা স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবী সম্বন্ধেই কিছু শুনব আশা করেছিলাম। শুনলাম কিন্তু বাংলাদেশের সর্বজনমান্য এবং সর্বজনপ্রিয় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের প্রতি অহেতুক তীব্র কটুক্তি। শুধু তাঁর ব্যক্তিগত কুৎসাই নয়, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভাকেও অস্বীকার এবং তাচ্ছিল্য। শরৎচন্দ্র অসত্যবাদী ও মিথ্যা গুজব-রটনাকারী বলে অপপ্রচার।

একজন প্রসিদ্ধ লেখিকার লোকান্তর ঘটেছে। তাঁর স্মৃতিতর্পণ করতে বসেছেন আর একজন প্রসিদ্ধ লেখিকা। তদুপলক্ষে আর একজন প্রসিদ্ধতম লোকান্তরিত লেখকের স্মৃতির প্রতি সম্মার্জনী তাড়না হলো। এতে পরলোকগতা লেখিকারও স্মৃতিকে অসম্মানিত করা হয়েছে কিনা সেটা সাধারণের বিচার্য। তবে বাংলাদেশের সাহিত্যরসিক যে-কোনও মানুষই স্বর্গতঃ শরৎচন্দ্রের এই আকস্মিক লাঞ্ছনায় বিস্মিত ও বিচলিত হবেন নিঃসন্দেহ।

হয়েছে লেখিকা নিরুপমা দেবীর মৃত্যু। কিন্তু পাঠকদের শুনতে হলো, অনুরূপা দেবীর 'জীবনের প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ পিতামহদেব' ভূদেবের 'মহাপ্রয়াণের' মহান বর্ণনা।

> —১লা জ্যৈষ্ঠ উদ্যত বজ্র মাথার উপরে খসেই পড়লো, জীবনের প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপ আমাদের পিতামহদেব মহাপ্রয়াণ করলেন।...আমাদের বাড়ী সমস্ত মাস ধরে কালবৈশাখীর বজ্রগর্ভ আসন্নবর্ষী কালমেঘে সমাচ্ছন্ন থেকে ১৩০১ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ বৈশাখী একাদশীর পরিপূর্ণ চন্দ্রকরোজ্জ্বল সুধা-ধবলিত মধ্যরাত্রে সেই সভয়-প্রতীক্ষিত অশনি নিপাতে কম্পিত হয়ে উঠলো। দুজন রাজ-কবিরাজ গৃহে মাসাধিককাল ধরেই উপস্থিত, তাঁদের সঙ্গে পিতামহদেবের সর্ত্ত হয়েছিল, সময় বুঝলেই তাঁরা—শুশ্রূষাকারী চারজন ব্রাহ্মণ সন্তান যাদের এই উদ্দেশ্যেই অন্য কাজ থেকে ছাড়িয়ে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের—ইঙ্গিত দেবেন, তারাও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল, সজ্ঞানে তাঁকে তাঁরই গৃহতলবর্ত্তী জাহ্নবীতীরস্থ করবে। ছেলেরা হয় তো আপত্তি করবেন, কিন্তু সে আদেশ তারা মান্য করবে না। ইতিমধ্যে নতুন বিছানাপত্র ও খাট গঙ্গার দিকের ফটকের মাপ দিয়ে তৈরি করান হয়েছিল— ইত্যাদি।
>
> —*কথাসাহিত্য*, পৌষ, ১৩৫৭, ২২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

একান্ত দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, স্বর্গগত শরৎচন্দ্রের যে কল্পিত অপরাধে লেখিকা তাঁর প্রতি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ঘৃণা-বিষাক্ত উগ্রভাষা ব্যবহার করেছেন, শরৎচন্দ্র সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। লেখিকার মনের ভ্রান্ত সন্দেহ ছাড়া তাঁর এ ধারণার অন্য কোনও ভিত্তি নেই। যে-গুজব লোকসমাজে প্রচারিত, তার জন্য

শরৎচন্দ্র দায়ী নন। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র স্বয়ং গুজব-রটনাকারী নন। বহুবার বহু লোক তাঁকে নিরুপমা দেবী সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেছেন, তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রম ও সম্মানের সাথেই নিরুপমা দেবী সম্বন্ধে কথা বলেছেন এবং অনেকের ভ্রান্তি নিরসন করেছেন। এ আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আমরা জানি—স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবীর প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ ও একান্ত শ্রদ্ধা ছিল। সে স্নেহ ও শ্রদ্ধার রূপ সংসারের কোনও ধূলিমলিন কুশ্রী মানসিকতার সাথে তুলনাই হতে পারে না। সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বহুবার তাঁর মুখে শুনেছি, একমাত্র নিরুপমা দেবী ছাড়া বাংলা সাহিত্যে লেখিকাদের রচনা কারুরই শিল্পোত্তীর্ণ বা রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি। মেয়েদের লেখা অত্যধিক কৃত্রিম এবং তাতে স্বকীয়তা অল্পই, একথা তিনি বলতেন। 'বুড়ির লেখার প্রধান গুণ, তার স্বাভাবিক আন্তরিকতা আর সংযম'—এ-কথা তাঁর মুখে অনেকেই শুনেছেন। নিরুপমা দেবীকে কিংবা তাঁর কোনও সমসাময়িক বাল্যবন্ধু সাহিত্যিককে তিনি রচনা শিক্ষা দিয়েছেন, এ ধরণের কথা শরৎচন্দ্রের মুখে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও কেউ কখনও শোনেননি। নিজের সাহিত্য এবং সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে তিনি খুব সামান্যই নিজমুখে আলোচনা করতেন। তাঁর জীবনের গভীব দুঃখসুখেব সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত বেশি স্তব্ধ ছিলেন। কখনও সে বিষয় নিয়ে মুখে নাড়াচাড়া করতে পারতেন না। এ-কাজ অন্যে করে এটাও পছন্দ করতেন না।

সেই আত্মগর্বলেশহীন, আপন-পর সবাকার প্রতি সমভাবে অকৃত্রিম স্নেহশীল, দুঃখীর দুঃখে গভীর সহানুভূতিপরায়ণ আপনভোলা মানুষটির কথা স্মরণ করে তাঁর পরিচিত কাব না চক্ষু আজও সজল হয়ে ওঠে? 'আপনাকে সম্মানিত করার গূঢ় উদ্দেশ্যে' বা 'বিনা কারণে কেবলমাত্র আনন্দ উপভোগের জন্য' তিনি নিরুপমা দেবী সম্বন্ধে কোনও মিথ্যা গুজব বা লঘু গল্প কখনও রটনা করেননি। তার কারণ পূর্বেই বলেছি। তিনি যথার্থই সুচরিতা নিরুপমা দেবী সম্বন্ধে অশেষ শ্রদ্ধা, অকপট স্নেহ এবং মহৎ মনোভাব পোষণ করতেন।

পৃথিবীর সব দেশেই দেখা গিয়েছে এবং যায়—খ্যাতির বিপত্তি আছেই। যাঁরা নিজের শক্তি বা প্রতিভা দ্বারা সাধারণের মধ্যে অসাধারণ হয়ে ওঠেন, তাঁদের সম্বন্ধে বহু মানুষের মুখে বহু রকম গুজব রটনা হয়ে থাকে। সে গুজব ভালো, মন্দ, সম্ভব, অসম্ভব নানাবিচিত্র হয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর জীবনকালেই কতরকমই যে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনেছি তার সংখ্যা ছিল না। তিনি নিজেও এ-সকল গল্প শুনেছেন। সব গল্পই যে খুব খুসি হওয়ার মত, অথবা শ্রুতিসুখকর ছিল, তা' মোটেই নয়। কবি-সম্পর্কে নানা কল্পিত গল্পের মধ্যে কোনও কোনও সুপ্রসিদ্ধা মহিলাব নামও যে জড়িত হয়নি তা' নয়। এখন যদি এইরকম কোনও প্রবাদ বা গুজবের জন্য কেউ পরলোকগত মহাকবিকেই গুজব-রটনাকারী স্থিরসিদ্ধান্ত করে তাঁর স্বর্গতঃ আত্মার উদ্দেশে বদ্ধমুষ্টি তুলে আস্ফালন করেন, তার চেয়ে হাস্যকর ও অদ্ভুত ব্যাপার আর কি হতে পারে?

ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু সিংহাসন-পরিত্যাগী সম্রাট অষ্টম এড্‌ওয়ার্ডের সতীর্থ ছিলেন এবং তাঁর পিতার পোষাক প্যারিস্ থেকে ধোলাই হয়ে আসত, এ গল্প আমরা বহুকাল ধরে শুনে এসেছি। জহরলাল স্বয়ং এ সম্বন্ধে লিখেছেন—

Another equally persistent legend, often repeated inspite of denial, is that I was at school with the Prince of Wales. The story goes on to say that when the Prince came to India in 1921, he asked for me I was then in gaol. As a matter of fact, I was not only not at school with him, but I have never had the advantage of meeting him or speaking to him.

Autobiography of Jawaharlal Nehru. New Edition p. 205

এই থেকে আমরা বুঝতে পারি, 'গুজব' স্বয়ম্ভু। এব উৎস নির্ণয় করা মানুষের সাধ্যাতীত। জহরলাল তাই বলেছেন, গুজবকে যিনি সত্য বলে প্রচাব করেন—'he would get a special mention for being a prized fool.' স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবীর সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী স্বর্গীয় শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে লিখেছেন—

মেয়েদের দানে বাংলাসাহিত্য এতটা সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে যে, লেখকেবা নাগাল পাচ্ছে না—অতএব একটা চ্যাম্পিযানকে খাড়া কবে ওদের খাটো কবা দরকাব, এতবড় স্বার্থকলুষিত সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি তাঁদেব ছিল না। যে-দেশে শীতলা মনসা ওলাবিবিবাও জগৎজননী জগদ্ধাত্রীব সঙ্গে একই উপচারে ও সমান নিষ্ঠায বরঞ্চ ক্ষতিকারিণী শক্তি হিসাবে সমধিক ভয়ে ভক্তিতে পূজাপ্রাপ্ত হন, সেখানে বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি জগতের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাকবিই নন, সাহিত্যিক সর্ব্বশক্তিমানেব সঙ্গে *সাধাবণ শক্তির একজন ঔপন্যাসিককে* সমপর্যায়ে দাঁড় কবাবাব জন্য উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভক্তবৃন্দ ঢাক-ঢোল-দামামা পিটিয়ে অধিকাব *(অনধিকাব বললেও অত্যুক্তি করা নিশ্চয়ই হয না)* স্থাপন করতে কৃতসঙ্কল্প হযে মন্ত্রের সাধনে শরীর পতন কবে। তা' সাধনা কবলে সিদ্ধি আসে বই কি।—

কথাসাহিত্য, পৌষ, ১৩৫৭, ২২০ পৃঃ।

দেখা যাচ্ছে, স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবীর স্মৃতিতর্পণের মধ্যে লেখিকা অনুরূপা দেবীর প্রতিপাদ্য বিষয়, শরৎচন্দ্র সত্যকার প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন না। তিনি একজন 'সাধারণ শক্তির ঔপন্যাসিক' মাত্র। 'উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভক্তবৃন্দের সাহায্যে' তিনি বাংলা সাহিত্যে যে 'অধিকার স্থাপন' করেছেন, তাকে 'অনধিকার বললেও অত্যুক্তি করা নিশ্চয়ই হয় না।'

লব্ধপ্রতিষ্ঠা লেখিকাদেব দানে...মেয়েদেব দানে বাংলাসাহিত্য এতটা সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে যে, পুরুষ লেখকেরা নাগাল পাচ্ছে না—অতএব একজন চ্যাম্পিযান খাড়া করে ওদের খাটো কবা দবকার।

এই রকম একটা ভীষণ ষড়যন্ত্রের ফলেই বাংলাসাহিত্যে রহস্যজনকভাবে শরৎচন্দ্র-রূপ চন্দ্রোদয় ঘটেছে। মাননীয়া অনুরূপা দেবী শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে তার

এই অভিমত অতি তীব্র ভাষায় সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন।

তিনি আরও অনেক গোপন তথ্য আমাদের জানিয়েছেন, যা ভবিষ্যতে শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণাকারীদের হয়ত প্রয়োজনে লাগতে পারে! শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টির মূল কারণ তিনি স্থিরসিদ্ধান্তে ব্যক্ত করেছেন—

বাংলা উপন্যাসের জন্মদাতা (ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাস ছেড়ে দিলে) বঙ্কিমচন্দ্রেব সমস্ত মহিমা গরিমা যে অন্ততঃ পথ-প্রদর্শকেব গৌরবটার সমমূল্যও নয়, বরং কিছু নিচেই নামিযে দেওয়া হয। এতটা আযোজন-পর্ব্বেব প্রয়োজন যে ছিল তার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিও আমবা দেখেছি। যখন সেযুগের সত্যকাব হিন্দুসমাজের পারিবারিক জীবনেব খুঁটিনাটি নিয়ে 'মনস্তাত্ত্বিক" উপন্যাস কযেকজন মেয়েই প্রথম লিখে একান্তরূপেই যশোলাভ কবলেন, সেযুগের সুবিখ্যাত নাট্যকারেরা তাঁদের সেইসব সর্ব্বজনসমাদৃত উপন্যাসগুলিকে নাট্যরূপ প্রদান করে খুব মোটা মোটা অঙ্কের টাকা উপার্জ্জন (তাঁদের মুখেই শোনা) করতে লাগলেন, তখন পুরুষ লেখক সে যাবৎ যাঁবা ইংবেজীব অনুবাদ অথবা ছোট গল্পেব লেখক ছিলেন, তাঁদের হঠাৎ চোখ খুলে গেল। *কথাসাহিত্য*, পৌষ, ১৩৫৭, ২২১ পৃঃ।

বলা বাহুল্য 'সে যাবৎ ইংরেজীর অনুবাদক ও ছোট গল্পের লেখক' বলে লেখিকা শরৎচন্দ্রকেই নির্দেশ কবেছেন। শরৎচন্দ্রের তরুণ বয়সের রচনা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—'আমাদের চক্ষে সে রচনা অদ্ভুতরসই পরিবেশন করেছিল।' একটু পবে আবার কৃপাপরবশ হ'য়ে লিখেছেন—'একজন সমধর্ম্মী লেখককে অবশ্য প্রশংসা ও সহানুভূতিব সঙ্গেই দেখেছি।' এইবার আমরা শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের জীবন এবং নিরুপমা দেবীর সাহিত্য-বচনাব সঙ্গে শবৎচন্দ্রের বচনাব আদর্শগত সম্বন্ধ সম্পর্কে মাননীয়া অনুরূপা দেবী যে সব আপত্তিজনক ভ্রান্ত উক্তি করেছেন—নিরুপমা দেবী এবং শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট মহাশয়েব শরৎচন্দ্রেব সম্বন্ধে উক্তি উদ্ধৃত ক'রে পাঠকদের সামনে সমগ্র বিষয়টা বিচারের জন্য উপস্থিত করছি। অনুরূপা দেবী লিখছেন—

প্রচাব-কর্ত্তাবা নির্ব্বাধে ও উৎসাহ সহকাবে রটনা কবে চলেছেন এই যে—নিরুপমা দেবীর সাহিত্যসাধনাব মন্ত্রগুরু সত্যদ্রষ্টা ঋষি শরৎচন্দ্র।। *এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কাবে যথেষ্ট মৌলিকতা আছে নিঃসন্দেহে তবে, এর ভিতব 'সত্যদ্রষ্টা'ব নিজেবও বেশ একটা পরিকল্পনা যে ছিল, সে কথা আমি তো জানিই, আরও অনেকেরই জানা আছে।* [এই অনেক কাবা?] তিনি অর্থাৎ [শবৎচন্দ্র] সুবিধামত অনেকেব কাছে নিজেব মর্য্যাদা বাডাবার জন্যই হোক, কিম্বা শুধু কল্পনা বিলাসেব আকাশকুসুম চয়নের জন্যই হোক বা আনন্দ লাভেব জন্যই হোক, অনেক রকম অবান্তর ও অনধিকার বটনা কবে বেড়িযেছেন, যা নিয়ে অন্য কোন সমাজে হলে ডিফামেশ্যন্ চার্জ্জ দিয়ে মামলা আনাও চলতে পাবতো! আমাদেব উচ্চ হিন্দু সমাজে ধৃষ্ট ব্যক্তিকে যথাসাধ্য পরিহার করেই চলতে উপদেশ দেওয়া হয়, কাদামাটি ঘেঁটে পাঁক তৈবি কবতে বলে নয়। যে ভদ্র সমাজের নামজাদা ঘবেব সম্মানিতা মহিলাদেব সম্বন্ধে কতখানি সংযতভাবে কথা বলা উচিত আজকেব দিনেব বহু সম্মানিত সেদিনকার ছন্নছাডা ভবঘুবে লোকটীব সে উচ্চশিক্ষা ছিল না, সে আমি, আমার স্বামী এবং এখনও

বর্ত্তমান দুচারজন নরনারী প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি। [কারা তাঁরা? নাম উল্লেখ করা দরকার] তিনি তাঁর বন্ধুব ছোট বোনকে বন্ধুরই মুখে শুনে শুনে 'বুড়ি' বলে উল্লেখ করতে পারেন, সেটা কিছুই বিচিত্র নয়, কিন্তু তাই থেকে এ প্রমাণ হয় না যে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে নিতান্ত নিয়মতান্ত্রিক ঘরের বাল-বিধবার শরৎচন্দ্রের মত চরিত্রের একজন অনাত্মীয় তরুণের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশা চলতো। *নিরুপমা দেবীর সাহিত্য সাধনায় শরৎচন্দ্রের হাত দিয়ে আরম্ভ করারই বা কি আছে?* যাঁরা এই দুজন লেখকের লেখা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন, এঁদের লেখার ষ্টাইল সম্পূর্ণই বিভিন্ন। বিশেষতঃ ১৩০৪, ১৩০৫, ৬, ৭ সালে শরৎ-প্রতিভাব কি এমন বিকাশ হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমারকে বাদ দিয়ে তাঁকে লোকে অনুকরণ করতে যাবে? শরৎচন্দ্রের মত সব লেখকরা তো আর মন্ত্র-দ্রষ্টা নয়, 'আলোকদীপ্ত সমুজ্জ্বলতর আদর্শ' সামনে থাকতে *কিসের দুঃখে উদীয়মান লেখক বা লেখিকা তাদেরই সমপর্য্যায়ের একজন খাতার পাতায়-দু-চারটি গল্প-লেখককে অনুসরণ বা অনুকরণ করতে যাবে?* ভাগলপুরে থাকতে একটি এক্সারসাইজবুকে লেখা 'বোঝা' 'অনুপমার প্রেম' 'বামনঠাকুর' প্রভৃতি কয়েকটি ছোট গল্প, যা আমাদেব চক্ষে সেদিন অদ্ভুতবসই পরিবেশন করেছিল, এ ছাড়া 'কোবেল' বলে একটি ইংরেজিব অনুবাদ গল্প ও মাইটি এটমেব অনুবাদ (বাংলা নাম মনে নেই) এই তো শরৎচন্দ্রের সম্বল ছিল। সে তার দাদা বিভূতি ভট্টের ও আমি আমার জ্ঞাতি কাকা অরুণদেবের মারফৎ খাতাগুলি পেয়ে হাতেব লেখার একজন সমধর্ম্মীলেখককে অবশ্য প্রশংসা ও সহানুভূতিব সঙ্গেই দেখেছি।

—*কথাসাহিত্য*, পৌষ, ১৩৫৭, ২২১-২২ পৃঃ

অন্যত্র—

নিরুপমা দেবীর কোন ছাপা লেখারও প্রুফ দেখবার অবকাশ শবৎচন্দ্রের ঘটেনি, এ কথা খুব জোর কবেই বলা যায়।... গদ্য বচনায় যদি কোন অনুপ্রেবণার প্রয়োজন হযে থাকে তা আমার এবং আমার দিদি ইন্দিরা দেবীরই।... *শরৎচন্দ্রের প্রেরণা বা সাহায্য কিছুমাত্র আবশ্যক হবার কোনই কাবণ ছিল না।* অনর্থক একটা রটা কথা নিয়ে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠা সুলেখিকাব যশকে খাটো করার এ চেষ্টা কেন। যখন সত্যতত্ত্ব জানা নেই।

—*কথাসাহিত্য*, পৌষ, ১৩৫৭, ২২৩ পৃষ্ঠা

অন্যত্র—

সেই তপস্বিনী ও যশস্বিনী মনস্বিনী তার নিজের শক্তিতেই যথেষ্ট শক্তিমত্তা দেখিয়ে গেছে, তার জন্য কারু দাগা বুলাবার প্রয়োজন হয়নি, হাতে খড়ি দেবার দরকারও কিছুমাত্র ছিল না, যিনি এ সব বাজে কথা রটনা করবার হীন কল্পনা-বিলাস কবে গেছেন, তিনি যে কত অসত্যদ্রষ্টা তার প্রমাণ এইখানেই।

—*কথাসাহিত্য*, পৌষ, ২২৬-২২৭ পৃষ্ঠা

এই মন্তব্য যে কত ভ্রান্ত, তার প্রমাণে স্বয়ং নিরুপমা দেবীর স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করছি। শরৎচন্দ্রের জীবিতকালেই তিনি এই কথাগুলি লিখেছিলেন।

এ যুগের কথা-সাহিত্যের গুরু রবীন্দ্রনাথের পরে শরৎচন্দ্রই এখন যুগন্ধর। তাঁহার

জীবনকথা এখন বাংলা-সাহিত্যের একটি সম্পদ্ রূপেই দাঁড়াইতেছে।... তাঁহার প্রথম জীবনের এই উদয়োম্মুখ প্রতিভার সহিত আমরা যেটুকু পরিচিত হইয়াছিলাম তাহা নিজেদের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় বলিয়াই মনে করি।

অন্যত্র—

তবে একটি কথা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, গল্পটি (অন্নপূর্ণার মন্দির) লিখিতে গিয়া অলক্ষ্যে শরৎদাদার 'শুভদা'র আভাষও যে গল্পের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে ইহা খুবই সত্য। যেমন কবিতা লিখিতে গেলেই অসাধারণ প্রতিভাশীল ভিন্ন সাধারণ লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না, তেমনি এই গল্পটিতে শরৎদাদার লেখার প্রভাবও হয়ত আমার মধ্যে ফুটিয়া কার্য্য করাইয়াছিল।...

শরৎদাদাব আমরা শিষ্যস্থানীয়া হইলেও তাঁহাব প্রতিভার অনুকরণ বা অনুসরণ কিছুই করিবার ক্ষমতা যে আমাদের নাই ইহা প্রত্যেকেব লেখা হইতেই প্রমাণিত হয।

অন্যত্র—

সাহিত্যসম্রাট স্বর্গীয বঙ্কিমচন্দ্র এবং আমাদের কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব —ইঁহাদের রচনা পাঠ আমাদের আবাল্য অস্থিমজ্জায় গ্রথিত হইলেও *আমাদেব শরৎদাদাব লেখাব প্রেরণা যে আমাদেব• উপব বিশেষ ভাবেই কাজ করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে বিষয়ে আমাদেব দাদা ও তাঁর বন্ধুদের সহিত আমারও তিনি গুরুস্থানীয়।*

অন্যত্র—

শরৎচন্দ্র যে আমাদেব প্রথম জীবনের সাহিত্য সাধনার উৎসাহদাতা গুরু, তাহাতে তো সন্দেহই নাই।

—'পুবাতন কথার আলোচনা'—*জয়শ্রী* মাসিকপত্র সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সাল, ২৭০-২৭৬ পৃষ্ঠা।

মাননীয়া অনুরূপা দেবী প্রমাণ করতে চেয়েছেন শরৎচন্দ্রের মত অভদ্র অশিক্ষিত ভবঘুরে ছন্নছাড়ার সাথে নিরুপমা দেবীদের কোনও রকম বাহ্যিক বা মানসিক কোনও কিছু ঘনিষ্ঠতা বা আদানপ্রদান থাকা সে সময়ে বা পরবর্তী কোনও সময়েই সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া শরৎচন্দ্র তখন মস্তবড় লেখকরূপে প্রমাণিত হওয়া দূরে থাক, তার সম্ভাবনা পর্যন্তও ছিল না। তাঁর যৎসামান্য ইংরাজীর অনুবাদ ও কয়েকটি ছোট গল্প অনুরূপা দেবীদের চক্ষে 'অদ্ভুত রস' এবং করুণা বা সহানুভূতিমাত্রই উদ্রেক করেছিল।

নিরুপমা দেবী এবং তাঁর দাদা শ্রদ্ধেয় বিভূতিভূষণ ভট্ট, শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে ভারতবর্ষ মাসিকপত্রে ১৩৪৪ সালের চৈত্র সংখ্যার স্মৃতিকথায় কিন্তু এর বিপরীত কথাই লিখেছেন। এখানে সেই স্মৃতিকথা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি। রচনা দুটি থেকে বোঝা যাবে শরৎচন্দ্রের ন্যায় পরম গুণী ও অকৃত্রিম দরদী মানুষটির সত্য পরিচয় এই দুটি গুণজ্ঞ সাহিত্যরসিক মানুষের কাছে কোনও দিনই প্রচ্ছন্ন থাকেনি। তাঁরা দুই ভাইভগ্নীই হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় ভালবাসায় শরৎচন্দ্রের কোমল হৃদয়বত্তা, বিরাট প্রতিভা ও শিল্পীসুলভ গুণরাশিকে যথোপযুক্ত সম্মান দিয়েছিলেন।

অমূল্য হীরককে সামান্য কাচখণ্ড বলে ভুল করেননি। প্রথমে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্টের কথা উদ্ধৃত করছি :—

আমার "শরৎদা"!

যাঁহার অপূর্ব্ব রচনাশক্তির কৌমুদীকে প্রকাশিত করিবার জন্য একদিন যে সমস্ত বাল্যবন্ধুগণ কতই না চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার অতর্কিত পূর্ণ প্রকাশ দেখিয়া সানন্দে প্রণাম করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন।...

...তরুণ জীবনে সেই অনুদিত শরৎচন্দ্রের চারিদিকে যে কয়টি তারা অথবা তাঁহারই অনুদিত জ্যোৎস্নালোকে যে কয়টি অ-ফোটা সাহিত্যিক ফুল ফুটিবার সম্ভাবনাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিল—আমি তাহাদেরই একটি। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরবর্ত্তী জীবনে সাহিত্যাকাশে দেখা দিয়া শরৎচন্দ্রের পার্শ্বে ভাসিয়াছেন, কেহ বা অকালেই নিভিয়াছেন—কেহ বা জীবনাকাশ হইতে চ্যুত না হইলেও শরৎ মহিমার ঔজ্জ্বল্যেব মধ্যেই আপনাকে অস্তমিত করিয়াছেন। আমি এই শেষের দলেব মধ্যেই একজন। কিন্তু শরৎদাব বিষয়ে আমাদের অন্ততঃ এইটুকু গর্ব্বের বিষয আছে যে, আমরা সেই অনুদিত শবৎচন্দ্রকে সকলের আগেই পূজিয়াছি এবং পূর্ণচন্দ্রোদযের পূর্ব্বে তাঁহারই আলোকে দাঁড়াইয়া অর্ঘ্য রচনা করিয়াছি। যখন সমস্ত বঙ্গ-সাহিত্যাকাশ আমাদের সাহিত্য-'রবিব' আলোকে উদ্ভাসিত, তখন বাঙ্গলাব বাহিরের একটা অনতিখ্যাত সহরের ক্ষুদ্রবিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্ষুদ্রতম সাহিত্য সভার মধ্যে *যে আমরা একটি পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনাকে দেখিয়াছিলাম এ-গৌরব আমরা করিতে পারি।*

মনে পড়ে, একদিন আমাদের সেই খেলাঘরের সাহিত্য-সভায যুবক শরৎচন্দ্রের একটা বচনা লইয়া ঘোর তর্ক করিতে করিতে প্রায় হাতাহাতির জোগাড হইয়া উঠিয়াছিল। আমি গায়ের জোবে সবারই চাইতে দুর্ব্বল হইলেও, গলার জোরে কাহারও অপেক্ষা কম ছিলাম না। হয়ত একটু বেশীই ছিলাম, তাই আমার সেই 'এতটুকু যন্ত্র' হইতে একটু বেশী শব্দই বাহির হইয়াছিল এবং আমি লাফাইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলাম—'বঙ্কিমের চাইতেও শরৎদার লেখা ভালো।' অবশ্য সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র একজন অখ্যাত তরুণ সাহিত্যিকের লেখা লইয়া আর একটী তরুণতর যুবকের এই ধৃষ্টতায় সেদিন তাঁহার মহিমালোকে বসিয়া নিশ্চয়ই সস্নেহ উপেক্ষায় হাসিয়াছিলেন।...

আমার পূর্ব্ব জীবনের শরৎদার কথা বলিতে যাওয়া মানে—আমার জীবনের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণময় অংশ তাহাকেই স্মরণ করা।...

শবৎচন্দ্রকে প্রথম যখন দেখি তখন তিনি ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে পড়েন। আমার সঙ্গে সহপাঠীরূপে দেখা হয় নাই—দেখা হইয়াছিল শাস্তা—আদেশদাতা রূপে। ... আমরা দুইটী ভাইভগ্নী প্রাক্-রবীন্দ্রী কবিগণের লেখার ভাঙা-চোরাই হউক, আর অনুকরণই হউক—একটা কিছু করিতাম।... কেমন করিয়া জানি না সেই সব লেখা, বিশেষতঃ নিরুপমার খাতাখানা শরৎচন্দ্রের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল। দাদাদের মধ্যে কেহ হয়ত তাহা শরৎদার হাতে দিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র তখন তাঁহার সমবয়স্কের মধ্যে একজন উচ্চ জগতের জীবরূপে এবং অত্যদ্ভুত 'ল্যাড়া' নামে অভিহিত...আমরা ছোটরা তখন ঐ অদ্ভুত মানুষটিকে দূর হইতে সসম্ভ্রমে দাদাদের পড়িবার ঘরে আসা-যাওয়া করিতে বা দাবাপাশা খেলিতে দেখিতাম মাত্র।... কিন্তু এহেন শরৎচন্দ্র সেই Lara, একদিন হঠাৎ আমার ছোট কুঠুরীর মধ্যস্থিত

অতি ক্ষুদ্র টেবিলটির পাশে আসিয়া হাজির! আমি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলাম—তিনি আমার কবিতার খাতাখানা টেবিলের উপর সজোরে ফেলিয়া বলিলেন—'কি ছাই লেখ, খালি অনুবাদ—তাও আবার ভুলে ভরা। নিজের কিছু নেই তোমার লিখবার?' আমি ত শুনিয়াই পৌনে মরা, কিন্তু তারপর কখন যে আমাদের আলাপ জমিয়া উঠিল এবং কবে যে তাঁহার খোলার ঘরের বইখাতাপত্রে ভরা টেবিলের পাশে বসিবার অধিকার পাইলাম তাহা আজ স্মরণ হয় না; কেবল এইটুকু মনে আছে যে তাঁহার সেই প্রথম জীবনের সাহিত্য সাধনার কুটীরের মধ্যে অতি সহজেই আমার স্থান হইয়াছিল। দিনের পর দিন *তাঁহারই সাহচর্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকাননে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইলাম।*

মনে পড়ে তাঁহার সেই ছোটঘরখানির মধ্যে বসিয়া তাঁহার বাল্য জীবনের কত কথাই না শুনিয়াছি। তাঁহার তখনকার অপটু লেখার মধ্যে কত না ভবিষ্যতের গৌববের ছায়া দেখিয়াছি এবং আশা করিয়াছি।... শবৎচন্দ্রের রসস্রষ্টা রূপই শেষ জীবনে প্রকটিত, কিন্তু যৌবনে একাধারে নট, সঙ্গীতজ্ঞ, যন্ত্রী এবং কাব্যরসজ্ঞ কবি—কত না নূতন নূতন রূপে তাঁহাকে দেখিয়াছি।... শরৎদা একদিন প্রস্তাব কবিলেন যে, যখন আমবা এতগুলি কুঁড়ি সাহিত্যিক ফুটি ফুটি করিতেছি তখন একটা কাজ কবা যাক। একটা হাতের লেখা কাগজ বাহির করা যাক। যে মুহূর্ত্তে বলা সেই মূহূর্ত্তে কার্য্যারম্ভ।...

এই মাসিকপত্রখানা আমাদের কুঁড়ি-সাহিত্যিকদের সভার মুখপত্র হইল। ইহাব প্রথম সম্পাদক যোগেশচন্দ্র এবং মুদ্রাকর গিবীন্দ্রনাথ, লেখক অনেকগুলি এবং লেখিকা মাত্র একটী —তিনি আব কেহ নয়, আমারই অন্তঃপুরচারিণী বিধবা ভগিনী শ্রীমতী নিরুপমা। ইনি আমাদের বন্ধুদের দৃষ্টিপথের *অন্তরালে থাকিযাও আমাদের বন্ধুবর্গের একান্ত আপনাব ছোট বোনটিই হইয়াছিলেন।* ইঁহাব তখনকার লেখা কবিতা বা প্রবন্ধ যাহা কিছু আমাদেব সভাব জন্য লিখিত হইত, তাহা আমাকেই সভায় পাঠ করিয়া শুনাইতে হইত এবং সভার মতামত আমাকেই বাড়ী গিয়া শুনাইতে হইত।...

তাঁহার জীবনের আর একটা কথা এবং বোধহয় সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা—তাঁহার অসাধারণ ভালবাসার ক্ষমতা। শেষ জীবনে যে ভালবাসা পোষা পাখী এমন কি সামান্য একটা বাস্তার কুকুরের জন্যও অজস্র ব্যয়িত হইয়াছিল—পূর্ব্ব জীবনেও তাহা আমবা যে কতবার কতবকমে অনুভব কবিয়াছি তাহা বলিতে গেলে সামান্য একটা প্রবন্ধে কূলাইবে না—প্রবন্ধটা গল্পে পরিণত হইবে। সেই ভালবাসাই বহুদিনের বিস্মৃতির আবরণকে ভেদ করিয়া হঠাৎ একদিন দুইটি Fountain pen-এর আকারে আমার ও আমার ভগ্নী নিরুপমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। নিরুপমা তখন 'দিদি' ও 'অন্নপূর্ণার মন্দির' প্রভৃতি প্রকাশ কবিয়া বঙ্গ সাহিত্যে কিছু যশঃ অর্জ্জন কবিয়াছেন, আমিও তখন 'স্বেচ্ছাচারী' লিখিয়া ভাবতীতে ছাপাইয়াছি। (*ভারতবর্ষ*, চৈত্র ১৩৪৪, ৫৮৭-৯২ পৃঃ)।

মাননীয় বিভূতিভূষণ ভট্ট মহাশয়ের এই রচনা পড়ে, সকল পাঠকের মনেই এই জিজ্ঞাসার উদয় হবে নিঃসন্দেহ যে, ১৩৫৭'র পৌষের 'কথাসাহিত্যে' 'উপন্যাস-সম্রাজ্ঞী' শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী নিরুপমা দেবীর স্মৃতিকথা বলতে গিয়ে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল অনাবশ্যক রুক্ষ কটূক্তি করেছেন তার মূলে সত্য কতটুকু এবং তার মূল্যই বা কতটুকু?

এইবার স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের জীবন ও রচনা সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলেছেন, এখানে তা উদ্ধৃত করা হল। এ থেকে নিরুপমা দেবীর সঙ্গে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর 'অভিন্ন হৃদয় মন' বা 'সমানা আকুতি' কতটা, তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

'শরৎচন্দ্র বন্দনা'

পর্ব্বতের এক নিভৃত গুহায় নির্ঝব যেমন তাহার জীবনের কিছুদিন কাটাইয়া সহসা একদিন প্রবল বেগে পৃথিবীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং নিজের প্রচুর জীবন ধারায় তাহার দেশ গ্রাম অভিষিক্ত করিতে করিতে চলিতে থাকে, তেমনি পশ্চিমেব এক সামান্য গৃহকোণে যে অদ্ভুত রচনাশক্তি ক্রম-পরিণতি লাভ করিয়া আজ বাংলা সাহিত্যভূমিকে তাহার অপূর্ব্ব বসধারায় অভিষিঞ্চিত ও প্লাবিত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, সেই অদ্ভুত শক্তি ও শক্তিমানের কথা ভাবিতে আজ আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। একদিন যে সুধা-নিস্যন্দিনী নির্ঝরিণীব স্নেহধাবা 'অভিমান', 'বালা', 'শিশু', 'কোবেল গ্রাম', 'বোঝা', 'কাশীনাথ', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস', 'বড দিদি' প্রভৃতি রূপে সেই গুহাতলে বহিযা সেই অখ্যাত দিনেব স্নেহ-সঙ্গীগুলিকে মন্ত্রমুগ্ধ কবিত, আজ সেই নির্ঝর তাঁহাব বিপুল বিস্তৃত স্রোতে বঙ্গ-সাহিত্যভূমিব বক্ষে 'শ্রীকান্ত', 'পথেব দাবী', 'দত্তা', 'ষোড়শী', 'পল্লী-সমাজ', 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি অসংখ্য চবিত্র তবঙ্গ-মালার বিচিত্র শোভা দান করিতেছে, ইহা মনে করিতেও কি সে দিনের সেই সঙ্গীগুলি হর্ষ গর্ব্বপূর্ণ এক বিচিত্র অনুভবে অনুভাবিত না হইযা থাকিতে পাবে?

('শরৎচন্দ্র বন্দনা' : নিরুপমা দেবী। [৩১শে ভাদ্র ১৩৩৯] শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্পাদিত *শবৎবন্দনা,* পৃঃ ১৫০)।

"আমাদের শরৎদাদা"

...আমার দাদাবা তাঁহাকে কতদিন হইতে জানিতেন তাহা ঠিক জানি না। কিন্তু আমি জানিলাম যখন আমাব লেখা কবিতা লইয়া দাদারা অত্যন্ত আলোচনা কবেন তখন। দাদাদের এক বন্ধু তাঁহাব নাম শ্রীশরৎচন্দ্র (মেজদা কিন্তু ইহাকে 'ন্যাডা' বলিযাই উল্লেখ কবিতেন)। তিনিও দাদাদের মারফৎ আমার লেখার পাঠক এবং সমালোচক।...

ইহার অল্পদিন পরেই মেজভাজ মেজদার নিকট হইতে এক বৃহদায়তন খাতা আমাদেব সেই ক্ষুদ্রপরিসর সাহিত্যচক্রে হাজির করিলেন। তাহা অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে লিখিত, নাম 'অভিমান!' শুনিলাম দাদাদের উক্ত বন্ধু শরৎচন্দ্রই ইহার লেখক। গল্পটি পড়িয়া যখন আমরা সকলেই অভিভূত, তখন মেজদা সাড়ম্বরে গল্প কবিলেন যে 'এই গল্পটি পড়ে একজন ন্যাড়াকে মাবতে ছুটে, তাকে তখন এই পাঠকের ভয়ে ক'দিন লুকিয়ে বেড়াতে হয়।' ক্রমে বৌদিদি দাদাব নিকটে তাঁহার বন্ধুর [শরৎচন্দ্র] সম্বন্ধে আরও কিছুকিছু গল্প সংগ্রহ করিয়া আমাদেব মধ্যে প্রচার করিলেন। আমরা তখন 'অভিমানের' লেখকেব উপব অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন। সেই উদাসী কবি-স্বভাববিশিষ্ট লেখকটিকে আমাদের বাসার পশ্চিমদিকে যে প্রকাণ্ড মসজেদ ছিল (শোনা যাইত তাহা নাকি সাজাহানের আমলের) তাহার বৃক্ষছায়াময় পথে কখনও কখনও দেখা যাইত। কোন গভীর বাত্রে সেই মসজেদের সুউচ্চ প্রাঙ্গণচত্বব হইতে গানের শব্দ, কখনো 'যমানিয়া' নদীর (গঙ্গার ছাড়) তীর হইতে বাঁশীর আওয়াজ ভাসিয়া আসিলে মেজদা মেজবৌদিকে শুনাইয়া বলিতেন 'এ ন্যাড়াচন্দ্রেব কাণ্ড।' আমাদের

সেই অল্পদিন অধিকৃত বাসাটি উক্ত নদীর তীরে সুবিস্তৃত সুউচ্চ টিলার উপরে অবস্থিত ছিল। তাহার চারিদিকের অসমতল ভূমিতে তাহাকে পার্ব্বত্য অধিত্যকার মতই দেখাইত! সেই বাটীর অধিকারীর আত্মজনের কয়েকটি স্মৃতি-সমাধি নদীতীরের টিলার গাত্রে ক্রমোচ্চভাবে স্থাপিত ছিল। আমাদের দল একদিন সেই স্মৃতি-সমাধি হইতে বায়ুপথে ভাসিয়া আসা গানের একলাইন আবিষ্কার করিল—'আমি দু'দিন আসিনি, দুদিন দেখিনি, অমনি মুদিলি আঁখি—'। ইহার পরে দাদাদের বৈঠকখানায় তাঁহার কণ্ঠেব আরও গান আমরা ভিতর হইতে শুনিয়াছি; কিন্তু, বাঁশী কখনও সে সব বৈঠকের মধ্যে তিনি বাজান নাই। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের রচিত আবও একটি গান তাঁহার প্রিয় ছিল 'গোকুলে মধু ফুবায়ে গেল আঁধার আজি কুঞ্জ বন'। আমাদের পাড়া খঞ্জরপুরেরই তিনি অধিবাসী ছিলেন, সেজন্য উক্ত মসজেদ ও নদীতীর প্রভৃতি তাঁহার বিচবণ স্থান ছিল এবং দাদাদের কাছেও প্রায়ই আসিতেন। হঠাৎ একদিন জানিতে পাবিলাম—তিনি আমাদের ছোটদাদাবই বিশিষ্ট বন্ধু। *ইহাতে আমাদের দল বিশেষ গর্বই বোধ করিয়াছিল।*

আমি সে সময়ে অজস্র কবিতা লিখিতাম। ছোড়দা তাঁহার নিজেব কবিতার সঙ্গে আমাব লেখাও তাঁহার সম্মানিত বন্ধুকে দেখিতে দিতেন এবং আমাদের খাতায় তাঁহার হস্তাক্ষবে ঐ সকল কবিতা সম্বন্ধে মতামত আসিয়া আমাদের উৎফুল্ল কবিয়া তুলিত। একদিন দেখি ছোডদা আমার একটি নূতন কবিতাব মাথায় লিখিয়া দিয়াছেন— 'আরো যাও—আরো যাও--দূবে, থামিও না আপনার সুরে'! পরে শুনিলাম শরৎদাদা নাকি তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'ঐ একটি ভাব আব একটি কথা ছাড়া বুডি যদি আর পাঁচ বকম ভেবে লেখে তো লেখার আবও উন্নতি হবে।' এই কথাই ছোটদাব হাতে উক্ত কবিতাকাবে আমার লেখার মন্তব্যরূপে বর্ষিত হইযাছিল। তাঁহাদের এইরূপ মন্তব্যের পব আমি যে কবিতাটি লিখিয়া তাঁহাদের খুশী কবি তাহাব কয়েকছত্র মনে পড়িতেছে... সেও একটি সমাধির উদ্দেশেই কল্পনার সঞ্চরণ। ... *সেই ক্রমবর্দ্ধিতাকার খাতাখানার কথা আজও মনে আছে—যাহার প্রায় প্রতি কবিতার মাথায বা আশে পাশে তাঁহার (শবৎচন্দ্রের) তরুণ জীবনেব সাহিত্য রুচির প্রচুব প্রমাণ ছিল।* তিনি নাকি ছোড়দাকে বলিয়াছিলেন যে 'বুড়ি যদি চেষ্টা কবে ত' গল্প লিখিতে পারিবে।' কিন্তু সেকথা তখন বোধহয আমরা বিশ্বাস করি নাই। ক্রমে আমরা শরৎদার আরও কয়েকখানি খাতা পড়িতে পাই। 'বাসা' 'বাগান' 'চন্দ্রনাথ' 'শিশু' 'পাষাণ'। এই পাষাণ গল্পটিকে আব দেখিলাম না। একজন পবমাণুবাদী নাস্তিক পিতার সন্তানের মানসিক সংঘাতের যন্ত্রণায় আমরা এতই অভিভূত হইয়াছিলাম যে, সে গল্পটির কথা আজও মনে আছে। পরে শুনিয়াছি যে 'অভিমানের' মতো সেখানিতেও একটি প্রসিদ্ধ ইংরাজী গল্পের ছায়া ছিল। কিন্তু ঐ দুইটি গল্পে যে তরুণ শরৎচন্দ্রের কতখানি প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল সে দুইটি নষ্ট না হইলে আজ তাহার বিচার হইত। এই 'শিশু' গল্পটিই পরে 'বড়দিদি' নাম ধারণ করিয়াছিল। ক্রমে তাঁহাদের 'সাহিত্যসভা' ও 'ছায়া'র কথাও জানিতে পারি। আমার লেখাও তাহাতে 'শ্রীমতী দেবী' নামে তাঁহারা দিতে লাগিলেন। *একটু আধটু গদ্য লেখার চেষ্টা আসিলেও শরৎদাদার গল্প পাঠে সে ধৃষ্টতা প্রকাশে তখন বোধহয় আমাদের লজ্জা আসিত।* শ্রীমান সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র এবং আমার ছোড়দা—ইঁহাদের সঙ্গেই আমার কবিতার প্রতিযোগিতা চলিত। *শরৎদাদাই বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন* এবং ছোটদার মারফৎ তাহা আমি পাইতাম।... সমালোচনা শক্তির বিকাশও শরৎচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যসঙ্গীগুলির মধ্যে

আনিবার নানাবিধ পথ নির্দ্দেশ করিতেন। শরৎদাদা কবিতা লিখিতে পারিতেন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু অমিত্রাক্ষরে ছোট্ট একটি 'গাথা' ছাড়া আর কিছু কখনও দেখি নাই। সেটির নাম মনে নাই, কিন্তু ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকটি লাইন মাত্র তাহার মনে আছে। প্রথম লাইনটি —'ফুলবনে লেগেছে আগুন।' সুপ্রভা আর ইন্দিরা নামে দুইটি নায়িকার (নায়কেব নাম মনে নাই) মনোভাব বিশ্লেষণ, পরে যথারীতি একজনের (সুপ্রভার) বিষপানে মৃত্যু এবং সেই পরাজয়েই তাহার জয়ের পতাকা উড্ডীন হওয়া ইত্যাদি—ইহাই 'গাথার' বিষয় হইলেও বর্ণনায় *অনেকখানি ক্ষমতারই প্রকাশ ছিল।*

এইরূপে *তিনি সেই ক্ষুদ্র সাহিত্যসভার সভ্যগুলির আদি গুরুস্থানীয় ছিলেন।* তবে, আমার লেখা 'তারার কাহিনী' 'প্রায়শ্চিত্ত' ও এইরূপ ছোট ছোট গদ্যাকারে গল্প তাঁহাদের 'ছায়া'য় প্রকাশিত হইলেও গল্প লেখার ক্ষমতা অন্ততঃ আমাব মধ্যে সে সময়ে আসে নাই।...

...শরৎদাদা বোধহয় তখন গোড্ডা নামক স্থানে চাকরী করিতে গিযাছিলেন, অথবা মজঃফরপুর আদির দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া সেই গল্প (উচ্ছৃঙ্খল) পাঠে তাহাব মাথাব উপরে লিখিয়া দেন, 'তুমি যে নিজেব মত ক্বরিয়া অনুকে ফুটাইতে পারিয়াছ ইহাতে বড় খুসী হইলাম।'

ইহার পরেই বোধহয় 'দেবদাস' লেখা হয়। ঠিক মনে পড়ে না।

'মন্দির' গল্প লেখা আমবা দেখি নাই; কিন্তু তিনি ব্রহ্মদেশে থাকাকালীন 'কুন্তলীন' পুবস্কাব প্রতিযোগিতায় সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়েব *নামে উক্ত গল্প পড়িয়াই তাহা যে শরৎদাদার লেখা—ইহা আমবা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি।* পরে 'যমুনা'য় তাঁহার পুরাতন ও নূতন লেখা নানা গল্প প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পবে তিনি একবার আমাদের বাড়ীতে (বহরমপুরে) আসিয়া কয়েকদিন অবস্থানও করিয়াছিলেন। একটি কথাব স্মরণে তাঁহাব স্নেহের পরিচয় আজও মনে আসিতেছে; কথাটি নিতান্ত পারিবারিক কথা। ছোটদা তখন বি-এল পাশ করিয়াছেন, কিন্তু পিতৃদেবের মৃত্যুর জন্য যে তাঁহাকে তাঁহার বড সাধের এম্-এ পড়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, সেই কথা স্মরণ করিযা তিনি [শরৎচন্দ্র] প্রস্তাব কবেন—ছোটদা কলিকাতায় গিয়া তাঁহার নিকটে থাকিয়া এম্-এ পড়িবেন। আমবা তাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন। এখান হইতে ফিরিয়া গিয়া তিনি 'চরিত্রহীন' লিখিতে আরম্ভ করেন এবং যমুনায় তাহা প্রকাশিত হইলে আমাদের কেমন লাগিতেছে জিজ্ঞাসা কবিয়া পাঠান্।

ইহার বহুদিন পরে সাহিত্য-সম্রাট রূপে বহরমপুরে তিনি আব একবার আসিযাছিলেন এবং অল্পক্ষণের জন্য আমাদের সঙ্গেও দেখা করিয়া যান। সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে দাদা এবং তাঁহার তদানীন্তন বন্ধু মহলে যাহা আলোচনা হইয়াছিল সে কথাটিও আজ মনে পড়িতেছে। তাঁহার [শরৎচন্দ্র] জন্য মস্ত বোট-পার্টি সজ্জিত —মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী (অধুনা মহারাজ) স্বয়ং অপেক্ষা করিতেছেন—সময় বহিয়া দণ্ডের পর দণ্ড অতিবাহিত হইতেছে—'উৎসবরাজে'র দেখা নাই। তখন বেশির ভাগ ব্যক্তিই এজন্য তাঁহার [শরৎচন্দ্রের] বিরুদ্ধে সমালোচনা কবিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কে না কি বলিয়াছিলেন—'এইই তো ঠিক —*কবি কি সকলের হাত ধরা—নিয়মে বাঁধা পুতুল হবে? সে স্বাধীন—স্বতন্ত্র—তার বশেই সকলে চলবে—সে কারও বশে নয়।*'...

আজ তাঁহার শ্রাদ্ধতিথিতে আর একটা শ্রাদ্ধতিথির কথা মনে পড়িতেছে, যাহাতে তিনি *আমাদেব পূর্ণ মাত্রায় অবরোধ প্রথা বিশিষ্ট গৃহান্তঃপুরের মধ্যে আত্মজনের মত প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।* সেদিন আমার স্বামীর সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ দিন। উক্ত 'যমানিয়া' নামে অভিহিত গঙ্গার ছাড়ের উপরে আমাদের বাসার অনতিদুরে একটি ঠাকুরবাড়ি ছিল ; তাহাতেই উক্ত অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। আমার এক মাতৃতুল্যা বয়স্কা বিধবা ভ্রাতৃজায়া (জ্যেষ্ঠতাতের পুত্রবধূ) আমাকে সেইখানে লইয়া গিয়া আসনে বসাইলে দেখিলাম—দাদারা বা ভগ্নীপতি কেহই সেখানে উপস্থিত হন নাই; (বোধ হয় দুঃখে) মাত্র ছোটদা [বিভূতি ভট্ট*] আর একজন কাহাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করিতেছেন। পরে বুঝিয়াছিলাম তিনিই শরৎদাদা। উক্ত কার্য্যের দানাদির মধ্যে তাঁহাদের একটা ভুল হওয়ায় কিছুক্ষণ পরে সসঙ্কোচে আমি পুরোহিতকে তাহা নিবেদন করিলে তাঁহারা সেটি সংশোধনার্থে কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তখন অসঙ্কোচে বড় ভাইয়ের অধিকারে আমাকে উদ্দেশ কবিয়া শরৎদাদা বলিলেন—'দ্যাখ দেখি, —কতটা হাঙ্গামে পডতে হল—ভুলটা এতক্ষণ পবে ধরিয়ে না দিয়ে তখনই দিলে না কেন?' আমি খুবই অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম। সেদিন ঘৃত মধু ইত্যাদির গন্ধে একটা ভিমরুল্ (যাহা পশ্চিমে বড্ড বেশি) উক্ত শ্রাদ্ধ কার্য্যের মধ্যেই আমাকে মক্ষমভাবে কামড়াইয়া ধবিয়াছিল ; কিন্তু সেটা এমন সময—যাহাব মধ্যে চঞ্চল হওযা বা আসন ত্যাগ করা উচিত মনে হয নাই, যখন সেটা রক্ত বহাইয়া দিয়াছে তখন তাঁহাবা (ছোট্দা ও শরৎদাদা) জানিতে পাবিয়া বিষম ব্যস্তভাবে তাহাব প্রতিষেধার্থ ছুটাছুটি বাধাইয়া দিলেন। ছোট্দার সঙ্গেই শরৎচন্দ্র ব্যাকুলভাবে একবার দধি একবার মধু লইয়া বিদ্ধ স্থানে দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন —অথচ তখন আমাদের সঙ্গে পরিচয সামান্যই। প্রতিবাসী এবং দাদাদেব বন্ধুভাবেই সাহায্যার্থে আসিয়াছিলেন মাত্র। শ্রাদ্ধান্তে যখন উক্ত ভ্রাতৃজায়াব সঙ্গে বাড়ী ফিবিতেছি—দেখি তখন শরৎদাদা আমাদেব বাড়ীর দিক্ হইতে পুঁটুলীব মত কি লইযা ছুটিযা আসিয়া ছোটদার হাতে দিলেন। ছোট্দা তাহা ভ্রাতৃজায়ার হাতে দিলে দেখি একখানা পাড়ওযালা কাপড় ও হাতেব গহনা—শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে যাহা বাড়ীতে খুলিয়া রাখা হইযাছে। মনের উত্তেজনায বোধহয় সে সময় আবাব সেগুলা লইতে অনিচ্ছা প্রকাশই হইয়া পডিযাছিল, কিন্তু সে জিদ্ সেদিন জয়ী হইতে পাবে নাই। মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়া তো কাঁদিতেই ছিলেন —ছোট্দা মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতেছেন এবং একজন বাহিরের লোক—তিনিও তাহাদের সঙ্গে কাঁদিতেছেন—এ দৃশ্য সেদিন শোকে মূঢ় ব্যক্তিকেও নিজ কার্য্যে লজ্জা আনিয়া দিযাছিল।

শরৎদাদাব বন্ধুবর্গ যে তাঁহার মনকে খুব কোমল পরদুঃখকাতব বলিযা বর্ণনা করিতেছেন, সেদিনে আমাদের নিকটেও তাহা এইরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল।

—*ভারতবর্ষ*, চৈত্র সংখ্যা ১৩৪৪ সাল, পৃষ্ঠা ৫৯৪-৫৯৮

স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবীর এই লেখার পর মাননীয়া অনুরূপা দেবীর বিবৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সর্বশেষে আরও দু একটি বিষয় মীমাংসার প্রয়োজন আছে। মাননীয়া অনুরূপা দেবী লিখেছেন—

* উদ্ধৃতির মধ্যে [চৌকাবন্ধনীযুক্ত] মন্তব্যগুলি সমস্তই আমার ।

একটা ধৃষ্ট মন্তব্য দেখে নিতান্তই মর্ম্মাহত হতে হয়েছে। কোন এক দৈনিক সংবাদপত্রে নিরুপমার সম্পর্কে লেখা হয়েছে, দারুণ অর্থাভাবে জগত্তারিণী মেডাল্ প্রভৃতি বিক্রি করে তার চিকিৎসাদি করতে হয়েছিল। এ সংবাদ সংবাদদাতা কোথায় পেয়েছেন জানি না। জরুরী প্রয়োজনে দূরবিদেশে যদিই বা সাময়িকভাবে কোন অলঙ্কারাদি বন্ধক রেখে কারুকে টাকা ধার করতেই হয় সেটা কি জনসাধারণকে উৎফুল্ল করবার মত এতই আনন্দদায়ক প্রয়োজনীয় সংবাদ? —*কথাসাহিত্য,* পৌষ ১৩৫৭, ২২৩ পৃঃ

এখানে মাননীয়া অনুরূপা দেবী স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবীর আর্থিক দুরবস্থা ও ঋণ গ্রহণের খবরকে অসম্মানকর ধৃষ্ট মন্তব্য বলে তিরস্কার করে নিজে কিন্তু সেই নিবন্ধের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের হীন অবস্থা ও অর্থসাহায্য প্রার্থনার সংবাদ সাগ্রহে পরিবেশন করেছেন—

নিরুপমারা ভাগলপুর ত্যাগ কর্ব্বার পূর্ব্বেই শরৎচন্দ্র ভাগলপুর থেকে পলাতক এবং একটি নাগা সন্ন্যাসীর দলে ভিড়ে মজঃফবপুরের কাছারীর মাঠের কোন গাছতলায় আমার স্বামী ও তাঁব বন্ধুদের দৃষ্টিগোচর হন।... আমারই এক সম্পর্কিত দেবর তাঁকে আবিষ্কার করে, ধর্ম্মশালায় অসুস্থ অবস্থায় দেখে আমাদের বাড়ী নিয়ে আসেন। সেখানে বৎসব দুই [?] বাস করাব পব তাঁকে রেঙ্গুণেব পথেই দেখা যায়। ইতিমধ্যে মজঃফরপুর ছাড়ার পর বাব দুই কিছু অর্থ-সাহায্য চেয়ে আমার স্বামীকে পত্র লেখেন—

—*কথাসাহিত্য,* পৌষ ১৩৫৭, ২২৩ পৃষ্ঠা

বাংলাদেশের পাঠকরা মাননীয়া লেখিকাকে তাঁর নিজেরই ভাষায় প্রতিপ্রশ্ন করতে পারেন না কি—

'জরুরী প্রয়োজনে দূব বিদেশে যদিই বা সাময়িকভাবে কোন কারুকে অর্থসাহায্য চাইতেই হয়, সেটা কি জনসাধারণকে উৎফুল্ল কববার মত এতই আনন্দদায়ক প্রয়োজনীয় সংবাদ?—'

লেখিকা ঐ নিবন্ধে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবীর শ্বশুরবাড়ীর সম্পত্তির আয় এবং পিতৃগৃহের অবস্থা মধ্যবিত্ত সংসারের পক্ষে কিছুমাত্র হীন না হওয়ায়, সবচেয়ে বড়ো কথা ভাই-ভাইপোরা থাকতে, তাঁকে জগত্তারিণী মেডেল বিক্রি করতে হয়েছে, এ কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ সম্বন্ধে আমরা যথার্থই লেখিকার সঙ্গে আন্তরিকভাবেই একমত। শুধু তাই নয়, স্বর্গীয় শরৎচন্দ্রও ভাগলপুরে ও অন্যত্র তাঁর বহু ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এবং আত্মীয়দের মধ্যে পরমভক্ত ও অন্তরঙ্গ বন্ধু গিরীন, সুরেন, উপেন প্রভৃতি এবং মজঃফরপুরে তাঁর বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য থাকা সত্ত্বেও লেখিকার স্বামীর কাছে বারংবার অর্থসাহায্য ভিক্ষা চেয়েছিলেন এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিতান্ত অন্তরঙ্গতা ভিন্ন মানুষ মানুষের কাছে দূর দেশ হতে অর্থ সাহায্য চাইতে পারে না। বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের মতো অভিমানী মানুষ। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, লেখিকা যে-শরৎচন্দ্রকে পথে পড়ে মরতে দেখে কুড়িয়ে এনে নিজেদের

বাড়ীতে শুধু আশ্রয় দিয়েছিলেনই নয়, সেখানে শরৎচন্দ্রের মত গৃহবিবাগী উদাসী মানুষও দীর্ঘ দুই বৎসর (!) অবস্থান করেছিলেন,—(যদিও তা' সত্য নয়, সকলেরই এটা জানা আছে। কিন্তু লেখিকার রচনায় স্বেচ্ছাকৃত অস্পষ্টতার জন্য পাঠকদের মনে এই ধারণাই জন্মাবে, যেন তাঁর বাড়ীতেই শরৎচন্দ্র বৎসর-দুই বাস করেছিলেন।) সেই শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে মাননীয়া অনুরূপা দেবী মুষ্টিভিক্ষা স্বরূপ 'ভারতবর্ষে', বা অন্য কোনও পত্রিকায় দুই লাইন শ্রদ্ধাঞ্জলি না হোক, সামান্য স্মৃতিকথাও লিখে শরৎচন্দ্রের প্রতি সমসাময়িক-সাহিত্যিকের কৃত্য সম্পন্ন করতে পারেননি। যে-কর্তব্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী থেকে বাংলাদেশের জীবিত সাহিত্যিক প্রত্যেকেই সম্পাদন করেছিলেন। আজ শরৎচন্দ্রের স্বর্গারোহণের সুদীর্ঘ চর্তুদশ বৎসর পরে নিরুপমা দেবীর লোকান্তর উপলক্ষে তিনি যে-ভাষায় ও যে-ভঙ্গীতে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য অযাচিত ও অবান্তরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে আমাদের দুঃখিত ও লজ্জিত হওয়া ছাড়া আর উপায় কি আছে?

সকলের চেয়ে বিস্ময়ের কথা, যে-মাসিকপত্রের প্রকাশক ও সম্পাদকেরা নিজেরাই কথাসাহিত্যিক, সেই পত্রিকাতে বাংলা দেশের সর্বজনবন্দ্য কথাসাহিত্যিকেব বিরুদ্ধে এত বড় একটা অপবাদ ও কুৎসা মুদ্রিত হয়েছে। সুপ্রসিদ্ধা প্রবীণা লেখিকার রচনাটি আংশিকভাবে প্রকাশিত হলে কোনও কথাই ছিল না। যে-অংশে বাংলা কথা-সাহিত্যের পরম গৌরব সেই স্বর্গগত কথা-সাহিত্যিক সম্বন্ধে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ভাষা ও ভঙ্গী শালীনতার সীমারেখা অতিক্রম করে গিয়েছে—সে-অংশ প্রকাশ ও সম্পাদনার সুরুচি এবং সৌজন্যের গুরুদায়িত্ব তাঁরা কেমন করে বিস্মৃত হলেন?

ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৫৮

অতি-সাম্প্রতিক কাব্য সাহিত্য

শান্তিনিকেতনে সাহিত্য-মেলায় যোগ দিতে এসে গভীরভাবে মনে পড়ছে গুরুদেবকে। তাঁর তপস্যাভূমি শান্তিনিকেতনে এইরকম একটি অনুষ্ঠানের যে প্রয়োজন ছিল, এটি অনেকেরই হয়তো আগে মনে পড়েনি।

গুরুদেব আমাদের জীবনের, বিশেষ করে সাহিত্যের সকল-ক্ষেত্রেই দৃষ্টিপাত করে তাঁর কল্যাণ-স্পর্শ দিয়ে চলতেন। বোলপুরের এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কেবলমাত্র বিদ্যায়তন রচনাতেই তো তিনি নিমগ্ন থাকেননি, মানবজীবনে কল্যাণসৃষ্টি এবং কলাসৃষ্টির সমস্ত দিকই তাঁর কাছ থেকে প্রাণরস আহরণ করে এখানে বিকশিত ও পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁর হৃদয়রসেই শুধুমাত্র নয়, হৃদয়রক্তে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে বাংলা-সাহিত্য।

ক্রমবর্দ্ধমান বাংলা-সাহিত্যের প্রতি কবির উৎসুক দৃষ্টি সদা-জাগ্রত ছিল। চলন্ত সাহিত্যের আলোচনার জন্য এই সাহিত্যমেলার অনুষ্ঠানে তাঁর চিত্তধারার প্রতি শ্রদ্ধাকৃত্য সম্পন্ন করা হয়েছে। এটি শুধু শান্তিনিকেতনবাসীদেরই কর্তব্য নয়, প্রধানত এটি সাহিত্যিকদেরই কর্তব্য। শান্তিনিকেতন এই পুণ্য-যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত ক্ষেত্র মাত্র। কারণ, ভাষা-দেশ-দল-মত-নির্বিশেষে সকল সাহিত্যিক অনায়াসে যদি কোনওখানে সমবেত হতে পারেন তো সে এই শান্তিনিকেতন।

নিখিল বিশ্ব-সাহিত্যসেবীদের পরমতীর্থ শান্তিনিকেতনে উদার আদর্শনিষ্ঠ সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় এই যে সাহিত্যমেলার উদ্বোধন করলেন, আমরা যেন একে মহৎ তাৎপর্যে গ্রহণ করি। গুরুদেবের জীবনের মূল আদর্শ মিলনের আদর্শ। এই সাহিত্যমেলায় সেই আদর্শ সুন্দর সার্থক হয়ে উঠুক। সামান্য-অসামান্য ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল সাহিত্যিকই যেন এই মেলায় স্বচ্ছন্দে মিলিত হতে পারেন। এই মেলা কুম্ভমেলার মতোই ভারতীয় ঐতিহ্যময় মিলনমেলায় পরিণত হয়ে উঠুক, যেখানে আপনা হতেই সমস্ত মানুষ নিরভিমান প্রসন্নচিত্তে এগিয়ে এসে যোগ দিতে পারেন। এর জন্য বাংলাদেশের সাহিত্যিকগণকেই অবশ্য প্রথমে এগিয়ে এসে আয়োজন করতে হবে।

ভারতবর্ষে অধ্যাত্মপথযাত্রী নানা ধর্মের, নানা দলের, মতের ও পথের তপস্বী এবং সিদ্ধপুরুষগণ, প্রতি বারো বৎসব অন্তর পুণ্য প্রয়াগতীর্থে বা হরিদ্বারতীর্থে কুম্ভমেলায় সমবেত হয়ে থাকেন। সেখানে তাঁরা সাক্ষাৎ-আলোচনায়, আপন আপন সাধনার ও সিদ্ধির জ্ঞানের আদান-প্রদানে পরস্পর উপকৃত হন এবং পরস্পরকে উপকৃত করেন। তেমনই আমাদের দেশের সাহিত্য তপস্বীরাও রুচি-দল-মত নির্বিশেষে তাঁদের সাধনার ফল এবং অভিজ্ঞতা ও বক্তব্য নিয়ে পুণ্যতীর্থ শান্তিনিকেতনে সাহিত্য-মেলায় সম্মিলিত হতে পারেন। এই মেলা ভবিষ্যতে পঞ্চবার্ষিকী অথবা ত্রৈবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়ে নবাগত সাহিত্যের বিচারে ও আলোচনায় সাহিত্যসেবীদের কল্যাণকর প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হতে পারে। গুরুদেবের বিশ্বভারতীর বিরাট আদর্শ এর মধ্যে সর্বতোভাবে সার্থক পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠুক। এই সাহিত্যমেলা সর্বভারতীয় রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ক্রমে নিখিল-বিশ্ব সাহিত্যমেলায় পূর্ণতা লাভ করুক, এই কামনা করি। পাক্‌-ভারত উপমহাদেশই মাত্র নয়, সমস্ত পৃথিবী যেন এই মিলন-তীর্থে অকুণ্ঠ হৃদয়ে আনন্দচিত্তে মিলিত হতে পারে।

এর জন্য যে উদার আতিথ্যের প্রয়োজন তা এখানকার জীবনাদর্শের মধ্যে, শিক্ষার মধ্যে, ঐতিহ্যের মধ্যে গুরুদেব আপন হাতে আয়োজন করে রেখে গেছেন। এখানকার আকাশে বাতাসে প্রান্তরে শাল-বীথিকায় গুরুদেবের প্রসন্ন হৃদয়ের উদার অভ্যর্থনা সতত বিরাজমান রয়েছে।

সাম্প্রতিক পাঁচ বৎসরের কাব্য-সাহিত্য নিয়ে আজ আমাদের আলোচনা। এই পাঁচ বৎসরে নূতন কবিতা রচিত হয়েছে যথেষ্ট, কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে অনেক।

লক্ষ্য করা যায়, এই পঞ্চবার্ষিকী কবিতার মধ্যে সৃজনী-প্রতিভাজাত কবিতার চেয়ে নির্মাণ-নৈপুণ্যজাত কবিতাই বেশি।

পাঁচ বৎসরের অন্তর্গত বাংলার কাব্যলোকে সংঘটিত একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য —যা অভিনব সন্দেশরূপে সাগর পরপারে বিদেশী বেতারেও প্রচারিত হয়েছিল।

একদল নবীন কবি নগরের রাজপথে প্রাচীরপত্রের ধ্বজা বহন করে 'বেশি করে কবিতা পড়ুন' ধ্বনি তুলে দেশবাসীকে কাব্য রসাস্বাদনে মনোযোগী করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কবিতা-নিস্পৃহ জনগণকে কবিতাপ্রিয় করে তোলার জন্য উঁচু আওয়াজ তুলে কাব্যের প্রচার এবং ফুটপাথে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে স্বরচিত কবিতা পাঠ—অভিনব সন্দেহ নেই। এইটুকু বোঝা গেছে, সমাজসচেতন কাব্য নামে যে কথাটি কিছুকাল থেকে শোনা গিয়েছে, যার অর্থ ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তৃতা এবং বিতণ্ডা শোনা যায়, ধ্বনি ও পোস্টারের মাধ্যমে এই কাব্য-আন্দোলন সমাজ-সচেতন কাব্যেরই একটি প্রত্যক্ষ রূপ সম্ভবত। জনগণ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সচেতনতা থেকে যে কাব্য নির্মিত হচ্ছে, জনগণই যদি সে কাব্য সম্বন্ধে নিস্পৃহ থেকে যায়, সে কাব্যে তারাই যদি রুচিশীল না হয়, তা হলে যে কোনও উপায়ে হোক তাদের কাব্যস্পৃহ করে তোলার জন্য প্রত্যক্ষ আন্দোলন করা ছাড়া উপায় কি?

কিন্তু জিজ্ঞাসা, কাব্য কি আন্দোলন করে আস্বাদন করার সামগ্রী? কাব্য কি সমালোচনা দ্বারা নির্ণীত ও প্রমাণিত হওয়ার বস্তু? তা যদি না হয়, তাহলে আজকের বৈঠকে আমরা কি করতে জড়ো হয়েছি? উত্তর দিতে পারা যায়, সমালোচনা দ্বারা কবিতা আস্বাদন করতে। এই আস্বাদনের ব্যাপারে আমার যা বক্তব্য এবং জিজ্ঞাস্য, বিনম্রভাবে নতুন কবিদের কাছে নিবেদন করছি।

বহু পুরুষানুক্রমে মানুষ পৃথিবীতে যা-কিছু সৃষ্টি এবং নির্মাণ করেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সৃষ্টি কাব্য। কবিতা মানুষকে তার আপন-সীমানা উত্তীর্ণ করিয়ে বহু দূরে অনেক ঊর্দ্ধে নিয়ে চলে যায়। মানুষের সীমিত শক্তি এখানে আপনাকে অনেকখানি অসীমের মধ্যে উন্নীত করতে এবং প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছে। পরম দুর্লভকে সহজে লাভ করতে পেরেছে—কামনাকে যথা অভিরুচি সফল সার্থক করে তুলেছে—যা মানুষ জীবনে আর কোনও ক্ষেত্রে এমন করে পারেনি বা পায়নি। মানুষ কল্পনায় স্বর্গ রচনা করেছে। যুগে যুগে দেশে দেশে পুরাণে গল্পে কিংবদন্তীতে ধর্মের পুঁথিতে পুঁথিতে স্বর্গ তার আশ্চর্য উজ্জ্বল রূপ নিয়ে মানুষের সামনে উঁকি দিয়েছে মাত্র, কিন্তু স্বর্গকে করতলগত করে সম্পূর্ণ উপভোগ করেছে পৃথিবীতে একমাত্র কবিচিত্ত। কবিতার মধ্যে স্বর্গ সম্পূর্ণভাবে মানুষের হৃদয়ে ধরা দিয়েছে।

কালিদাস যেদিন রচনা করেছিলেন—

তত্রাগারং ধনপতিগৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং
দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন

সেদিন তাঁর কুটিরের পাশেই দুর্গন্ধ নর্দমা ছিল কিনা, তাঁর ভাঙা দরজার সামনেই আবর্জনার স্তূপ পড়ে ছিল কিনা, গৃহিণীর হাঁড়িতে চাল বা শিশুর গায়ে জামার অভাব ছিল কিনা, আমাদের কারুরই জানা নেই। কিন্তু মহারাজা বিক্রমাদিত্যের রত্নসিংহাসনের বর্ণনা, রাজসভার আড়ম্বর, স্বর্ণপাত্রে বাজভোগ গ্রহণ আর রূপসী চামরধারিণীদের কাহিনী আমাদের যথেষ্ট জানা আছে। কিন্তু আমরা কেউই বোধহয় অস্বীকার করব না, মেঘদূত কাব্যরচনাকালে কবি কালিদাস তাঁর কল্পলোকের যে সিংহাসনে বসে অমরার সুখ উপলব্ধি করেছিলেন, সে সুখভোগ সম্রাট বিক্রমাদিত্যের ভাগ্যে ঘটেনি। বিক্রমাদিত্যের তুলনায় কালিদাসের ঐশ্বর্য উপভোগ ও সুখানুভূতি তুচ্ছ নয়, বরং অনেক উচ্চই।

মানুষ জীবনের বাস্তবলোকে যেমন আপনার কর্মজগৎকে সৃষ্টি করেছে, তেমনি মানসলোকে সৃষ্টি করে নিয়েছে কল্পনাজগৎকে। কর্মজগৎ থেকে গড়ে উঠেছে তার বিবাট ও বিচিত্র সভ্যতা—কল্পজগৎ থেকে গড়ে তুলেছে মানুষ সাহিত্য, কাব্য। মনোময় জগতের এই কল্পলোক বস্তুময় জগতের কর্মলোক হতে তুচ্ছ নয় অথবা দূরে নয়। বরং অদৃশ্য অস্পর্শ হয়েও বস্তুজগতের অতি নিকটবর্তী বলা যেতে পারে। কর্মময় জগতের মূলে আছে মানুষের মন। মনেরই নিজস্ব লীলার রাজ্য কল্পনার অনির্বচনীয় লোক। বাস্তব থেকে রস আহরণ করে তার প্রাণ, কিন্তু তার আত্মা সকল বন্ধন, সকল দায়িত্বের ঊর্দ্ধে। মাটি আর সারের কাছে ঋণী বলে গোলাপফুলকে যদি মাটিরই পাপড়িতে গড়ে তুলতে চেষ্টা করা হয়, তার পেলবতা ও বর্ণগন্ধের সমারোহকে বাস্তবজীবনের প্রয়োজন-শূন্য বিলাসিতামাত্র বলে উপহাস করা হয়, যুক্তিতর্কের দিক থেকে বিচার করলে সেটা ন্যায্য প্রমাণিত হতে পারে, কিন্তু ঠিক ঐ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে গোলাপফুলের বিচার করা হাস্যকর, রসিকজনেরা অবশ্যই বলবেন। সংসারেব সকল বস্তুই ন্যায়ের দণ্ডে বা প্রয়োজনের দণ্ডে মাপা যেতে পারে না,—রসের দণ্ডে, আনন্দের দণ্ডে, শিল্পের দণ্ডেও মাপ আছে। অনেক কিছুই সাধারণ বস্তু এবং বিষয় আছে, যুক্তির সাহায্যেই যাদের প্রমাণিত করা হয়। কিন্তু সংসারে এমনও অল্পকিছু অসাধারণ বিষয় আছে, যাদেব প্রমাণ—উপলব্ধি আস্বাদন আর আনন্দের মধ্যেই নিহিত।

অবশ্য বলা যেতে পারে, উপলব্ধি, আস্বাদন এবং আনন্দেরও তো মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। অর্থাৎ, মানুষের রুচি ও প্রবৃত্তির গতি বদল করার শক্তিও যখন মানুষের নিজেরই হাতে কতকটা,—তখন আজকের যুগের অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুতর প্রয়োজনের জন্য আমরা শিল্পের রূপ ও শিল্প-আস্বাদনের রুচি বদল করে নেব না কেন?

এই রুচি ও আস্বাদনের রং-বদল পৃথিবীতে চিরকাল নিজের স্বাভাবিক নিয়মেই হয়ে আসছে। প্রয়োজনের চাপে উদ্দেশ্যমূলকভাবে হয়নি। ফুলেরই প্রয়োজনে ফুল ফুটে উঠেছে, ঝরে পড়েছে,—গবমের তাগিদে নয়। সাহিত্যেরই সজীবতার প্রয়োজনে

সাহিত্য যুগে যুগে বদল হয়েছে, বদল হবেও।

আজ আমাদের শান্তচিত্তে চিন্তা করে দেখা দরকার, যুগানুগত আপাতকালের কাছে আমরা সর্বকাল বা চিরকালকে বন্ধক দিয়ে রাখব কি না। শিল্পী এবং তার সৃষ্টি আপাতকালে আশ্রয় গ্রহণ করে মাত্র, তার লক্ষ্য বা ইষ্ট সর্বকাল। এই সর্বকালিক আদর্শকে সর্বকালিক সত্যকে কোনও কিছুরই জন্য ক্ষুণ্ণ করলে মহৎ শিল্পের অভ্যুত্থানে বাধা ঘটে।

আপন জীবনকালে যে-সকল জীবনসমস্যার মধ্যে, আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখের মধ্যে কবিচিত্ত আন্দোলিত হয়ে থাকে, যেখান থেকে তাপ সঞ্চয় করে তাঁর চিত্তের প্রদীপ জ্বলে ওঠে, তার প্রভাব এবং প্রতিচ্ছবি আপনিই তো সাহিত্যে-কাব্যে ফুটে উঠবে। শিল্পী ও কবি তাঁদের জীবনের বর্তমান যুগের বাইরের মানুষ নন। স্বীয় কালের দুঃখ-সুখ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁরা জড়িত। প্রতি যুগের মানসিক ছবি তো আপনা হতেই কবির কাব্যে, চিত্রীর চিত্রে সঞ্চারিত হয়। যেমন বহু পূর্বকালের ছবি আমরা প্রাচীন সাহিত্যে কাব্য-চিত্রে দেখতে পাই।

আজ পৃথিবীর কাব্যসাহিত্যচিত্রের জন্য অলিখিত অথচ দৃঢ় নির্দিষ্ট ক্যারিকুলাম তৈরি হয়েছে। আজ নবীন কবি লেখনী নিয়ে ভাবছেন তাঁর কবিতার ভাব এবং বিষয়বস্তু কি হওয়া উচিত। চিত্রকর তুলি নামিয়ে চিন্তা করছেন,—কোন বিষয়কে অবলম্বন করে তাঁর হৃদয়ের আনন্দকে মুক্তি দিলে সার্থক চিত্র হবে। অর্থাৎ আজ কবি ও শিল্পীর হৃদয়ের পূর্ণ স্বাধীনতা নেই যা খুশি তাই নিয়ে কাব্য রচনা করবার বা তুলি টানবার। মস্তিষ্ক সম্রাট হয়ে বসে বুদ্ধির শাণিত প্রভাবে হৃদয়ের গতি নিয়ন্ত্রিত করছে। এখন—

> 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
> ময়ূরেব মতো নাচেরে—'

লিখবার উপায় নেই। হৃদয় এখন বুদ্ধির শিকলে বাঁধা। নাচ সে হয়তো ভালরকম শিখেছে, তার শিক্ষার আশ্চর্য নৈপুণ্য যে বাহ্‌বা পাওয়ার যোগ্য এতে সন্দেহ নেই। তবে কল্পনাকাশের মেঘোদয়ে হৃদয়-ময়ূরের পেখমমেলা স্বাধীন নৃত্য, আর বিশেষ উদ্দেশ্য-সচেতন বুদ্ধিব শিকলে বাঁধা হৃদয়ের সুশিক্ষিত সুনিপুণনৃত্য—এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ সকলেই মানবেন। যুগের প্রয়োজন, যুগের চিন্তা, যুগের রুচি কেউই অস্বীকার করে না। কিন্তু কাব্যের উদার বিস্তৃতিকে গণ্ডীর মধ্যে খর্ব করার ব্যবস্থায় আপাত-কল্যাণ থাকেও যদি, চিরন্তন কল্যাণ থাকতে পারে না। কল্পলোক মানুষের জীবনে যতই প্রধান হয়ে উঠুক না কেন, বস্তুলোককে অস্বীকার বা অতিক্রম করতে পারে না। কারণ, কবির চিত্ত কল্পলোকে সঞ্চরণশীল হলেও কবি স্বয়ং বস্তুলোকেরই অধিবাসী, রক্তে-মাংসে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় গঠিত। তাই এতকাল কল্পলোক ও বস্তুলোকের সম্মিলিত স্পর্শে অনেক মহৎশিল্পের উদ্ভব হয়েছে পৃথিবীতে। আজ বস্তুলোক তার সর্বগ্রাসী

আত্মপ্রসারণে কল্পলোককে নির্মূল করতে চায়। কল্পলোককে অবজ্ঞায় উপহাস এবং অস্বীকার করে বস্তুলোককেই এখন একমাত্র চরম ও পরম সত্য বলে মেনে নেওয়ার মতবাদ এসেছে। আমাদের মনে হয়, এতে হবে মানুষের সামনের দিকের যাত্রাকে পিছনের দিকে টেনে পিছিয়ে আনা।

ছোটকে বড় করে তোলার মধ্যে গৌরব আছে, কিন্তু বড়কে ছোট করে আনায় কৃতিত্ব থাকলেও গৌরব নেই।

লাভ-ক্ষতির হিসাব আর দায়িত্ব ও কর্তব্যের গুরুভার—এব থেকে বিশ্বদুনিয়ায় কারুরই রেহাই নেই। কবিচিত্ত নামে যে বস্তুটি এতকাল ধরে কাজের দুনিয়ায় দরকারি-জোয়াল টানা থেকে ফাঁকি দিয়ে আকাশে বাতাসে মাটিতে যদৃচ্ছা-বিচরণ করে ফিরছিল,—আজ তাকেও ধরে এনে প্রত্যক্ষ সংসারের সদুদ্দেশ্যের জোয়ালে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। আজ পরাধীন মানবের আর অন্নহীন মানবের দুঃখে সকলেই আমরা ব্যথিত, আত্মগ্লানিপরায়ণ, কিন্তু দুর্ভাগা কবিদের এই শৃঙ্খলিত বন্দীদশা কারুর অন্তর স্পর্শ করে না কেন? আমি তো দেখি, আজ পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে দুঃখী এবং বঞ্চিত বর্তমান যুগের নবীন কবিরা। এদের উপরে আজ যে শাসন ও বন্ধন অদৃশ্য লিখনে দেশে দেশে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, তাদেব চিন্তাশক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচিকে সুনির্দিষ্ট এবং নির্ণীত-লক্ষ্য করে দেওয়া হচ্ছে, তার করুণতা কেন সকলের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

কবিতা যদি পরিপূর্ণ মুক্তির মধ্যে, দায়িত্বের ভারমুক্ত পাখার অবাধ সঞ্চরণের উপযুক্ত উন্মুক্ত আকাশের দূরবিস্তৃতি না পায়, তবে তার প্রাণের লীলা, গানের লীলা, গতিব লীলা খর্ব হবেই, হয়ে উঠবে আড়ষ্ট। আধুনিক নবতম কবিতার আস্বাদ গ্রহণ করতে গিয়ে আমরা বাধা ও বেদনা পাই তাব সর্বাঙ্গের কঠোর নিষেধ-শৃঙ্খলগুলিতে।

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৬০

আশাপূর্ণার লেখা

সংসারে অনেক সময়ে অনেক জিনিস প্রত্যক্ষভাবে চোখের সামনে থাকলেও, চোখে পড়ে না। এই চোখে-না-পড়াটা কি নির্ভেজাল সামগ্রিক সত্য? আমার মনে হয়, তা নয়। ছোটখাটো দামী জিনিস অনেক সময়েই হয়তো অমনোযোগিতায় চোখ এড়িয়ে যায়, কিন্তু ঘরের সামনে একটা বটবৃক্ষ খাড়া হয়ে উঠলেও যদি আমরা সহজ ঔদাসীন্যে সেটার অস্তিত্ব যেন নেই এমন ভান করি, তখন বুঝতে ভুল হয় না এই চোখে-না-পড়া স্বেচ্ছাকৃত।

আজকের যুগের মানুষ সত্যিই নতুন মানুষ। এঁদের মধ্যে মূল্যবোধ, রুচি, রীতিনীতিই শুধু বদলে যায়নি, অদ্ভুত বদলে গেছে ভিতরের সত্যবোধ। শুভবোধ। সত্য ও শুভ এখন নিজস্ব প্রয়োজন-ভিত্তিক। জীবনের সমস্ত কিছুই বুঝি এখন আত্মপ্রয়োজনের বা গোষ্ঠী-প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়িত হয়।

রাজনীতি ক্ষেত্রের নীতি ও কৌশল এ-যুগে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজিত, প্রসারিত। সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও। সঙ্গীত, নাট্য, সাহিত্য এখন গোষ্ঠীনির্ভরতায় মূল্যায়িত এবং স্বীকৃত অস্বীকৃত।

বিদ্যায়তনে বিদ্যাও এই একই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রয়োজনভিত্তিক মানে মূল্যায়িত হয়ে এক বিকৃত বিদ্বান-গোষ্ঠী তৈরি করে চলেছে।

একসময় ছিল, যখন সাহিত্যের দিকে তাকিয়েই সাহিত্যের মূল্য নির্ণীত হত, বিদ্যার দিকে তাকিয়েই বিদ্বান্ নির্ণয় হত। তার মধ্যে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি ছিল না, মতলব ছিল না। সমালোচকেরা সাহিত্যের প্রতিই লক্ষ্য রেখে সাহিত্য-সমালোচনা করতেন। সে সমালোচনা যতই কেন রক্ষণশীলতার শেকল-বাঁধা হোক অথবা পশ্চাৎপন্থী হোক। তার ভিত্তি ছিল অকপট বিশ্বাস, তাঁদের স্বার্থ বা মতলব নয়। সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েও দেখতে পাইনির মিথ্যে ভান ছিল না।

বাংলা সাহিত্যে চল্‌তি কালের লেখা নিয়ে বহু সমালোচনা, ভাল লেখা নিয়ে সমঝদারকুলের নাড়াচাড়া দেখতে পাই। এঁদের চোখে এখনও আশাপূর্ণা দেবীর রচনাশক্তি 'তেমন কিছু' বলে নজর হতে দেখিনি। বরং, অনেকেই তাঁর একাডেমিক বিদ্যে এবং ইংরেজি ভাষার জ্ঞান কতখানি সেইটি ভাল করে খোঁজ রাখেন,—মৌখিক কথাবার্তায় বিভিন্ন জায়গায় শুনেছি।

সমঝদাব ব্যক্তিরা ভাল করে জেনে রেখেছেন, এঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র অন্দরমহলের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ, সুতরাং সেই হিসেবেই সাহিত্যের নম্বর পাওয়ার অধিকারী। তাঁর রচনায় মহৎ সাহিত্যগুণ দুর্লক্ষ্য, কারণ তাঁর আশপাশের সরঞ্জাম কই? তিনি কি ইতিহাসে পণ্ডিত? দর্শনে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে? এমন কি মনোবিকলনে? ইংরেজি ভাষাটাই তো তিনি ছোঁয়ার সুবিধে পাননি নিজমুখে বলেন সর্বত্র। সুতরাং তিনি কী করে উৎকৃষ্ট মানের সাহিত্য সৃষ্টি করবেন? অর্ধশিক্ষিত অনভিজ্ঞ সমাজ আর হৃদয়বৃত্তিমুগ্ধ সামান্য নারীকুল তাঁর সাহিত্যের প্রজা হতে পারে। সত্যিকারের খাঁটি সাহিত্যগুণ সে সৃষ্টিতে সম্ভবপর নয়।

যদিও, আমাদেরই এই দু'শো বছরের বাংলা সাহিত্যের সীমিত অধ্যায়ে অপণ্ডিত সাহিত্যস্রষ্টাদের সৃষ্টি অসার্থক হয়নি। বিদ্যালয়ের সীমানা বহির্ভূত স্ব-শিক্ষিত রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের মন্দিরে বাংলা সাহিত্যের খবর পৌঁছে দিয়ে গিয়েছেন। অভিজ্ঞতার এবং জ্ঞানের পরিধি কেবলমাত্র বাইরের থেকে জমা করে তোলা স্তূপীকৃতিতে 'সাহিত্য শিল্প' হয়ে ওঠে না, অন্তরিন্দ্রিয়ে সেই বিশেষ শক্তিটি যদি না থাকে, অর্থাৎ তৃতীয় নেত্র না থাকে ; যার সাহায্যে অভিজ্ঞতা ও কল্পনা যথার্থ সাহিত্য হয়ে ওঠে। উপাদান অনেক আর পটভূমিকা প্রকাণ্ড হলেও, সার্থক সাহিত্য সব সময়ে হয় না। তবে,

প্রকাণ্ড পটভূমিকা আর নানা বিচিত্র বিষয়ের উপস্থিতিতে তার একটা উচ্চতা আর জৌলুষ চমৎকৃত করে বৈকি।

বাংলা সাহিত্য এখনও এক স্কুল-পলাতক আর কালেজী-বিদ্যাহীন লেখক-যুগলকে স্তম্ভ করে তারই উপরে ভার রেখে উঁচু দিকে চারতলা পাঁচতলা ছয়তলা বানানোয় ব্যাপৃত। আরও অনেক উঁচু হোক সাহিত্যসৌধ কিন্তু খাঁটি উপাদান হলেই হল। বিভূতিভূষণেরও অভিজ্ঞতার পরিধি সীমিত ছিল, বিষয়বস্তুও সামান্য সামগ্রী নিয়ে,—কিন্তু দৃষ্টি ছিল তাঁর অসীম।

আমার আশ্চর্য ঠেকেছিল আশাপূর্ণা দেবীর বিস্ময়কর ট্রিলজির প্রথম খণ্ড 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' বইখানি যখন প্রকাশিত হল। মনে নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছিল, এ বই নিয়ে বাংলা সাহিত্যে নিশ্চয় যথেষ্ট সাড়া পড়বে। সমঝদার যাঁরা, যাঁরা খাঁটি জিনিসের উঁচু মান চেনেন, তাঁরা নিজেদেরই দেশের বিশেষ কোনও এক সময়ের অদৃশ্য মানুষগুলিকে তাদের তৎকালীন সমাজের পটভূমিকায়, তাদের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, নীতি, রীতি, আচরণসহ জীবন্তভাবে প্রত্যক্ষ করাব বিস্ময় আর আনন্দ প্রকাশ না করে পারবেন না। পৃথিবীর নানা বিচিত্র সমাজব্যবস্থা বিভিন্নকালের কেমন আকৃতিতে ছিল, তারই একটি সার্থক নিদর্শন এই বইখানি। এর মধ্যে নানা বিভিন্ন নরনারী ও ঘটনার সমাবেশ আছে। চরিত্রও নানারকম। সেই জেনারেশনের পরের জেনারেশন দ্বিতীয় খণ্ডে 'সুবর্ণলতা'। তখন সমাজের চেহারা অনেক বদল হয়েছে। মানুষের মনের, বহির্জগতের অবস্থার এবং বিশ্বাসেরও বদল হয়েছে। কিন্তু, বদলটা বাইরের দিকে যত, অন্তঃপ্রকৃতিতে তা নয়। ভিতরটা প্রায়-অনড় হয়ে আছে সংস্কারের ও অভ্যাসের দৃঢ় শিকড়ে। এরই মধ্যে ডানা ঝাপ্‌টানো নারী-অন্তরাত্মা,—যা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' থেকে শুরু—সেই বন্ধন-বিদ্রোহী অন্তরাত্মার খাঁচার বাইরে আসার ছবি দেখি তৃতীয় জেনারেশন 'বকুল-কথা'য়। এই বন্দী মানবাত্মার বন্ধনমুক্তির আর্তি কোনও বিশেষ একটি ভৌগোলিক কোণে ঘটলেও, এ কিন্তু সারা বিশ্বের। বিভিন্ন কালের সীমানায় এরা বিশ্বের সকল দেশে এই একইভাবে বন্ধনে যন্ত্রণা পেয়েছে, কেউ কেউ বিদ্রোহ করেছে পাথরের পাঁচিলে মাথা ঠুকে রক্তাক্ত হয়ে। কালই ধীরে ধীরে তাদের বন্ধনপাশ খুলে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। তাদের সমাজব্যবস্থার শুধু নয়, তাদের চিন্তার, বুদ্ধির,—মনুষ্যত্বের।

আশাপূর্ণার 'ট্রিলজি' বিশ্বসাহিত্যের আসরে নিয়ে যদি আমরা দাঁড়াই, উপযুক্ত অনুবাদের মাধ্যমে (অনুবাদ অনুপযুক্ত হলে মূল সৃষ্টির যে কত ক্ষতি হয়, বিদেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভুল ধারণা তার মর্মান্তিক নিদর্শন) তাহলে এ বই 'ভারতবর্ষের সাহিত্য' বলে এবং উত্তীর্ণ সাহিত্য বলে স্বীকৃত হবে আমার ধাবণা।

এদেশে সাহিত্যস্বীকৃতি পেতে হলে যা যা বহিরঙ্গের ব্যাপারে জরুরী, সেগুলি যাঁদের নেই কিংবা যাঁরা সেই 'যস্মিন্ দেশে যদাচার' কৌশল শিখতে পারেননি, তাঁদের সৃষ্টিকর্ম যত সাহিত্যগুণসম্পন্ন বা শিল্পোত্তীর্ণ সামগ্রী হোক্ না, তাঁদের খবর বিদগ্ধ ও সমঝদার সমাজে সহজে পৌঁছয় না। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রায়

অর্ধশতাব্দীকাল ধরে বাংলা সাহিত্যে অতি উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্প এবং সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে চলেছেন। তাঁর লেখার ঔজ্জ্বল্য এবং সাহিত্যমানের হিসেবে তিনিও উঁচু সমাজের বিশেষ চোখে পড়েননি। কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা সংস্থা একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন। আমার অনুযোগ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নয়, সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। যে-সাহিত্য ভাল হয়েছে, যে-সাহিত্য যথার্থ সাহিত্যগুণসম্পন্ন, সে-সাহিত্য কেন তার সমকালীনদের কাছে সমাদর পাবে না? দূরকালের অনাগত সমালোচকের অপেক্ষায় তাদের প্রতীক্ষিত থাকতে হবে!

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র নবম সংস্করণ হয়ে গেছে, 'সুবর্ণলতা' চতুর্থ সংস্করণ, 'বকুলকথা' প্রকাশিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যে দ্বিতীয় মুদ্রণ হয়েছে।

এই দুর্মূল্যের বাজারে নানা অভাব আর তিক্ততার মধ্যে আঠারো-কুড়ি-বাইশ টাকা দামের এক এক খণ্ড বই স্বচ্ছন্দে ফুরিয়ে যাওয়া বৃহৎ পাঠকসমাজের হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছুবার নিদর্শন। বিদগ্ধ সমালোচকেরা নিঃশব্দ থাকুন ভবিষ্যৎকাল এর যথার্থ মূল্য দিতে ত্রুটি করবে না। অনেক বই অবশ্য গরম ফুলুরির মত দ্রুত ফুরোয় জানি। সিনেমা-সংক্রান্ত অথবা ডিটেক্‌টিভ্ বা যৌন-উদ্দীপক। যা সুরার মতন মানুষকে টানে। কিন্তু, সুরায় আর নির্ভেজাল দুধে যে-পার্থক্য, মহৎ সাহিত্য আর স্নায়ু-উদ্দীপক সাহিত্যে সেই রকম তফাৎ।

আশাপূর্ণার লেখার বিষয়বস্তু এবং পরিধি নিয়ে অনেকের মুখে উল্লেখ শুনেছি। এ সম্পর্কে আমার ধারণা,—বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বা বিশেষত্ব যতই থাক, তা খাঁটি সাহিত্যগুণসম্পন্ন হয়েছে কিনা, এইটিই বিচার্য হওয়া উচিত। সৃজিত-সাহিত্য আর নির্মিত-সাহিত্য দু'রকম সাহিত্যে বিশ্বের বাজার এখন ভর্তি। নির্মিত-সাহিত্যের দাপটে বঙ্গবাণীর আঙিনায় এখন সৃজিত-সাহিত্য অন্ধকার কোণে মুখ লুকিয়ে কুণ্ঠিত। নির্মিত-সাহিত্যের হাতে অনেক তীক্ষ্ণধার হাতিয়ার আছে। গায়ে লৌহবর্ম। সৃজিত-সাহিত্য হাতিয়ারহীন পদাতিক। তার অশ্ব রথ হস্তী নেই। কিন্তু, সে নিজে নির্ভেজাল যোদ্ধা। তার মগজে সারা বিশ্বের উজ্জ্বল মগজগুলি ঠাসা নেই। আশাপূর্ণার সৃষ্টি ইংরেজি ভাষার ভাণ্ডার খুলে, সচেতনে বা অবচেতনে অন্যের ঋণ গ্রহণের সুযোগ পায়নি। এটি তাঁর পরম সৌভাগ্য বলেই আমার ধারণা।

তাঁর সাহিত্য খাঁটি এ দেশের সামগ্রী, একে আমরা 'ভারতীয় দ্রব্য' বলে নির্দ্ধিধায় বিদেশে পাঠাতে পাবি। 'পথের পাঁচালী' যে শিল্পগুণে এবং সাহিত্যতে রসিকসমাজের স্বীকৃতি ও সম্মান পেয়েছে, আশাপূর্ণার ট্রিলজির মধ্যে আমি তা অনুভব করেছি। সবলতা ও অকপটতা বিভূতিভূষণের লেখনীর বিশেষ গুণ, আশাপূর্ণার লেখনীরও সেই সৎগুণটি লক্ষণীয়। এঁরা নিজেদের সামান্য অভিজ্ঞতার কানাকড়ি নিয়ে অসামান্যকে হাজির করে—খেলায় জিৎ আয়ত্তে রাখেন।

কথাসাহিত্য, কার্তিক ১৩৮১।

ছোটগল্প

বিমাতা

১

দশমবর্ষীয়া বালিকা মাধুরী যখন মাতৃহারা হইল, তখন তাহার মর্ম্মন্তুদ বেদনা-মথিত আকুল শোকাশ্রু-ধারা রুদ্ধ করিতে হইয়াছিল দুই বৎসরের শিশু ভাই তপনকুমারের মুখপানে চাহিয়া। অবোধ ক্ষুদ্র ভাইটি যখন মাধুরীর ক্রোড়ে চড়িয়া, তাহার গলাটি জড়াইয়া, রুগ্না মাতা যে কক্ষে শয়ানা ছিলেন, সেইদিকে আঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ক্রন্দন-বিজড়িত স্বরে, 'দিদা! মা চল্। মা দাব' প্রভৃতি অসম্পূর্ণ বাক্য দ্বারা আধ আধ স্বরে মাতাকে দেখিবার ও মাতার নিকট যাইবার উদ্দাম ইচ্ছা প্রকাশ করিত, মাধুরীকে তখন উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ দমন করিয়া, অশ্রুসিক্ত বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভ্রাতাকে ভুলাইবার জন্য বাগানে পেয়ারা, ফুল কিংবা চড়ুইপাখীর সন্ধানে যাইতে হইত।

মাধুরী যে একবার বুকের গুরু বোঝা নামাইয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবে, এমন সুযোগ ও অবকাশ একদিনের জন্যও তাহার মিলিল না। শিশু তপন মাতার রুগ্নাবস্থা হইতেই সর্ব্বদা তাহার দিদার নিকট থাকিত, আহার, নিদ্রা, খেলা-ধূলা, ভ্রমণ, বিশ্রাম সবই তাহার দিদা নহিলে চলিত না। মায়ের মৃত্যুর পর এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে দিদার কাছ ছাড়া হইত না। সমস্ত দিনটি সে দিদির আঁচল ধরিয়া হাঁটিয়া কিংবা ক্রোড়ে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। সন্ধ্যাবেলা দিদির মুখে 'রাজপুত্তুর ও সোনার হরিণের উপকথা', একই গল্প প্রত্যহ শুনিত। কোনও কোনওদিন বা তাহার স্বর্গগতা মাতার আলোচনাও করিত। তপন বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে শ্রবণ করিত—তাহাদের মাতা 'স্বর্গ' নামক উৎকৃষ্ট উচ্ছ্বাস-আলোকময় দেশে, হীরা মণি-মাণিক্য-খচিত অপরূপ স্বর্ণময়ী পুরীতে বাস করিতে গিয়াছেন এবং সেখানে তাঁহার সমস্ত অসুখ সারিয়া গিয়াছে ও সুখে আছেন। দিদির কথাগুলির মর্ম্মার্থ আদৌ গ্রহণ করিতে না পারিলেও সে দিদির মুখের কাহিনী শুনিতে অতিশয় ভালবাসিত। কোনও কোনওদিন সন্ধ্যায় ঘুমের পূর্ব্বে যখন সে ঘোরতর বাহানা ধরিত, ক্রন্দন-পরায়ণ দুর্দ্দান্ত বলিষ্ঠ শিশুকে সাধ্যায়ত্ত করা সেদিন মাধুরীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়িত। ভ্রাতাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া মাধুরী নিজে সুদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিয়া, স্বর্গগতা মায়ের প্রতি কি জানি কেন দুর্জ্জয় অভিমানে ফুলিতে থাকিত। ভাই-বোনে একত্রে কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতলে শাণের উপর বা সিঁড়ির চাতালে ঘুমাইয়া পড়িত।

সময়ই শোকের একমাত্র ঔষধ। দীর্ঘদিনে শিশু তপন ক্রমশঃ মায়ের কথা ভুলিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু মাধুরীর প্রথমকার উদ্বেলিত শোক কতকটা প্রশমিত হইলেও অন্তস্তলে নিদারুণ বেদনার ক্ষত শুষ্ক হইল না। অন্তঃসলিলা ফল্গুরই মত তাহার ক্ষুদ্র বক্ষান্তরালে মায়ের অভাব-বেদনা সর্ব্বসময়েই প্রবাহিত রহিল।

বালিকাবয়সেই সংসারের কঠোর পরীক্ষায় মাধুরী বয়স অনেক না হইলেও অনেক বেশী সংযম, সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধি-বিবেচনা লাভ করিয়াছিল। সংসারের সামান্য একটু আঘাতেই তাহার অন্তর্নিহিত গোপন বেদনাক্ষত হইতে রক্ত ঝরিয়া পুরাতন ক্ষতকে আবাব নবীন করিয়া তুলিত। কিন্তু তাহার মর্ম্মের এই মর্ম্মন্তুদ বেদনার কথা সে বহির্জ্জগতে কাহাকেও জানাইতে পারিত না—পিতাকে পর্য্যন্ত নহে।

সংসারে মাধুরী প্রাণ দিয়া ভালবাসিত তপনকে। তপনই তাহার ক্ষুদ্র জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা ছিল। এই দুইটি বালক-বালিকা পরস্পর পরস্পরের অবলম্বন ও কেন্দ্র হইয়া একত্রে পৃথিবীর এক কোণে লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে একটি বৃন্তে দুইটি কলিকার ন্যায় ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল।

২

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তপনের এখন চারি বৎসর এবং মাধুরীব দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। তপন মাতার কথা প্রায় বিস্মৃতই হইয়াছে, তবে মাধুরী মাঝে মাঝে তাহার নিকট স্বর্গগতা মাতার কাহিনী বলিত এবং প্রত্যহ প্রত্যূষে দুই ভাই-বোনে মায়ের সুবৃহৎ ব্রোমাইড ফোটোর তলে প্রণাম করিয়া পুষ্প উপহার দিত বলিয়া তপন মা'কে অন্তর হইতে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাহা হইলেও মাতার জীবন্ত মূর্ত্তি তাহার আদৌ মনে নাই। ফোটোগ্রাফের মূর্ত্তিই অন্তরে মুদ্রিত আছে, আর মাধুরীর ন্যায় তাহার অন্তস্তলে মায়ের জন্য কোনও গোপন বেদনাবোধ নাই। সে জ্ঞান হইতে দিদাকেই পাইয়াছে, দিদাকেই চিনিয়াছে, দিদাই তাহার বন্ধু, সঙ্গী, খেলার সাথী, স্নেহময়ী মা।

ফাল্গুনের শেষ। সন্ধ্যার অন্ধকার ছায়া মেদিনীবক্ষে তাহার কৃষ্ণাঞ্চলখানি ধীরে ধীরে বিস্তৃত করিবার আয়োজন করিতেছে, গোধূলির রক্তরাগ পশ্চিম হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই, আম্র-মুকুল-সৌগন্ধ্য-লুব্ধ ভ্রমরকুল আম্রশাখাসমীপে ঘন গুঞ্জনধ্বনি তখনও বন্ধ করে নাই। উদ্যানে পুষ্করিণী-ঘাটের চাতালে ইষ্টক-নির্ম্মিত বিলাতী মাটীর বেঞ্চের উপর মাধুরী চুপ করিয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল। তপনও তাহার পার্শ্বে পা ঝুলাইয়া, ময়লা পিরাণের প্রান্তে অনেকগুলি তেঁতুলবীচি ক্রোড়ের উপর দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়াছিল।

সমস্ত দ্বিপ্রহর এই তেঁতুলবীচিগুলি লইয়া দুই ভাই-বোনে 'টোক্কা-ফোক্কা' খেলা হইয়াছে। খেলায় সমস্ত বীচিগুলিই মাধুরী একা জিতিয়া লইয়াছিল। মাধুরী যখন তপনের অবশিষ্ট সর্ব্বশেষ বীচি দুইটিও জিতিয়া লইল, তখন তপন তাহার বড় বড় ভাসা চক্ষু দুইটি দুঃখ অভিমান ও অশ্রুতে পূর্ণ করিয়া বেদনা-মিশ্রিত গাঢ় স্বরে প্রশ্ন করিল,—'আমি তবে এবাল তি নিয়ে তেল্‌ব? আমি তি হেলে গেলুম?'

তপনের অবাধ্য জিহ্বা এখনও 'র'কে 'ল' এবং 'ক' ও 'খ'কে 'ত' উচ্চারণ করা ত্যাগ করে নাই।

মাধুরী ভ্রাতার আসন্ন বর্ষণোন্মুখ নেত্রের প্রতি চাহিয়া বীচিগুলি অঞ্চল হইতে মেঝেয় ঢালিয়া ফেলিল এবং সাগ্রহে ভ্রাতাকে ক্রোড়ে লইয়া বক্ষে জড়াইয়া ধরিল। সে তখন নানারকমে প্রমাণ করিয়া দিল, তপনবাবুরই জিৎ হইয়াছে এবং এই সমুদায় বীচিগুলিরই ন্যায্য মালিক শ্রীমান তপনকুমার বসু। তপনের ম্লান অধরে তৎক্ষণাৎ মেঘাপসারিত রৌদ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল এবং শশব্যস্তে দিদার বাহু-বন্ধনী হইতে নিজেকে সত্বর মুক্ত করিয়া পরিধেয় জামার অগ্রভাগ বামহস্তে ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের ক্ষুদ্র মুষ্টি দ্বারা তাহার ভিতর জয়লব্ধ বীচিগুলি সাগ্রহে রক্ষা করিতে তৎপর হইল।

সারাদিন খেলাধূলা করিয়া বৈকালে দুই ভাই-ভগিনী রন্ধনকারিণী 'বামুনদিদি'র নিকট দুধ ও মিষ্টান্ন আহার করিতে গেল। মাধুরী তাহার ভ্রাতাকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার করিতে না আসায় প্রখররসনা বামুনদিদি কর্ত্তৃক ভর্ৎসিতা হইল। এইরূপ ভর্ৎসনা মাধুরী মধ্যে মধ্যে শুনিয়া থাকে, কোনওদিন তিরস্কার অতিরিক্ত হইয়া মাত্রা লঙ্ঘন করিলে ভর্ৎসনাকারিণীর সম্মুখ হইতে অপসারিত হইয়া অন্তরালে গিয়া সে অশ্রু মুছিযা থাকে। অদ্য বামুনদিদি তাহাকে চিরপ্রথানুসারে মামুলী তিরস্কার-বাণী না শুনাইয়া কতকগুলি নূতনতর কঠিন কথা শুনাইয়াছেন। কথাগুলি সত্য হইলেও মাধুরীর পক্ষে অতিশয় বেদনাদায়ক। কাহারও মুখের উপর জবাব দেওয়া বা উচ্চবাচ্য করা মাধুরীর স্বভাববিরুদ্ধ। বামুনদিদির নূতনতর ভর্ৎসনা ও ভীতি-প্রদর্শন শুনিয়া নীরবে অশ্রু সংবরণ করিতে করিতে, ভ্রাতাকে আহার করাইয়া, কোনও মতে নিজেও কিছু গলাধঃকরণ করিয়া মাধুরী বাগানে চলিয়া আসিয়াছে।

পুষ্পোদ্যানসংলগ্ন পুষ্করিণীর ঘাটে বিলাতী মাটির বেঞ্চের উপর মাধুরী উন্মনা চিত্তে বসিয়া যখন বামুনদিদির কথাগুলির অর্থ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন বালক তপন তাহার পূর্ব্বসংগৃহীত অতি যত্নের তেঁতুলবীচিগুলি সযত্নে জামার প্রান্তে ধারণ করিয়া দিদার পার্শ্বে সুগম্ভীরভাবে উপবিষ্ট হইয়া, বার বার দিদার মুখের প্রতি চাহিতেছিল। দিদার এমন গম্ভীর চিন্তামগ্ন ভাব প্রায়ই সে দেখিতে পায় না, সুতরাং একটু বিস্মিত অথচ উদ্বিগ্ন নেত্রে বার বার দিদার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এবং মৃদু কণ্ঠে তেঁতুলবীচি লইয়া খেলা ও উড্ডীয়মান প্রজাপতি ধরার প্রস্তাব করিয়াও যখন দিদার উদাসভাব বিদূরিত করিতে পারিল না, তখন সেও অত্যধিক গম্ভীর হইয়া, মাধুরীর গা ঘেঁসিয়া বসিয়া পা দুইটি ঠিক মাধুরীর মত করিয়া ঝুলাইয়া দিল। তাহার মুখের সেই সময়কার সুগম্ভীর চিন্তাশীল ভাব দেখিবার জিনিষ বটে।

শেষ ফাল্গুনের সুমিষ্ট সান্ধ্য সমীরণ পুষ্করিণীর সুশীতল শীকরাভিষিক্ত হইয়া, উদ্যানস্থ অগণিত পুষ্পের সৌরভ মাখিয়া, চঞ্চলপদে নাচিয়া বেড়াইতেছিল। পুষ্করিণীঘাটের নিকটেই একটা অজ্ঞাতনামা বিলাতী পুষ্পবৃক্ষ হইতে একটা সুতীব্র গন্ধ-বাতাস চতুর্দ্দিকে ছড়াইতেছিল। পার্শ্বে বাগানের বেড়ার উপর মাধবীলতায় স্তবকে

স্তবকে শুভ্র ও রক্তবর্ণ কুসুমগুলি মৃদু বায়ু-আন্দোলনে এদিকে ওদিকে দুলিতেছিল। স্তব্ধ নির্জ্জন উদ্যানমধ্যে অগণিত পুষ্পমেলার মাঝখানে এই মলিনতাশূন্য নিষ্পাপ পুষ্পেরই মত সুন্দর বালক-বালিকা দুইটি যেন ফুলের মধ্যেই মিশিয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যা ধীরে ধীরে তাহার কৃষ্ণচ্ছায়া ধরার উপর মেলিয়া ম্লান সুগম্ভীরভাবে পৃথিবীবক্ষে পদার্পণ করিল। আকাশে ক্রমে ক্রমে এক একটি করিয়া ৫/৭টি তারা ফুটিয়া উঠিল। মাধুরী চিন্তা হইতে মন ফিরাইয়া তপনের প্রতি চিন্তিত অথচ সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া ডাকিল,—'তপো!'

শান্তনেত্রে দিদির মুখপানে চাহিয়া তপন কহিল,—'উঁ!'

'আমাদের যদি নতুন মা আসে, তবে কি হয়?'

'বেছ্ অয়।'

'বেশ হয়? উঁহু, এ আমাদের ছবির মা নয় রে বোকা, আগেকার সেই ছেলেবেলাকার মা নয়, এ একজন নতুন মা আসবে, বামুনদিদির কাছে শুন্‌লি না? এ মাকে আমরা আগে কক্ষনো দেখিনি, একেবারে নতুন।'

তপন দিদির প্রতি বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলিয়া, সুবৃহৎ এবং সুকৃষ্ণ আঁখি-তারকা দুটি আরও বৃহৎ করিয়া কহিল,—'একেবালে নতুন? বালো মা আব্বে, না দিদা?'

তপনের ধারণা ছিল, নূতন দ্রব্য মানেই 'বালো' অর্থাৎ ভাল। সে খেলনা, জুতা, কাপড়, জামা প্রভৃতি দ্বারা নূতন পুরাতন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাতে পুরাতন অপেক্ষা নূতনকেই সে অধিক মনোনীত করে। মাধুরীর ওষ্ঠাধরে একটু ক্ষীণ হাস্যরেখা চিত্রিত হইল,—'দূর বোকা! তুই কিচ্ছু বুঝিস্ না, বড্ড ছেলেমানুষ। শুন্‌লি না, বামুনদিদি বল্‌ছিল, "সৎমা আসলে জব্দ হবি।" এবার সৎমা এসে আমাদের জব্দ কর্‌বে।'

তপন সুচিন্তিতভাবে কহিল,—'তথ্‌মা অব্দ কলে না। বাবা তোকে পলে', বলিয়া, চক্ষুতে চশমা পরিবার ইঙ্গিত করিয়া দিদিকে দেখাইল।

'যাঃ, ঐজন্যেই তো তোকে বোকা বলি, একটা কথাও বুঝতে পারিস্ না। চশমা শব্দ করে না, বাবা চোখে পরেন, সে কি আমি জানি না? আমি বল্‌ছিলুম "সৎমা"। বাবা এই মাসেই বিয়ে ক'রে আবার নতুন মা আন্‌বেন যে।'

তপন দিদির কথাগুলির যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিল কি না, জানি না, তবে সে প্রসন্নমুখেই কহিল,—'নতুন মা আব্বে।'

৩

মাধুরীর পিতা বিবাহ করিয়া যাহাকে আনিয়াছেন, সে মাধুরী অপেক্ষা মাত্র বছর দেড়েকের বয়োজ্যেষ্ঠা, কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিয়াই তিনি গৃহিণীত্ব পদ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়া মাধুরীর তিন গুণ বেশী বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য ও আচার-ব্যবহার লইয়া সংসার

চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের দেশে প্রচলিত গ্রাম্য ছড়া একটি আছে,—

'যে মেয়ে সতীনে পড়ে,
ভিন্ন বিধি তারে গড়ে।'

মাধুরীর বিমাতা অন্নতারারও এ প্রবচন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম ঘটে নাই। নববধূ গৃহে আসিয়াই সমুদয় গৃহস্থালীর কর্ত্তৃত্বভার এবং ভাঁড়ার ও সিন্দুকের চাবী স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। বিবাহের পর সেই যে প্রথম স্বামিগৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের নাম করেন নাই। পিতৃগৃহে পিতা-মাতা নাই, সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ এবং ভ্রাতৃজায়াবৃন্দ আছেন। অন্নতারা মাধুরী এবং রন্ধনকারিণীর নিকট সর্ব্বদা পিতৃগৃহের ধনৈশ্বর্য্যের ও ভ্রাতৃগণের তাঁহার প্রতি অতুল স্নেহের ভূরি ভূরি গল্প করিলেও, প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ পর্য্যন্ত কেহই দেখিতে পায় নাই, কারণ, বিবাহের পর পত্রদ্বারাও তাহারা একবার সংবাদ লয় নাই। আর ধনৈশ্বর্য্যের প্রমাণ, তাহার পিতৃগৃহদত্ত শৃঙ্খবলয় মাত্র আভরণ। মাধুরীর মাতার অলঙ্কারগুলি অন্নতারার নধর অঙ্গের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল।

যাহা হউক, অন্নতারা গৃহস্থালীর ভার লইয়া প্রথমেই অপব্যয়নিবারণে যত্নবতী হইলেন। মাধুরীকে বৃদ্ধ গোপাল পণ্ডিত সকালে ও সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা করিয়া পড়াইয়া যাইত। অন্নতারা সেই পণ্ডিতটিকে সর্ব্বপ্রথমে ছাড়াইয়া দিলেন। বলিলেন— মেয়েমানুষের জন্য মিছামিছি মাস্টার-পণ্ডিত রাখিয়া টাকা খরচ করিবার আবশ্যক নাই, যেহেতু, স্ত্রীলোককে উকীল, ব্যারিস্টার কিংবা জজ, ম্যাজিস্টার হইয়া উপার্জ্জন করিতেও হইবে না। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ব্যয়সঙ্কোচ করিতে করিতে তপন ও মাধুরীর বৈকালিক আহার্য্য দুধ, মিষ্টান্ন রুটী অথবা খই-মুড়িতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

মাধুরীকে প্রথমটা অন্নতারা মোটেই প্রীতির চক্ষুতে দর্শন করেন নাই এবং নিজের শারীরিক খর্ব্বতা হেতু মাধুরী অপেক্ষা দেড় বৎসরের বড় হইলেও অনেকটা ছোট দেখাইত বলিয়া আরও মাধুরীর উপর তাঁহার বিদ্বেষ ভাব বেশী হইয়াছিল। মাধুরীর উপর যখন তখন অনাবশ্যক কর্ত্রীত্ব করিয়া তিনি যে মাধুরী অপেক্ষা ঢের উচ্চপদস্থা ও মাননীয়া, ইহা প্রমাণ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। আবাল্য দুঃখসহনশীলা বালিকা অনেক সময়েই বিমাতার অবিচার ও অত্যাচার নীরবেই সহ্য করিয়া লইত।

মাধুরী বড় হইয়াছে, বিবাহের জন্য পিতা অত্যন্ত ব্যস্ত ও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। সুগৌরবর্ণা সুগঠিতাঙ্গী ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা, কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে আসিয়া অপরূপ সুন্দরী হইয়া উঠিতেছিল। মাধুরীর স্বাস্থ্য-সবল পরিপুষ্ট দীর্ঘদেহ তাহার বয়স অপেক্ষা অধিক বয়ঃক্রমের ভ্রম জন্মাইত। পিতা কন্যার যোগ্য পাত্র অনুসন্ধান করিতেছিলেন, মনের মত সম্বন্ধ দুই একটি মিলিতেও ছিল, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পণের টাকার অতিরিক্ত দাবী হেতু সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, সদ্বংশজাত ও অবস্থাপন্ন পাত্রমাত্রেরই অভিভাবকগণ অসম্ভব টাকার দাবী করিতেছিলেন, সুতরাং পাত্র অনুসন্ধান করিতে করিতেই প্রায় বৎসরাধিককাল কাটিয়া গেল।

তপন এখন ৬/৭ বৎসরের হইয়াছে এবং স্কুলে পড়াশুনা করিতেছে। নতুন মা'র সহিত একদণ্ডও তাহার বনিবনাও হয় না। নতুন মা সমবয়স্কা পীঠাপীঠি ভাই-বোনের মত সর্ব্বদাই তপনের পিছনে লাগিয়া থাকিতেন। খুঁজিয়া খুঁজিয়া তপনের দোষ ও ত্রুটি বাহির করাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও প্রধান কার্য্য হইয়াছিল।

পিতা পূর্ব্বে কখনও কোনওদিন পুত্র-কন্যার গাত্রে হাত তুলেন নাই, কিন্তু আজকাল প্রায়ই 'দুরন্তপনা' করা, 'মাতার মুখের উপর জবাব করা', 'জিনিসপত্র নষ্ট করা' ইত্যাদি কল্পিত অথবা সত্য অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া সে পিতা কর্ত্তৃক প্রহৃত হইত। বিমাতা কর্ত্তৃক 'মিটমিটে ডাইন' আখ্যা-প্রাপ্তা মাধুরীও প্রায়ই তপনকে অতিরিক্ত 'আস্কারা দিয়া নষ্ট করিতেছে', কিংবা 'তাঁহার কথা শুনে না' এইরূপ অভিযোগের নিমিত্ত পিতার নিকট ভর্ৎসিতা হইত।

মাধুরী মায়ের বিরুদ্ধে কোনওদিন পিতার নিকট অভিযোগ আনয়ন করে নাই, কারণ, সে জানিত তাহাতে ফল বিপরীতই হইবে। বিমাতা সর্ব্বদা পিতার নিকট তাহাদের নামে সত্য ও মিথ্যা অভিযোগ করিয়া, একেই তাহাদিগকে পিতার অপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন, তদুপরি সে যদি পিতার নিকট সকল ঘটনা আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিতে যায়, বিমাতা দ্বিগুণ ক্রুদ্ধা হইয়া আরও তাহাদিগকে উৎপীড়িত কবিবেন, কোনই সন্দেহ নাই। তবে সে নিজে তিরস্কৃতা হইলে যত না কষ্ট পাইত, তপনের গায়ে পিতা কিংবা বিমাতা হাত তুলিলে, তাহার বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হইত। তপনকে সে পূর্ব্বের মত এখনও আগুলিয়া বেড়ায়, কিন্তু বিমাতা সেই জন্যই অধিকতর অসন্তুষ্ট। আর তপনও আজকাল বিমাতার অতিরিক্ত শাসন-পীড়নে দুষ্ট, দুরন্ত ও একরোখা হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বের সেই শান্তস্বভাব আধ আধ সুমিষ্টভাষী তপন এখন অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অন্নতারার দিবারাত্রি ভর্ৎসনায় তাহার মেজাজ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে এবং কথাবার্ত্তা কর্কশ হইয়াছে, তবে এই কর্কশতা একমাত্র অন্নতারারই সহিত কলহকালেই দেখা যাইত। অতিরিক্ত স্নেহহীন নির্দ্দয় ব্যবহারে তাহার সুকোমল অন্তর ও সুমিষ্ট রসনা কঠিন ও বিরস হইয়া আসিতেছিল। ইহাতে বেদনা বোধ করিত সর্ব্বাপেক্ষা মাধুরী। কিন্তু তপন দিদার কাছে ঠিক সেই পূর্ব্বের তপন আছে, দিদার নিকট তাহার পূর্ব্বস্বভাবের এতটুকু বৈলক্ষণ্য দেখা যাইত না।

মাধুরীকে যখন কোনও স্থান হইতে পাত্রপক্ষীয়েরা দেখিতে আসিত, মাধুরীর বুকের ভিতর গুরু গুরু করিতে থাকিত, যদি ইহারাই তাহাকে বধূরূপে মনোনীত করিয়া লইয়া যায়, তবে তপনের কি হইবে? তপনকে ছাড়িয়া শ্বশুরবাটী যাইতে তাহার এক তিলও ইচ্ছা ছিল না, বরং তপনকে ছাড়িয়া একদিন সেই অজানা

অচেনা ঘরে যাইতেই হইবে, ইহা ভাবিয়া সে আতঙ্কে শিহরিয়া, ভাইটিকে আরও কাছে জড়াইয়া ধরিত।

অন্নতারার একটি কন্যা হইয়াছে, অন্নতারা স্বামীকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি কন্যার জন্য যেরূপ 'অর্দ্ধেক রাজত্বসহ রাজপুত্তুর পাত্র' সন্ধান করিতেছেন, তাহা গৃহস্থঘরে মেলা দুর্ঘট এবং মিলিলেও স্তূপীকৃত রৌপ্যচক্র বাহির করিতে না পারিলে সে কার্য হইবে না। তাঁহার ত ঐ একটিমাত্র 'সবেধন নীলমণি' কন্যা নহে, এই যে আর একটি কন্যা আসিয়াছে, ইহাবও ভবিষ্যৎ ভাবিতে হইবে তো। তা ছাড়া যদি কখনও তাঁহার কিছু ভাল-মন্দ ঘটে এবং অন্নতারার কপাল ভাঙ্গে, তখন সেই অসময়ে সন্তান-সন্ততি লইয়া কি অন্নতারা রাস্তায় দাঁড়াইবেন? তাহা অপেক্ষা বরং দ্বিতীয়পক্ষ পাত্র খুঁজিয়া বিবাহ দিলে, যাহা কাম্য, সবই মিলিতে পারে, অথচ পণের টাকা সামান্যই লাগিবে।

৪

মাধুরীর বিবাহ হইয়া গেল। পাত্র দ্বিতীয়পক্ষ বটে, তবে বয়স বেশী নহে। ত্রিশ হইতে বত্রিশের মধ্যে হইবে। এম-এ পাশ, কলিকাতার কোনও বড় কলেজের অধ্যাপক, সচ্চরিত্র এবং গুণবান্ একটি পুত্র আছে, বয়স প্রায় চারি বৎসর। কলিকাতা সিমলা ষ্ট্রীটে বাড়ী, গৃহে বিধবা মাতা এবং একটি বিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগিনী ছাড়া আর কেহ নাই।

কন্যার দুই একখানি অলঙ্কার, বরাভরণ, দানসামগ্রী, বিবাহরাত্রে বরযাত্রিগণেব আহার ইত্যাদিতে বিবাহ খরচ সর্ব্বসমেত দেড হাজার টাকার মধ্যে হইয়া গেল। এত অল্প ব্যয়ে রূপে, গুণে, অবস্থায় সর্ব্বপ্রকারে নিখুঁত সুন্দর 'মনের মত জামাই' লাভ করা যে অত্যন্ত সৌভাগ্য না থাকিলে ঘটে না, আত্মীয়-স্বজন সকলেই একবাক্যে এ কথা কহিলেন। দ্বিতীয়পক্ষ বিবাহে যে কন্যা অসুখী হইতে পারে, এ চিন্তা পিতার মনে একবারও উদিত হয় নাই। কারণ, পাত্রের যদি বৃদ্ধবয়স না হয়, তবে, দ্বিতীয়পক্ষ বিবাহে কন্যার সুখী হইবার কোনও ব্যত্যয় ঘটিবে না, ইহা অনেক পিতামাতারই দৃঢ়বিশ্বাস।

বিবাহের পর বাসরঘরে সারারাত্রি মাধুরী তপনকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিয়া কাটাইল। তপন বিবাহের উৎসবের মধ্যে বেশ স্ফূর্ত্তিতে ও আনন্দেই ছিল। 'দিদার বিয়ে' এটা ত সুখেরই কথা। তাহাব উপর দূরসম্পর্কীয়া একজন দিদি যখন তপনের নাম সহি করিয়া "দিদার বিবাহে হর্ষোচ্ছ্বাস" নামক একখানি ভগ্নচ্ছন্দ উচ্ছ্বাসযুক্ত কবিতা রচনা করিয়া দিলেন এবং সেই কবিতা যখন গোলাপী রঙের কাগজে ছাপা হইয়া আসিল, তখন তপনকুমারের আনন্দ রাখিবার স্থানই রহিল না। নিজে ভাল করিয়া পাঠ করিতে না পারিলেও কবিতাটি সম্পূর্ণ তাহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল এবং 'আজকে আমার দিদামণির বিয়ে' ইত্যাদি আওড়াইয়া অবিরত সেই গোলাপী কাগজ হস্তে

লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার পর নূতন জামাইবাবু দেখিয়াও তাহার মনটা বেশ খুশী হইয়াই উঠিয়াছিল। গৌরবর্ণ, চশমা-পরিহিত সুবেশ জামাইবাবুর সঙ্গ তখন দিদার সঙ্গ অপেক্ষা তাহার অধিকতর লোভনীয় মনে হইতেছিল।

পুষ্প ও স্বর্ণাভরণ-ভূষিতা, রক্তবর্ণ-চেলাবগুণ্ঠিতা, সীমন্তে প্রচুর সিন্দূরলিপ্তা, বধূবেশিনী দিদা যখন তপনকে ক্রোড়ে লইয়া এক দণ্ডের জন্য ছাড়িতে চাহিতে-ছিল না ও অবগুণ্ঠনান্তরালে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া আকুলভাবে কাঁদিয়া, তাহাকে উত্তরোত্তর দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ করিতেছিল, তখন সে একটু বিস্মিত, হতভম্ব এবং কাঁদ-কাঁদ হইয়া পড়িয়াছিল। দিদির এই উচ্ছ্বসিত আকুল ক্রন্দন, তাহার বুকের ভিতরটা কোনও এক অজানা আশঙ্কায় দুলিয়া উঠিয়া চক্ষে অশ্রুর ধারা বহাইয়া দিল।

তাহার পরদিন বাসি বিবাহের প্রাতে যখন তপন ব্যাপারটা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিল, তখন সে একটানা ক্রন্দনসহ বাহানা ধরিল, সেও দিদির সহিত জামাইবাবুর বাটী যাইবে। সকলে অনেক বুঝাইল, ভুলাইবার জন্য অনেক প্রয়াস করিল, কিন্তু একগুঁয়ে বালক সেই যে প্রাতে একটিমাত্র কথা লইয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছে, সমস্ত দিন একভাবে কাঁদিতে লাগিল। মাধুরীর ত সাবাদিন অবিশ্রান্ত অশ্রুপাতে চোখ-মুখ অস্বাভাবিক রকম স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমে অপরাহ্ণ যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ভাই-বোনের ক্রন্দন ততই বাড়িয়া চলিল। বর-কন্যা-বিদায়ের সময় তপন থাকিলে অধিক মাত্রায় গণ্ডগোল ঘটিবার সম্ভাবনা বোধে পিতা তপনকে লোক দ্বারা অন্যত্র প্রেরণ করিলেন। মাধুরী কিন্তু ইহাতে অধিকতর ব্যথিতা এবং আকুলা হইয়া পড়িল।

অন্নতারা জামাতার সম্মুখে একখানি এক বিঘৎ চওড়া লালপাড় গরদের সাটী পরিয়া নগ্নগাত্রে শ্বশ্রূচিত গাম্ভীর্য্যসহকারে গৃহিণীপণা করিয়া বেড়াইতেছিলেন। মাধুরীকে মাতৃসুলভ অনেক উপদেশ ও সান্ত্বনাবাণী কহিতে কহিতে অঞ্চলে চক্ষু ঘষিয়া ঘষিয়া রোদনারক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। মাধুরীকে সংসার-জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক সদুপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করিয়া, জামাতা বাবাজীর বাধ্য হইতে, শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণীর সেবা শুশ্রূষা করিতে, পুত্রটিকে নিজ পুত্রজ্ঞানে লালনপালন ও স্নেহ-যত্ন করিতে, অনেক নীতিশিক্ষা প্রদান করিয়া, জামাতা সন্তোষকুমারের হস্তে সপত্নীকন্যার হস্ত তুলিয়া দিয়া ক্রন্দনবিজড়িত স্বরে কহিলেন, 'বাবা, আমাদের বড় আদরের বুকের ধনকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম। তুমি দেখো বাবা, যদি কোনও ভুল ক'রে অপরাধ করে, তুমি ক্ষমা ক'রে নিও। আমাদের বড় যত্নের মেয়ে ও; আমার তপনের চেয়েও বেশী।'

তাহার পর ক্রন্দনজড়িত স্বর আরও এক পর্দ্দা নামাইয়া করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন, 'মা আমার বাড়ী আঁধার ক'রে চল্লেন। কি ক'রে যে আমি এই বাটীতে তিষ্ঠাব, ভেবে পাচ্ছি না।'

ক্রমে যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। বর ও কন্যাকে সকলে আশীর্ব্বাদ করিতে

আসিলেন। মাধুরী পিতার পদতলে প্রণতা হইয়া মস্তক তুলিতে পারিল না, ভূমিতলে তাহার মস্তক লুটাইয়া পড়িল। পিতারও চক্ষুতে বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু ঝরিতেছিল, সযত্নে কন্যাকে উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তকটি স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া ধান্য-দূর্ব্বাসহ হস্তখানি কন্যার মস্তকে রক্ষা করিলেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া নীরবে নিমীলিতনেত্রে মৌন আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় স্ফীত, অশ্রুভারাক্রান্ত এবং মুখখানি অস্বাভাবিক মানসিক বেদনা-গোপন-চেষ্টায় রক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল। মাধুরী একে একে সকলকে প্রণাম করিয়া, পিতার প্রতি অশ্রুরুদ্ধ নেত্রে চাহিয়া ক্ষীণ অস্ফুট স্বরে কহিল, 'মা ?'

পিতা নীরবে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, ক্ষণপরে একখানি কাচাবরিত কাষ্ঠফ্রেমবদ্ধ নাতিবৃহৎ ফটোগ্রাফ আনিয়া জামাতা এবং কন্যাব সম্মুখে রক্ষা করিলেন। চিত্রখানি ২৩/২৪ বর্ষ বয়স্কা একজন ক্ষীণকায়া তন্বী, ফ্রক ও টুপী-পরিহিত একটি অল্পবয়স্ক শিশু ক্রোড়ে লইয়া স্বাভাবিকভাবে ভূমিতলে পা দু'খানি রাখিয়া চেয়ারে উপবিষ্টা। শিশুটির মুখখানি নড়িয়া যাওয়ার জন্য ঝাপ্সা ও অস্পষ্ট। মাতার মুখখানি কিন্তু সুন্দর ও সুস্পষ্ট। উজ্জ্বল বিস্তৃত চক্ষু দুইটি এবং হাস্যরেখাচিত্রিত ফুল্ল ওষ্ঠাধর যেন জীবন্ত বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছিল। মাধুরী এবং সন্তোষকুমার একত্রে চিত্র-পদতলে যুগপৎ মস্তক অবনত করিল।

দেওয়ালে পূর্ব্বে যেখানে মাধুরীর মাতার সুবৃহৎ ব্রোমাইড চিত্রখানি শোভিত ছিল, সেখানি অপসারিত করিযা কাগজ মুড়িয়া দেরাজের মধ্যে তুলিয়া রাখা হইয়াছে এবং দেওয়ালের সেই স্থলে একখানি পুষ্পগুচ্ছশোভিতা মুক্তাদন্ত-বিকসিতা নীল-নয়না বিলাতী মেমের চিত্রযুক্ত বৃহৎ ক্যালেণ্ডার শোভা পাইতেছিল। অন্নতারা যখন নূতন করিয়া স্বীয় পছন্দমত গৃহ সাজাইয়াছিলেন, তখন এই ক্যালেণ্ডারখানি ফটোগ্রাফের স্থানাধিকার করিয়াছিল।

ট্রেনের সময় হইল বলিয়া, মুহুর্ম্মুহুঃ পুরুষরা সত্বর প্রস্তুত হইতে তাড়া দিতেছিলেন। মাধুরী গ্রন্থিবদ্ধাঞ্চলে স্বামীর সহিত ফিটনে আরোহণ করিল। শকটোপরি উপবিষ্টা হইয়া একবাব আশান্বিত অশ্রুরুদ্ধ নেত্রে অবগুণ্ঠনান্তরাল হইতে কাহার একখানি সুকোমল মুখ ও বড় বড় আঁখি দেখিবার আকুল প্রত্যাশায় চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। একটি সুতীক্ষ্ণ অথচ সুমিষ্ট কণ্ঠের 'দিদা' ডাক শুনিবার জন্য সে উৎকর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু মুহুর্ম্মুহু যুগল শঙ্খধনি ও মানবের কোলাহল ব্যতীত কিছুই তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না।

৫

কলিকাতায় শ্বশুরবাটী আসিয়াও মাধুরীর শোকোদ্বেগ বিশেষ উপশমিত হইল না। সুসজ্জিত সুন্দর ত্রিতল বাটী, বিজলীচালিত সুস্নিগ্ধ ব্যজনী, উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোক, কিছুই তাহার চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিল না। শাশুড়ী, ননদ বিরক্ত হইলেন। এত বড়

'ধেড়ে মেয়ে'ও যে কান্নাকাটি করিয়া বিরক্ত করিবে, ইহা অসহ্য। তাঁহারা প্রথমে কিছু মিষ্টকথা কহিয়া, পরে একটু একটু তিক্তকথাও কহিতে লাগিলেন। শাশুড়ী বরদাসুন্দরী অন্তরালে কহিলেন,—'সেখানে সৎমায়ের আদরে এতই কি সুখে ছিলেন যে, আমাদের এত আদরে এত যত্নে মন উঠ্ছে না! তা নয়, বুড়োধাড়ী মেয়ে, ওর মন কেমনের কান্না নয়, ও হচ্ছে রিষের কান্না! এত সুখ-ঐশ্বর্য্যির মধ্যেও ওর কাঁটা রয়েছে, সেই দুঃখে দিনরাত মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে থাকে! ঐ গোমড়ামুখী হিংসুকীর রিষ থেকে আমার "অমি" যে কি ক'রে বাঁচবে, এখন তাই ভাব্ছি।'

ফুলশয্যার রাত্রে স্বামী সন্তোষকুমার মাধুরীকে অনেক কথা বলিয়াছিলেন এবং অনেক শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার এক-চতুর্থাংশ মাধুরীর কর্ণে এবং মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছিল কি না সন্দেহ। তবে মোটের উপর একটি কথা তাহার ভাল লাগিয়াছিল, সেটি সন্তোষকুমারের পুত্র অমিয়েশের কথা। মাধুরী সেই রাত্রে অমিয়কে দেখিতে চাহিল, সন্তোষকুমার কহিলেন, 'সে আমার মায়ের কাছে ঘুমুচ্ছে, কাল দেখো।' সন্তোষের কতকগুলি কথার মর্ম্মার্থ সে এইরূপ বুঝিয়াছিল যে, মাধুবী যদি সন্তোষের ভালাবাসা পাইতে এবং সন্তোষকে ভালবাসিতে চাহে, তবে অমিয়কে যেন প্রাণ ভরিয়া স্নেহ-যত্ন এবং সন্তোষের মা'কে শ্রদ্ধাভক্তি করে। সে যদি অমিয়ের কিংবা সন্তোষের জননীর কষ্টের কারণ হয়, তবে সন্তোষের প্রেমলাভ দূরে থাক, সদ্ব্যবহারও পাইবে কি না সন্দেহ! তাহার পর সন্তোষকুমার তাঁহার একমাত্র কনিষ্ঠা সহোদবা তৃপ্তির কাহিনী নববধূকে বলিলেন। তৃপ্তিব শ্বশুর দরিদ্র, স্বামী অসচ্চরিত্র, মাতাল এবং শাশুড়ী-ননদ 'দজ্জাল' হওয়ায় তাহাকে শ্বশুরবাটীর সম্পর্ক চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন করিয়া এখানে আনা হইয়াছে। সন্তোষকুমার কহিলেন, 'তৃপ্তি একটু রাগী ও অভিমানিনী, সে যদি তোমার প্রতি কখনও কোনও অন্যায় করে, তুমি তাহা সহ্য করিয়া লইও, তোমার যা কিছু দুঃখ-কষ্ট-বেদনা, তুমি আমার নিকট প্রকাশ করিও এবং আমার উপর অভিমান রাগ তুমি যত পার করিও, আমি কখনও বিরক্ত হইব না; কিন্তু মা'কে তৃপ্তিকে ও অমিয়কে তোমার সুখী করা চাই-ই। ওদের সুখী করিতে পারিলেই তোমার আমাকে সুখী করা হইবে।'

তাহার পর সন্তোষকুমার তাঁহার পূর্ব্ব-স্ত্রীর কথাও কতক কতক মাধুরীর নিকট প্রকাশ করিলেন। সে খুব বড়লোকের কন্যা ছিল এবং বিবাহের ৩ বৎসর পরে অমিয়কে প্রসব কবিয়া মারা গিয়াছে। সম্পূর্ণ প্রকাশ না করিলেও বুঝা গেল, স্ত্রীর সহিত সন্তোষের বিশেষ বনিবনাও ছিল না এবং শেষটা সে রাগ করিয়া পিত্রালয়ে ছিল। সন্তোষকুমার কহিলেন, 'আমি সাধারণ গৃহস্থলোক, বড়লোকের কন্যা বিবাহ করিয়া একবার ভুগিযাছি, এবার তাই সম-অবস্থাপন্ন গৃহ হইতে তোমায় লইয়া আসিয়াছি; আশা করি, তোমায় লইয়া সুখী হইতে পারিব।'

মাধুরীকে পিত্রালয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে শুধু দুজনের কথাই বলিল এবং অশ্রান্ত অশ্রুধারায় উপাধান সিক্ত করিয়া ফেলিল। মাধুরী স্বর্গগতা জননীর কথা

২/১টি কহিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু তাহার বাষ্পজড়িত কণ্ঠ ক্রমাগত রুদ্ধ হইয়া গিয়া তাহাকে কিছু প্রকাশ করিতে দিতেছিল না। সহৃদয় সন্তোষকুমারের অন্তর কিশোরী বালিকার গূঢ় অন্তর্ব্বেদনার কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠিল।

প্রথমটা সন্তোষকুমার মাধুরীর সহিত একটু কঠিন ব্যবহার ও দৃঢ়ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কারণ, প্রথমা স্ত্রীর নিকট তিনি সুমিষ্ট স্নিগ্ধ ব্যবহার ও আকুল প্রেমোদ্বেলিত সুকোমল অন্তর লইয়া দাঁড়াইয়া বিপরীত প্রতিদান পাইয়াছিলেন, তাই তাঁহার ধারণা হইয়াছে, স্ত্রীর নিকট দৃঢ়তার সহিত প্রভুত্ব প্রকাশ না করিলে স্ত্রী কখনও বশীভূতা এবং বাধ্য হয় না। মাধুরীর সহিত এই ধারণানুযায়ী ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার স্বাভাবিক সুকোমল মৃদু-প্রকৃতি ও সহৃদয় অন্তর তাঁহাকে প্রতিক্ষণে বাধা দিতেছিল। মাধুরীর অশ্রুজড়িত কণ্ঠ হইতে তাহার মৃতা মাতা এবং স্নেহের ছোট ভাইটির করুণ কথা শুনিয়া স্বভাবতঃ স্নেহপ্রবণ সন্তোষকুমার কহিলেন—'তুমি তপনকে দেখবে? তাকে এখানে আন্‌বার ব্যবস্থা করব কি?' মাধুরী প্রথমটা সাগ্রহে সম্মতি প্রকাশ করিয়া, পরমুহূর্ত্তেই অসম্মতা হইয়া কহিল, —'আমাকে তার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, আমি সেখানে গিয়া তাকে দেখ্‌ব। সে কারুর বাড়ী গেলে ভয়ে চোর হয়ে থাকে, কিছু খেতে পারে না।'

মাধুরীর ননদ তৃপ্তি ফুলশয্যার পরদিন প্রাতে মাধুরীকে 'বাথরুমে' কাপড় ছাড়াইতে লইয়া গিয়া, কালরাত্রে দাদা কি বলিয়াছেন, জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। মাধুরী কোনও কথাই গোপন করিল না যাহা তাহার স্মরণে ছিল, সমস্তই অকপটে তৃপ্তির নিকট ব্যক্ত করিল। তৃপ্তি সমস্ত কথা শুনিয়া একটু গম্ভীর হইয়া পড়িল। দাদা তাহার শ্বশুরবাড়ীর ও স্বামীর কাহিনী ইহারই মধ্যে বৌয়ের কাছে প্রকাশ করিয়াছে, ইহা তাহার অত্যন্ত অপমানজনক বোধ হইল, তাহার অবস্থা নববধূ শীঘ্রই জানিতে পারে, ইহা তাহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। মাধুরী তাহা হইলে তাহার দীনাবস্থা—দুর্ভাগ্যের বিষয় সমস্তই অবগতা হইয়াছে? তৃপ্তির মনটা অত্যন্ত ভারী হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতেছিল, মাধুরী হয়ত এখন হইতেই তাহাকে অনুগ্রহজীবিনীরূপে দেখিতেছে! পরক্ষণে একটা অহেতুক বিদ্বেষে মাধুরীর প্রতি তাহার অন্তর তিক্ত হইয়া উঠিল। মাধুরী পরের মেয়ে, কোথা হইতে 'উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া' গৃহলক্ষ্মী —সর্ব্বময়ী হইয়া এ গৃহে পূর্ণাধিকারে সাম্রাজ্ঞী হইয়া উপবিষ্টা হইবে, আর তৃপ্তি ঘরের মেয়ে পরের মত মাধুরীরই অনুগ্রহজীবিনী—কৃপার পাত্রী হইয়া দীনভাবে নত-মস্তকে জীবন কাটাইবে, ইহা যেন অত্যন্ত অন্যায় ও অসহ্য বলিয়াই তাহার মনে হইতে লাগিল।

জলযোগ করিতে বসিয়া মাধুরীর তপনকে মনে পড়িল। তাহার কি এখন খাওয়া হইয়াছে? দিদা খাওয়াইয়া না দিলে যে তাহার ভাল করিয়া খাওয়াই হয় না। তপনের কথা মনে হওয়ামাত্র মাধুরীর গণ্ড বহিয়া মুক্তাধারার ন্যায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আহার্য্যে হাত দিয়া সে নিজের অজ্ঞাতেই হাত গুটাইয়া লইল। তৃপ্তি দুই

একবার আহার করিতে অনুরোধ করিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল এবং মাতার নিকট গিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল,—'যাও বাপু, তোমার প্যান্‌প্যানানী কচি খুকী বৌকে খাইয়ে এসো, আমি পারলুম না। বাবা! ঢের ঢের অবাধ্য মেয়ে দেখেছি, এমন কখনও দেখিনি। আর, এরই মধ্যে ত দাদাকে হস্তগত করেছেন দেখ্‌ছি।' মাতা কন্যার শেষোক্ত বচনে একটু সোৎসুক এবং সন্দিগ্ধভাবে কহিলেন,— 'দাদাকে হস্তগত করেছে কি রকম?'

তৃপ্তি মুখ ঘুরাইয়া উত্তর করিল,—'হস্তগত কর্‌তে আর বাকী আছে কি? ঐ সুন্দর টুলটুলে মুখখানি আর দিবারাত্রি চোখের জল, ওতে কি আর পুরুষমানুষকে হাত কর্‌তে সময় লাগে? এরই মধ্যে ত দাদা আমাদের চোদ্দপুরুষের নাড়ী-নক্ষত্রের সন্ধান বৌয়ের কাছে বলেছেন। তাহার পর বৌয়ের মন কেমন কর্‌ছে ব'লে শালাকে এনে এখানে রাখবেন বন্দোবস্ত কর্‌ছেন, দুই একদিনের মধ্যেই নতুন বৌয়ের ভাই এলো ব'লে, সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে।'

অপরিসীম বিস্ময়ে ও ক্রোধে স্তব্ধ হইয়া মাতা বিস্ফারিত নয়নে কন্যার মুখের প্রতি নির্ব্বাক্‌ভাবে দৃষ্টি মেলিয়া রহিলেন। কন্যা তখন সতেজে বিজ্ঞতাসূচক স্বরে কহিতে লাগিল,—'তুমি "অমি" "অমি" ক'রে ভেবে মর, অমি তোমার ঠাঁই পেলে ত? দাদা এরই মধ্যে যা কাণ্ড আরম্ভ করেছে, আমি আর তুমি যে কোথায় দাঁড়াব, তাই ভাবছি। ভাল হউক্, মন্দ হউক্, আমার তবু মাথা গোঁজবার ঠাঁই একটা আছে।' যদিও মাতা এবং কন্যা উভয়েই জানিতেন, সেই 'মাথা গুঁজিবার ঠাঁই'তে মস্তক প্রবিষ্ট করান দূরে থাকুক, একটি অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করানও অসম্ভব।

মাতা এবার ক্রুদ্ধভাবে নববধূর উদ্দেশে উঠিতে গেলেন, তাঁহার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। তৃপ্তি কিন্তু বুঝিল, মাতা গিয়া যদি নববধূকে ভর্ৎসনা করেন, সেটা নিতান্তই অশোভন হইবে এবং দাদাও হয়ত ইহাতে বিরক্ত হইবেন। সে মাতাকে নিবৃত্তা করিয়া কহিল,—'আমি যাচ্ছি মা! তুমি যেও না, ও এখন কনে'বৌ, এখন ওকে কিছু বল্‌লে বড় নিন্দের হবে, তাহা ছাড়া দাদাও হয়ত বিরক্ত হবে।'

মাতা দুই একবার কন্যার মত খণ্ডনের প্রয়াস করিয়া, অবশেষে বুঝিলেন, এ ক্ষেত্রে তাঁহার বধূর নিকট না যাওয়াই সমীচীন। তৃপ্তি এবারে গিয়া একটু সহানুভূতির মিষ্টকথায় মাধুরীকে শান্ত করিয়া খাওয়াইয়া আসিল।

মাধুরী গত রাত্রে স্বামীর নিকট অমিয়ের কথা শোনা অবধি তাহাকে দেখিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। বাটীতে আত্মীয়বর্গের আরও অনেক বালক-বালিকা খেলিয়া বেড়াইতেছিল, ইহার মধ্যে কোনটি অমিয়, মাধুরী তাহা জানে না। অমিয়কে দেখিবার প্রবল ইচ্ছা দমন করিতে না পারিয়া তৃপ্তির নিকট বলিয়া ফেলিল,—'দিদিমণি! অমিয়—খোকা কোথায়?'

তৃপ্তি কহিল, 'সে নীচে একতলায় মা'র কাছে আছে। তাকে দেখ্‌বে? নিয়ে আসবো?'

মাধুরী সাগ্রহ-দৃষ্টিতে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। তৃপ্তি অমিয়কে আনিতে নীচে নামিয়া গিয়া, মাতাকে কহিল—'মা, অমি কোথায়? নতুন বৌ তাকে দেখ্‌তে চাচ্ছে।'

মাতার অন্তরটা কন্যার পূর্ব্বকথিত বাক্য শ্রবণে নববধূর উপর একটু বিরূপই হইয়াছিল, এখন বধূর অমিয়কে দেখিবার ইচ্ছা শ্রবণে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। 'কেন?' অমিয়কে দেখে সে কি করবে? অমিযকে দেখে আর তার কায নেই। অমিয় আছে শুনেই যার এত হিংসা, সে অমিয়কে চোখে দেখলে ত প্রাণেই বাঁচবে না। না—অমিকে নিয়ে যেতে হবে না। ওর দৃষ্টি থেকে বাছাকে আমি কি ক'বে যে বাঁচিয়ে রাখব, দিন-রাত্রি এখন এই ভাবনা হয়েছে। সন্তু আমায় আবার এ কি বৌ এনে দিলে জানি না। এতদিন বিয়ে করেনি, সেটা দেখছি এর চেয়ে ভাল ছিল। এক বড়লোকের মেয়ে বৌ এনে জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হয়েছি, এ আবার কোন্ ছোটলোকের মেয়ে এল, আমার আবার কি দুর্গতি করবে জানি না।'...তাহার পর ক্রন্দনসুরে বিনাইয়া বিনাইয়া কহিতে লাগিলেন—'সন্তু তো আমার বিয়ে করতে চায়নি, আমিই তো বাছার জোর ক'রে বিয়ে দিলাম। বলি, চিরকালই কি সন্ন্যাসী হয়ে থাক্‌বে? বে'-থা' ক'বে ঘরবাসী হোক্! তা আমারই বরাত! মন্দ কপাল নইলে এমন রাজকন্যা বৌই বা আমার যাবে কেন?' ইত্যাদি!

সন্তোষকুমারের মাতা বরদাসুন্দরীকে অদ্যাবধি কেহ মৃতা পুত্রবধূর জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিতে শুনেন নাই বরং ধনিকন্যা পুত্রবধূর মৃত্যুর পর হইতে পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিয়া 'লক্ষ্মী বধূ' গৃহে আনিবার প্রবল ইচ্ছা এবং কল্পনা এতাবৎকাল তাঁহার মুখে শুনা গিয়াছে। মাধুরীর প্রতি অসন্তোষ ও ক্রোধে অদ্য সেই পুত্রবধূর নামোচ্চারণ করিয়া বরদাসুন্দরীকে আক্ষেপ প্রকাশ করিতে আত্মীয়াগণ প্রথম শ্রবণ করিলেন। সে বধূ সত্যই স্বামী এবং শ্বশ্রূকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্য এবং ঘৃণা করিত। এই গৃহ, পরিবার, ধনৈশ্বর্য, বৈভব এবং স্বামী সকলই সে নিজের অযোগ্য বলিয়া মনে করিত। কিন্তু বরদাসুন্দরী পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, বড়লোক কন্যা পুত্রবধূকে রীতিমত খোসামোদ করিয়াই চলিতেন, তথাপি একদিনের জন্যও তিনি বধূকে খুসী করিতে পারেন নাই এবং নিজেও বধূ কর্ত্তৃক সুখী হয়েন নাই, মাতৃভক্ত সন্তোষকুমার এইজন্য অত্যন্ত বেদনা বোধ করিতেন। সন্তোষকুমারকে বধূ সর্ব্বাংশে তাহার নিজের অনুপযুক্ত মনে করিত এবং সেই লইয়া সন্তোষের বিবাহিত দাম্পত্যজীবনের তিনটি বৎসরই অশান্তিতে কাটিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, তৃপ্তি মাতার অনর্গল বচনে কর্ণপাত না করিয়া অমিয়কে ক্রোড়ে লইয়া উপরে উঠিয়া গেল। মাধুরীর সম্মুখে অমিয়কে দাঁড় করাইয়া দিয়া তৃপ্তি কহিল—'অমি! এই দ্যাখ তোর নতুন মা।'

যদিও অমিয়ের নূতন কিংবা পুরাতন কোনও মাতা সম্বন্ধেই তাহার বিন্দুমাত্র ধারণা বা জ্ঞান ছিল না, তবুও সে ক্ষুদ্র মস্তকটি নাড়িয়া বলিয়া উঠল 'মা—না,

বৌ।' সে এ পর্য্যন্ত এই অবগুণ্ঠনবতী নবাগতাকে সকলের মুখেই 'বৌ' বলিতে শুনিয়াছে; সুতরাং সে পিসীমার ত্রুটি সংশোধন করিয়া বলিল, এ মাতা নহে, বৌ।

মাধুরী সাগ্রহে তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিয়া প্রশ্ন করিল, 'তোমার নাম কি?'

বালক সপ্রতিভভাবে কহিল,—'থ্রীমান্ অমিয়েথ চন্দল্ লায়, বাবাল্ নাম থ্রীযুক্ত সন্তোথকুমাল্ লায়, তিতামহল নাম ঈথল্ বুবনমোহন লায়।' ক্ষুদ্র বালক এক নিশ্বাসে গ্রামোফোন রেকর্ডের ন্যায় কথাগুলি বলিয়াই নীরব হইল। তাহাকে নাম জিজ্ঞাসা করিলেই সে এক নিশ্বাসে নিজের নাম, পিতার নাম এবং মৃত পিতামহের নাম পর্য্যন্ত বলিয়া দিত। মাধুরী ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে বক্ষে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া আবার চুম্বন করিল।

৬

দিদা চলিয়া যাওয়ার পর হইতে তপন অকস্মাৎ অত্যন্ত শান্ত ও নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দিনই প্রায় একাকী থাকে এবং নির্জ্জনে গুম্ হইয়া বসিয়া বসিয়া কি জানি কি ভাবে। অষ্টাহ পরে মাধুরী পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়া গাড়ী হইতে নামিবার সময় দেখিতে পাইল, তপন দূরে একটা বৃক্ষান্তরালে সরিয়া যাইতেছে। মাধুরী তপনকে দেখিয়া আনন্দাতিশয্যে আত্মহারা হইয়া প্রায় ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিল। তপন কিন্তু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, তবে তাহার বিশ্বাসঘাতক চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া ফেলিল। দিদার নিকট সে কোনও প্রকার বেদনার আভাস প্রকাশ করিবে না, ইহাই সে কয়দিন ধরিয়া ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু কার্য্যকালে সব গোলমাল হইয়া গেল। মাধুরী তপনকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া চুম্বনের পর চুম্বনে মস্তক ও বদনমণ্ডল প্লাবিত করিয়া দিল; তাহার নিজেরও চক্ষুতে ধারা বহিতেছিল। অনেক বাক্যব্যয়ে তপনের অভিমান মিটিবার পর দুই ভাই-বোনে যখন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, অন্নতারা মুখখানা ভীষণ গম্ভীর করিয়া সেদিক্ হইতে চলিয়া গেলেন। শ্বশুরগৃহ হইতে নবাগতা কন্যা তাঁহাকে প্রণাম করিল, সেদিকে দৃক্পাতও করিলেন না।

এবার শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়া মাধুরী সমস্ত দিনই তপনের কাছে শ্বশুরবাড়ীর গল্প করিত। গল্পের মধ্যে অধিকাংশ ভাগই অমিয়েশের কথা। অমিয়ের কথা শুনিতে শুনিতে তপন যখন এক এক সময়ে তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, মাধুরীর ফুল্ল মুখখানি নিমেষমধ্যেই ম্লান হইয়া পড়িত। শুষ্ক কণ্ঠে সে বলিত,— 'না ভাই, সে হয় না। তাদের বাড়ী তোমার যাওয়া হতে পারে কি? সে হয় না।' সরলচিত্ত সংসারানভিজ্ঞ বালক আবদার ধরিত, কেন যাওয়া হইবে না? দিদি যখন সে বাটীতে যাইতে পারেন এবং সেটা যখন তপনেরই জামাইবাবুর বাটী, তখন সে বাটীতে তপন যাইতে পাইবে না কেন? এইরকম নানাবিধ প্রশ্নে সে দিদাকে ব্যতিব্যস্ত

করিয়া তুলিত।—মাধুরীর প্রথমে ইচ্ছা ছিল, তপনকে একবার শ্বশুরালয়ে লইয়া যায়, কারণ 'দিদার' শ্বশুরবাড়ী যাইবার তপনের প্রবল আগ্রহ ও বিবাহের পরদিবসে দিদার সহিত যাইবার জন্য আকুল ক্রন্দন এখনও মাধুরী ভুলিতে পারে নাই।

তপনকে সন্তোষকুমার হুগলী হইতে কলিকাতায় লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার সংসারে নানা কথার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহার কিছু কিছু অংশ মাধুরীর কর্ণগোচরও হইয়াছে। শাশুড়ী বরদাসুন্দরী একটু কঠিনভাবেই ঐ সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন।

বরদাসুন্দরী যখন কঠোরভাবে কহিয়াছিলেন, অমিয়কে দূরে ঠেলিয়া, তিনি কখনই বধূর 'মা-খেকো' ভাইকে আনিতে দিবেন না, তখন মাধুরী প্রথমটা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে আশ্চর্য্যভাবে কিয়ৎক্ষণ শ্বশ্রূর প্রতি চাহিয়া রহিলেও পরমুহূর্ত্তেই বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নতনেত্রে বসিয়া রহিল। মাধুরী নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এ জীবনে তপনকে এ বাটীতে আসিতে দিব না। যাহারা এত নিষ্ঠুর, তপনের নামোল্লেখেই যাহারা এত ঘৃণা ও নির্দ্দয়তা প্রকাশ করে, তাহাদের বাটীতে মাধুরী কখনও কোনদিনই তপনকে আসিতে দিবে না। নিজের বক্ষের সমস্তটুকু স্নেহোত্তাপ দিয়া, যাহাকে কত কষ্টে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রাণাধিক প্রিয়তর তপোমণিকে সে কখনও ইহাদের নিকট এক নিমিষের জন্য আনিবে না। পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িয়াছিল—বিমাতা অন্নতারার কথা—সে যে তপনকে আদৌ দেখিতে পারে না। ৬/৭ বৎসরের ক্ষুদ্র বালককে সে তাহার প্রতিযোগী শত্রুর ন্যায়ই মনে করে এবং তদ্রূপ ব্যবহারও করিয়া থাকে। মাধুরী আকুল হইয়া উঠিল, হায়, তাহার প্রাণাধিক ভাইটিকে সে কোথায় কাহার নিকট রাখিবে? তাহার যে মনে হয়, তাহার বুকটির যদি একখানি কপাট থাকিত, তবে সে নিজের বুকটির ভিতরেই অতি সঙ্গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে তাহার তপনধন ভাইটিকে লুকাইয়া রাখিত, জগতে কাহারও কাছে তাহাকে বাহির করিত না, শুধু তাহারা দুইটি ভাই-বোন একত্র থাকিত—একত্র গল্প করিত, খেলা করিত।

আবাল্য দুঃখসহিষ্ণু বুদ্ধিমতী বালিকা তাহার শ্বশুরালয়ে জীবনযাত্রার পথ যে সরল এবং সুগম নহে, বরং অধিকমাত্রায়ই দুর্গম ও বন্ধুর, তাহা সেইদিনই বুঝিয়া লইয়াছে। শ্বশ্রূর নিকট ভর্ৎসিতা হইবার পর শ্বশুরবাটীর কেহ মাধুরীর চক্ষুতে আর অশ্রুকণা দেখে নাই। বালিকা সেই যে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল,—আর ইহাদের সম্মুখে চোখ হইতে এক ফোঁটা অশ্রু পড়িতে দিব না, সে প্রতিজ্ঞা ঠিক রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এক এক সময়ে অতিরিক্ত দুঃখভারে বক্ষ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, নিদ্রালুতার ভান করিয়া সারা দ্বিপ্রহর অবগুণ্ঠনে বদনমণ্ডল সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া, উপাধানে মুখ রাখিয়া, গোপনে অশ্রুত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু কাহারও সম্মুখে এতটুকু দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে নাই, স্বামীর নিকটেও নহে।

তপনের নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়া তাহাকে বুঝাইয়া, কলিকাতায়

'জামাইবাবুর বাড়ী' যাইবার উদ্দাম ইচ্ছা হইতে নিবৃত্ত করিতে মাধুরীর ইচ্ছা থাকিলেও সে পারিতেছিল না। প্রথমতঃ, ক্ষুদ্র বালক সংসারের ক্রূরতার মর্ম্ম বুঝিবে কিনা সন্দেহ, দ্বিতীয়তঃ, যদিও কিছুমাত্র বুঝিতে পারে, তাহা হইলে দিদার শ্বশুরবাড়ীর উপর ভীষণ আক্রোশ জন্মিবে, সুতরাং মাধুরী তপনকে বলিতেও পারিল না এবং বুঝাইয়া শান্ত করিতেও সমর্থ হইল না।

এক মাস কাটিয়া গেল। সন্তোষকুমার মাধুরীকে লইতে আসিলেন। তপনের আনন্দের সীমা নাই, জামাইবাবু আসিয়াছেন। সে সমস্ত দিন ধরিয়া জামাইবাবুকে তাহার লাট্টু, মার্ব্বেল, ঘুড়ি, লাটাই, হরিদ্রা ও সবুজবর্ণের মাঞ্জা-দেওয়া সূতা, পেন্সিল কাটা কল, ষোলফলা ছুরি, টীনের মোটরকার, রবারের বল, ছবির বই ও প্রাইজের বই ইত্যাদি অত্যন্ত যত্নের সহিত দেখাইতে লাগিল। সারাদিন অজস্র গল্প করিয়া বৈকালে বাগানে জামাইবাবুকে বেড়াইতে লইয়া গেল। বাগানে কোন্ ফুলগাছটা দিদার এবং কোনটা তাহার নিজের রোপিত, কোন্ আতাগাছে অমুক বৎসর শতাধিক আতা ফলিয়াছিল, কবে কোন কণ্টক-বহুল পুষ্পবৃক্ষ হইতে শিবপূজার পুষ্প আহরণ করিতে গিয়া দিদার হস্তে কণ্টক বিদ্ধ হইয়া রক্তপাত হইয়াছিল এবং কোন বৃক্ষশাখায় লাগিয়া তাহার রঙিন পিরাণ ছিন্ন হইয়াছিল, এই সমস্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সোৎসাহে জামাইবাবুর কর্ণগোচর করিতেছিল। সন্তোষকুমার কখনও বা অন্যমনস্কভাবে এবং কখনও অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তপনের কথাগুলি শুনিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে দুই-একটি প্রশ্ন করিতেছিলেন।

অনেকক্ষণ ঘুরিবার পর তপন শ্রান্ত হইয়া, পুষ্করিণীর তটে সিমেন্টের বেঞ্চের উপর উপবেশন করিবার নিমিত্ত জামাইবাবুর হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া চলিল। উভয়ে উপবেশন করিলে, সন্তোষকুমার প্রশ্ন করিলেন, 'আচ্ছা তপন! তোমার দিদিকে ত আমি নিতে এসেছি, তুমিও কেন দিনকতকের জন্যে তোমার দিদির সঙ্গে আমাদের বাড়ী চল না?'

তপন তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে এবং সানন্দে সম্মত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই ঈষৎ ক্ষুণ্নস্বরে কহিল,—'দিদা যে আমায় নিয়ে যেতে চায় না!'

সন্তোষকুমার বলিলেন,—'যদি তোমায় নিয়ে যাই আমি সঙ্গে ক'রে, তোমার দিদি কি আর আপত্তি করতে পার্‌বে? কিন্তু তুমি সেখানে গিয়ে কাঁদবে না ত? মন কেমন কর্‌বে না ত? তোমার দিদি বলেছিল, তুমি নাকি নতুন কারুর বাড়ী গেলে খেতে পার না, ভয়ে ভয়ে থাক!'

তপন উৎফুল্ল অথচ বিজ্ঞভাবে হাসিয়া বলিল,—'হুঁ, তা হবে কেন? সে ত নতুন কারুর বাড়ী গেলে ভয়ে ভয়ে থাকি, এ ত আর নতুন লোকের বাড়ী নয়, এ ত আপনার লোকের বাড়ী, তা ছাড়া দিদা সঙ্গে যাচ্ছে। মন কেমন আমার কার জন্যে কর্‌বে? এক ছোটখুকীর (বিমাতার কন্যা) জন্যে আর ভুলোর (কুকুর) জন্যে কর্‌তে পারে বটে। তা আমি থাকতে পারবো ঠিক।'

সন্তোষকুমার একটু হাসিয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে তপনের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, —'তোমার মা, মায়ের জন্যে মন কেমন করবে না? বাবার জন্যে?'

তপন সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল,—'একটুও না, একটুও না। বাবাকে ত আমি যমের মতই ভয় করি। বুঝলেন জামাইবাবু, বাবার মত আমি স্কুলে রজনী পণ্ডিত কিংবা রমেশ মাস্টারকেও ভয় করি না। বাবার জন্যে মন কেমন করবে? বরং বাবা যখন মোকর্দ্দমা করতে এখান থেকে কল্‌কাতা যান, আমাব তখন বেশ আনন্দই হয়।'

সন্তোষকুমার ঈষদ্ধাস্য সহকারে প্রশ্ন করিলেন,— 'আর, মা?'

'মা?—কে, নতুন মা'র কথা বলছেন ত? হ্যাঁঃ! ওর জন্যে আবার মন কেমন করবে? উনিই ত দিন-রাত্রি বাবার কাছে লাগিয়ে লাগিয়ে আমায় মার খাওয়ান, বকুনি খাওয়ান। বুঝলেন জামাইবাবু! আমি হচ্ছি ওর দু'চোখের বিষ। নিজে গালমন্দ দিয়ে মেরে-ধ'রে আবার বাবার কাছে ব'লে দিতে যান, আবার কত সময় মিথ্যে ক'রে বানিয়ে বানিয়ে বলেন, আমি নাকি ওঁর মুখে জবাব করেছি, ওঁকে অপমান করেছি!'

একটুখানি থামিয়া তপন আবার বলিল,—'উনি ত আমার নিজের মা নন, সৎমা কি না! সৎমা কক্ষনো ভালবাসে না।'

সন্তোষকুমার স্মিতমুখে বসিয়া তপনের কথাগুলি শুনিতেছিলেন, মানসনেত্রে তাঁহার একখানি সুন্দর কোমল মুখচ্ছবি জাগিতেছিল, সে ছবি তাঁহার স্নেহের দুলাল অমিয়েশচন্দ্রের। তপনের শেষোক্ত মন্তব্যগুলি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি হঠাৎ অত্যন্ত চমকিয়া উঠিলেন। তাহার পর তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া, একটু চিন্তিতভাবে দূরে ঘনায়মান অন্ধকারে সৌরভামোদিত শ্বেতপুষ্পাচ্ছাদিত গন্ধরাজ বৃক্ষটির প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

জামাইবাবুকে অন্যমনস্ক এবং নির্ব্বাক্ দেখিয়া, তপনকুমার কিয়ৎক্ষণ উস্‌খুস করিয়া তাহার পর বেঞ্চ হইতে নামিয়া পড়িয়া, সন্তোষকুমারের হস্তধারণ করিয়া বলিল, —'চলুন এবার বাড়ী যাই, সন্ধে হয়ে গেছে।'

সন্তোষকুমার একটি চিন্তাসূচক দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া,—'চল' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কর্ণে তপনের শেষ কয়টি কথা তখনও ধ্বনিত হইতেছিল, —'সৎমা কক্ষনো ভালবাসে না।'

৭

মাধুরী প্রায় ৬ মাস শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। প্রথম আসিয়া, তপনের জন্য বড় বেশীই মন-কেমন করিত, অমিয়কে পাইলে যেন তপনের বিরহব্যথা তাহার অনেকটা উপশমিত হইত, কিন্তু প্রথম প্রথম অমিয়কে সে কাছে কাছে পাইত বটে, কিন্তু আজকাল আর পায় না। শাশুড়ী ঠাকুরাণী অমিয়কে আজকাল মাধুরীর নিকট বেশী

মিশিতে দিতে ভালবাসেন না।

অমিয়েশ অল্পদিনেই মাধুরীর অত্যন্ত সঙ্গপ্রিয়, অনুগত ও বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। মাধুরীও তাহাকে পাইলে যেন আর কিছুই চাহিত না। এই কোমলপ্রাণা তরুণীর ভ্রাতৃবিরহ-বেদনাতুর স্নেহাকুল অন্তরখানি অমিয়েশকে পাইয়া আশাতীত তৃপ্ত ও আনন্দিত হইয়াছিল। মাধুরী বাক্স খুলিয়া অমিয়েশকে যাহা ইচ্ছা তুলিয়া লইতে অনুরোধ করিত, অমিয়কে অদেয় তাহার যেন কিছুই ছিল না, তাহার স্নেহাকুল প্রাণটুকু যেন এই মাতৃহীন ক্ষুদ্র বালকটিকে অত্যধিক জোরেই বুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছিল। মাধুরী অমিয়ের সহিত তাহার একবয়সীর ন্যায় নানা অর্থশূন্য এবং বালকসুলভ গল্প ও কথাবার্ত্তা কহিত, নানা প্রকার রূপকথা শুনাইত, শয়নগৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া সঙ্গোপনে দুইজনে 'আগডুম বাগডুম' ও 'ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি' খেলিত। এই ৪/৫ বৎসরের শিশুর মুখের জড়তাযুক্ত সুমিষ্ট অর্দ্ধ-নিঃসৃত বাণী ও সুন্দর মুখখানি মাধুরীর প্রাণের সব বেদনা—সব ক্ষুধা যেন মুছিয়া লইতে চাহিত। এইরূপে ৪/৫ বর্ষ বয়স্ক শিশু ও যৌবন-সোপানে পদার্পিতা কিশোরী পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্নেহ-ক্ষুধিত অন্তর লইয়া অহেতুক স্নেহ ও প্রীতির রজ্জুতে সুদৃঢ়াবদ্ধ হইতেছিল।

অমিয়েশ রাত্রে মাধুরীর নিকট শয়ন করিবার জন্য প্রায়ই বাহানা ধরিত এবং মাধুরীরও ঐকান্তিক ইচ্ছা, অমিয়কে লইয়া শয়ন করে, কিন্তু শাশুড়ী ঠাকুরাণী কোনও-মতেই তাহাতে সম্মতা নহেন। বিমাতার সহিত পৌত্রের এতাদৃশ ঘনিষ্ঠতা বরদাসুন্দরীর আদৌ প্রিয় ছিল না। তৃপ্তির চক্ষুতেও এটা 'বি-নদৃশ' বা 'বাড়াবাড়ি' ঠেকিত। এ শুধু স্বামীরই মন ভুলাইবার জন্য মিথ্যা মায়ার ফাঁদ বা কপট স্নেহের অভিনয়, ইহা মাতা এবং কন্যা প্রায়ই আলোচনা করিতেন। 'সতীনপোর উপর সৎমায়ের টান', 'মাছের মায়ের পুত্রশোক' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইত।

মাধুরীকে 'নতুন মা' অথবা 'ছোটমা' বলিয়া ডাকিতে তৃপ্তি প্রায়ই অমিয়কে শিক্ষা দিত, কিন্তু অমিয় প্রথম হইতে 'মা ভালো' অথবা 'ভালো-মা' সেই যে বলিয়াছিল, সেই হইতে মাধুরীকে অমিয় 'ভালো-মা' বলিয়াই ডাকে। 'ভালো-মা' সম্বোধনটা তৃপ্তি এবং বরদাসুন্দরীর কর্ণে বিশেষ মিষ্টরস বর্ষণ না করায়, তাঁহারা অন্য নামে সম্বোধন করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিফল প্রয়াস হইয়া, বধূর উপরেই জাতক্রোধ হইয়া উঠিলেন।

বরদাসুন্দরী আজকাল অমিয়কে তাঁহার নিজের ঘরে আটক রাখিয়াছেন। ত্রিতলে মাধুরীর শয়নকক্ষে অমিয়কে উঠিতেই দেন না। উভয়ের মিলামিশা এবং একত্র হওয়া একেবারেই বন্ধ করিয়াছেন।

গ্রীষ্মকাল, বেলা দ্বিপ্রহর। অমিয়েশ মাধুরীর নিকট যাইবার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিছানার পাশে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গৃহতলে একখানি সুচিক্কণ শীতলপাটী বিছাইয়া ভিজা গামছা গায়ে জড়াইয়া গৃহিণী শয়ন করিয়াছিলেন। তৃপ্তি একখানি ডিটেক্‌টিভ নভেল লইয়া, অমিয়েশের প্রহরায় নিযুক্ত ছিল। পুস্তকখানি এইমাত্র পাঠ শেষ হওয়ায়

সে-খানি মুড়িয়া, উপাধাননিম্নে রাখিয়া, মাতার সহিত ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতুষ্পুত্রের আলোচনায় প্রবৃত্তা হইয়াছে। মাধুরীর সহিত অমিয়ের এই অত্যধিক মিলামিশাটা যে আদৌ শুভসূচক নহে, তৃপ্তি তাহাই প্রমাণ করিতেছিল। বরদাসুন্দরী সুচিন্তিতভাবে কহিলেন,—'হ্যাঁ, ছেলেটা যা "ন্যাওটো" হয়ে পড়েছে, তাতে ওর কাছ-ছাড়া করা শক্ত। জানিনে মা, কার মনে কি আছে! অমিকে আর ওর কাছে যেতে দিয়ে কায নেই।'

তৃপ্তি উত্তেজিতস্বরে উত্তর করিল,—'তুমি "কায নেই" বল্লেই ত হবে না, দাদা যে অমিকে দিন-রাত্রি শিক্ষে দিচ্ছেন, "ভালো-মা'র কাছে থেকো," "ভাল-মা'র কথা শুনো" "ভাল-মা'র বাধ্য হয়ো"।' বরদাসুন্দরী কহিলেন, —'রোসো না, আমি সে পথও বন্ধ করছি আজই।'

রাত্রে পুত্রের আহারের কাছে উপবিষ্টা হইয়া মাতা অনেক অবান্তর কথাবার্ত্তার পর মাধুরী ও অমিয়-সংশ্লিষ্ট কতকগুলি কল্পিত ও সম্পূর্ণ অলীক অপ্রিয় ব্যাপার এমনই সাজাইয়া গুছাইয়া করুণভাবে পুত্রের গোচর ভূত করিলেন যে, সন্তোষকুমার মাধুরীর উপর একটু বেশ বিরক্ত এবং সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। বরদাসুন্দরীর অভিপ্রায় ছিল, সন্তোষের ধারণা করাইয়া দেওয়া যে মাধুরী অমিয়কে যে স্নেহ করে বা ভালবাসে, তাহা কপট ছলনামাত্র এবং কেবলমাত্র উহা সন্তোষকুমারকেই দেখাইবার জন্য অভিনীত হয়, কিন্তু মূলে অমিয় মাধুরীর দুই চক্ষুর বিষ। বরদাসুন্দরী যে সদুদ্দেশ্যে রাত্রিকালে 'কুঁড়াজালি' হাতে লইয়া পুত্রের আহার-তত্ত্বাবধানে বসিয়াছিলেন, তাঁহার সেই উদ্দেশ্য একেবারেই বিফল হয় নাই; সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা কায করিয়াছিল।

মাধুরী এই কয় দিন 'অমু'কে না পাইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্টা হইয়া উঠিয়াছিল। শাশুড়ী ও ননদ সর্ব্বদাই মাধুরীর নিকট হইতে অমিয়কে তফাতে আগুলিয়া রাখে এবং মাধুরীর সতীনপুত্রের উপর অতিরিক্ত স্নেহাতিশয্যের প্রতি কঠোর ব্যঙ্গ ও স্বার্থঘটিত ইঙ্গিত করিয়া মাধুরীকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিতেছিল। অপরাহ্নে একাকিনী ত্রিতলে শয়নকক্ষে ভূমিতলে সিমেন্টের উপর মাধুরী চুপ করিয়া শুইয়াছিল। শয্যারচনা ও গৃহ পরিষ্কৃত করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও, তাহার মনে ছিল না বা সে-দিকে লক্ষ্য ছিল না। সন্তোষকুমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া মাধুরীকে অসময়ে এইরূপভাবে শয়ানা দেখিয়া, অসুস্থ হইয়াছে কিনা, উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিলেন। মাধুরী বস্ত্রাদি সংবৃত করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, সে সুস্থই আছে।

দ্বিপ্রহরে অমিয়কে লইয়া তৃপ্তি তাহাকে অত্যন্ত অপমানিত করিয়া গিয়াছে। মনটা অত্যন্ত বিষণ্ণ, ব্যথিত ও তিক্ত হইয়াছিল, এরূপ অবস্থায় সন্তোষকুমার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি অমিয়ের সম্বন্ধে নাকি অন্যায় করছ?'

ভিতরে ভিতরে দিন-রাত্রি অবিরত সহ্য করিয়া ধরিত্রীর ন্যায় ধৈর্য্যশীলা মাধুরীরও অন্তর অত্যন্ত উত্তপ্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল। সে ভাবিল, বরদাসুন্দরী কিংবা

তৃপ্তির ন্যায় সন্তোষকুমারও ঐরূপ বা ঐ ভাবের কোনও কথা বলিতে বা তিরস্কার করিতে আসিয়াছেন; তাই অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিল,—'আপনিও, —আপনিও অমন ক'রে বল্‌বেন না। আমি "অমিয়"কে মোটেই চাই না। তার উপর আমার কিসের জোর? আমি তার—', বলিতে বলিতে বাক্য অসমাপ্ত রাখিয়া, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মাধুরী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্তোষকুমার ভুল বুঝিলেন। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার আশঙ্কিত অগ্নি বুঝি এইবার জ্বলিয়াছে। এই ভয়েই তিনি বিবাহ করিতে ইতঃস্ততঃ করিয়াছিলেন এবং পশ্চাৎপদ ছিলেন। মাতৃহারা বিমাতৃপীড়িত বালক তপনের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, —'সৎমা কক্ষনো ভালবাসে না।'

৮

উপরিউক্ত ঘটনার পর প্রায় বৎসরাবধি কাল কাটিয়া গিয়াছে। মাধুরী ইহার মধ্যে পিত্রালয়ে আর যাইতে পায় নাই। অপরাহ্নে গৃহ পরিষ্কার করিয়া, টেব্‌লের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাধুরী একখানি পত্র পাঠ করিতেছিল। তাহার সুগৌর ললাটদেশে চিন্তার রেখা ও বদনমণ্ডলে বেদনার ছায়া সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছিল।

পত্রখানি তাহার বিমাতা অন্নতারা হুগলী হইতে লিখিয়াছেন। তপন অতিরিক্ত অবাধ্য, দুষ্ট ও দুরন্ত হওয়ায় তাহার চরিত্রসংশোধনের এবং বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাহাকে রাঁচিতে দুষ্ট ছেলেদের সংশোধন করিবার বোর্ডিংয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মাধুরী পত্রখানি পাঠ করিবার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির নিশ্চলদৃষ্টিতে সেই পত্রখানির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নিশ্চল দেহ ও স্থির-দৃষ্টি অন্তরের তুমুল বিপ্লবের বিন্দুমাত্রও অভিব্যক্ত করিতেছিল না, বরং তাহার অন্তরের সহিত বাহিরের সম্পূর্ণ বৈপরীত্যই দৃষ্ট হইতেছিল।

মাধুরীর মনে বায়োস্কোপের ন্যায় দ্রুতগতিতে বিগত শৈশব জীবনের চিত্রগুলি একটির পর আর একটি প্রতিফলিত হইতেছিল। তপন যখন ভূমিষ্ঠ হয়, মাধুরীর বয়ঃক্রম তখন ৮ বৎসর। তপন যেদিন জন্মগ্রহণ করে, সেদিনকার কথা মাধুরীর বেশ মনে আছে। সেই মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি ও আনন্দ-কোলাহল সে একটুও বিস্মৃত হয় নাই। তাহার পর তপনের 'আটকৌড়ে'য় সে মেয়ে হইয়াও কুলা বাজাইয়াছিল, পিতা তাহাকে কত আদর করিয়া বলিয়াছিলেন,—'মাধু আমার মেয়ে কে বলে? ও আমার ছেলে।' তপনের জন্মের পরই তাহাদের মাতা দুরন্ত সূতিকারোগে আক্রান্তা হয়েন এবং দুই বৎসর প্রায় শয্যাগতা থাকিয়া অনেক চিকিৎসাদির পর, এক শ্রাবণ-সন্ধ্যায় দশ বৎসরের বালিকা মাধুরী ও দুই বৎসরের শিশু তপনকে স্বামীহস্তে সঁপিয়া দিয়া কোন্ অজানা রাজ্যে চিরপ্রস্থান করেন। ওঃ! সে কতদিনের কথা! মনে হয় যেন শত যুগ।

মাধুরীর মনে পড়িতেছিল নিজের শৈশবের কথা। তপন তখন জন্মে নাই। পিতামাতার সে কি আদরেরই একমাত্র নয়নমণি দুহিতা ছিল! পিতা তখন সবেমাত্র

ওকালতী প্র্যাক্‌টিস্‌ করিতেছেন। যেদিন কোনও মোকদ্দমা থাকিত, তিনি যাইবার সময় মাধুরীর মুখ দেখিয়া ও মুখচুম্বন করিয়া প্রশ্ন করিতেন, 'বল্‌ তো বুড়ি! আজ হার হবে না জিত্‌ হবে?' মাধুরী অর্থ বুঝুক বা নাই বুঝুক, তার একটিমাত্র বাঁধা বুলি ছিল, 'জিত্‌ হবে।' পিতা সানন্দে তাহাকে চুম্বন করিয়া কাছারী যাইতেন। মাতাও তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। মাতার জীবিতকালে মাধুরী সম্ভব অসম্ভব কোনও দ্রব্য প্রার্থনা করিয়া কখনও নিরাশ হয় নাই। তাহার পর তপনের জন্মের পর হইতেই তাহার পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। তপনকে প্রসব করিয়াই মাতা শয্যা গ্রহণ করিলেন, বালিকা মাধুরী শিশু ভ্রাতাটিকে দুধ খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো প্রভৃতি কার্য্যের ভার গ্রহণ করিল। তবুও তাহারা ভাইবোনে শয্যাশায়িনী মাতা বর্ত্তমানে একদিনও একটু কষ্ট বা কোনও অভাব অনুভব করে নাই। মাতা রোগশয্যায় পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও সর্ব্বদা তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন ও স্নেহাদরের ত্রুটি করিতেন না। তাহার পরে মাতার মৃত্যুর পর অন্তরে নিদারুণ বেদনাঘাত প্রাপ্ত হইলেও মাধুরী একদিনও শিশুভ্রাতাসহ সংসারে কোনও কিছুর অভাব অথবা পিতার অযত্ন অনাদর পায় নাই। পিতা তাহাদের দুইজনকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। তপন বাল্যাবধি কখনও কোন দ্রব্যের জন্য বাহানা আবদার করিয়া বিমুখ হয় নাই। পিতা কখনও তাহাকে একটি কড়া কথা কহেন নাই। তাহার পরে বিমাতার আগমন ও তপনের লাঞ্ছনারম্ভ সমস্তই মনে পড়িল। হায়। আজ যদি তাহাদের সেই স্নেহময়ী মা জীবিতা থাকিতেন, তবে আজ বালক তপনকে আত্মীয়-বান্ধব-হীন সুদূর বিদেশে সম্পূর্ণ পর ও অপরিচিতের মধ্যে শাস্তিবহুল স্থানে কখনই নির্ব্বাসিত হইতে হইত না। হায়! না জানি অভিমানী বালক নিদারুণ মর্ম্মযাতনায় সেখানে কতই না কাঁদিতেছে! সেখানে তাহার প্রতি মমতা করিবার যে কেহই নাই। সে না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলে তাহাকে ঘুম হইতে তুলিয়া খাওয়াইবার বা অসুখ করিলে গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া একটু স্বস্তি দিবার যে কেহই নাই। মাধুরীর মনে পড়িয়া গেল, তপন রাত্রিতে একাকী শুইতে পারে না, তাহা ছাড়া, তাহার রাত্রিতে ঘুমন্ত অবস্থায় অসংলগ্ন কথা কহিয়া উঠা ও হাত-পা-ছোড়া অভ্যাস আছে। কে এখন তাহাকে কাছে করিয়া যত্নে বুকটির কাছে টানিয়া লইয়া শুইতেছে? হয়ত রাত্রিতে ঘুমন্ত অবস্থায় হাত-পা ছোড়া ও বিছানায় গড়াগড়ি দেওয়ার জন্য তাহার শাস্তি হইতেছে! রাত্রিতে চৌকীদারের হাঁক শুনিলে বা বর্ষারাত্রে মেঘগর্জ্জন বজ্রধ্বনি শুনিলে, তপনের সেই সভয়-আকুলভাবে 'দিদা'কে জড়াইয়া ধরা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। মাধুরীর আয়ত-নয়নদ্বয় বহিয়া ধারার পর ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগল। 'দাদুমণি! সোনা আমার! কত কষ্টই না পাইতেছিস্‌ সেখানে! মাণিক! হায়! অভাগিনী দিদার যে তোর প্রতীকারের কোনও ক্ষমতা নাই। ভাইটি আমার! দিদাকে স্মরণ করিয়া নিভৃতে একা একা না জানি কত কান্নাই কাঁদিতেছিস! সংসারে যে তোর কেউ নাই, কিছু নাই। তোর দিদাও যে মরিয়া গিয়াছে। অভিমানী ভাই আমার! তুমি যে দিদা ছাড়া জগতে কাউকে

চেন না। তোমার কান্না, তোমার "দিদা" ডাক আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি। উপায় নাই, উপায় নাই, কোনওরকমে কিছুমাত্র উপায় নাই। দিদা যে তোর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চক্ষুর উপর যেন তোর এই নিদারুণ শাস্তি দেখিতেছে, ইহার বিরুদ্ধে একটি মুখের কথা কহিবারও শক্তি বিধাতা তাহার রাখেন নাই।'

মাধুরীর চক্ষু হইতে অবিরাম-স্রোতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল, স্থিরভাবে টেব্‌লের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সে তন্ময় চিত্তে তপনের কথাই চিন্তা করিতেছিল।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ হওয়ায় সচকিত হইয়া মাধুরী টেব্‌লের উপর হইতে পত্রখানি তুলিয়া লইয়া, বদনের অশ্রুচিহ্ন মুছিয়া, গৃহ হইতে সত্বর বাহির হইয়া গেল। সন্তোষকুমার গৃহে প্রবেশ করিয়া মাধুরীকে ডাকিলেন। মাধুরী বাহির হইতেই 'এখনই আস্‌ছি' বলিয়া দ্বিতলে নামিয়া গেল এবং ক্ষণকাল পরে মুখ ধৌত করিয়া স্বাভাবিক শান্তমুখে স্বামীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

সন্তোষকুমার কহিলেন, 'দিনকতক মধুপুরে বেড়াতে যাব ভাব্‌ছি, তোমার কি মত?'

মাধুরী শান্তভাবে কহিল, 'বেশ ত। কবে যাবে?'

'আমি একা নয়, তুমি সুদ্ধ—', বলিতে বলিতে সন্তোষকুমার থামিয়া গেলেন।

মাধুরী এবারেও শান্ত অচপল দৃষ্টিতে স্বামীর প্রতি চাহিয়া কহিল, 'বেশ, ভালই ত। মা, দিদিমণি, অমিয় এরা সবাই-ই ত?'

সন্তোষকুমার একটু চিন্তিতভাবে, অথচ মাধুরীর মুখভাবের প্রতি তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসাময় দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, 'না, অমিয়রা যাবে না। অমিয়রা গেলে কিন্তু তোমার আমার একত্র একটু বেড়ানো বা আমোদ-আহ্লাদ কর্‌বার অসুবিধা হবে। এখানে তোমাকে নিয়ে ইচ্ছামত একটু বেড়াতে বা সবসময় শান্তিতে আমোদ-আহ্লাদ কর্‌তে মোটেই সুবিধা পাই না, সেখানে খোলা ফাঁকা যায়গায় বেশ দু'জনে মিলে থাকা যাবে। বামুন, চাকর আর একজন ঝি সঙ্গে নেব, কি বল?'

মাধুরীর ইহাতে কোনও ভাব-বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না, সে তেমনই নিরুৎসাহভাবেই বলিল, 'বেশ।'

সন্তোষকুমার আরও ২/৪টি কথাবার্ত্তার পর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন এবং ত্রিতলের সুবিস্তৃত ছাদে ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে লাগিলেন।

সন্তোষকুমার মাধুরীকে যে এই মধুপুর-যাত্রার কথা বলিতে আসিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে একটু মিথ্যাও ছিল। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, সপরিবারে—পত্নী, পুত্র, মাতা এবং ভগিনী সমভিব্যাহারে মধুপুর-যাত্রা করিবেন, কিন্তু মাধুরীর মন বুঝিবার জন্য কেবলমাত্র তাহাকে লইয়া উভয়ে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু যে মতলবে তিনি উক্ত প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন, তাহা বিফল হইল, কেননা, ইহাতে মাধুরীর মনের ভাব—হর্ষ বিষাদ কিছুই বুঝা গেল না। সন্তোষকুমার এ পর্য্যন্ত মাতা এবং ভগ্নীর নিকট পত্নীর বিরুদ্ধে অনেক কথাই শুনিয়াছেন, কিন্তু সংযতবাক্ মৌনস্বভাবা মাধুরীর

নিকট এ পর্য্যন্ত অমিয়, তৃপ্তি কিংবা বরদাসুন্দরীর বিরুদ্ধে একটি কথাও শ্রবণ করেন নাই। তিনি আজি মধুপুর-যাত্রার প্রলোভন দেখাইয়া, পত্নীকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। আশা করিয়াছিলেন, ইহাতে মাধুরী বাক্যে না প্রকাশ করিলেও, তাহার মুখভাবে খুশী হইবার চিহ্ন পাওয়া যাইবে নিশ্চয়। কিন্তু সংযতস্বভাব, গম্ভীর ও শান্তপ্রকৃতি মাধুরীর বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য বা ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। সে আপনার চতুর্দ্দিকে নিজের অপরিসীম সংযম, ধৈর্য্য ও মৌনতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করিয়া, সকলের নিকট হইতেই যেন অনেকটা দূরে নিজকে রক্ষা করিয়াছিল।

সন্তোষকুমার ছাদে পায়চারি করিতেছিলেন। মাধুরীর বাক্য, ব্যবহার ও ভাব দেখিয়া, তাহার চিত্তের ভাব বিন্দুমাত্রও বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। মনস্তত্ত্ববিদ্ যুবক অধ্যাপক বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের নিকট মনস্তত্ত্বের এত গবেষণা আলোচনা করিয়া, গৃহে আজ সামান্যা এক গ্রাম্য অশিক্ষিতা কিশোরীর ও যাহার মনের সহিত তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকট সম্বন্ধ, তাহারই কাছে হার মানিতে হইবে, ইহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

সন্তোষকুমার অবশেষে নিজের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি দ্বারা যাহা সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তই হইল। তিনি স্থির করিলেন, বরদাসুন্দরী, তৃপ্তি ও অমিয়কে মাধুরী প্রীতির চক্ষুতে দেখিতে পারে নাই, সেইজন্যই উহাদের সম্বন্ধে কোনও কথাই সে সন্তোষকুমারের নিকট উত্থাপিত করে না। সন্তোষকুমার ভাবিয়াছিলেন, অমিয়, তৃপ্তি ও মাতাকে না লইয়া, কেবলমাত্র মাধুরীকে সঙ্গে লইয়া মধুপুর যাইবার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই সে সানন্দে সম্মতি দিবে, কিন্তু কৈ, তা ত কিছুই দেখা গেল না। না —মাধুরী যদি অমিয়কে ভালই বাসিত, তবে নিশ্চয়ই অমিয়ের কথাও অন্ততঃ সন্তোষকুমারকে কহিত।

সন্তোষকুমার চিন্তা করিতে লাগিলেন, মাতা এবং তৃপ্তি এক এক সময়ে মাধুরীকে কড়া কথা শুনাইতেছেন এবং দুর্ব্ব্যবহারও করিতেছেন, ইহা তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন এবং স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, কিন্তু মাধুরীকে কোনওদিন অটল মৌনতাবর্ম্ম ত্যাগ করিতে দেখেন নাই। শ্বশ্রূ ও ননদিনীর প্রতি মাধুরী না হয় এই সকল কারণে বিমুখ হইতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র বালক অমিয়েশ তাহার কি করিয়াছে? সে ত তাহাকে খুবই ভালবাসে, সে বাটীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বোধ হয়, তাহার 'ভালো-মা'কেই অধিক ভালবাসে। পরক্ষণেই মনে পড়িয়া গেল, 'ওঃ, স্ত্রীলোকরা সর্ব্বাপেক্ষা সতীন এবং সতীনের পুত্রকে ভীষণ শত্রু জ্ঞান করে, সে যতই নির্দ্দোষ অথবা শিশু বালক হউক না কেন, তাহারা এই স্বাভাবিক ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ত্যাগ করিতে পারে না। মাধুরীও তাই স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক গতি ত্যাগ করিতে পারে নাই।'

তাহার পর ভাবিলেন, মাতা ও ভগিনী যে মাধুরীর প্রতি কুব্যবহার অথবা তিরস্কার করেন, বোধ হয় মূলে দোষ মাধুরীর নিশ্চয়ই আছে, নতুবা বিনা অপরাধে মানুষ মানুষকে আঘাতই বা দিবে কেন? বোধ হয় ভিতরে ভিতরে অমিয়কে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ করে বলিয়া বরদাসুন্দরী ও তৃপ্তি মাধুরীর উপর অসন্তুষ্টা। সন্তোষকুমার স্থির

সিদ্ধান্ত করিলেন, মাতা ও ভগ্নী মাধুরীর বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট যাহা বলেন, সব সত্য এবং মৌন-স্বভাবা মাধুরী বাক্যে কিছু প্রকাশ না করিলেও তাহার ব্যবহারও অমিয়ের প্রতি গোপন ঈর্ষা-বিদ্বেষ, তৃপ্তি ও বরদাসুন্দরীকে কঠিন ব্যবহার করাইতে বাধ্য করে।

৯

চৈত্র মাস। কলিকাতা সহরে নিদারুণ গ্রীষ্মের প্রভাবে চারিদিকে ভীষণ বসন্তমারীর আবির্ভাব হইয়াছে। বৈকালবেলা মাধুরী কাপড় কাচিয়া আসিয়া সিক্ত বস্ত্রখানি বারান্দার রেলিংয়ের উপর শুকাইতে দিতেছিল, উঠানের কোণের বাতাবীলেবুর গাছটায় অজস্র ফুল ধরিয়াছিল, বৈকালিক বাতাস তাহার সৌরভ-ভার সমস্ত বাড়ীটিময় ছড়াইয়া দিতেছিল। সুমিষ্ট লেবুফুলের গন্ধ ও সান্ধ্য চৈতালি বাতাস যেন সকলের মনে একটা মাদকতাময় আবেশ আনিয়া দিতেছিল। অমিয়েশ বহির্ব্বাটিতে খেলিতে গিয়াছিল। ম্লান শুষ্ক ওষ্ঠাধরে সে মাধুরীব নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। অমিয়েশের প্রতি সস্নেহ নেত্রে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া মাধুরী প্রশ্ন করিল, 'এমন সময়ে খেলা ছেড়ে বাড়ীর ভিতরে এলে যে অমু?' বলিয়া মুহূর্ত্তেই সচকিতে শঙ্কিতভাবে অমিয়ের ললাটে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, 'এ কি! তোমার মুখচোখ এত লাল হয়েছে কেন? জ্বর হ'ল নাকি?' হস্তদ্বারা গাত্রোত্তাপ পরীক্ষা করিয়া উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে কহিল, 'হ্যাঁ, জ্বরই ত হয়েছে দেখছি! মাথাব্যথা করছে কি বাবা?'

অমিয় মাধুরীর ক্রোড় ঘেঁসিয়া দাঁড়াইযা তাহার ঊরুদেশে মস্তকটি ঘষিতে ঘষিতে কহিল, 'বড্ড সমস্ত গা মাথা ব্যথা ও চোখ জ্বালা করছে ভালো-মা!'

মাধুরী ম্লান-শঙ্কাকাতর মুখে অমিয়কে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া শাশুড়ীর গৃহের দিকে চলিল। দালানে আসিতে আসিতে তৃপ্তির সহিত দেখা হইল। তৃপ্তি অসময়ে অমিয়কে মাধুরীর ক্রোড়ে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কঠিন স্বরে কহিল, 'অমি! বিকেলবেলা বাইরে খেলাধূলা ছেড়ে বাড়ীর ভিতরে এখানে কি হচ্ছে? যা করতে বারণ ক'রে দেওয়া গেছে, তোমার তাই করা অভ্যাস হয়েছে, রোসো, দাদাকে ব'লে এবার তোমায়—'

তৃপ্তির কথা সমাপ্ত না হইতেই মাধুরী ধীরভাবে কহিল, 'অমুর জ্বর হয়েছে দিদিমণি!'

বিস্মিতভাবে তৃপ্তি কহিল, 'কৈ, আমরা ত শুনিনি। এই ত খানিক আগে বাইরে খেলা করতে বেরিয়ে গেল।'

মাধুরী ম্লান-শুষ্ক মুখে কহিল, 'এরই মধ্যে জ্বর এসেছে। এই দেখ না গা পুড়ে যাচ্ছে।'

তৃপ্তি বিরক্তমুখে কহিল, 'ছেলেটি ত ভাল ছেলে নয়। অসুখ করছে, তা আমায় কি মা'কে বলতে সুবিধা হ'ল না।'

মাধুরী কোনও উত্তর না দিয়া শাশুড়ীর শয়নকক্ষে অমিয়েশের শয্যায় অমিয়েশকে শোয়াইয়া দিয়া, থার্ম্মমিটার আনিয়া জ্বর পরীক্ষা করিতে লাগিল। দেহের উত্তাপ পারদে উঠিল প্রায় ১শত ৩ডিগ্রী। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্যস্তভাবে বরদাসুন্দরী গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'অমির জ্বর এসেছে? কৈ, আমাদের ত কিছু বলেনি?'

মাধুরী ধীবভাবে শাশুড়ীকে কহিল, অমিয়েশ বহির্বাটী হইতে আসিবামাত্র প্রথমে মাধুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং মাধুরী তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়াছে। তৃপ্তি অথবা বরদাসুন্দরীকে জ্বরের বিষয় জানাইতে তাই অমিয়েশ অবকাশ পায় নাই।

অমিয়েশের জ্বর ক্রমে প্রবল বসন্তজ্বরে প্রকাশ পাইয়াছে। বরদাসুন্দরীও প্রায় ৫/৬ দিন জ্বর ও আমাশয়ে শয্যাগতা রহিয়াছেন। তৃপ্তি সংসারের তত্ত্বাবধান ও মাতার শুশ্রূষা করিয়া অমিযব নিকট আসিয়া বসিতে এক মুহূর্ত্ত অবকাশ পায় না। মাধুরী রাত্রি ও দিনকে সমান করিয়া ফেলিয়া, স্থির অচপলভাবে বোগীকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছে। ক্রোড়ের উপর সুচিক্কণ, মসৃণ, কচি কলাপাতা মেলিয়া, তদুপরি মাখন লেপিয়া, ঐ মাখন-লেপিত কদলীপত্রোপরি সাবধানে রোগীকে শোয়াইয়া রাখিযাছে। অচৈতন্যাবস্থায় বিকারের ঝোঁকে বালক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, মাধুরী ধীর প্রশান্তভাবে অপরিসীম চিত্ত-সংযমেব সহিত যন্ত্রণা উপশমের নিয়মগুলি পালন করিয়া যাইতেছে। একমনে ধীরভাবে ঔষধ খাওয়ানো, ঘা ধৌত করা, মল-মূত্র পূঁয-রক্ত পরিষ্কার করা, ঠিক ঘড়ি ধরিয়া দিনে ও রাত্রে সমানভাবে যন্ত্রের ন্যায় করিয়া যাইতেছিল। রাত্রির আহার মাধুরী ত্যাগই করিয়াছে; দ্বিপ্রহরে একবার উঠিয়া, নামমাত্র ভাতের থালার সম্মুখে বসে।

যে রাত্রিতে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন বালকের সমস্ত মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশিত হইল, নাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে, মুখ দিয়া হেঁচকির ন্যায় একটা অব্যক্ত শব্দ বাহির হইতেছে, হস্তপদ শীতল হইয়া গিযাছে, দুইজন খ্যাতনামা ডাক্তার ও তিনজন বসন্ত চিকিৎসক বৈদ্য যখন ঈশ্বরকে ডাকিতে উপদেশ দিয়া, ম্লানমুখে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন, তাহার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত মাধুরী ধীরভাবে গরম জলের বোতল দিয়া হস্ত-পদের উত্তাপ আনয়নের চেষ্টা করিতেছিল, এখন হঠাৎ উম্মাদিনীর ন্যায় ক্রোড় হইতে অমিয়কে শয্যাতলে শোয়াইয়া দিয়া ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

বরদাসুন্দরীর জ্বর ভাল হইয়াছে। তিনি কন্যাসহ রোগীর কক্ষের মেঝের উপর শুইয়া উচ্চৈঃস্বরে নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শোকাহত বেদনাতুর সন্তোষকুমার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় স্তব্ধভাবে চেয়ারে বসিয়া ছিলেন, তাঁহারও নেত্র হইতে অশ্রু বহিতেছিল। মাধুরীকে হঠাৎ ঐরূপভাবে বিশৃঙ্খলবেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যাইতে দেখিয়া তিনি নিস্পলকনেত্রে সেইদিকে বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

মাধুরী অমিয়র কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া অন্ধকারে ত্রস্ত দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া ত্রিতলে উঠিয়া গিয়া, ঠাকুরঘরের শিকল খুলিয়া অন্ধকার কক্ষে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। ঠাকুর, রক্ষা কর, রক্ষা কর! ভগবান্, রক্ষা কর! মাধুরী যে বড় মুখ করিয়া অমিয়কে সুস্থ করিয়া তুলিবে বলিয়া সন্তোষকুমারকে প্রবোধ দিয়াছে। মাধুরী কাতরভাবে ভূমিতলে পাথরের উপর মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে কাঁদিয়া বলিতেছিল,—'হে শ্যামসুন্দর, তোমায় যদি যথার্থ কখনও ভক্তি ক'রে থাকি, আর অমুকে আমি যদি যথার্থই পেটের সন্তান ব'লে ভেবে থাকি, তাকে যা স্নেহ করেছি, ভালবেসেছি, তার মধ্যে যদি এক কণাও স্বার্থ বা প্রতারণা না থাকে, তবে আজ আমাকে আমার অমুধনকে ফিরিয়ে দাও। দাও ঠাকুব!' আঁধার-ঘনীভূত গৃহতলে ধূলার উপর প্রায় ১৫ মিনিট পড়িয়া থাকিয়া এইরূপ ক্রন্দন ও ঐকান্তিক প্রার্থনার পর মাধুরী মনে একটা যেন অভূতপূর্ব্ব সান্ত্বনা ও শক্তি লাভ করিল। উঠিয়া বসিয়া জানু পাতিয়া গলবস্ত্রে যোড়হস্তে অন্ধকার-গৃহমধ্যস্থ সিংহাসনোপরি স্থাপিত বিগ্রহ-মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া অস্ফুট স্বরে সুদৃঢ়ভাবে কহিল,—'যদি আমি মনে জ্ঞানে অমুকে আমার পেটের সন্তানের চেয়ে ভিন্ন ভেবে থাকি, যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ওকে "সতীনপো" ভেবে ভিন্ন চোখে দেখে থাকি, তবে অমুর মুখের "মা" ডাক আর আমি শুনতে পাব না। আর যদি তার আমি যথার্থই "মা" হয়ে থাকি, তা হ'লে তার মুখের "মা" ডাক হ'তে কখনই আমি বঞ্চিত হব না। ঠাকুর, অমুকে কোলে নিয়ে তোমায় আবার প্রণাম করতে যদি আস্তে পারি আসব, নইলে নয়।' ভূমিতলে মস্তক লুটাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিয়া মাধুরী উঠিল। অন্ধকার গৃহ হাতড়াইয়া কোণে যেখানে একটি বৃহৎ তাম্রকুণ্ডে বিগ্রহের স্নান-জল এবং চরণামৃত রক্ষিত থাকে, সেইখানে গিয়া একটি কুশী করিয়া এক কুশী চরণামৃত লইয়া অন্ধকারে সাবধানে দ্বিতলে নামিয়া আসিল।

মাধুরীর প্রাণে একটা অদ্ভুত শক্তি ও ভরসার আবির্ভাব হইয়াছিল। দৃঢ়পদে অমিয়েশের গৃহে প্রবেশ করিয়া উচ্চরোলে ক্রন্দনপরায়ণা শ্বশ্রূ ও ননদিনীকে সে ঘর হইতে অন্যত্র যাইতে এবং ক্রন্দননিবৃত্তা হইতে অনুরোধ করিয়া অমিয়েশের পার্শ্বে গিয়া উপবিষ্টা হইল।

সন্তোষকুমার মাধুরীকে দেখিয়া এবার যেন একটু সম্বিৎ পাইলেন; তৃপ্তি ও বরদাসুন্দরীকে, ক্রন্দন করিলে রোগীর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা বুঝাইয়া, অন্যত্র লইয়া গেলেন।

মাধুরী স্থিরভাবে বসিয়া অমিয়েশের সর্ব্বাঙ্গে সেই কুশীর চরণামৃত লেপিয়া দিতে লাগিল এবং মুখের ভিতর কয়েক ফোঁটা চরণামৃত ঢালিয়া দিল। তাহার পর ধীর, সংযত অথচ ক্ষিপ্রভাবে রোগীর তখনকার করণীয় কার্য্যগুলি কবিতে ব্যাপৃতা হইল।

ভোররাত্রিতে রোগীর নাড়ী পাওয়া গেল এবং হস্তপদ স্বাভাবিক উত্তপ্ত হইয়া

উঠিল। অচেতন অনেকদিন পরে চৈতন্যলাভ করিয়া অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে ডাকিল, 'মা—'

তাহার পর চিকিৎসকগণকে আহ্বান করা হইলে, তাঁহারা আসিয়া রোগীর আরোগ্যলাভের ভরসা দিয়া কহিলেন, 'এইরূপ কর্ম্মপটু, অসাধারণ ধৈর্য্যশালিনী এবং সেবায় অভিজ্ঞা শুশ্রূষাকারিণী না থাকিলে রোগীর জীবনলাভ এখনও অসম্ভব।'

একজন বৃদ্ধ বসন্ত-চিকিৎসক কহিলেন,—'হাজার হউক, ইনি রোগীর মাতা, ইঁহার ন্যায় সেবা নার্স দ্বারা কখন সম্ভবে না। তবে সন্তানের এইরূপ মৃত্যুর সহিত দ্বন্দ্ব অবস্থায় এই প্রকার অসাধারণ ধৈর্য্যশালিনী মাতা আমি ইতঃপূর্ব্বে আর দেখি নাই।'

সন্তোষকুমার চিকিৎসকগণের এবংবিধ বাক্যশ্রবণে বিবর্ণমুখে নতমস্তকে অপরাধিভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। ডাক্তাররা জানিতেন না, মাধুরী অমিয়েশের মাতা নহে—বিমাতা।

১০

অমিয়েশের অসুখ এখনও সারে নাই। সর্ব্বাঙ্গেব গুটিকাগুলি পাকিয়া পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়াছে, শরীরে একটি তিল রাখিবার স্থান নাই।

মাধুরী প্রাতে অমিয়েশের গৃহ পরিষ্কার করিয়া, চাদর-বালিসের ওয়াড়গুলি ও মশারিটি কাচিবার জন্য লইয়া ও রোগীর অন্যান্য বস্ত্রাদি সাবান-জলে ধৌত করিবার জন্য দ্বিতল হইতে নামিয়া আসিতেছিল। তৃপ্তি সিঁড়ির উপরে একখানি খামে মোড়া পত্র মাধুরীর হস্তে আলগোছে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। পত্রখানি লইয়া মাধুরী একতলায় 'কলঘরে' গিয়া মশারি ইত্যাদি বস্ত্রগুলি ভূমিতে নামাইয়া খামখানি ছিঁড়িয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিল। কয়েক লাইনমাত্র পাঠ করিবার পরই হঠাৎ সর্পদষ্টের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া, একটা অস্ফুট কাতরোক্তি সহকারে ভূমিতলে থপ করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মাথা বনবন করিয়া ঘুরিতেছিল ও কর্ণে একসঙ্গে সহস্র ঝিল্লীরব শ্রুত হইতেছিল। অশ্রুহীন বিবর্ণ নিষ্পলক দৃষ্টি ভূপতিত পত্রখানির দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মাধুরী পত্রখানি লইবার জন্য হাত বাড়াইল। সমস্ত শরীর তাহার বেতসপত্রের ন্যায় থরথর করিয়া কম্পিত হইতেছিল, হস্তখানি পত্র স্পর্শ করিলেও উঠাইয়া লইবার শক্তি ছিল না। সমুদায় অঙ্গুলিগুলি অবশ অসাড় হইয়া গিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পত্রখানি অবশ হস্তে তুলিয়া লইয়া চক্ষুর সম্মুখে মেলিয়া ধরিল।

চারিপৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ পত্র। পত্রের সব কথাগুলির অর্থবোধ না হইলেও কযেকটি লাইন যেন সুবৃহৎ মূর্ত্তি ধরিয়া, তাহার দৃষ্টিসম্মুখে অগ্নিময় হইয়া নৃত্য করিতেছিল। 'তপন নাই', 'তপন নাই'। মাধুরী পত্রখানা কলঘরের সিক্ত মেঝেয় ফেলিয়া, দুই হাতে বুকটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া লুটাইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ সে নড়িল না, একভাবে পড়িয়া রহিল, কিন্তু তাহার সমস্ত শরীর, প্রত্যেকটি লোমকূপ পর্য্যন্ত ভীষণ দ্রুতবেগে কম্পিত হইতেছিল। চক্ষু হইতে এক ফোঁটাও অশ্রু তাহার ঝরিল না, অধিকন্তু সেই চক্ষুর্দ্বয়ের প্রতি চাহিলে, তাহাতে 'জল' বলিয়া কোনও জিনিষের সংস্পর্শ

আছে বা ছিল বলিয়া বোধ হইতেছিল না। প্রস্তরগঠিত চক্ষুর ন্যায় অশ্রুহীন, ভাবশূন্য সুবৃহৎ চক্ষু দুইটি স্থির নিষ্পলক হইয়া গিয়াছিল। বহুক্ষণ এইভাবে পড়িয়া থাকিবার পর মাধুরী উঠিয়া বসিল। দুই তিনবার মস্তকের অবেণীবদ্ধ চুলগুলি দৃঢ়হস্তে সজোরে ধরিয়া নিজেকে যেন সচেতন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল, কারণ তাহার মনে হইতেছিল, তাহার বোধশক্তি, অনুভূতিজ্ঞান যেন লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ভূপতিত বারিসিক্ত পত্রখানি আবার তুলিয়া লইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিল। এবারে পত্রখানি দুই-তিনবার পাঠ করিয়া, সমস্ত বিষয় মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইল।

অন্নতারা সবিস্তারে অনেক ভণিতা করিয়া বিশেষ শোক এবং সমবেদনা সহকারে জানাইয়াছে, 'তপন গত ২৩শে চৈত্র বৃহস্পতিবার রাঁচি বোর্ডিং-এ চারদিনের ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে আমাদের সকলকে ফাঁকি দিয়া চিরদিনেব মত তাহার স্নেহময়ী মাতার ক্রোড়ে চলিয়া গিয়াছে।'

মাধুরী চুপ করিয়া কল-ঘরের মেঝেয় বসিয়া রহিল। তাহার শরীরের সেই ভীষণ কম্পন থামিলেও সমস্ত শরীর যেন অসাড় অবশ হইয়া পড়িল এবং তাহার অনুভবশক্তি যেন একেবারেই লোপ পাইয়া গেল। তিন সপ্তাহাধিক কাল সে আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম সমস্তই ত্যাগ করিয়াছে। তাহার শরীরের সমস্ত গ্রন্থিগুলি যেন একেবারেই শিথিল ও শরীরের যন্ত্রগুলি নিশ্চল হইয়া গিয়াছে বোধ হইতেছিল।

দ্বিতল হইতে তৃপ্তির সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের ডাক আসিল, —'নতুন বৌদি! তোমার কি কাপড় কাচা, চান্ করা এখনো হ'ল না? অমিয় যে তোমার জন্য কাঁদছে! সকালে ৭টার সময় কলঘরে ঢুকেছ, বেলা যে প্রায় দশটা হ'ল।'

মাধুরী সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তৃপ্তির একটিমাত্র কথা তাহার মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, 'অমিয় যে তোমার জন্য কাঁদছে।'—তাই তো, অমিয় যে তাহার পানেই চাহিয়া বাঁচিয়া আছে! ওঃ, অমিয়ের কথা সে যে একেবারেই বিস্মৃতা হইয়াছিল!

মাধুরীর মুখে একটা দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, সে কলটা খুলিয়া দিয়া তৈল-লেশ-হীন প্রচুর কেশভার-যুক্ত রুক্ষ মস্তকটি জলের তোড়ের নিম্নে পাতিয়া দিল। অমিয়েশের শয্যাদি কাচিয়া সিক্ত বস্ত্রে সে যখন দ্বিতলে উঠিল, তাহার অত্যধিক বিলম্বের জন্য তৃপ্তি তখন মাতার নিকট বলিতেছিল—'হ্যাঁঃ। সৎমায়ের আবার টান! ছেলেটা কেঁদে কেঁদে খুন হচ্ছে, তা তিন ঘণ্টার ওপর আয়েস ক'রে চান্ই হচ্ছে।' মাধুরীকে দেখিতে পাইয়া কি যেন একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মাধুরীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়া বিস্মিতভাবে মাধুরীর মৃতের ন্যায় বিবর্ণ মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

মাধুরী ধীরপদে অমিয়েশের শয্যাপ্রান্তে গিয়া ঘড়ি দেখিয়া খলে ঔষধ মাড়িয়া মধু মিশ্রিত করিয়া অমিয়কে খাওয়াইয়া দিল। তাহার পর সন্তর্পণে তাহার মাথাটি ক্রোড়ের উপর তুলিয়া লইয়া সর্ব্বাঙ্গে নিজের শীতল হস্তখানি সযত্নে ধীরে ধীরে বুলাইয়া দিতে লাগিল।

প্রায় ৪ সপ্তাহ্ কাটিয়া গিয়াছে। অমিয়েশ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে, তবে এখনও হাঁটিতে বা চলাফিরা করিতে পারে না। পথ্য ঝোল-ভাত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দুরন্ত ব্যাধি জম্মের মত তাহার সর্ব্বাঙ্গে করাল দন্তাঘাত-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

এই এক মাস মাধুরী কাহারও সহিত একটিমাত্র কথা কহে নাই। প্রাণহীন পুত্তলিকার মত যন্ত্রচালিতের ন্যায় কায করিয়া গিয়াছে, তাহার চক্ষুতে একদিন এক ফোঁটা জল কেহ দেখে নাই অথবা তাহার কোনপ্রকার চিত্তচাঞ্চল্যও লক্ষিত হয় নাই। বরদাসুন্দবী, তৃপ্তি এবং সন্তোষকুমার তপনের মৃত্যুসংবাদ অবগত হইবার পর, মাধুরীর এই প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার সহিত কোনও বাক্যালাপ করিতে ভরসা করিতেন না।

সন্তোষকুমার এই এক মাসে মাধুরীর নিকট হইতে অনেকখানি সুদূরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। মাধুরীর এক মাসে চেহারা অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত শরীর এবং ওষ্ঠাধর রক্তলেশহীন পাণ্ডাশ বর্ণ ধারণ করিয়াছে। আয়ত সুন্দর ভাসা ভাসা ডাগর চক্ষু দুইটি কোটর-প্রবিষ্ট হইয়া বসিয়া গিয়াছে এবং চোখের কোলে যেন কালি লেপিয়া দিয়াছে। শরীর অস্বাভাবিক কৃশ ও ক্ষীণ আর মুখভাব ভাবশূন্য প্রস্তরপুত্তলিকার ন্যায় হইয়া গিয়াছে। শুধু এক এক সময়ে চক্ষুতে তাহার একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ও জ্বালা ফুটিয়া উঠে, তখন তাহার মুখের দিকে চাহিতে কাহারই ভরসা হয় না। তাহার কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে কথা বলিতে কাহারই শক্তিতে কুলায় না। সে স্নানাহার বন্ধ করে নাই, দ্বিপ্রহরে একবারমাত্র ভাতের সম্মুখে বসে। তৃপ্তি অথবা বরদাসুন্দরী তাহাকে আহার বিষয়ে কোনও অনুরোধ করিতেও ভরসা করেন না।

আজকাল সারারাত্রি বিনিদ্র হইয়া এবং সারাদিন কঠোর পরিশ্রমে পরিচর্য্যা করিয়া মাধুরী অমিয়েশের কাছে সর্ব্বদা না থাকিলেও চলিতে পারে, তাই সন্তোষকুমারের ঐকান্তিক ইচ্ছা, মাধুরী দিবসে এবং রাত্রিতে কিয়ৎপরিমাণে বিশ্রাম গ্রহণ করে, কিন্তু বহুবার চেষ্টা করিয়াও এ-কথা মুখ ফুটিয়া মাধুরীর নিকট জ্ঞাপন করিতে সাহসী হয়েন নাই। এই কঠোর তপঃপরায়ণা সাধিকার তপোভঙ্গ করিতে যেন কাহারই শক্তিতে কুলাইত না। তাহাকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করা যেন একটা নিতান্তই অশোভন কথার মত বোধ হইত, তাই বলি-বলি করিয়াও সন্তোষকুমারের বলা হইত না।

সন্তোষকুমার তাই আজকাল অমিয়েশের অপেক্ষা মাধুরীর জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। মাধুরীর এই নিশ্চল ভাব ও শারীরিক পরিবর্ত্তন তাঁহাকে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

বৈশাখের শেষ। সন্ধ্যাবেলা বরদাসুন্দরী অমিয়েশকে ক্রোড়ে লইয়া দালানে বসিয়া রূপকথা শুনাইতেছিলেন। মাধুরী আড়াই মাস পরে আজ ত্রিতলের শয়নকক্ষে প্রবেশ

করিয়াছে। উন্মনাভাবে সমস্ত ঘরময় কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইবার পর মাধুরী একটি দেরাজ খুলিয়া, ড্রয়ারের মধ্য হইতে একটি কাগজের বাক্স বাহির করিল। বাক্সের ডালাটি খুলিয়া কয়েকটি জিনিষ বাহির করিল, একটি রবারের বল, একখানি টিনের রং-চটা মোটরগাড়ী, একটি সুদৃশ্য কাচের দোয়াত, এইরূপ কয়েকটি খেলনা ও একখানি ছবির বহি। সে যখন শ্বশুরবাড়ী আইসে, এইগুলি নূতন জুতার একটি পেস্ট্ বোর্ডের বাক্সে ভরিয়া তপন মাধুরীর অগোচরে তাহার ট্রাঙ্কের মধ্যে পুরিয়া দিয়াছিল। এইগুলি তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় দ্রব্য এবং একমাত্র সম্পত্তি ছিল।

মাধুরী কিয়ৎক্ষণ নিষ্পলকনেত্রে সেই খেলনাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিয়া, আস্তে আস্তে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। তাহার পর পুস্তকখানি খুলিয়া দেখিল, প্রথম পৃষ্ঠায় আঁকাবাঁকা সুবৃহৎ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—'দিদাকে উপহার দিলাম। শ্রীমান্ তপনকুমার বসু।' অক্ষরগুলি যেন মূর্ত্তিমান লেখক হইয়া মাধুরীর মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠিল।

মোটরগাড়ী, রবারের বল প্রভৃতি খেলনাগুলি সজোরে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া, সে ভূমিতলে উপুড় হইয়া পড়িল। রবারের বলের সুকোমল স্পর্শটি তাহার বক্ষে যেন একটি বহুদিন অস্পর্শিত কোমল হস্তের স্পর্শ-স্মৃতি জাগাইয়া কম্পিত শিহরণ বহাইয়া দিল। সজোর চাপে মোটরগাড়ীর ছোট্ট টিনের চাকা মাধুরীর বক্ষ কাটিয়া রক্তধারা বাহির করিল। সংবরণাতীত অসহ্য মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় গৃহতলে লুটাইয়া মাধুরী যাতনাক্লিষ্ট হৃদয়বিদারী অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, 'তপন! ভাইটি আমার! আয়, ফিরে আয় দাদু! আর তোকে কেউ তাড়িয়ে দেবে না, দিদার কছে ফিরে আয়, শুধুমাত্র আমরা ভাই-বোনে থাক্‌ব, আর কাউকে সেখানে রাখব না, আয় তপো, ফিরে আয়।' অবরুদ্ধ গঙ্গোত্তরী আজ মাধুরীর বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া ভূমি সিক্ত করিল। শরবিদ্ধা মৃত্যুযন্ত্রণা-কাতরা বিহঙ্গিনীর ন্যায় যন্ত্রণা-নীল মুখে সে ছট্‌ফট্ করিতেছিল, মানসনেত্রে তাহার ভাসিয়া উঠিয়াছিল তপনের মৃত্যুশয্যা। স্বজনবিরহাকুল ক্ষুদ্র বালক একাকী আত্মীয়বান্ধবহীন বিদেশে সুদূর নির্ব্বাসনে, হৃদয়হীন শিক্ষক ও অভিভাবকগণের কঠোর প্রহরা ও শাসনে বন্দী হইয়া কতই না কষ্টভোগ করিয়াছে, তাহার চির-প্রফুল্ল মুখখানি কতই না বেদনাকাতর ও ম্লান হইয়া গিয়াছিল! তাহার কচি বুকখানিতে না জানি কত অভিমান, কত দুঃখেরই তরঙ্গ উঠিয়াছিল! রোগশয্যায় পড়িয়া একাকী সে কতবার যন্ত্রণায় কাঁদিয়া 'দিদা' বলিয়া ডাকিয়াছে! তাহার তৃষ্ণায় কি কেহ জল দিয়াছিল? যন্ত্রণায় কি কেহ ক্রোড়ে লইয়া সর্ব্বাঙ্গে স্নেহশীতল হস্ত বুলাইয়াছিল? না—না—কিছুই হয় নাই—কিছুই হয় নাই। এইরূপে মাধুরীর কল্পনানেত্রে, রুগ্নশয্যায় শায়িত তপনের যন্ত্রণাকাতর দৃষ্টি মাধুরীর বক্ষে অনবরত ছুরিকা বিদ্ধ করিতেছিল।

সন্তোষকুমার অমিয়েশের নিকট মাধুরীকে না দেখিয়া, অনুসন্ধান করিতে করিতে ত্রিতলে শয়নগৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। একটা অস্ফুট কাতরোক্তি তখন তাঁহার কর্ণে

প্রবেশ করিল। তিনি সেই শব্দে থমকিয়া দাঁড়াইয়া, গৃহমধ্যে উঁকি দিয়া চাহিয়া, স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। গৃহতলে লুণ্ঠায়মানা মাধুরীর যন্ত্রণা-বিবর্ণ নীলমুখ দেখিয়া, সভয়ে চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন। সন্তোষকুমার অনেকক্ষণ স্থিরভাবে, ঘোরতর অপরাধীর ন্যায় নতমস্তকে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনুতাপের জ্বলন্ত কশাঘাতে তাঁহার অন্তস্তল পুড়িয়া যাইতেছিল, 'হায়! তিনি কেন তপনকে এখানে আনিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন নাই? তাহা হইলে আজ মাতৃহীন ক্ষুদ্র বালককে সুদূর বিদেশে এমন দারুণ কষ্ট সহিয়া হয়ত মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে হইত না।' পর মুহূর্ত্তেই মনে হইল, মাধুরী তাঁহার মাতৃহীন পুত্রকে মৃত্যুর কবল হইতে ছিনাইয়া লইয়া ফিরাইয়া দিয়াছে, কিন্তু তিনি মাধুরীর মাতৃহীন ভ্রাতাটির জন্য কি করিয়াছেন? তাঁহার কি কিছুই কর্ত্তব্য ছিল না?

সন্তোষকুমার দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই নিদারুণ দৃশ্য অধিকক্ষণ দেখিতে সমর্থ হইলেন না, নিঃশব্দপদে দ্বিতলে নামিয়া গেলেন। মাধুরীর সম্মুখে নিজেকে যেন অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী বোধ হইতেছিল, তাহার সম্মুখে যাইবার অধিকার যেন তাঁহার নাই বোধ হইতেছিল।

তিনি বুঝিলেন, এই ধরিত্রীর ন্যায় অসাধারণ ধৈর্য্যশালিনী দেবীতুল্যা নারীর এই শোককাতরাবস্থার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার যোগ্যতা যদি কেহ রাখে, তবে সে অমিয়েশ।

অমিয়কে মাধুরীর নিকট লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া সন্তোষকুমার গৃহের বহির্দ্দেশ হইতে শুনিতে পাইলেন গৃহমধ্যে তৃপ্তি ও বরদাসুন্দরী অমিয়েশকে বুঝাইতেছে, 'দূর বোকা ছেলে! ও যে তোর সৎমা! বড় হ'লে বুঝতে পার্‌বি, ও তোর কে হয়? তোর মা ও কেন হবে? তোর মা স্বর্গে গেছে।'

মাসিক বসুমতী, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৩১

যমের অরুচি

১

'ক্ষেন্তি, অ-ক্ষেন্তি, ওলো শতেক-খোয়ারি হারামজাদি! কানের মাথা খেয়েছিস্ কি ?'

'ক্ষ্যান্ত যে ঘাটে গেছে মা, চাদর আর বালিশের ওয়াড়গুলো সাবান দিতে। কি বল্‌চো ?'

'সে একেবারে গঙ্গার ঘাটে গেলেই আমি নিশ্চিন্দি হই। এমন সর্বনাশীদেরও পেটে ধরেছিলুম,— মাগো।'

'কি হয়েছে মেজদি ?'

'মা তোকে ডাকচেন, তাই ?'

'মা আমাকে ডাকচো ? আমি যে ঘাটে ছিলুম।'

'এদিকে আয় একবার সর্বনাশি! দেখবি তোর বেড়ালে কি সর্বনাশ করে গেছে। রাত্তিরে চিড়ে দিয়ে খাবার যে দুধটুকুন্ ওঁর জন্যে রেখেছিলুম, তোর রাক্ষুসী-বেড়াল তা খেয়ে শেষ করে রেখে গেছে। আবাগি, তোর বেড়াল নিয়ে তুই সুদ্দু বিদেয় হয়ে যা, তাহলে আমি বাঁচি। আর যে আমি পারিনে, সেই ন'টার সময় দুটি ভাত মুখে দিয়ে ট্রেন ধরেছেন, সারাদিন আফিসের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে বাড়ি ফিরছেন, —ঘরে আজ তো ক্ষুদ-রত্তিটুকুও নেই, পরন্তু মাসকাবার হলে চাল কেনা হবে, —দুধটুকু রেখেছিলুম আজকে রাত্তিরের মতো চিড়ে ভিজিয়েই দুধটুকু দিয়ে খেতে দেব, তা সর্বনাশীর বেড়াল সে দুধটুকু ঢাকনা উল্টে ফেলে খেয়ে গেছে।'

'মা, ক্ষ্যান্তকে বকে আর কি হবে—'

'চুপ কর, হতভাগি, চুপ কর্! তুইও যেমন, তোর ক্ষ্যান্তও তেমনি। এমন হাড়-হাবাতিদের পেটে ধরেছিলুম, ভিটেমাটি উচ্ছন্ন যেতে বসেছে! পেটের শত্রুর বাড়া শত্রু নেই রে,— আপনার শত্রু আপনিই পেটে ধরে মানুষ করেছি! তোদের যদি পেটে না ধরতুম, তাহলে আজ এত দুর্দশা হতো না। শ্বশুরের ভিটে উচ্ছন্ন যেতো না,— গাঁয়ে পাঁচজনের কাছে মাথা হেঁট করে থাকতে হতো না!— সর্বস্বান্ত হয়ে দেনা করে বে দিলুম, তাতেও স্বস্তি নেইকো,— ছ' মাসের মধ্যেই সব খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্তি হয়ে মুখ পুঁছে ফিরে এলেন একজন,—আর একজন দিন দিন হাতির মতো বেড়ে উঠছেন, আমাদের গলায় দড়ি দেবার জন্যে।'

'কি হয়েছে ? এত বকাবকি কিসের ? কিরে, সবাই চুপচাপ রইলি যে! চারু, কি হয়েছে ? মেয়েদের বকছিলে বুঝি তুমি ?'

'আমার মরণ হলেই বাঁচি বাপু, আর সহ্য হয় না। ওদেরও তো মৃত্যু নেই ? এই কষ্ট সহ্য করেও এই লাঞ্ছনার মধ্যেও ক্ষেন্তি কি খেয়ে, কি মনের সুখে দিন দিন অত ঢেঙা আর মোটা হচ্ছে বলো দেখি ?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ক্ষেন্তি মোটা ঢেঙা হচ্চে তার জন্যে তোমায় অত ভাবনা করতে হবে না। যতসব বাজে কাণ্ডকারখানা।— মিছিমিছি বাচ্চাদুটোকে তুমি শক্ত কথা শোনাচ্চ কেন বলো দেখি? তোমার তো এমন স্বভাব ছিল না মনোরমা। আজকাল তোমার মেজাজ আশ্চর্যি বদ্‌লে গেছে দেখতে পাই। আগে কখনও তোমার মুখ দিয়ে কড়া কথা বেরোতে শুনিনি তো। এই দারিদ্র্যে ও দুর্দিনে তুমি সুদ্ধ যদি ধৈর্য হারিয়ে বসো, তাহলে আমিই বা কোথায় যাই, আব ঐ অভাগা কচি মেয়েদুটোই বা বাঁচে কি করে?'

'ওগো, আমি যে আর পাড়ার লোকের বাক্য-যন্ত্রণা সইতে পাবছিনে। আজ মিত্তিরজ্যাঠা, পরেশ চাটুয্যে আর গোবিন্দকাকা এসেছিলেন। আমায় ডেকে নানান্ কথা শুনিয়ে গেলেন। বললেন, আসছে অঘ্রানের মধ্যে ক্ষেন্তির বিয়ের ব্যবস্থা না করলে ওঁরা তার প্রতিকার করতে বাধ্য হবেন। পাড়ার গিন্নিদের বাক্য-যন্ত্রণায় ঘাটে তো বেরুবার জো নেই।'

'পাড়ার গিন্নিদের বাক্য-যন্ত্রণার শোধ তাই কি ওদের ওপর দিয়ে তুলে নিতে চাও? যদি এইই না সহ্য করতে পারবে মনোরমা— তবে বাংলা দেশে মেয়ের "মা" হয়েছিলে কেন?'

'ওগো, শুধু কি ওদের গঞ্জনাই দিয়ে থাকি, "মা" হয়ে নিজের মুখে, পেটের মেয়ের মৃত্যুকামনাও যে করেচি— কিন্তু এ যে কত কষ্টে—তা কেউ বুঝবে না গো, কেউ বুঝবে না।'

২

'মেজদি ভাই,— সাবু আর নেই, মার সাবু কি করে হবে?'

'মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে আর কি হবে ভাই, একবার কাকিমাদের বাড়ি যা,— না, না, থাক্, তোর গিয়ে কাজ নেই, আমিই যাচ্ছি,— মণ্টুর এই ফোড়াটা ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ বদ্‌লে দিয়ে যাই। তুই বরং মা'র জন্যে এই কাঁচা বেলটা উনুনে পুড়িয়ে রাখ্, আর নুনগুলো গলে যাচ্ছে, রোদ্দুরে বার করে দে।'

'এই কটা দিন কি করে যে চল্‌বে মেজদি, ভাবনা হচ্চে। বাবা তো শনিবারে মাইনে পাবেন।'

'হুঁ—'

'ক্ষ্যান্ত, চারু, কি হচ্চে তোমাদের?'

'এসো মণিদা! ক্ষ্যান্ত, জলচৌকিটা উঠোনে নামিয়ে দে তো মণিদাকে!'

'তারপব? কি খবর তোমাদের? মাসিমা কেমন আছেন আজ? মণ্টুবাবুর ফোড়া এখনও শুখোয়নি নাকি? দেখি,— অনেকটা কেটেছে দেখচি! ও কি মণ্টুবাবু? তোমার চোখে জল যে? পুরুষমানুষের কান্না লজ্জার কথা!'

'না, না— কৈ কাঁদিনি তো? হ্যাঁ মেজদি, আজকে কি আমি কেঁদেচি?'

'না, না— কে বলে তুমি কেঁদেচো? দেখি ভাই, পা-টা একটু সোজা করো তো,— ভালো করে তুলোটা ঠিক করে দিই—'

'মেজদি, আমিই তাহলে চললুম কাকিমাদের ওখানে— বেলা হয়ে যাচ্চে, বাবা এসে হয়তো ভাত চাইবেন। আমি ভাতটা চাপিয়ে গেলুম, তুমি দেখো।'

'শোন্ ক্ষ্যান্ত,—আমার কাছে আয় একবার।—'

'কি তোদের কথা রে চারু? যা আমার সামনে বলতে পারছিসনে, কানে কানে বল্‌ছিস!'

'আমি বল্‌বো মণিদা, আমি বল্‌বো? ছোড়দি কাকিমাদের বাড়ি মার জন্যে সাবু ধার করে আনতে যাচ্ছে কিনা, তাই মেজদি—'

'তুই চুপ কর দেখি ফাজিল ছেলে! সব কথাতেই ওর কথা কওয়া চাই। মেজদি, তুমি আদর দিয়ে দিয়ে মোণ্টোটার মাথা খেয়েছ। দিন দিন ওর বুড়োপণা বাড়ছে।'

'হ্যাঁ, আমি বুড়োপণা করি বৈকি? আর, তুমি বুঝি খুব ভালো? আমি তো ফাজিল ছেলে, আর তুমি যে বুড়ো ধাড়ি মেয়ে, সব্বাই বলে—'

'মণ্টু, চুপ কর্ শীগ্‌গির। বড় বোনের মুখের ওপর পাল্টা-জবাব করা। ইস্কুলে লেখাপড়া করে এই বুঝি তোমার শিক্ষা হচ্চে? বড় বোনকে অপমান করা! ছি ছি, আজ তুমি ছোড়দিকে ওরকম করে যা ইচ্ছে বলচ, দুদিন বাদে আমাকেও তাহলে অমনি করে বলবে তুমি!'

'অ্যাঁ—অ্যাঁ—দ্যাখো না মেজদি, ছোড়দি দিনরাত্রি খালি খালি বকে, "মেজদি আদর দিয়ে দিয়ে আমার মাথা খাচ্চে।" ওকে বুঝি তুমি আদর দাও না? আমারই যত দোষ?— আমি তোমার মুখের ওপর কক্ষনো জবাব করেছি কি? কক্ষনও কোরবো না।'

'ছোড়দিকে কড়া কথা বললে মেজদিকেও বলা হয়, ছোড়দিকে অপমান করলে মেজদিকেও অপমান করা হয়। "দিদি" সবই এক। বুঝেছ ভাই? আর কখনও এমন কোরো না, কেমন? ক্ষ্যান্ত, তুই আর দাঁড়াসনি ভাই, বেলা হয়ে যাচ্ছে।'

'আমিই তোমাদের ভাই-ভগিনী বিরোধের হেতু, কি বলো ক্ষ্যান্ত?'

'না না মণিদা, তা কেন? মণ্টুটা যত বড় হচ্ছে, তত দুষ্টু হয়ে উঠছে।'

'চারু, মাসিমা আজ কেমন আছেন?'

'তেমনিই আছেন মণিদা! জ্বর কমেনি, তব আমাশাটা কাল থেকে একটু কম মনে হচ্ছে। ক'দিন আর মোটে বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না, বড্ড বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছেন।'

'হুঁ, আমাশায় কাহিল করে বেজায়, তার ওপর অত হাই-টেম্পারেচার! কবরেজ-জ্যাঠাই তো দেখচেন?'

'হ্যাঁ।'

'মেসোমশায় কোথায়?'

'বাবা কাল মনোহরপুরে গেছেন ক্ষ্যান্তর সেই সম্বন্ধটার জন্যে। আজ সকালে তো ফিরবার কথা,—এখনো ফেরেননি।'

'মনোহরপুরের সেই দোজবরে সম্বন্ধ তো? সেটা কিন্তু বিশেষ সুবিধার নয়। পাত্র সুবোধ মিত্তির বড় বদ লোক। বয়সও প্রায় চল্লিশ কিম্বা চল্লিশের কাছাকাছি হবে।'

'গোবিন্দজ্যাঠা, মিত্তিরমশাইরা যেসব সম্বন্ধ এনে দিয়েছেন আর দিচ্চেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে শাসাচ্ছেন, আস্‌চে অঘ্রানের মধ্যে বিয়ে দিতে না পারলে আমাদের সঙ্গে সামাজিক আচার ব্যবহার বন্ধ করতে বাধ্য হবেন,—সেই কাশ রুগী গোবর্ধন ঘোষের হাতে সত্যি সত্যি কি করে বাবা, বাপ হয়ে মেয়েকে সম্প্রদান করবেন? গোবর্ধন ঘোষ যে বাবার বাপের বয়সী, তার হাতে দেওয়ার চেয়ে ক্ষ্যান্তকে গঙ্গায়—'

'উঃ! আমাদের দেশে এই পণপ্রথা ব্রাহ্মণ কায়স্থ সমাজে কি ভীষণ সর্বনাশা মূর্তি ধরে দাঁড়াচ্ছে, তলিয়ে ভাবতে গেলে বুক কেঁপে ওঠে। সমাজ এই ভীষণ অনাচারের কিছুমাত্র প্রতিকার করছে না, পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে শুধু চেয়ে আছে,—সমাজে এই কর্তব্য ত্রুটিজনিত মহাপাপের ভবিষ্য প্রায়শ্চিত্ত কি যে নির্দিষ্ট আছে তা ভগবানই জানেন।'

'এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বৈকি মণিদা! ভগবানের রাজত্বে অন্যায় করে অব্যাহতি কেউই পায় না। তার শাস্তি, তার প্রায়শ্চিত্ত আছেই— একদিন আগে আর পাছে! এই ভীষণ অত্যাচার কসাইবৃত্তির শাস্তি আমাদের জাতকে আমাদের সমাজকে ভুগতে হবে না? এত বড় হিন্দু মহাজাতটা যে আজ উৎসন্ন যেতে বসেছে, তার মল কারণ— দুর্বলের উপর জুলুম ও ঘৃণা; আর নারীর উপর অত্যাচার নয় কি? দরিদ্র ও দুর্বলকে অস্পৃশ্য জাতি করে রাখা আর মেয়েমানুষকে মানুষের সকল প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, একটা জড় পুতুল, ভোগের সামগ্রী করে রাখা, এই-ই আমাদের জাতের সবচেয়ে বড় মহাপাপ! আর এই পাপেই তার ধ্বংসের পথ পরিষ্কার হয়েছে। ক্ষ্যান্ত ঘরে আছে বলে, সমাজ-কর্তাদের আহারে তৃপ্তি নেই, নিদ্রায় স্বস্তি নেই, এত ভাবনা! গোবর্ধন ঘোষের সঙ্গে বিয়ে হয়ে ছ' মাসের ভিতর আমার মতো হাত খালি করে থান পরে আবার বাপের কাছে ফিরে এলে তখন আর কিছু ক্ষতি হবে না। অসহায় দুর্বলের উপর এমনধারা অত্যাচার আর কতদিন পৃথিবী সহ্য করবেন জানি না।'

'দ্যাখো চারু, আমার মনে হয়, উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জেলার সঙ্গে আমাদের বিবাহ বিধি প্রচলিত হলে, আর অসবর্ণ বিবাহটাও রীতিমতো প্রচলিত হয়ে গেলে, এই পণপ্রথাটা অনেকটা খর্ব হতে পারে। অনুরোধ উপরোধ কাকুতি মিনতি বা সভাসমিতি বক্তৃতাতে প্রকৃত কার্যকরী ফল যে কিছু ফলবে তার আশা হয় না।'

'মণিদা, চেষ্টা করলে কার্যসিদ্ধি হয় না, এ আমি বিশ্বাস করি না। যাঁরা সামান্যমাত্র সহজ চেষ্টা করলেই দেশের এই বিশ্রী অনাচার ও উৎপীড়নটা বন্ধ করতে পারেন, তাঁরা নিজেদের ছোট মনের হীন-স্বার্থের খাতিরে কোনোদিন সে চেষ্টা করেননি, অথচ তাঁরাই সমাজে শিক্ষিত উন্নত ভদ্র বলে পরিচিত, আর তাঁদেরই উপর ভবিষ্যৎ সমাজের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। তুমি কি বলতে চাও মণিদা, দেশের শিক্ষিত ছেলেরা যদি বিবাহে অস্বাভাবিক পণ গ্রহণ করাটা ঘৃণা বলে মনে করে এবং তারা আন্তরিক বিরুদ্ধবাদী হয়ে আপন জীবনে তার প্রতিকার করতে দৃঢ় বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে কি পণপ্রথা দিনকে দিন এমনি ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে? "সমাজ" কাদের নিয়ে? দেশের যুবারা যদি আন্তরিক ঘৃণায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাঁরা পণ্যদরে টাকার ওজনে তাঁদের জীবনের সহধর্মিণীকে গ্রহণ করে নিজের মনুষ্যত্ব ও পত্নীর সম্মানের অবমাননা ঘটাবেন না, তাহলে কার সাধ্য তা রোধ করতে পারে? শিক্ষিত বা উপার্জনক্ষম ছেলেদের বাপমায়ের অতিরিক্ত বাধ্য, সুবোধ শিশুটির মতো হয়ে উঠতে দেখি— শুধু বিবাহ আর পণ নেওয়ার সময়েই। বাবা-মা যদি অন্যায়ই করেন এবং সে অন্যায় যদি কেউ বুঝতে পেরেও সমর্থ ও সাহায্য করে, তবে তার মতো কুসন্তান আর দ্বিতীয় নেই, এই আমার বিশ্বাস।'

'চারু, তারা হয়তো সব সময়েই নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করতে সুযোগ পায় না,— কাবণ—'

'মণিদা, আমি বিশ্বাস করি না ভাই। যারা "কালো মেযে" বিবাহ করবো না স্বচ্ছন্দে বলতে পারে, অল্পবয়স্কা মেয়ে বিযে কববো না, কিম্বা কেউ কেউ বা "গরীবের মেয়ে বিয়ে করবো না" বলে আপত্তি জানিয়ে বেশ স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারে,— তারা কর্পর্দকমাত্র "পণ গ্রহণ না করে বিয়ে করবো" এই কথাটি বলবার বেলায়ই বুঝি ভীত সুবোধ সলজ্জ হয়ে ওঠে? শ্বশুবের বুকের শোণিত-শোষণের বেলায়ই দেখি তাদের মাতৃভক্তি আর পিতার বাধ্যতা হঠাৎ উপ্‌চে ওঠে! ছিঃ! জানো মণিদা, বাংলার মেয়েরা মানুষের আকারে জন্মিয়েও জন্তুমাত্র হয়ে থাকে। তোমরা সেই "সার্সি"-র মতো তাদের নিজেদের হীন স্বার্থ যন্ত্র-চালিত ইতর শ্রেণীর বন্য জন্তু পর্যায়ভুক্ত করে রেখেছ ভাই—তাদের মনুষ্যত্ব ও নারীত্বের উপর দিয়ে এই অসম্মান অবমাননার জাঁতা অহর্নিশি পেষণ চলেছে। তা না হলে সাধ্য ছিল না তোমাদের, আমাদের নিয়েই সমাজের বুকের উপর এতবড় অন্যায় অনুষ্ঠান করো! যাঁদের রক্তমাংস ও জীবন হতে এই রক্তমাংসের দেহ ও জীবন লাভ করি, যাঁদের অপার স্নেহে ও আত্মত্যাগে পরিপুষ্ট হয়ে বেঁচে বড় হয়ে উঠি, যাঁদের চেয়ে নিঃস্বার্থ ভালোবাসার জন ও হিতার্থী সংসারে দুর্লভ, সেই বাপ-মায়ের বুকে ছুরি বসিয়ে, —মাকে নিরাভরণা ও বাপকে দেনার দায়ে জীবন্মৃত পথের ভিখারী করে, যে ব্যক্তি নিজের ঘড়ি ছড়ি জুতা পাঞ্জাবি আংটি এসেন্স অনাবশ্যক বিলাসদ্রব্য কড়ায়-গণ্ডায় নিখুঁত করে বুঝে নেয়, সেই ঘৃণ্য নীচ-চেতাকে পিতামাতার দুঃখের হেতু সংসারের

শত্রুকে "মানুষ" কখনও অনাবিল প্রেমের অর্ঘ্য দিয়ে জীবন সমর্পণ করতে পারে না! এই সমস্ত অনাচার মেয়েরা যদি বুঝতে পারে, সেই ভয়েই সেই স্বার্থেই তাদের মানুষের সব প্রকার অধিকার ও উৎকর্ষ থেকে বঞ্চিত করে, নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের যন্ত্র পুতুলমাত্র করে রেখেছ তোমরা! মেয়ে জন্মালেই আমাদেব দেশে বাপমায়েরা আতঙ্কে শিউড়ে ওঠেন কেন? কার জন্য এই নিরপরাধ সদ্যোজাতা বালিকা বাপমায়ের আনন্দভাজন সন্তান হয়েও আতঙ্কের বিষয়, দুঃখের বিষয় হয়ে ওঠে? জন্মমাত্রই বাপমায়ের বিমর্ষ মুখের হতাশ দীর্ঘশ্বাস তার কচি অঙ্গে এসে স্পর্শ করে, সে কার জন্য? সন্তান হয়ে বাপ-মার গলগ্রহ ও শত্রু হয়ে ওঠে কন্যা— সে কার রক্ত-শোষণের আশঙ্কায়? কে সেজন্য দায়ী? যে বিবাহ করে সেই-ই নয় কি? মণিদা, সেই নিষ্ঠুর আত্মসুখসর্বস্ব স্বার্থপর স্বামীর উপর "মানুষের" নির্মল ভক্তি, সুগভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রেম কখনই জন্মাতে পারে না। তবে যাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বিকাশ বা মানুষের উচ্চ বৃত্তিগুলি উন্মীলিত হয়নি, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, ন্যায্য-অন্যায্য, কর্তব্য-অকর্তব্য এ সম্বন্ধে ধারণা বা বোধশক্তিই জন্মায়নি, তাদের কথা স্বতন্ত্র।'

'চারু. আমাদের সমাজে বহু অত্যাচার ও অবিচার অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। পুরুষরা যে তা মোটে দেখতে পায় না বা বুঝতে পারে না তা নয়। ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে ও বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত নিজেদের অনুষ্ঠিত পাপ, অত্যাচার ও অন্যায়ের স্তূপের বিরাট দেহের দিকে চেয়ে ভয়ে ও দুর্বলতায় তারা এর প্রতীকার করবার ইচ্ছা জাগলেও তা পারছে না। আজ তাই বর্তমান যুগের এই জীবন সমস্যায় এ দেশের পুরুষরা এই "জ্যান্ত পুতুল" মেয়েদের নিয়ে কিছুমাত্র তৃপ্ত ও সুখী হতে পারছে না। অথচ নিজেদের কৃত অন্যায় ও অপরাধের প্রাচুর্যের দিক দিয়ে, — নারী এই অজ্ঞানতা রূপোর কাঠির দীর্ঘবর্ষ-ব্যাপী ঘুম ভেঙে শিক্ষা ও জ্ঞানোৎকর্ষের সোনার কাঠির পরশ পেয়ে চোখ মেলে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াক, এ ইচ্ছা প্রাণের তলে তলে জাগলেও তা মুখ ফুটে বলতে পারছে না বা তার জন্য প্রয়াস করতে সাহসী হচ্ছে না। যদি তারা ঐ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী স্তূপীকৃত অত্যাচারের কৈফিয়ৎ চেয়ে বসে? আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি চারু, তোমাদেরও চোখে আজ এই সহনাতীত অন্যায়টা কি জ্বলন্তভাবে ফুটে উঠেছে। সর্ববিধ শিক্ষা ও উৎকর্ষ থেকে বঞ্চিত রাখলেও; এই চিন্তাশক্তি ও বিদ্রোহিতা তোমার মধ্যে কে জাগিয়ে তুলেছে জানো? সে এই পুরুষদেরই চরম অত্যাচার। স্ত্রীকে প্রকৃত "জীবনসঙ্গিনী" বলে যে গ্রহণ করতে চায়,— সে কখনও গহনা ও টাকার ওজনে তাকে আনতে পারে না, ঠিক কথা। এতেই বোঝা যায়, আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবাদের প্রকৃত শিক্ষার উৎকর্ষ ও মনের উৎকর্ষ আজও ঘটেনি। তাহলে—'

'চুপ করো মণিদা, ক্ষ্যান্ত আসছে। ও ছেলেমানুষ, ওর সামনে এসব সম্বন্ধে আলোচনা করা ঠিক নয়।'

৩

'ও চারি,— কোথায় গেলিরে— উনি এসেছেন, পা ধোবার জল দে—'

'তুমি ব্যস্ত হয়ো না, চারু আসছে। অহোরাত্র মেয়েদুটো খেটে খেটে সারা হয়ে গেল! এইবারে ওরা যদি ব্যারামে পড়ে তাহলেই অন্ধকার। চারুটা তো রোগা হাড়সার হয়ে গেছে। ওর দিকে চেয়ে দেখলে আমার বুকের ভিতরটা যেন ফেটে যায়! উঃ— নারায়ণ— ক্ষ্যান্ত, তোর মেজদিদি কোথায় রে?'

'মেজদি বাগানে নারকোল পাতা কুড়িয়ে আনতে গেছে, কাঠ নেই কিনা; বাবা, আপনি একটু বসুন, আমি এখানেই হাতমুখ ধোবার জল এনে দিচ্ছি।'

'তাই এনে দে, ঘাটে আর যেতে পারিনে মা।'

'ওগো, সারাদিন বোধ হয় তোমার খাওয়া হয়নি? মুখ যে বড্ড শুক্‌নো দেখছি।'

'সুবলগঞ্জ থেকে ফেরার সময় নকীবপুরেব কাছারিতে একটা ডাব খেয়েছি। আহা হা, তুমি আবার উঠে এলে কেন? তুমি শুয়ে থাকো, পড়েটড়ে গিয়ে আবার নতুন উপসর্গ জোটাবে কি? আমি খাবো অখন, ক্ষ্যান্ত, চারু ওরা আছে, আমার জন্যে তোমায় অত ব্যস্ত হতে হবে না।'

'না, আমি এই বাইরের দাওযাটায় একটু বসি। আজ এ-বেলা জ্বর একটু কমেছে মনে হচ্ছে। সারাদিন না খেয়ে না নেয়ে রোদ্দুরে ঘুরে এলে, যে-জন্যে গেলে তাও বোধ হয় কিছু হয়নি? হা— দামোদর, আর কত দুঃখু দেবে?'

'দুঃখু এখনই বা কি আর হয়েছে মনো, এর পরে হয়তো সপবিবারে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে কিম্বা না খেয়ে উপোস করে মরতে হবে।'

'সুবলগঞ্জে কিছু হলো না বুঝি? তারা তো মেয়ে পছন্দ করে গেছল!'

'মেয়ে তো পছন্দ হয়েছিল,— সব জায়গাতেই ঐ চাকতিরই খাঁক্‌তি! মনোহরপুরের সম্বন্ধটাই শুধু টাকার গোলমাল বেশি করেনি। কিন্তু জেনেশুনে একটা অসচ্চরিত্র আর সন্দিগ্ধ পুরুষের হাতে মেয়েটাকে কি করে জন্মের মতো সঁপে দিই? মনোহরপুরে খবর নিলুম, সবাই-ই বললে,— "সুবোধ মিত্তির আর পক্ষের বৌটাকে সন্দেহ-বাইয়ে বড় যন্ত্রণা দিয়েছে। ঘরে চাবি দিয়ে তাকে বন্ধ করে রেখে তবে বেরুতো। অবস্থা থাকলেও ঐ সন্দিগ্ধ প্রকৃতির জন্যে একটা ঝি পর্যন্ত রাখত না। তার নিজের ভাই এলে, দেখা করতে দিত না!" জেনেশুনে এই ভীষণ প্রকৃতির লোকের হাতে মেয়েটাকে কি করে জ্যান্ত জবাই করতে দিই? নইলে সুবোধ মিত্তির দোজবরে হলেও বয়স চল্লিশের উপর নয়, অবস্থাও ভালো, আর তিন-চারশো টাকার মধ্যে রাজীও হয়েছিল; কিন্তু সে তো ছেড়ে দিতে হলো।'

'সুবলগঞ্জের এ-সম্বন্ধটিও তো দোজবরে, তবে এত খাঁই কচ্চে কেন?'

'খাঁই করে কেন? আমাদের উদ্ধার করবে বলে। ছেলেপিলে সুদ্ধ দোজবরে পাত্রই কম টাকায় নিতে চায় না, তা ও-পাত্রটির আবার ছেলেপুলে নেই। আর

দোজবরে একবরে! সর্বস্ব খুইয়ে দেনা করে চারুকে তো প্রথমপক্ষ বি-এ পড়ছে ছেলে দেখে দিয়েছিলুম,— এখনও ওর বিয়ের চারশো টাকা বাকী! তা সবই তো মিছে হয়ে গেল! ওরকম কেবলমাত্র পাত্রটির উপর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে না দিয়ে চারুটাকে যদি একটু মোটা ভাতকাপড়ের সংস্থান দেখে দিতুম, তাহলে আমি অবর্তমানে হয়তো ওকে পথে দাঁড়াতে হতো না! আর, বাঙালীর ঘরে দোজবরে একবরে সবই সমান, তবে বয়সে একেবারে বুড়ো না হলেই হলো।'

'তা সুবলগঞ্জের এরা কত চাইছে?'

'বললে গহনা বরাভরণে ও নগদে সবসুদ্ধু আটশোর কমে কিছুতেই হবে না।'

'তুমি কত বলেছিলে?'

'আমি পাঁচশো পর্যন্ত উঠেছিলুম, তারপর জবাব দিয়ে চলে আসতে হলো। নারায়ণ—নারায়ণ!'

'হ্যাঁ গা, পাঁচশোই বা পাবে কোথায়? চারুর বিয়েরই চারশো টাকা দেনা আজও শোধ হয়নি! আমার গায়ে আর একটুকরো সোনা নেই, খানকতক তক্তাপোষ, কাঠের সিন্ধুক আর খান দুচ্চার কাঁসা পেতলের বাসন ছাড়া ঘরেও তো এমন কিছু নেই যে বিক্রি বা বন্ধক দিয়ে টাকার উপায় করবে! বিম্‌লির বিয়েতে আমার গায়ের সমস্ত গয়না আর ঘরে যা কিছু দামী জিনিস ছিল সবই গেছে, চারুর বিয়েতে জমিজমা যেখানে যেটুকু ছিল সব ধুয়ে-মুছে শেষ হয়ে উল্টে আবার দেনার দায়ে মাথা বিক্রি হয়ে রয়েছে। তা তুমি কি সত্যিই ভিটে বেচে ক্ষ্যান্তর বে দেবে?'

'উপায় কি আর? ভিটে তো এদিকেও যাবে, ওদিকেও যাবে। বৃন্দাবন সার — দেনা কি তুমি শোধ হবে ভেবেচো? ভিটে বিক্রি ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। দেনা শোধ করে বাকি টাকাটায় ক্ষ্যান্তর যদি একটা উপায় হয়ে যায়, ভাবচি।'

'হ্যাগা, আমরা সত্যিই কি তবে গাছতলায়—'

'উপায় নেই মনো, উপায় নেই। সবই প্রারব্ধ কর্মের ফল! দামোদর যদি গাছতলায় দাঁড়ানোই বিধান করে রেখে থাকেন তা এড়াবার সাধ্য কি!'

'বাবা, আপনি হাতমুখ ধুয়ে ফেলুন, আমি ভাত বাড়ছি। মা, তুমি এই ভর সন্ধেবেলা দাওয়ায় বেরিয়ে এসেছ কেন? হিম লেগে জ্বর বাড়বে যে! তুমি কি আজ নিজেই বেরিয়ে আসতে পেরেচো?'

'নিজেই আস্তে আস্তে উঠে এসেছি একটু, দিনরাত্রি ঘরের ভিতর আর ভালো লাগে না।'

'তোমার গা দেখি মা? নাঃ, কপালটা তো বেশ গরম রয়েচে। চলো, ঘরে শুইয়ে দিইগে। তোমার সন্ধেবেলাকার ওষুধের অনুপান কি? পানের রস আর মধু, না মা?'

'কি জানি মা; চারুই সারাদিন ওষুধ খাওয়ায়, কোন্ সময়ের কি অনুপান সেই-ই জানে। চারু কোথায় গেল?'

'মেজদি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে বড্ড কাহিল-পানা হয়ে পড়েছে! রগের কাছটা একটু কেটে গেছে ইঁট লেগে। তবুও সে উঠে আসছিল তোমায় ওষুধ খাওয়াতে আর বাবাকে ভাত দিতে! আমি আসতে দিইনি তাকে, জোর করে ও-ঘরে শুইয়ে রেখে এলুম।'

'কে রে ক্ষ্যান্ত?— কে পড়ে গেছে? চারু নাকি? অ্যাঁ?'

'না, না বাবা, কিছু হয়নি; আপনি খাবেন চলুন।'

'চারু কোথায়? কোথায় তোর মেজদি, হ্যাঁরে?'

'বাগানে নারকোল পাতা কুড়িয়ে এক বোঝা পাতা আর কাঠের টুকরো নিয়ে আসছিল, হঠাৎ কেমন মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে ভির্মি লাগাব মতো হয়ে গেছল! এখন বেশ ভালো আছে, আমি তাকে উঠতে মানা করে ও-ঘরে শুইয়ে রেখে এসেছি।'

'কেন এমন হলো বল্ তো? ওগো, এইমাত্র আমি তোমায় বলছিলুম না, চারুটা বড্ড কাহিল-চেহারা হয়ে পড়েছে।'

'সারাদিন এই হাড়ভাঙা খাটুনি, আগুন-তাতে দু'বেলা রান্না, ভাবনা-চিন্তা, ভালো করে নায় না, খায় না— এই সতেরো বছর তো মোটে বয়স,—এত পেষণ কি করে সয় ঐ কচি-হাড়ে? আমি বড় কঠিন প্রাণ মা, তাই এইসব চোখের উপর দেখে সহ্য করচি। ক্ষ্যান্ত, চারুকে আমার কাছে এ-ঘরে এনে শুইয়ে দে, আমার প্রাণটা বড় অস্থির হচ্চে।'

'হ্যাঁরে, ইঁট লেগে কপাল কেটে গেছে বলছিলি না? ঘরে যদি দুধ থাকে তো একটু গরম করে খাইয়ে দিলে হতো।'

'আজ যে মেজদির একাদশী, বাবা,—'

'ওহ্— ভগবান্! আহা হা, তাই জন্যেই মাথা ঘুরে পড়ে গেছে— দামোদর, আর কত পরীক্ষা করবে!'

'ক্ষ্যান্ত, তুই আজকে রাঁধলিনে কেন মা? আজ ওকে খাটতে দিলি কেন?'

'না মা, রান্না তো আজ আমিই করেছি। মেজদি আমাকে রাঁধতে দিতে চায়নি, আমি জোর করে তাকে হেঁসেল থেকে তুলে দিয়েছি। রান্না তো ভারী, সিম-বেগুনের ঝোল, আর ওলভাতে-ভাত। মেজদিকে আজ সংসারের কাজও কিছু করতে দিইনি, ও আজ রান্নাঘরের পাশের দিকে ঐ শাকের চারা আর লঙ্কা বেগুন গাছগুলোতে সারাদিন রোদ্দুরে বসে কাটারি দিয়ে বাখারি কেটে কেটে বেড়া দিয়েছে। আমি বললুম, মেজদি, আজ থাক, তা বললে আজ আমার কাজকর্ম নেই, ছাগল গরুতে গাছগুলো খেয়ে গেলে, ভাত খাওয়ার মুশকিল হবে। তারপর কাকীমাদের সাত সের মুগ এনে কাল বালি-খোলায় ভেজে রেখেছিল, আজ সেগুলো যাঁতায় ভেঙে ডাল তৈরি করে পাঠিয়ে দিলে। কাকিমা একসের ডাল আমাদের দিয়েচেন। সারাদিন অত খাটুনির পর আবার সন্ধেবেলা নারকোল পাতা আনতে গিয়েছিল, মাথা ঘুরে পড়বে না তো কি?'

'ক্ষ্যান্ত, আমার খিদে নেই, তোরা খেয়েদেয়ে নিস্, ও-ঘরে আমার বিছানাটা ঝেড়ে দে একটু, শুয়ে পড়ব।'

'বাবা, আপনি সারাদিন কিছু খাননি,—দুটি ভাত মুখে দেবেন চলুন। বাবা—'

'না মা, আমার সত্যিসত্যিই আর খিদে নেই। আমি শুতে চললুম, আমায় আর ডাকাডাকি করে বিরক্ত করিসনে।'

'মা, ওমা, বাবা যে না খেয়ে শুতে চলে গেলেন! কি করবো? সারাদিন একটি ডাব খেয়ে আছেন, আর কিছু খাওয়া হয়নি যে—'

'আমি আর কি করবো মা—আমি— আর যে পারিনে, দেহে মনে আমার আর এক বিন্দুও সামর্থ্য নেই— আমায় তোমরা আর জড়িও না— হা ঠাকুর,— আরও কত মনে আছে তোমার।'

৪

'মেজদি, ঘুমুলে?'

'উহুঁ—'

'মেজদি—'

'কি বলছিস?'

'না মেজদি, কিছু না।'

'এত রাত অবধি জেগে কি ভাবছিস?'

'কিছু না।'

'আচ্ছা ঘুমো।'

'মেজদি, মণ্টুকে দেয়ালের দিকে সরিয়ে দিয়ে তুমি মাঝখানটায় মণ্টুর জায়গায় এসে শোও না ভাই আমার কাছে—'

'যাচ্ছি। এই মণ্টু—দেখি, দেখি,— এই যে— তোমায় ভালো করে শুইয়ে দিচ্ছি ভাই। কৈ ক্ষ্যান্ত, আয়, কাছে আয়। কি হয়েছে রে? সমস্ত দিন আজ তোর মুখখানা অত ম্লান শুকনো শুকনো দেখচি কেন?'

'কৈ, কিছু না তো মেজদি!'

'ক্ষ্যান্ত, মাথাটায় কি জটাই পাকিয়ে রেখেছিস্। মাগো, চুলগুলো যেন পাখির বাসা হয়ে রয়েছে। ক'দিন আমি চিরুনি নিয়ে ডাকিনি কিনা,— দেখি কাল মাথাটা সাবান দিয়ে না হয় ঘষে দোবো। হ্যাঁরে, মাথাটা মেজদির বুকের ভেতর গুঁজে দিয়েও মেজদির কাছে শোওয়ার সাধ কি তোর মিটছে না? তাই অমন করে জড়াচ্ছিস কচি ছেলের মতো? মণ্টু জেগে থাকলে এতক্ষণে মারামারি বাধাতো।'

'মেজদি, তোমাকে এমনি করে জড়িয়ে তোমার বুকের ভেতর মাথা গুঁজে শুলে আমার যেন আর কোনও কিছু ভয় থাকে না ভাই!'

'কেন, ভয় কিসের ক্ষ্যান্ত?

'কিছু না মেজদি, আমার মাঝে মাঝে কেমন যেন আপনা আপনি বিনা কারণে ভয় করে— কি জানি।'

'আজ ক'দিন ধরেই তোকে কেমন মনমরা দেখচি, আমার কাছে লুকুচ্ছিস কেন ভাই? কি হয়েছে বল না? আমার কাছে লজ্জা কি দিদি, বাবার কষ্ট দেখে বড্ড দুঃখ হয়েচে, না?— হ্যাঁ, আমিও তা বুঝতে পেরেছি। মনে কষ্ট করে ভেবে কি করবি ভাই? তোর আর অপরাধ কি— অপরাধ আমাদের সমাজের, আর অদৃষ্টের।'

'মেজদি, আমার জন্যেই বাবার এই যন্ত্রণা—আমি যদি না থাকতুম, তাহলে—'

'না রে না, তুই না থাকলেও কষ্ট কিছু কম হতো না। সে বরং তোর চেয়ে আমিই বেশি দুর্দশা ও কষ্টের কারণ বাবা-মার। যাক্, ওসব কথা ভেবে মন-খারাপ করে কিছু লাভ নেই। ঘুমো,—আমি তোর মাথা চুলকে দিই।'

* * *

'ও ভাই মেজদি?'

'অ্যাঁ— কিছু বলছিস কি ক্ষ্যান্ত?'

'না না, কিছু নয়, তুমি ঘুমোও।'

'ক্ষ্যান্ত, তোরা এখনও কথা কইছিস? অনেক রাত হয়েছে, ঘুমো, অসুখ করবে যে! দুটো বেজে গেল।'

'এই যে ঘুমুই মা—'

৫

'অন্নদাপিসি, বাবা তো প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন, এই মাসের মধ্যেই যাতে বিয়েটা হয়ে যায়। কি করবেন, ওঁর কি বিয়ে দেবার অনিচ্ছা? পাত্র না পেলে কি করবেন?'

'পাত্র পাবেন নাই-বা কেন? এই তো রামদাদা সেদিন একটা সম্বন্ধ এনে দিয়ে গেলেন।'

'রামখুড়ো, মিত্তিরমশাই, গোবিন্দজ্যাঠা ওঁরা যা সম্বন্ধ এনে দিচ্ছেন, আর যেখানে দিতে বলছেন, সেখানে জেনেশুনে বৈধব্যদশা ও সধবার বৈধব্যের বাড়া অবস্থায় কি করে মেয়েকে সঁপে দেন? ওঁরা যে দুটি সম্বন্ধ এনে দিয়ে অঘ্রানের মধ্যেই বিয়ে দেবার হুকুম দিয়ে গেছেন, সে দুটি পাত্রের হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে, গলায় পাথর বেঁধে নদীর জলে ডুবিয়ে মারা ভালো।'

'তা বাছা, তোমাকে তো তোমার বাপ এত নেকাপড়া শিখিয়ে এত টাকাকড়ি খরচা করে, জমিজমা সর্বস্ব বন্দক দিয়ে পেরথম্ পক্ষ জোয়ান ছেলের সঙ্গে বে দিলেন, তবে বছর না ঘুরতে তোমারই বা অমন দশা হলো কেন? বিধবা-সধবা থাকা মেয়েমানুষের কপালের নেকন। যার কপালে "রাঁড় ডণ্ড" নেকা আছে স্বয়ম্

বিধেতাপুরুষ এসেও তা খণ্ডোন্ কত্তে পারে না! আর যার এয়োতের জোর থাকে, সে বুড়ো তেজবোরে স্বোয়ামিকে নিয়ে ঘরকন্না করে ছেলেপুলে রেখে হাসতে হাসতে ড্যাংডেঙিয়ে চলে যায়! ঐ যে শরৎ ঘোষালদের মেজো পুঁটি,— তার তো পিতেমোর বইসী তেজবরে বরেতে বিয়ে হয়েছিল! এখনও কেমন শাঁখা সিঁদুর নিয়ে সুখে সচ্-চন্দে ঘরকন্না কচ্চে। পেটে সন্তান হয়নি, ভালোই হয়েছে, সতীন পো সতীন ঝি জামাই বৌ নাতিনাতনি কিছুরই তো অভাব নেই। সেদিন মেজো নাতনির বিয়ে হলো কত ঘটা করে। তোমার সঙ্গে একসঙ্গেই তো বিয়ে হয়েছিল! তুমিই বা এমন জোয়ান-স্বোয়ামিকে হারিয়ে বসে রইলে কেন, আর সেইই বা বুড়ো-স্বোয়ামি নিয়েও হাতের নোয়া নিয়ে রয়েছে কেন? সবই অদেষ্টো মা, অদেষ্টো! মেজো পুঁটির ফি বছর পুজোয় এক-একখানা ভারী গয়না হয়! কৈ পেরথম্ পক্ষের মাগেদের তো অমন সুখ সচ্চিন্দি দেখলুম না কারো?— উমেশ মল্লিকের সঙ্গে বে হলে ক্ষেন্তি খেয়েপরে দু'খানা ভালো গয়না গায়ে দিয়ে "জন্ম সাখোক" কত্তে পেতো। এখানে তো এই হাড়ির হাল আছে! আর বয়সও তো পেবায় তিন চার ছেলের মা হবার মতো হয়ে গেছে! অতবড় মেয়ে আর কোন ভরসায় তোমার বাপ এখনও বুকের উপর রেখেছে? রংটুকুও যদি তোমার মতো হতো,— তাও বা কথা ছিল, রং ময়লা, টাকা দেবার ক্ষ্যামতা নেই, "জজ ম্যাজিষ্টব" জামাই খুঁজচেন কিসেব জোরে?— গাঁয়ের লোক ভালোরই চেষ্টা করেছে, তাকে যদি তোমরা "মন্দ" বলে ধরে নেও, সে আলাদা। কিন্তু এও বলে দিয়ে যাচ্চি মা,— এই "অগ্‌ঘানে" বে দিতে না পারলে মিত্তিরমশায়ের মায়ের ছেরাদ্দ'য় তোমাদের ডাক পড়বে না ঠিক হয়ে গেচে। এই চুপি চুপি শুনিয়ে গেনু।'

'পিসি,— বাবা যে ক্ষ্যান্তব বিয়ের জন্যে পাগলের মতো হয়ে বেড়াচ্ছেন, তাঁর কষ্ট কে বুঝবে?'

'কি জানি বাছা, তোমার বাপের কেমনতর পাগল হওয়া? যারা নিতে চাইচে, সেখানে মেয়ে দিচ্ছেন না, অথচ আবার পাগলও হচ্চেন! পাড়ায় যে এদিকে কথা রটেচে, তার খপর রাখো? আমরা যে নিন্দেয় কান পাততে পারচিনে! ভালো কথা বলতে এলে তোমরা "মন্দ" বোঝো,— আমাদের দরকার কি মা,— ভাই ভাজের মোতন দেখি, নিন্দে শুনে সেইজন্যে "পেরাণডা" করকর্ করে— এইই যা। তা এখন চনু মা,আজ আবার নক্ষ্মীজনাদ্দনের ওখানে "পেল্লাদ-চরিত্তির" কথা হবে। আমাদের নিবেরণ কথকমশাই এসেচেন কি না?— হ্যাঁ চারু, আঁচলে ধরে আছিস ওগুলো কি র‍্যা? কাঁচালঙ্কা নাকি? বাড়ির গাছে ফলেচে বুঝি—তা ঝাল আছে তো? আমাদের পোড়া গাছদুটোয় লঙ্কা ফলে খুব, কিন্তু সে মিথ্যে, একরত্তি ঝাল নেইকো তেতে। আমি আবার একটু ঝাল নইলে গেরাস মুখে তুলতে পারিনে। —দিবি? তা দে না মা, গোটাকতক বেন্নুনে দিয়ে দেখব অখন, কেমনতর ঝাল? ছুঁসনে বাছা, আলগোছে এই আঁচলের কোণেই ঢেলে দে। চললুম তাহলে। তোমার

মা তো তোমার খুড়ীর বাড়ি গেছেন, তাঁকে বোলো আমি এসেছিনু।— থাক থাক — পেন্নাম কত্তে হবে না, পায়ে হাত দিও না, এইমাত্তর কাপড় কেচে আসচি। কি আর আশীর্বাদ করবো মা, ওপরটা তো এমন সোন্দর, কপালের ভেতরটা যে এমন ছাইভরা কে জানত? এমন জগোদ্ধাত্তিরীর মোতোন রূপ সবই "ছাইভস্ম" হয়ে গেল — হরি বলো— হরি বলো— তাই তো বলি গো, সবাইয়ের কাছে— চারুর আমাদের কোনখানটায় বিধবার নোক্ষণ আছে? হাতপায়ের গড়নটি যেন লক্ষ্মী ঠাকরুণ! অদৃষ্টটা এমন মন্দ কেন হলো?— গতরটা সুখে থাক্ মা— ধম্মে মতি হোক্— হরি বলো, — হরি বলো।'

* * *

'মেজদি— মেজদি— শীগগির এসো, সর্বনাশ হয়েছে—'

'কি হয়েছে বে মণ্টু? অমন করছিস কেন?'

'ছোড়দি গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়ে গেছে, মেজদি গো—'

'অ্যাঃ! সে কি রে! কোথায় সে? কোথায় সে?'

'মণিদা তাকে তুলে এনে আমাদের বাইরের ঘরে শুইয়েছেন— উঁ হু হু হু -- মেজদি গো, ছোড়দিকে মোটে চেনা যাচ্চে না। কি ভয়ানক দেখতে হয়ে গেছে — উহ! কি হবে ভাই?'

'চুপ চুপ, ব্যস্ত হ'সনে — চল শীগ্‌গির— মাকে শীগগির ডেকে নিয়ে আয়—'

* * *

'ক্ষ্যান্ত, ক্ষ্যান্ত, মা আমার, —কেন এমন কাজ করলি মা। ও হো হো— হো—'

'চুপ করুন মাসিমা, শান্ত হোন। অস্থির হয়ে কোনো লাভ নেই।'

'ওহ্! কি সর্বনাশ হলো মণিদা! কেন এমন বুদ্ধি হলো ওর। আজ ক'দিন ধরেই সারারাত ও ঘুমোয় না, ছটফট করে, সারাদিন শুকনো মুখে আমার আড়ালে আড়ালে সরে থাকে, আমি বুঝেও বুঝতে পারিনি, হায় হায় হায়! মণিদা, তুমি কি করে ধরে ফেললে? ও কি বাঁচবে? কিন্তু এমন ভীষণ অবস্থা হয়ে বেঁচে থেকে যে আরও যন্ত্রণার জীবন হবে।'

'সে এখন পরের কথা, এখন তো ওকে বাঁচাতে চেষ্টা করতে হবে; ভয় নেই, মারা যাবে না, কারণ বেশি গভীরভাবে পোড়েনি। আর বুক ও পেট খুব সামান্য পুড়েছে, চামড়া মাত্র। আমি মেশোমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসছিলুম! মেসোমশাইকে ক্ষ্যান্তর জন্য একটি পাত্রের কথা বলে যাবো এই ভেবে আসছি, — বাগানের ও-পাশটা থেকে দেখতে পেলুম ক্ষ্যান্ত কি যেন একটা জিনিস কাপড়েব ভিতর লুকিয়ে নিয়ে মজুমদারদের ঐ ভাঙা বাড়িটার পশ্চিমদিকেব ঘরটায় ঢুকে, ভিতর থেকে দোর বন্ধ করে দিলে। ভর্ সন্ধেবেলাতে ক্ষ্যান্তকে ঐ বাড়িতে অমনভাবে ঢুকে দোর বন্ধ করতে দেখে একটু আশ্চর্য হলুম, ওখানে যাবো কিনা ভাবচি, এমন সময়ে, একটু পরেই দরজার ফাঁক দিয়ে আগুনের আলো দেখতে পেয়ে,

—দৌড়ে গিয়ে দরজায় দু-তিনটে সজোরে লাথি মারলুম। পচা দরজা ভেঙে পড়ে গেল তখুনি— ভিতরে দেখি ছেঁড়া মশারির মতো কি একটা জিনিস গায়ে জড়িয়ে সেইটের উপর কেরোসিন ঢেলে জ্বালিয়ে দিয়েছে, দাউ দাউ করে জ্বলচে, আর সারা ঘরময় ছুটোছুটি করছে।'

'উহ্— উহুহু-হু মাগো— কেন এমন তোর বুদ্ধি হলো? আমার অনাদরের জন্যেই কি অভিমানে প্রাণ খোয়াতে গিয়েছিলি মা? ওরে, আমি মা হয়ে তোর মৃত্যুকামনা করেছি বলেই কি সেই দুঃখে তুই প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছিস? ও মা ক্ষ্যান্ত, — আমার বুকের ভেতরটার দিকে চেয়ে দেখ একবার— আমি তোকে ভালোবাসি কিনা—'

'মণিদা, অজ্ঞান হয়েও এত কাতরাচ্ছে কেন ভাই? ওকি অজ্ঞানেও যন্ত্রণা টের পাচ্ছে?'

'যন্ত্রণা টের পাচ্ছে বৈকি, এ কি কম যন্ত্রণা! বুঝতে পারলে কেউ এমন কাজ করে!'

'মণিদা, ক্ষ্যান্ত যদি বাঁচে, তবে আমাদের এ-গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়াই ভালো। আর, তা করতেই হবে।'

'পরের কথা পরে হবে চারু, ঘরে বোধ হয় অয়েল ক্লথ নেই? দেখি, খানকতক খুব কচি কলাপাতা এনে বিছানাটায় বিছিয়ে দিতে হবে। মেশোমশাই এখনো অফিস থেকে ফিরলেন না যে। সন্ধের ট্রেনের সময় তো হয়ে গেছে।'

'বাবা সন্ধের ট্রেনেই প্রায় আসেন, না হলে ন'টার ট্রেনে আসেন। উঃ, মণিদা, কিরকম ছটফট করছে ও! ঐ যে ডাক্তারবাবুর সঙ্গেই বাবা আসছেন।'

৬

'গাঙ্গুলিমশাই, কায়েতপাড়ার খবর শুনেচেন?'

'হ্যাঁ। বিভূতি সেনেদের তো?'

'ছি ছি ছি, কি কেলেঙ্কারি, কি কেলেঙ্কারি! অতবড় বুড়োধাড়ি মেয়ে ঘরে পুষে রাখলে এসব ব্যাপার যে ঘটবেই এ তো জানা কথা। এইজন্যেই হিন্দুশাস্ত্রে গৌরীদানের বিধি লিখে গেছেন! বাবা, ঋষিরা কি কম বিবেচনা করেই বলে গেছেন, — স্ত্রীলোক বাল্যকালটি বাপমায়ের শাসনে থাকবে, তারপর যৌবনে পদার্পণ করলেই স্বামীর শাসনের মধ্যে থাকবে, শেষে বৃদ্ধকালে বৈধব্যাবস্থায় পুত্রের অধীনে কাল কাটাবে— এর ব্যতিক্রম ঘটালেই ব্যভিচার আসবে। তা আজকাল মেয়েরা যৌবন পেরিয়েও বাপের ঘরে থুমড়ো হয়ে বসে থাকছে, এসব কুকীর্তি ঘটবে না কেন বলুন?'

'আমাদের "দ্বোয়ারি" বলছিল, সে প্রায়ই নাকি সন্ধের দিকে ক্ষেন্তি ছুঁড়িকে মজুন্দোরদের ঐ পোড়ো বাড়িটায় যেতে দেখেছে! আর চক্কোবত্তীদের ঐ মণে ছোঁড়াটা

তো প্রতিদিনই সন্ধেবেলা বিভূতি সেনের বাড়ি গিয়ে, ঐ সোমত্ত সোমত্ত ছুঁড়িদুটোর সঙ্গে ইয়ারকি দেয়।'

'আচ্ছা, মণেটা তো শুনি রামকেষ্ট মিশনে নাম লিখিয়ে সন্ন্যেসী হয়েছে, বে-থা করলে না, আজকাল আবার মোটা চট-কাপড় পরে গাঁধি-মহাত্মার দলেও ঢুকেছে, — এত পাশটাশও তো করলে— শিক্ষিত ধার্মিক ছেলে বলে এত সুনাম— তা ওর এ কিরকম ব্যাভার, কি প্রবৃত্তি?'

'আরে, দেশ উদ্ধার করে আর পরোপকার করে বেড়ালেই বা, তা বলে কি আর রামকেষ্টর পুঁথিতে লেখা আছে— পরের বাড়ির সোমত্ত বিধবা আর আইবুড়ো মেয়ের সঙ্গে ইয়ারকি দিও না? বিয়েই করতে বারণ শুধু।'

'সত্যি সত্যি, বিভূতি সেনেদের বাড়ি মণের এত আত্মীয়তা কিসের? ওরা কায়েত, মণে বামুন। ছি, ছি, ছি, কি ব্যভিচার!'

'আরে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, যে যেমন কর্ম করবে তার ফলও ঠিক তেমনিই হবে! এখন ভুগুন বিভূতি সেন! গোবর্ধন ঘোষ— চারখানা গাঁ জুড়ে যার অতবড় তেজারতির কারবার— তাকে জামাই পছন্দ হলো না?'

'কি হয়েছে চাটুয্যেমশাই? কাব কথা বলছেন?'

'ঐ তোমাদের "পবিত্রানন্দ" না "শুদ্ধানন্দ" যার নাম হয়েছে, হরিশ চক্কোত্তীর ব্যাটা মণি চক্কোত্তী।'

'কে মণিদা? হ্যাঁ, তা কি হয়েছে তাঁর?'

'বিভূতি সেনের মেয়ে পুড়ে ম'লো, মণির এত মাথাব্যথা কেন? তুই না ব্রহ্মচারী, তোর তো স্ত্রীলোকের মুখদর্শন নিষেধ, বিশেষত যুবতী স্ত্রীলোক। এই বুঝি সব ব্রহ্মচর্য হচ্চে?'

'গাঙ্গুলিমশাই, কি বলছেন আপনি? অমন কথা মুখেও আনবেন না। মণিদার মতো ছেলে আমাদের গাঁয়ে আর একটিও দেখাতে পারেন? ওরকম দেব-চরিত্রের মানুষ কটা হয়? ছি ছি ছি, ওঁর সম্বন্ধেও এমন কথা আপনারা উচ্চারণ করতে পারছেন? অতবড় স্বার্থত্যাগী, পরোপকারী, উদারচিত্ত ছেলে আমাদের জেলার মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, রেখে দাও "স্বার্থত্যাগী", "পরোপকারী"! ভিক্ষে করে পরের টাকায় অমন সবাই মড়কে, দুর্ভিক্ষে, বানে, পরোপকার করতে ছুটতে পারে! হুজুগে মেতে রোজগারপাতি না করে অমন সকলেই স্বার্থত্যাগ করতে পারে।'

'দেখুন গাঙ্গুলিমশাই, মুখ সামলে কথা কইবেন। সবাইকে নিজেদের চরিত্রের লোক ভাববেন না। মণিদা দেশের কাজে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি, নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন। অতবড় পি. আর. এস. পাশ করেও গ্রামের চাষাভুষোদের সঙ্গে খালি পায়ে খালি গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গ্রামের উন্নতির জন্যে নিজের সব উৎসর্গ করেছেন। আর চরিত্র? ওঁর মতো লোকের পায়ের ধুলোও যেদিন এই গাঁয়ের

লোকেরা পাবে, সেদিন গাঁ উদ্ধার হয়ে যাবে জানবেন।'

* * *

'দেখলে হে চাটুয্যে! যত্‌নেটার কি চোট্‌পাট্‌ আস্পদ্দার বুলি! ফাজিল ছোকরা, কলকাতা থেকে কটা পাশ করে এসে ভারী বক্তৃতা করতে শিখেছেন। আমাদের বোঝাতে আসে কিনা, কে মহাপুরুষ স্বার্থত্যাগী? ব্যাটা আমার সমাজসংস্কারক দেশ-উদ্ধারকারী! ওর বাপ আজও এখনও আমাদের এক ধমকে ভড়কে যায়! ছুঁচো ব্যাটা!'

'জানেন গাঙ্গুলিমশাই, বে-থা না করে পরের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে যদি ইয়ারকি মেরে সাধু সেজে বেড়ানো যায়, তা মন্দ কি? যাই হোক, ক্ষেন্তিটা মরেনি তাহলে, বেঁচে উঠেছে?'

'আরে, তুমি তাও বুঝি শোননি? বাঁচবে না তো কি? ঐ মণেই তো বাঁচিয়েছে। — আচ্ছা, সন্ধের আঁধারে মজুন্দোরদের পোড়ো বাড়িটায় ক্ষেন্তিই না হয় "আত্মহত্যে" করতে গিয়েছিল বুঝলুম,— কিন্তু সেই ভর সন্ধেবেলা মণেটা সেখানে কি দরকারে গিয়েছিল? ও যে তাকে বাঁচিয়ে আনলে, ও কি করে এ-পাড়া থেকে টের পেলে ক্ষেন্তি ও-পাড়ায় ঐ পোড়ো বাড়িতে দোর বন্ধ করে পুড়ে মরছে?'

'ঘোর কলি! ঘোর কলি! পাপ চারপো পূর্ণ হয়ে এসেছে এবার। "যেমন কর্ম তেমনি ফল"— বীভৎস চেহারা হয়েচে। কি আর বলব! সমস্ত চুল ভুরুটরু পুড়ে গেছে। গায়েব চামড়া সব পুড়ে কুঁচকে গেছে, মাঝে মাঝে লাল দগ্‌দগে ঘা,— সে অতি বিকট দৃশ্য!'

'যাই হোক, সমাজের বুকের উপর এতবড় একটা ব্যভিচার চলবে, এটা তো ঘটতে দেওয়া ঠিক নয়! এর একটা প্রতিবিধান তো কবা উচিত!'

'নিশ্চয়ই, তাতে কি সন্দেহ আছে?'

'চলুন, কায়েতপাড়ায় মিত্তিরমশাইদের ওখানে একবার যাওয়া যাক। দেখি, এতবড় কাণ্ডটার তাঁরা কি মীমাংসা করেছেন।'

'হ্যাঁ, চলুন না, চলুন না, যাওয়া যাক। আরে ছ্যাঃ, দেখলেন তো, অমন ছুঁড়িতে যমেরও অরুচি।'

গল্পলহরী, মাঘ ১৩৩২

সাগর-স্বপ্ন

১

স্বর্গদ্বারের শেষ সীমানায় যেখানে শুধু কাঁটাবন আর জঙ্গল ভিন্ন লোকালয় দেখা যায় না, সমুদ্রতীরের উঁচু পাড়ে মস্তবড় একটা বালির ঢিবির উপরে পা ঝুলিয়ে বসে নিবিষ্টচিত্তে নীলরংয়ের তুলিটা কাগজের উপর বুলিয়ে বুলিয়ে ছবি আঁকছিল মুকুর। অনেকক্ষণ ঘাড় হেঁট করে তুলি টানবার পর মাঝে মাঝে এক একবার বিভল স্বপ্ন-উদাস দৃষ্টি মেলে সামনের অন্তহীন সুনীল জলরাশির উপরে মৃদু-ঘনায়মান সাগর-সন্ধ্যার গভীর শান্ত-স্নিগ্ধ শ্রীর দিকে চেয়ে দেখছিল।

স্বচ্ছ ঘন-নীল আকাশ ও সান্ধ্য সমুদ্র মুকুরের সাগরেরই মতো অতল-গভীর কালো আঁখিতারা দু'টির উপর নীলের মায়াঞ্জন বুলিয়ে সাগরতলের অজানা কোন্ নীল পুরীর সুনীল-স্বপ্ন ফুটিয়ে তুলছিল!

দক্ষিণ হাতখানি তার ঢেউয়েরই মতো তালে তালে বিসর্পিত গতিতে যন্ত্রচালিতবৎ আপনাআপনি তুলি টেনে যাচ্ছিল ক্রমাগত, নীলের পরে নীলেরই বৈচিত্র্য ফুটিয়ে,—অনন্ত সাগরের সাথে উদার-ব্যোমের ঘন আলিঙ্গনের অসীম প্রতিকৃতিখানি সীমার মাঝে ছোট্ট করে সুপরিস্ফুট ক'রবার প্রয়াসে। চিত্রখানির বিষয় হ'চ্ছে 'সাগরের বক্ষে সন্ধ্যা'।

গম্ভীর কল্লোল-ধ্বনি-পূর্ণ নির্জ্জন সাগর-তটের স্তব্ধতা হঠাৎ ভঙ্গ হয়ে উঠল —কতকগুলি তরুণী-কণ্ঠের কলহাস্য-চীৎকারে। চকিত মুকুর তুলি টানা বন্ধ করে মুখ তুলে চাইলে। নীচের সমুদ্র-বেলায় সিক্ত বালুর উপর দিয়ে সান্ধ্য-ভ্রমণ-বেশে সুসজ্জিতা কতকগুলি নারী দলবদ্ধা হয়ে এগিয়ে আসছেন! সমুদ্রের চপল ঢেউগুলি বারে বারে তাঁদের পদ-চুম্বন করেই ক্ষান্ত হয়নি, যথেষ্ট সাবধানতা ও দ্রুতপদে পলায়ন সত্ত্বেও তারা দুরন্ত শিশুর মতো ঝাঁপিয়ে ছুটে এসে খলখলহাস্যে তাঁদের পেটিকোটের লেস্ ও শাড়ীর প্রান্ত ভিজিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে! সমবেত যুবতী ও তরুণী-কণ্ঠের কলহাস্য-চীৎকারে জনহীন সাগরতট তাই হঠাৎ মুখরিত হয়ে উঠেচে।

মুকুর চেয়ে দেখল, তাদের দলের মধ্যে একটি কিশোর বালক ও একটি ফ্রক-পরা দশ-এগার বৎসর বয়সের বালিকা ছাড়া বাকী কয়জনই যুবতী এবং বিবাহিতা। কেবল দু'টিমাত্র তরুণী সেই দলে আছেন, উভয়ই অনবগুণ্ঠনা কুমারী-বেশধারিণী।

ঊর্দ্ধে দৃষ্টি না পড়ায় উঁচুপাড়ে ঢিবির উপর চিত্রাঙ্কনরত মুকুরকে এতক্ষণ তাঁরা দেখতে পাননি। এবার তার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় সকলেই একটু সম্বৃতা হয়ে কোমল কণ্ঠের উচ্চ হাস্য-পরিহাস সহসা সংযত করে মৃদুগুঞ্জনে গল্প ক'রতে ক'রতে এবং কেউ কেউ বা অঙ্কন-রত মুকুরের প্রতি কৌতূহল দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে-করতে যেদিক দিয়ে আস্ছিলেন আবার সেই মুখেই ফিরে চলে গেলেন।

মুকুর এতক্ষণ নতমুখে নিজের কাজ করে যাচ্ছিল। একবার মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ায় এবার তুলির টানে সুনীল জলের উপর সান্ধ্যমেঘ ও গোধূলির রাঙা আলো-ছায়ার রঙ্ ঠিক যেন মনের মত হয়ে ফুট্‌ছিল না! বিরক্ত মুকুর ভ্রূকুঞ্চিত করে তুলিকা নামিয়ে রাখ্‌ল। সামনের দিকে চেয়ে দেখ্‌ল যুবতী ও তরুণীর দল অনেক দূরে এগিয়ে গেছেন, তবে তাঁদের গতিভঙ্গী ও পরিচ্ছদ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। এতগুলি মেয়ের মধ্যে একটি মেয়ের গতিভঙ্গী মুকুরের আর্টিস্ট-দৃষ্টি আকর্ষণ ক'র্‌ল। সকলের চেয়ে তার বেশভূষা ও চলন-ভঙ্গিমায় যেন বেশ একটু স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল।

সবারই পরিধানে মূল্যবান রঙিন ঢাকাই কিম্বা টাঙ্গাইল শাড়ী। ঢাকাই শাড়ীর ঝিলমিলে বুটী ও টাঙ্গাইল শাড়ীর চওড়া জরীপাড়ের ঝক্‌ঝকে বাহারে সমুদ্রতীর আলো করে চলেছেন তাঁরা। শুধু সবার শেষে হাঁটছে যে মেয়েটি, তার পরিধানে ফিকে চাঁপাফুল রংয়ের খদ্দর শাড়ী। লাল ও গোলাপী ফুল এবং সবুজ-লতাপাতা-আঁকা বিচিত্র সুন্দর পাড়ের আঁচলখানি ঘুরিয়ে পিঠের উপর সুবিন্যস্তভাবে ফেলে কাঁধের উপবের অঞ্চলাংশ কুঞ্চিত করে ব্লাউজের সঙ্গে একটা দেশী আইভরী ব্রোচ্ দিয়ে 'পিন্' করা। সেইরকমেরই চাঁপারং খদ্দরের লতা-পুষ্প-খচিত পাড়, ঢিলা হাফ-হাতা ব্লাউজটি কনুইয়ের উপর পর্য্যন্ত ঢেকে রয়েছে। সন্ধ্যার ম্লান আলোতেও দেখা যাচ্ছিল তার ছোট্ট পা দু'খানির তলা আল্‌তা দিয়ে লাল টুক্‌টুকে রঙানো।

কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা অন্ধকার সাগর-বক্ষে কোন্ এক অজানা ভীতিময় কালো পর্দা টেনে আনছিল ধীরে ধীরে, আর আকাশে তারাফুলগুলি বড় বড় হীরার মত ধ্বক্ ধ্বক্ করে একটির পর একটি জ্বলে উঠ্‌ছিল। দূর চক্রবাল-সীমায় যেখানে সাগর ও গগন গভীর আলিঙ্গনে মিলিত হয়েছে, সেইদিককার তারাগুলিকে মনে হচ্ছিল তারা যেন সমুদ্রের জলের ভিতর থেকে একটি একটি করে ফুটে উঠ্‌চে! —যেন সাগরবক্ষে দিগ্‌বধূরা অসংখ্য প্রদীপ ভাসিয়ে দিচ্চে। অন্ধকার সাগর-বুকে উঁচু উঁচু ঢেউগুলি ঘূর্ণায়মান হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার সময়ে তাদের সাদা ফেণাগুলি ফস্‌ফরাস মেখে দীপ্ত হ'য়ে এগিয়ে আস্‌তে লাগল।

মুকুর তার পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে তটভূমিতে নেমে সামনের দিকে এগিয়ে চল্‌ল বাড়ীর উদ্দেশে। অন্ধকারে ঢেউগুলি মাঝে মাঝে তার নগ্ন পা' দু'খানি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরে যেতে লাগল, আর তার পাদস্পর্শে সিক্ত বালিগুলি অন্ধকারে জোনাকীর মত ঝিক্‌মিক্ করে আলোকিত হয়ে ফুলঝুরির মত হেসে উঠ্‌তে লাগল।

২

'দুয়ো—সমুদ্র, দু—য়ো সমুদ্র, হেরে গেলে—ছি—ছি—', 'রীতি, তুই ভারী বীর হয়েছিস না? সরে আয় বল্‌চি শীগ্‌গির—'

'ইঃ, ভয় কিসের? এই দেখ না, ঐ যে বড় ঢেউটা আস্‌চে, ওর উপরে আমি লাফিয়ে উঠ্‌বো।'

'রীতি, অত এগিয়ে যাস্‌নে বল্‌চি! সরে আয় শীগ্‌গির, —আর তোকে কোনও-দিন সমুদ্রে নাইতে—', কথা সমাপ্ত হ'তে না হ'তেই ভীষণ গর্জ্জনে প্রকাণ্ড ঢেউ এসে সবাইকে বিপর্য্যস্ত ও ওলোট-পালট করে বালিতে ফেলে দিয়ে, এবং বিশেষভাবে রীতিকেই একটু বেশী জব্দ করে ফিরে চলে গেল। তখন ফর্‌সা মোটাসোটা প্রৌঢ়া একটি নারী হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে কাপড় চোপড় ঠিক করতে করতে বকতে সুরু করলেন,—'একরত্তি মেয়ের ভারী মর্দ্দানি!! সমুদ্রকে "দুয়ো" বল্লে ত' সমুদ্র রেগে যাবেই,—এ' একেবারে ধরা কথা! রীতি বেজায় বাড়াবাড়ি সুরু করেছে, কাল থেকে ওর সমুদ্রে চান্ করা বন্ধ কোরবো। ওকে বাড়ীতে রেখে আসবো—।' একাদশবর্ষীয়া রীতি তখন 'নেকার-বোকারে'র উপর রঙীন পেঁয়াজী ডুরে শাড়ীখানি মালকোছা মারতে মারতে ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করবার জন্য আবার তাল ঠুকে প্রস্তুত হ'চ্ছিল। বহুক্ষণ ঢেউয়ের সাথে লড়াইয়ের পর রীতি একটা বড় ঢেউয়ের অতর্কিত ধাক্কা সামলাতে না পেরে উল্টে পড়ে গেল। একটি সুগৌরবর্ণা সুন্দর-মুখশ্রী তরুণী রীতির কাছে দাঁড়িয়েই স্নান করছিল, সে রীতির বিপদ দেখে হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়ে রীতিকে অট্টহাস্যপরায়ণ তরঙ্গ-দস্যুর কবল থেকে উদ্ধার করে, ঢেউয়ের ধাক্কা সামলাতে সামলাতে টলে টলে সামনের দিকে এগিয়ে তীরে উঠে এল। রীতি ও তরুণী উভয়েরই মুখে তখন খুব হাসির ঘটা।

সেই শুভ্রবর্ণা বিপুলদেহা প্রৌঢ়াটি তখন জল থেকে বালুসৈকতে উঠে দাঁড়িয়েচেন। তীব্রস্বরে ভর্ৎসনা করতে করতে তিনি বারম্বার জানাতে লাগলেন, রীতির মতো 'দস্যি মেয়ে' ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয় নেই এবং তা' জেনেও ঐ 'অবাধ্য দস্যি মেয়ে'কে সমুদ্র-স্নানে নিয়ে আসাই তাঁর প্রধান ভুল হয়েছে।

স্তবকে স্তবকে ঘন-কুঞ্চিত রেশমের মতো চুলে ডান পাশে সিঁথা কাটা সুগঠিত-নাসা, টানা-চোখ, পাত্‌লা ওষ্ঠাধর, সুচিত্রিত-ভ্রূ, অতিসুন্দর মুখশ্রী, ২৪।২৫ বৎসর বয়সের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি যুবক মালকোছা ধুতির উপর কোমরে চামড়ার 'বেল্ট' আঁটতে আঁটতে জলে নেমে আসছিল। রীতি বলে উঠল—'দিদি, ঐ লোকটিকে কাল সন্ধ্যাবেলা সেই স্বর্গদ্বারের ওদিকে বালির ঢিবির উপর দেখেছিলাম।' তরুণী রীতির কথায় মুখ ফিরিয়ে একবার সেইদিকে দৃষ্টিপাত করে তারপর আবার অন্যদিকে ফিরে রীতির সিক্ত চুলগুলি শুষ্ক গামছা দিয়ে মুছে, ঝেড়ে, সোজা করে দিতে মন দিল। রীতিদের স্নান সমাপ্ত হয়েছিল। অদূরে বালুর উপর দিয়ে আর একদল সাগর-স্নানার্থিনী নেমে আসছিলেন। তার মধ্য থেকে ফর্সা রং, ছিপ্‌ছিপে গড়ন, বড় বড় উজ্জ্বল চোখ একটি সুন্দরী তরুণী রৌদ্র-রক্তিম হাস্যোদ্ভাসিত মুখে দ্রুতপদে এগিয়ে এসে বল্ল—'এই যে নীলিকা, তোরা আজ যে আমাদের আগেই এসে পড়েছিস! আমাদের আজ একটু লেট্ হয়ে গেছে ভাই! তোদের স্নান হয়ে গেছে যে দেখ্‌চি।

না—ভাই তা' হবে না, আমি একলা নাইবো না, তুমি আর একবার আমার সঙ্গে নাইবে চলো।' বলতে বলতে নীলিকার সুগোল নরম মণিবন্ধটিতে একটু জোরে চাপ দিয়ে টান্‌ল। সিক্ত-বসনা নীলিকা সখীর দৃঢ়মুষ্টি থেকে হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়ে ভিজা চুলের রাশি বাঁ হাতে জড়িয়ে কবরী বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে ব'ললে,—'না ভাই, আজ আর যাবো না। বেশী বেলা হলে বালি তেতে ওঠে, হাঁটতে কষ্ট হয়। আর, আমি আবার জলে নামলে রীতিও আবার নাইতে চাইবে; কত বকাবকি করে জ্যাঠাইমা ওকে জল থেকে তুলেছেন। তা'ছাড়া তুহিনের টন্‌সিল ফুলে জ্বর হয়েচে, সে একা আছে, আমাদের শীগ্‌গির ফিরতে বলে দিয়েচে।' 'আচ্ছা, আমি তোমায় বেশী দেরী করাব না—ঠিক পনেরো মিনিট মাত্র। আর, রীতিকে আমি বল্লেই জলে নামবে না। রীতু, লক্ষ্মী ভাই, তোমার কাপড় ছাড়া মাথা মোছা হয়ে গেছে, আর জলে নেমো না—কেমন? রীতু ভা—রী বাধ্য মেয়ে, ও একবার স্নান করেছে, আর জলে নামবে না। নীলাকে নিয়ে আমি একটু নেয়ে আসি ভাই, কেমন? নীলা তো এখনও ভিজে কাপড়েই আছে!'

খোসামোদের বিনয়পূর্ণ সুমিষ্ট সুরে কথাগুলি উচ্চাবিত হওয়ায়, রীতি লুব্ধ দৃষ্টিতে ঢেউগুলির দিকে চাহিতে চাহিতে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত মাথা হেলিয়ে সম্মতি প্রকাশ ক'রল—যদিও তার মন তখন ঐ সম্মুখের স্নানরতা বালক বালিকা ও পুরুষ নারীর দলে ভিড়ে আর একবার দুরন্ত তরঙ্গগুলির সহিত ঝাঁপাঝাঁপি করে আসবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল!

নীলিকা আবার বল্‌ল—'সীতা, কাজ নেই ভাই, আজ তুই তোর বৌদিদের সঙ্গেই নেয়ে আয়। আবার জলে নামলে জ্যাঠাইমা কি ভাববেন?'

'রোস্ না, আমি জ্যাঠাইমারও "পারমিশান্" নিচ্চি', বলে অসিতা দ্রুতপদে এগিয়ে আর একটু উঁচুতে উঠে, জ্যাঠাইমা যেখানে তাঁর কোন পরিচিতা সধবা আত্মীয়া নারীর সহিত তদ্‌গতচিত্তে আলাপে মগ্না ছিলেন সেখানে এগিয়ে এসে ডাক্‌ল—'জ্যাঠাইমা—', মোটা মোটা সোনার তাগা পরা স্থূলশুভ্র বাহুদ্বয় আন্দোলিত করে জ্যাঠাইমা তখন বহুদিন অদর্শনের পর আত্মীয়া সখীটির অতর্কিত সাক্ষাৎ পেয়ে অত্যন্ত খুশী মনে সাংসারিক আলাপে নিবিষ্টা ছিলেন। ডাক শুনে পিছন ফিরে চেয়ে বললেন—'কে রে? অসিতা? তোদের যে আজ এত দেরী হোল আস্‌তে?'

অসিতা বল্‌ল, 'আজ সকালে আমরা চক্রতীর্থে সেজবৌদির মামার বাড়ী বেড়াতে গেছলুম, তাই আসতে বেলা হয়ে গেল।' তারপর গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে মিনতির সুরে বল্‌ল—'জ্যাঠাইমা! নীলিকা এখনও গা' মোছেনি, ভিজে-কাপড়েই আছে, সে আর-একটু আমার সঙ্গে নাইবে কি?'

জ্যাঠাইমা নীচে সিক্ত বালুবেলায় নীলিকা ও রীতি যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেইদিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন—'তা' যাক্ না! রীতু গা' মুছেচে, ও যেন আবার জলে না নামে।' তারপর বাম-হস্তস্থিত সিক্ত গামছাখানি, রৌদ্রতাপ নিবারণের জন্য

মাথার উপর তুলে দিয়ে আবার সেই আত্মীয়াটির সহিত আলাপে নিমগ্না হ'লেন।

অসিতা বালিকা-সুলভ চঞ্চল-পদে হরিণীর মত লঘু লম্ফে উঁচু বালির পাড় হতে সাগর-সৈকতে নেমে এসে নীলিকার পিঠে এক ধাক্কা দিল। 'চল চল্ শীগ্‌গির, একেবারে "হাইয়েস্ট অথরিটি"র "পারমিশান্" নিয়ে এসেছি।'

নীলিকা মৃদু হেসে তার সঙ্গে এগিয়ে চল্‌ল। রীতি এতক্ষণ চুপ করে ছিল; কিন্তু আর থাকতে না পেরে অনুনয়ের স্বরে চেঁচিয়ে বলে উঠল—'দিদিভাই! আমি একটুখানি জলে নামবো কি? শুধু একটিবার মাত্র পা' দু'টি ভিজিয়ে আসব।'

নীলিকা জলের ভিতর হতে ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—'না ভাই, তোমার ফ্রক্ ভিজে যাবে, তুমি নেমো না।'

রীতি উদ্দাম ইচ্ছায় বাধা পেয়ে নিরাশা, ক্রোধ, ক্ষোভ ও অভিমানে মুখখানা অত্যন্ত ভারী ও অন্ধকার করে বালুর উপর ধপ্ করে বসে পড়ল।

অসিতা ও নীলিকা হাত ধরাধরি করে ঢেউয়ের বেগ ঠেলতে ঠেলতে প্রথম 'ব্রেকার'টা পার হয়ে দ্বিতীয়টার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। অসিতা আরও অগ্রসর হবার ইচ্ছা করায় নীলিকা বল্‌ল—'না ভাই, আজ আর আমি খুব বেশী এগোব না—কারণ, আজ আমার "আনডার-অয়ার্" নেই, শুধু সেমিজ পরে এসেচি। তাড়াতাড়িতে ভুল হয়ে গেছে।'

অসিতা বল্‌ল 'আমি দাদার হাফ্-প্যান্টে কাজ চালিয়ে নিই। নিজের "ইজের বডি" বা "পা-জামা"গুলো পরে সমুদ্রে এখন আর নাইতে আসিনে—কারণ সেগুলো টুইলের লংক্লথের কিম্বা খদ্দরেব তৈরি, কাজেই বড্ড শীগ্‌গির ছিঁড়ে যায়। জিনের হাফ্প্যান্টগুলো ছেঁড়ে না।'

নীলিকা হেসে বল্‌ল, 'সাদা কাপড়ের কিম্বা পাতলা কাপড়ের "আনডার ক্লথে" সমুদ্র-স্নান পোষায় না; বিশেষতঃ মেয়েমানুষের। শীঘ্র ছিঁড়ে যায়, আর ভিজে গেলে পরা না-পরা সমান হয়ে দাঁড়ায়। আমি কাকাবাবুর পুরানো মোটা খাকি "ইউনিফর্ম্ম" কেটে নিজের গায়ের মাপে একটা নিজের মনের মত "সুইমিং-কস্টিউম্" তৈরী করে নিয়েচি।'

অসিতা সম্মুখের একটা প্রকাণ্ড ঢেউ পিঠ নীচু করে মাথার উপর চলে যেতে দিয়ে, তার টাল সামলে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল—'কি রকম কাটের করেছিস্? সাঁতার কাটবার "অর্ডিনারী" যে কালো "সুইমিং কস্টিউম্"গুলো দেখা যায়, ঐরকমই তো?'

নীলিকা ঢেউয়ের সঙ্গে উঠা-নামা করতে করতে মাঝে মাঝে থেমে থেমে বল্‌ল,—'না, ও'রকম ঢিলে করিনি, বেজায় বালি ঢোকে। অনেকটা "ইজের বডি"র ধরণের কাট্ হয়েছে—অথচ খুব টাইট্ করে করেচি। খাকির একটিমাত্র দোষ —ভিজলে একটু ভারী হয়। তা টাইট্ করে ফিট্ কর্‌লে তা' টেরই পাওয়া যায় না, অথচ অনেক সুবিধা, হাজার ধ্বস্তা-ধ্বস্তিতে ছেঁড়ে না, ভিজ্‌লেও কিছু ক্ষতি হয় না।'

অসিতা মুচকে হেসে একটু ঠাট্টার সুরে বল্‌ল,—'খাকি কিন্তু খাঁটী খদ্দর নয়, খাঁটী বিলিতী।'

নীলিকা হেসে উত্তর দিল,—'সাধ করে নতুন খাকি কিনে যদি "সুইমিং কস্টিউম্‌" করতুম, তা'হলে নিশ্চয়ই অন্যায় হোত বৈকি!'

গল্প করতে করতে অসাবধানে একটা বড় ঢেউয়ে খানিকটা লবণাক্ত জল দু'জনের নাকে মুখে প্রবেশ করায়, হাঁপাতে হাঁপাতে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে সখীদ্বয়া তীরের দিকে সরে এল। অসিতার বৌদিরা সেখানে হাঁটুভোর জলে সবাই মিলে জড়াজড়ি করে সর্ব্বাঙ্গে বালি মেখে কলরব করে স্নান কবছিলেন, বেশী এগোবার সাহস তাঁদের নেই। সেখানকার আছড়ে-পড়া ঢেউগুলির বালু-আলোড়নের মধ্যে স্নান অসিতাদের মনঃপূত হ'ল না, আবার এগিয়ে দু'টো 'ব্রেকার' পার হয়ে বড় ঢেউয়ের মাঝে বুক-পর্য্যন্ত জলে গিয়ে দাঁড়াল তারা। কিন্তু বাতাস জোর হওয়ায় ও জোয়ারের মুখ বলে ঢেউয়ের বেগ ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগল, এবং তারা অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়তে লাগল। নীলিকা বেশীক্ষণ সেই তরঙ্গযুদ্ধে দাঁড়াতে না পেরে 'রণে ভঙ্গ' দিয়ে পিছিয়ে এল। অসিতা হাসতে হাসতে বল্‌ল—'নীলা, তোর প্রাণের ভয় বড় বেশী।'

নীলিকা তার প্রতিবাদ করে স্নান-পরিচ্ছদের অভাবের উল্লেখ করায় অসিতা বল্‌ল—'ওটা তোমার একটা বাজে "প্রিটেক্‌স্ট"।

নীলিকা ও অসিতা যেখানে স্নান ক'রছিল, তার বামপাশে হাত বারো-তেরো দূরে মুকুর আরও একটা বড় ব্রেকারের ওপারে স্নান ক'রছিল। তার সঙ্গে একজন তেলেগু-নুলিয়া যুবক একখণ্ড লম্বা 'পাল-দুআ' কাঠ নিয়ে, তার সাহায্যে মুকুরকে ঢেউয়ের ওপরে গা ভাসান্‌ বা সমুদ্র-তরঙ্গে সাঁতার শেখাচ্ছিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউগুলির শীর্ষে মুকুরের কুঞ্চিত-কেশ কালো মাথাটি ও নুলিয়ার তালপাতার চোঙা-টুপী-পরা মাথাটি ছাড়া আর কোনও অবয়বই দেখা যাচ্ছিল না।

অসিতারা সকলে সমুদ্র থেকে উঠে সিক্ত মসৃণ বালুবেলার উপরে দাঁড়িয়ে গায়ের জল-সিক্ত শাড়ী সেমিজগুলি সুবিন্যস্ত করে নিতে নিতে বাড়ী ফিরবার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগল।

এমন সময়ে তারা শুনল, মুকুর সিক্তবস্ত্রে ব্যস্তভাবে সমস্ত নুলিয়াদের ডেকে বল্‌ছে, তার হাত থেকে একটি বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরী সমুদ্রে পড়ে গেছে, উদ্ধার করে দিতে পারলে তাদের পুরস্কৃত ক'রবে। অসিতা তার ভিজা চুলের রাশি রাঙা গামছাখানায় বেশ করে জড়িয়ে, দু'হাত দিয়ে চাপ দিয়ে নিংড়াতে নিংড়াতে নীলিকার সামনে এগিয়ে এসে কৌতুকপূর্ণ মুখে নিম্নস্বরে বলল,—'নীলা, ঐ ছেলেটি ভাই, নিশ্চয়ই একজন কবি। আমি ওকে না চিনে এবং ওর পরিচয় না জেনেও, কেবলমাত্র চোখে দেখে বলে দিচ্ছি।' নীলিকা অঙ্গুরী-অন্বেষণ-তৎপর চিন্তিত-মুখ মুকুরের প্রতি একবার চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উত্তর দিল,—'কি রকম? আজকাল জ্যোতিষশাস্ত্রটাও

তোমার করতলগত হয়েছে নাকি?'

অসিতা হাসতে হাসতে উত্তর দিল,—'আরে, কাল ওকে সেই স্বর্গদ্বারের শেষ সীমানায় ঝাউগাছ আর কাঁটা বনগুলোর ওপাশে উঁচু বালির ঢিবিটার উপর বসে থাকতে দেখেছিলি মনে নেই? আমি তখনই ওকে "মার্ক" করেছিলাম। ও' তখন কিছু-যেন লিখছিল বলে মনে হ'ল। অতো নির্জ্জনে সমুদ্রতীরে বসে কেউ চাল-ডাল নুন-তেলের জমা খরচ বা আফিসের হিসাবপত্র লেখে না, কবিতা লেখাই সম্ভব। আর চেহারা, চুল, বেশ-ভূষা সবই কাব্যিকে তা'র, দেখ্‌তে পাস্‌নি? জনহীন সাগর-তীরে সন্ধ্যা আঁধারে উদাসনেত্রে পেন্সিল হাতে বসে থাকা থেকে সমুদ্রে এই আংটি হারানোটি পর্য্যন্ত যেটুকু ওর পরিচয় পেলুম—ও' কবি না হয়ে যায় না।'

নীলিকা হেসে বলল, 'আমি কিন্তু বলতে পারি, ও "পেন্টার্‌"। অবশ্য কবিও হ'তে পারে, কারণ "পেন্টার্‌" হ'লে সে যে পোয়েট্রী লিখতে পারে না তা'তো নয়। তবে ও যে একজন চিত্রকর, তাতে কোনও সন্দেহ নেই—কারণ, কাল আমি স্পষ্টই দেকেচি, ও'র হাতে নীল রঙেব তুলি ছিল। তুমি কাল যেটাকে "লিখ্‌ছিল" বলে সন্দেহ করেচো, সেটা ও' লিখছিল না, আঁকছিল।' অসিতা পরাজিতা হয়ে একটা দুষ্টামীর হাসি হেসে বল্‌ল,—'এক্স্‌কিউজ্‌ মি, আমি ভুলে গেছলুম যে তুমি একটি "সেন্টিমেন্টাল্‌-গার্ল্‌",—বঙ্গ-সাহিত্যের একজন রাইজিং-পোয়েটেস্‌; সুতরাং আমার চেয়ে ও-সব খবর তোমারই বেশী জানা স্বাভাবিক।'

নীলিকার গণ্ড হতে কর্ণমূল পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠল। সে অসিতার কথার প্রতিবাদ করে কি উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঈষৎ চমকিতভাবে বাম হাতের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে উঠ্‌ল—'সীতা! আমার একগাছি চুড়ি কি হ'ল ভাই?' শুভ্র নিটোল প্রকোষ্ঠ বেষ্টন করে কাঁচের লাল টুকটুকে ডালিমদানা চুড়ির কোলে তিনগাছি করে ছ'গাছি ফ্যান্সী "মিক্স্‌-প্যাটার্ণে"'র সোনার চুড়ি ঝক্‌মক ক'রছিল, বামহাতের একগাছি সোনার চুড়ি অন্তর্হিত হয়েছে। অসিতার মুখ হতে কৌতুক-রেখা নিমেষে অন্তর্হিত হ'ল। বিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে উদ্বেগপূর্ণ স্বরে সে বলে উঠল— 'সে কি রে?'

তারপর সকলে মিলে 'খোঁজ খোঁজ' রব পড়ে গেল! কিন্তু সকলেই বুঝলেন, অন্বেষণ বৃথা! উন্মত্ত তরঙ্গের অশ্রান্ত আনাগোনার আলোড়নে কোথায় বালির তলে তার সমাধি হয়ে গেছে এতক্ষণে, তার পুনরুদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত।

অদূরে মুকুর অসিতাদের সকলের উদ্বিগ্ন-মুখে অন্বেষণ করা দেখে বুঝতে পেরেছিল, দুরন্ত সিন্ধু এদেরও কোনও দ্রব্য অপহরণ করেছে। কিন্তু সেটা কি, এবং কার, তা বুঝতে পারলে না। কিছুক্ষণ নুলিয়াদের নিয়ে অঙ্গুরীয়কের ব্যর্থ-অন্বেষণের পর সে উঠে চলে গেল। উঁচু পাড়ের উপর দিয়ে যেতে যেতে চেয়ে দেখল, স্থূলকায়া জ্যাঠাইমা ও অসিতাদের বাড়ীর সকলে দলবদ্ধা হয়ে তখনও সমুদ্রতীরে অন্বেষণ বা জটলা ক'রছেন। নীলিকার সুন্দর মুখখানি ঈষৎ ম্লান ও দুঃখিত।

৩

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে 'ফ্ল্যাগ্-স্টাফে'র কাছ্-বরাবর নীলিকাদের সঙ্গে আজও মুকুরের দেখা হ'ল। মুকুর আজও লক্ষ্য ক'র্‌ল, তাদের দলে বিপুলকায়া হাস্য-প্রসন্নাধরা জ্যাঠাইমা হ'তে তরুণী যুবতী বালিকা সকলকারই পরিধানে বিলাতী-সূতার মূল্যবান রেশম কিম্বা জরীর বিচিত্র পাড়যুক্ত শাড়ী, শুধু নীলিকার পরিধানে ঘন চকোলেট্ রঙের পাড় সাদা ধব্‌ধবে খদ্দরশাড়ী ও নীল্‌চে-রংয়ের মোটা খদ্দরের একটি প্লেন্ জ্যাকেট। হাতে তার ক্রুশে জাল্‌তি-বোনা কালো রেশমের একটি লম্বা থলি। থলিটির গায়ে গোলাপী রেশম দিয়ে ইংরাজীতে বড় বড় অক্ষরে নাম লেখা —'কুমারী নীলিকা রায়'। তারা সমুদ্রতীরে হাঁটতে হাঁটতে সুন্দর সুচিত্রিত রঙীন ঝিনুক, জমাট-বাঁধা সমুদ্র-ফেণা, বিচিত্র শামুক, শঙ্খ—যা' কিছু সংগ্রহ ক'রছিল, সেই থলিটির মধ্যে পূর্ণ করছিল।

নীলিকারা মুকুরের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অগ্রসর হয়ে স্বর্গদ্বার ছাড়িয়ে 'বালুখণ্ডে'ব দিকে বেড়াতে চলে গেল। মুকুর কিছুক্ষণ ফ্ল্যাগ্-স্টাফের সামনে বেঞ্চের উপর বসে ঘন-নীল সমুদ্র-বক্ষে গোধূলির রক্তিমাভার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে দু'জন ভ্রমণক্লান্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে সেই বেঞ্চে মুকুরের পার্শ্বে উপবিষ্ট হওয়ায়, মুকুর আস্তে আস্তে উঠে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'ল। সাগরবক্ষোর্দ্ধে দূর-দিক্-চক্রবালগামী সিন্ধু-কপোতগুলির পানে অলস দৃষ্টি মেলে অন্যমনস্ক মনে কি-জানি-কি ভাবতে ভাবতে সিক্ত বালুবেলার উপর নগ্ন পায়ে অলস-মন্থর গতিতে চলেছিল সে। ঢেউগুলি মাঝে মাঝে তার পা দু'খানি চুম্বন করে ফিরে ফিরে যাচ্ছিল।

স্বর্গদ্বারের শ্মশান-ঘাটের কাছাকাছি এসে পিছনে পরিচিত কণ্ঠের গল্প ও হাস্য-গুঞ্জন-ধ্বনিতে মুকুর সচকিতে ফিরে চেয়ে দেখল, নীলিকারা প্রায় হাত চার-পাঁচ তফাতে আস্‌চে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা মাত্র নীলিকার বড় বড় সুন্দর কালো চোখদু'টির শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টিব সহিত তার দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য সম্মিলিত হ'ল। অপ্রতিভ মুকুর তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সমুদ্রেব দিকে একটু বেশী সরে গিয়ে দ্রুতপদে হাঁটতে আরম্ভ ক'রল। অন্যমনস্কতায় সমুদ্রেব দিকে একটু সরে আসায়, একটি বড় ঢেউ মুকুরের কাপড় ভিজিয়ে হাঁটুর উপর দিয়ে চলে গেল। অসিতারা কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে সেইদিকে একবার নেত্রপাত করে সহাস্যমুখে পরস্পরে বোধ হয় তার বুদ্ধিরই তারিফ্ কর্ত্তে কর্ত্তে চলে গেল। বিপন্ন মুকুর সিক্ত বসন-প্রান্ত হতে বালি ও জল ঝাড়তে ঝাড়তে একবার মুখ তুলে সামনের দিকে চেয়ে দেখ্‌ল, নীলিকা সবার পিছনে ছোট ভাইটির হাত ধরে চল্‌তে চল্‌তে তারই দিকে চেয়ে আছে। তারও মুখে যেন ঈষৎ কৌতুকের ক্ষীণ-আভাস রয়েছে, কিন্তু দৃষ্টিতে যেন সহানুভূতির করুণ ছায়াও ফুটে উঠেছে বলে মনে হ'ল। মুকুরের সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হ'বা মাত্র সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে আর একটু দ্রুতপদে এগিয়ে সঙ্গিনীদের

অতিক্রম করে তাদের অগ্রবর্ত্তিনী হ'ল। মুকুর তার অলক্তক-রঞ্জিত ছোট ছোট পা' দুখানি ক্ষিপ্রতালে ফেলার সুন্দর ভঙ্গীটির দিকে অল্পক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে থাকবার পর আবার ধীরপদে অগ্রসর হ'ল।

স্বর্গদ্বারের শেষের দিকে মুকুর তার এক বন্ধুর বাড়ীতে অতিথি হয়ে উঠেছিল। তাদের বাড়ী হতে আরও অনেকটা দূরে একখানি সাদা ধবধবে বাড়ী খালি পড়ে ছিল। বাড়ীখানির সামনে ট্যাব্‌লেটে সোনালী অক্ষরে 'প্রবাল-পুরী' নাম লেখা। একেবারে নির্জ্জন দিকটায় সমুদ্রতটের উপরেই আগোগোড়া মার্ব্বেল পাথরে গড়া এই সুন্দর বাড়ীখানি মুকুরের শিল্পী-প্রাণকে বড় বিমুগ্ধ করে তুলতো। সে প্রায়ই এই নব-নির্ম্মিত চাবিবন্ধ বাড়ীখানির সামনের দিকের ছোট্ট মার্ব্বেল দালান কিম্বা সিঁড়ির উপরে বসে বসে বহুরূপী সিন্ধুর রূপ-বৈচিত্র্য উপভোগ ক'রত।

কিন্তু ছাদের উপরে পায়চারী ক'রতে ক'রতে মুকুর যেদিন দেখ্‌ল 'প্রবাল-পুরী'র বাতায়নগুলি আলোকোদ্ভাসিত, একটুখানি বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থেকে বুঝ্‌ল, বাড়ীর অধিকারী কিম্বা ভাড়াটে এসে থাকবে! সেদিন থেকে সে আর সে-বাড়ীর দালান মাড়াতো না।

একদিন ভোরে বেড়াতে বেরিয়ে মুকুর দেখ্‌ল, 'প্রবাল-পুরী'র সামনে সমুদ্র-তটে রীতি ও তার কিশোর ভাইটি ঝিনুক কুড়াচ্ছে; এবং নীলিকা সবুজরংয়ের ঘাসের চটি পায়ে 'প্রবাল-পুরী'র সামনের সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ ধাপের উপর দাঁড়িয়ে একখানা রাঙা মোটা চিরুণী দিয়ে ঘন কেশরাশির বিশৃঙ্খলামোচন ক'রছে। উদ্দাম সমুদ্র-হাওয়া তার হাতের বেষ্টন হ'তে চুলগুলিকে এলোমেলোভাবে উড়িয়ে দিয়ে তাকে বিপন্না করে তুল্‌চে। নবনীত-শুভ্র সুগঠিত বাহুখানির উত্থান-পতন ও নিবিড় মেঘের মতো ঘন-কুন্তল-রাশির মধ্যে লাল টুকটুকে চিরুণীখানির ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভাব ও অন্তর্ধান-লীলায়, ভোরের অরুণালোকে 'প্রবাল-পুরীর' মর্ম্মর-সোপানে দণ্ডায়মানা তরুণী নীলিকাকে মুকুরের চোখে মূর্ত্তিমতী ঊষষীরই মতো ঠেক্‌ল।

নীলিকা সমস্ত চুলগুলি আঁচড়ে সুসংযত করে ডান হাতে কেশ-গুচ্ছ ধরে, বাম হাত দিয়ে মাথার মাঝখানটায় ঈষৎ চাপ দিয়ে একটু ফাঁপিয়ে ধরতেই, বাম-পাশ-ঘেঁসা অল্প-বাঁকা সিঁথা আপনিই সোজা দু'ভাগ হয়ে পড়ে গেল। তারপর, চুলের রাশি দু'হাত দিয়ে ধরে হাত জড়িয়ে একটি এলোচুলের কবরী বেঁধে নীলিকা ভাই-বোনদু'টিকে ডাকতে ডাকতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল—'তুহিন—তুহিন— রীতি—', নীলিকার বারম্বার উচ্চ-আহ্বান সমুদ্রের গর্জ্জন ও হাওয়ার হুহু-রবে কারুরই কানে পৌঁছাচ্ছিল না। নীলিকা এবার সিঁড়ির উপর চটিজোড়া খুলে রেখে চিরুণীখানি হাতে দোলাতে দোলাতে শুষ্ক বালির ভিতরে পা টেনে টেনে এগিয়ে চল্‌ল—ভাইবোন-দু'টির কাছে।

'চা ও খাবার খেয়ে বেড়াতে যেতে হবে, আর ঝিনুক কুড়াবার সময় নেই', জানিয়ে ভাই-বোনদু'টির পিঠে চিরুণীর দ্বারা আদর-সূচক মৃদু আঘাত করতে করতে

নীলিকা বাড়ীর দিকে ফিরে দাঁড়াতেই মুকুরের দিকে দৃষ্টি পড়ল।

ফিকে গেরুরা রংয়ের সিল্কের লম্বা ড্রেসিংগাউন্ ও সেই রংয়ের রেশমী-পাগড়ী পরে জরীর পশ্চিমা লপেটা পায়ে দিয়ে মুকুর প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিল। হাতে সুদৃশ্য একখানি ডায়েরী ও নোট্‌বুক-পেন্সিল।

নীলিকা প্রথম-দৃষ্টিপাতে গেরুয়া পাগড়ী ও গাউন-পরিহিত মুকুরকে চিনতে পারেনি; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তার ক্ষোদিত-প্রস্তর-পুত্তলির ন্যায় নিখুঁত-সুন্দর মুখশ্রী, স্বপ্নময় চাহনি ও অলস-মন্থর গমন-ভঙ্গীতে চিনতে পারল। একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে ক্ষণকাল সেইদিকে চেয়ে থেকে, তারপর মুখ ফিরিয়ে ভাই-বোনদু'টিকে নিয়ে বাড়ীর সিঁড়িতে গিয়ে উঠল্। জ্যাঠাইমার সাদা ধব্‌ধবে পিঠখানি তখন দ্বিতলের বাতায়ন-পথে দেখা যাচ্ছিল, তিনি ডাকছিলেন—'ও নীলা—রীতি,—খোকা—তোদের চা যে জুড়িয়ে গেল—'

মুকুর দ্রুতপদে সমুদ্রতীরে নেমে পড়ল। পূর্ব্বদিকে রক্তবর্ণ হয়ে সূর্য্যোদয়ের আভাস সূচনা করছিল। মুকুর স্বর্গদ্বারের পশ্চিমদিকে ধীরে আপন মনে ঘাড় হেঁট করে পের্নসিলটা ঠোঁটে চেপে ধরে অত্যন্ত অন্যমনস্ক মনে কত কি ভাবতে ভাবতে হেঁটে চলল। সমুদ্রের শুভ্র ফেণপুঞ্জ আনমনা মুকুরের জরীর জুতা চুম্বন করে পালিয়ে গেল। চিন্তাধ্যানমগ্ন মুকুর সচেতন হয়ে থম্‌কে দাঁড়াল। তার মনে পড়ে গেল সে আজ ভোরে 'স্বর্গদ্বার রোড়' দিয়ে শ্রীমন্দিরে যাবে ভেবেছিল। তাই পাকা রাস্তায় হাঁটতে হবে বলে জুতা পরেছিল ও শ্রীমন্দিরে যাবে বলে রেশমী-আলখাল্লা পাগড়ী পরেছিল। সমুদ্রতীরে ভিজা বালির উপরে সে কেন যে নেমে এল, কিছুই ঠিক কর্ত্তে পারল না। তারপর জুতাজোড়াটি খুলে হাতে নিয়ে পাড়ের উপর উঠে, একখানি রঙচঙে জেলেডিঙি নৌকার পাশে ছায়ায় গিয়ে বসে পড়ল। আজ আর তার মন্দিরে যাওয়া হ'ল না। সে নিজেই নিজের এই অদ্ভুত অন্যমনস্কতায় অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পড়েছিল; অনেক চিন্তা করেও সে ঐ ভুলের কারণ নির্ণয় কর্ত্তে সমর্থ হল না।

সূর্য্য তখন ঊর্দ্ধে উঠে পড়েছেন, চারিদিক সোনালী রৌদ্রে ভরে গেছে। মুকুর নোট্‌বুক ও ডায়েরীখানি সঙ্গে নিয়েছিল, শ্রীমন্দিরে গিয়ে দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি নোট্‌বুকে এবং ডায়েরীতে যথাযথভাবে লিখে নেবে বলে। অনেকক্ষণ নৌকার পাশে বসে থাকবার পর সে আস্তে আস্তে ডায়েরীখানির পাতা উল্টে পড়তে লাগল—

৯ই ফাল্গুন—আজ পাঁচদিন হ'ল 'সু'—র সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ এড়াতে না পেরে ও চিত্রাঙ্কনের কিছু খোরাক সংগ্রহের জন্য সাগর-তীরে এসেচি। পুরীধামে এসে শ্রীমন্দিরটি এবং সবচেয়ে সমুদ্রটিই একমাত্র দেখবার জিনিস বলে আমার মনে হচ্ছে। 'সু'—যে বাড়ীখানি ভাড়া নিয়েচে তার নাম 'রত্নাকর'। স্বর্গদ্বারের শ্মশান ছাড়িয়ে মাইলখানেক পশ্চিমে এই বাড়ী—সমুদ্র হতে প্রায় একশো গজ তফাতে। সমুদ্রের উম্মত্ত গর্জ্জনধ্বনি ও দুরন্ত হাওয়ার হুহু শব্দ সব সময়ই কানে লেগে আছে; আর সাগরের নব-ঘন নীলরূপ সর্ব্বদাই চোখের উপরে ভাস্‌চে। আমাদের বাড়ী লোকালয়

হ'তে তফাতে; আবার আমাদেরও বাড়ীর সিকি-মাইল তফাতে আর একখানি বাড়ী আছে। সে বাড়ীখানি অনেক দূরে হলেও এখান থেকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। সমুদ্র হ'তে প্রায় বিশ গজ্ তফাতে, বালির উপরে দুধ-ধব্‌ধবে শ্বেত-মার্ব্বেলের ছোট্ট দোতলা বাড়ীখানি। অ—নে—ক দূর থেকে দেখলে মনে হয়, সমুদ্রতটে ধূ ধূ বাদামী বালুরাশির উপর পড়ে আছে যেন একখানি শাদা বড় ঝিনুক বা শঙ্খ! বাড়ীর ছাদের সামনের দিক্‌টা মুসলমানী মিনারের গড়নের। অর্দ্ধ-চক্রাকারে সাজানো এগারোটি শুভ্র স্তম্ভের উপর গম্বুজাকার সোনালী-কলস উপুড় করে বসানো।

দিবসান্তে অস্তাচলশায়ী রক্তিম-রবির সোনালী-আলোর ধারা যখন তার সোনার আঁচলখানি মেলে দেয় সুনীল জলরাশির বুকের উপর, সাগরের পশ্চিম দিকটা নীল বেণারসী শাড়ীর ঢালা-জরীর সাঁচ্চা-আঁচলার মতো ঝক্‌মকিয়ে ওঠে, আর সমস্ত বুকখানির উপর তাব চিকমিক করে হেসে ওঠে সেই আঁচলার রঙের আভাস— 'প্রবাল-পুরী' নামটি তখন সত্যিই সার্থক হয়ে ওঠে। এগারোটি স্বর্ণাভ কলস সহ কারুকার্য্যময় দুগ্ধধবল সৌধশীর্ষ, অস্তাকাশের সেই সোনালী আলোর ধারায় স্নাত হয়ে সাগর-আয়নার নীল বুকে নিজের প্রতিচ্ছবিখানি দেখতে থাকে যখন, আর তার প্রতি কক্ষ ও দালানের মর্ম্মর-মেঝের উপরে যখন দু'বেলা উদয় ও অস্তের আলোক-আবীর খেলা হতে থাকে, তখন মনে হয় এই বাড়ীখানি রচনা ও এর নামকরণ করেছেন যিনি, তাঁকে দেখতে পেলে জিজ্ঞাসা করি একবার, কোন্ সে বরণীয় শিল্পীর কাছে দীক্ষিত হয়েছিলেন তিনি? কিসের আদর্শে গড়েছিলেন তাঁর এই স্বপ্ন-প্রাসাদ? —অনাদি অনন্ত সুরে কল্লোল-গীতি-পরায়ণ নৃত্যচঞ্চল, ফেণ-মুকুট তরঙ্গহার-সজ্জিত ঐ উন্মাদ সিন্ধুর সহিত পরামর্শ করে,—না, সাগর-কল্লোলের সাথে সমান তালে হাততালি দিয়ে অহর্নিশি হো-হো হাস্যে দিগন্ত মুখরিত করে সারাদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে, ঐ চির-অশান্ত সমুদ্র-বাতাসের সহিত পরামর্শ করে, না,—ঐ ধূ-ধূ, ধূ ধূ—অনন্ত গৈরিক-বসনা উদাসিনী বালুবেলার সহিত পরামর্শ করে?... কে এই সামঞ্জস্যকর সুন্দর নামটি বলে দিয়েছিল তাঁকে?...ঐ সাগর বক্ষোর্দ্ধে দূরদিগন্তাভিমুখী সিন্ধু-পারাবতেরা, না—অতল সমুদ্রের তলদেশে সাগর-রাজের সত্যকারের প্রবালপুরীর অধিবাসী ঐ নানাবর্ণ-রঞ্জিত সুচিত্রিত-দেহ সিন্ধু-সৈকতশায়ী অগণ্য বিচিত্র ঝিনুক-শিশুরা?...কারা?'

—হঠাৎ একটা করুণ আর্ত্ত-চীৎকার-শব্দে মুকুরের পড়া বন্ধ হয়ে গেল। খাতা থেকে মুখ তুলে সামনের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে, একুট শুভ্র নধর ছাগ-শিশুকে একটা পাটকিলে রংয়ের কুকুর সবেগে তাড়া করেছে। অসহায় ছাগ-শিশু—বালুকার উপর দিয়ে ভাল দৌড়াতে পারছে না, কুকুরটা বেগে ছুটে আসছে। মুকুর তাড়াতাড়ি উঠে কুকুরটাকে ভয় দেখিয়ে জোরে তাড়া ক'রল, সে লেজ গুটিয়ে কেঁউ কেঁউ করতে করতে ও বারে বারে পিছন ফিরে চাইতে চাইতে পলায়ন করল। আর ছাগ-শিশুটি সেইখানেই দাঁড়িয়ে ভীত-দৃষ্টিতে কম্পিত-কণ্ঠে কাতরভাবে ডাকতে

লাগল। মুকুর ছাগ-শিশুটিকে কোলে উঠিয়ে নিয়ে রাস্তার উপরে তুলে দিতে গেল।

৪

সমুদ্রতীরে নীলিকার সঙ্গে মুকুরের প্রায় প্রত্যহই দু'বেলা বেড়াবার সময়ে এবং এক-একদিন স্নানের সময়েও দেখা হয়। নীলিকার সঙ্গে তার সখী অসিতা ও অসিতার বৌদিদিরা প্রায় বেড়ান এবং স্নান করেন। আবার কোনও কোনওদিন 'জাঠাইমা' কিম্বা কেবলমাত্র রীতি ও তুহিন নীলিকার সঙ্গে থাকে। সমুদ্রবেলায় দাঁড়িয়ে প্রতিদিন সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত তারা একসঙ্গেই দেখে। কত শত বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দলবদ্ধ হয়ে কিম্বা একাকী, অথবা যুগল-দম্পতীতে সমুদ্র-তটে পাদচারণা করে, এই সুন্দর মনোরম দৃশ্য উপভোগ করে। তাদের মধ্যে মুকুর ও নীলিকারাও বহু লোকের মাঝে পরস্পরের অনেকখানি ব্যবধানে দাঁড়িয়ে এই সুমধুর দৃশ্য উপভোগ করে' বাড়ী ফির্‌ত। প্রত্যহ দেখা হওয়ায় তারা পরস্পরকে খুবই চিনে নিয়েছিল, যদিও সুদূর ব্যবধানেই উভয়ে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করে বাড়ী ফিরত। বহুদূর থেকে কেবলমাত্র চলনভঙ্গী বা অবয়বমাত্র দেখেই খুব সহজে এবং শীঘ্রই তারা পরস্পরে পরস্পরকে চিনে নিতে পারতো।

নীলিকার খদ্দরের বঙীন-শালখানি তিন-কোণা করে গায়ে জড়াবার ভঙ্গী ও বাম-প্রকোষ্ঠে রেশমী-দড়িতে দোদুল্যমান ঝিনুক কুড়াবার কালো রেশমী থলিটি হাজার লোকের মাঝখানে ও বহুদূর-ব্যবধানেও মুকুরের দৃষ্টিকে অতিক্রম করতে পারতো না। আর, মুকুরের কুঞ্চিত-কেশ মস্তক, সুদীর্ঘ সুঠাম চেহারা, নিখুঁত মুখখানি ও শিথিল মন্থর গমন-ভঙ্গী নীলিকা সুদূর হতেও এক মূহূর্ত্তে চিনে ফেলতে পারত।

শেষে এমনই অভ্যাস হয়ে গেল—যেদিন কোনও কারণে সহরের ভিতরে বা অন্য কোনও দিকে যদি তারা একজন বেড়াতে যেত, কিম্বা একবেলা বেড়াতে না বেরুত, তা হ'লে সে বেলা অপবজনের সমুদ্রতীরে ভ্রমণটাই কেমন যেন অসম্পূর্ণ রয়ে যেত। অজানা কি জানি কি কারণে মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে যেত, কিছু ভাল লাগত না সেদিন। অথচ দূর থেকে তারা পরস্পরকে দেখে নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় গম্ভীর মুখে দু'জনে দু'দিকে চলে যায়।

প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গেল। মাঝে মাঝে নীলিকার মনে হ'ত, অপরিচিত যুবককে প্রত্যহ দেখার নেশা এবং কোনও একদিন দেখা না হ'লে তার জন্য অহেতুকী উদ্বিগ্নতা ও মনের ভাবনা, এটা একান্ত অনুচিত হচ্ছে। তাই সে মাঝে দিনকতক সমুদ্রতীরে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ ক'র্‌ল। অফিস্‌-কোয়ার্টার, স্টেশনের দিকে বেড়াতে যেত। সম্পূর্ণ দু'দিন অদর্শনের পর তৃতীয় দিনে স্নানের সময়ে অদূরে স্নানরত মুকুরের সহিত নীলিকার দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। তখন, মুকুরের আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টি ও প্রসন্ন-স্মিত মুখ নীলিকার বুকের মধ্যে অনেকখানি তোলপাড় করে কান-দু'টি রাঙা করে তুল্‌ল।

কিছুদিন পরে মুকুরও ঠিক নীলিকারই মত মনে মনে বিবেকের কঠোর তাড়নে, মনের মধ্যে এই দর্শন-স্পৃহাটা নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ ও অকর্ত্তব্য ব'লে বহু চিন্তা করে' সমুদ্র-স্নান ও ভ্রমণ বন্ধ করে বাড়ীর মধ্যে অত্যন্ত মনোযোগে দিনকতক ছবি আঁকতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌ল।

কয়েকদিন পরে ভোরের বেলা সাগরের সুমিষ্ট গম্ভীর আহ্বান-ধ্বনিতে সদ্যো-জাগরিত মুকুর বাইরে এসে দাঁড়াতেই কোটী তরঙ্গ-বাহু উত্তোলন করে সাগরের উম্মত্ত ব্যগ্র-আহ্বান, তার প্রাণের সযত্ন-রুদ্ধ ভ্রমণ-বাসনাকে বিদ্রোহী করে তুল্‌ল। নগ্নপদে গেঞ্জি গায়ে নিদ্রা-স্ফীত-আঁখি, বিস্রস্ত-কেশদাম মুকুর, ছড়িগাছটা টেনে নিয়ে, সাগরতীরে বেরিয়ে পড়্‌ল। শুভ্র ফেণপুঞ্জে পা দু'খানি সিক্ত করে করে চলতে চলতে মুকুর দেখল, নীলিকা কমলা-রংয়ের খদ্দর শাড়ী ও জামা পরে ভাই-বোনদুটির সঙ্গে নেমে আস্‌চে। তার অচপল শান্ত নেত্রদুটি আজ একটু চঞ্চলভাবে চারিদিকে উৎসুক দৃষ্টিপাত করে ফির্‌ছিল! মুকুর দূব হতে মুহূর্ত্তেই যেন বুঝতে পারল, কিসের এই অন্বেষণ! মুকুরের প্রতি দৃষ্টি পড়ামাত্র কিন্তু নীলিকা, বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে হাঁটতে সুরু কর্‌ল। এমনি করে আরও কয়েকদিন কেটে গেল।

মুকুর মাঝে মাঝে সমুদ্রতীরে বসে তালপাতার সূঁচালো টুপী ও কৌপীন-পরিহিত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ 'নুলিয়া' অথবা সদ্যো-ধৃত প্রকাণ্ড অদ্ভুত সামুদ্রিক মৎস্য বা জন্তুর 'পোরট্রেট' এঁকে নিত। নাসিকায় প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার ও সর্বাঙ্গে হরিদ্রালিপ্ত উৎকল-বালিকা কিম্বা পায়ে প্রকাণ্ড গোদযুক্ত উৎকলীয়ের ছবিও সখ করে আঁকত।

রীতি ও তুহিন নিজেদের ছবি আঁকিয়ে নেবার লোভে মুকুরের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য বেজায় লোলুপ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নীলিকাব কঠোর নিষেধে তা' এ-পর্য্যন্ত হয়ে ওঠেনি। নীলিকা রীতি বা তুহিনের 'গায়ে-পড়ে আলাপ'টা পাছে মুকুর, নীলিকার তার সহিত আলাপের ইচ্ছা বা এমনি একটা কিছু ভেবে নেয় —এই ভয়ে প্রাণান্তে তুহিন ও রীতিকে সেদিকে ঘেঁষতে দিত না। আবার মুকুবও ঐ প্রিয়দর্শন কিশোর বালকটি এবং প্রফুল্লতার জীবন্ত-উৎস হাস্যচঞ্চলা বালিকাটির সহিত 'ভাব' ক'রতে একান্ত উৎসুক হওয়া সত্ত্বেও, পাছে নীলিকা মনে করে তারই সহিত পবিচিত হ'বার বা ঘনিষ্ঠতার অভিপ্রায়ে এই অসমবয়স্ক বালক-বালিকাদু'টির সহিত মুকুবের এই অযাচিত বন্ধুত্ব চেষ্টা, তাই ইচ্ছা সত্ত্বেও, সঙ্কোচে ও আশঙ্কায় তুহিন কিম্বা রীতিকে ডাকতে পারত না।

কিছুদিন পরে প্রায় তিন-চারদিন মুকুর আর নীলিকাকে দেখতে পায় না। 'প্রবাল-পুরী'র খোলা দ্বার-বাতায়ন ও সমুদ্র-তীরে ক্রীড়ামত্ত রীতি-তুহিনকে দেখে, তারা যে এখানেই আছে, বুঝতে পারা যেত, কিন্তু তিন-চারদিন নীলিকাকে বাড়ীর বাইরে বা'ব হতে না দেখে তার শারীরিক অসুস্থতা অনুমান করে মুকুর মনে মনে বড় উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ছিল। দু'বেলা প্রবাল-পুরীর সম্মুখ দিয়ে বেড়াতে গিয়ে এবং স্নানের সময় সমুদ্রতীরে খুঁজেও কেবলমাত্র রীতি, তুহিন ও মাঝে মাঝে জ্যাঠাইমা

ছাড়া নীলিকার চিহ্নমাত্র সে দেখতে পেত না। মুকুর মনে মনে স্বস্তিহীন হয়ে উঠল।

তারপর একদিন তিন-চারখানি সারিবন্দী গো-যানের মধ্যে অসিতাদের সকলকে ও তার সহিত নীলিকাকেও দেখা গেল। তাদের সঙ্গে জিনিষপত্র ও বিছানা প্রভৃতি দেখে মুকুর অনুমান কর'ল, তারা 'কোণারক' দেখতে গিয়েছিল। নীলিকার সহিত একটি যুবকও গাড়ী হতে নামল ও নীলিকার সঙ্গে সঙ্গে প্রবাল-পুরীর দিকে অগ্রসর হ'ল। অসিতাদের গাড়ীগুলি তাদের বাড়ীর দিকে চলে গেল।

মুকুর হঠাৎ নিজের প্রতি নিজে খুব কড়া হয়ে উঠল। মনে মনে আপনাকে বহু ভর্ৎসনা করে' বয়স্থা ভদ্র-কুমারীর প্রতি ঐরূপ মানসিক আকর্ষণ নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ বিবেচনা করে' আজ আব সমুদ্রে বেড়াতে যাবে না স্থির করে ফেল্‌ল।

বিকেলে যত রৌদ্র পড়ে আসতে লাগল, সমুদ্রতীরে দলে দলে বালক-বালিকা, পুরুষ-নারীদের যতই ভ্রমণ উপবেশন ও খেলাধূলার মেলা বসে গেল, মুকুরের মন ততই ঐদিকে আকৃষ্ট হতে লাগল; এবং সে মনে মনে নিজেকে নিজে কৈফিয়ৎ দিতে লাগল—'কেন? আমি বেড়াতে যাব না কিসের জন্য? আমি অন্যায়ই বা কি কবছি? সমুদ্রতীরে কত শত অপরিচিতা নারী বেড়িয়ে থাকেন— অনেকের সাথেই তো "মুখ-চেনা" হ'য়ে যায়! তার জন্য নিজের স্বাস্থ্যোন্নতি ছেড়ে বেড়ানো বন্ধ ক'রবার তো কোনও কারণ নেই। আমি তো কোনওদিন তাঁর সাথে আলাপের, এমন-কি তাঁর পরিচয়-গ্রহণের চেষ্টা করিনি, তবে কিসের ভয়ে বেড়ানো বন্ধ কর্ব্ব?'

মুকুর মনে মনে নিজেকে ভীরু ও দুর্ব্বল বলে তিরস্কার করে এবং নিজের অহৈতুকী দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি বেশভূষা সমাপন করে বেরিয়ে পড়ল।

সমুদ্রতীরে গিয়ে কিন্তু সে সমস্ত কথাই একেবারে ভুলে গেল,—অবাধ্য আঁখি-দু'টি চঞ্চলভাবে খুঁজে ফিরতে লাগল তার দৃষ্টির স্বতঃ-প্রার্থিতকে!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'বার অনেকক্ষণ পরে শুক্লপক্ষের চন্দ্রালোকে বাড়ীর দিকে ফির্‌ল যখন সে, তখন সমুদ্রতীর জন-বিরল! জ্যোৎস্না নিশীথে ক্বচিৎ দু' একজন সাগর-সৌন্দর্য্য-পিপাসু বালুর উপর বসে আছে বা গান গাইছে।

মুকুর বাড়ী ফিরে চায়ের পেয়ালা এবং ডায়েরী ও স্টাইলো পেন্‌টি নিয়ে সমুদ্রের দিকে সামনের গোল বারান্দাটিতে ইজিচেয়ারখানির উপর এসে ব'সল। সুদূর হতে ক্ল্যারিওনেট্ বাঁশীতে 'মহাসিন্ধুর ওপার হতে কি সঙ্গীত ভেসে আসে' অতি সুন্দর সুরে বাজ্‌ছিল। মুকুর বাঁশীর সুর লক্ষ্য করে চেয়ে অনুমানে বুঝ্‌ল প্রবালপুরীতেই বাঁশী বাজ্‌ছে। কিন্তু সেখানে বংশীবাদক তো কেউ এতদিন দেখা যায়নি, বা বাঁশীও শোনা যাযনি! হঠাৎ মনে পড়্‌ল—আজ যে একটি যুবককে নীলিকার সাথে গো-যান হতে নামতে দেখেছিল, সম্ভবতঃ সেই বংশীবাদক।

মুকুর আনমনে স্থিরভাবে বসে রইল। তখন বাঁশী সে গান শেষ করে আবার নতুন তান ধরেছে—'নীল আকাশে অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে দেছে চাঁদের আলো'— বাঁশী বেজে বেজে ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে চুপ করে গেল। চায়ের পেয়ালা

জুড়িয়ে জল হয়ে গেল—মুকুর ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত হ'য়ে মুদিত নেত্রে নিশ্চলভাবে শুয়ে। তা'র কানে তখনও বাঁশীর মিষ্টি সুর বাজচে— 'এখন যদি মরতে না পাই তবে আমার মরণ ভালো।'

মুকুরের বন্ধু এসে আহারের জন্য তাকে ডাকল। নিজের বিধুরতায় লজ্জিত মুকুর তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। আহার শেষে রাত্রে আবার এসে বারান্দাটিতে বসল। চিঠি ও ডায়েরী প্রভৃতি লেখার ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক-আলোকটির বোতাম টিপে ধরে চেয়ারের হাতার উপর ডায়েরী খাতাখানি রেখে, লিখে যেতে লাগল—

'সম্মুখে অনন্ত অসীম জ্যোৎস্না-পুলকিত নীলাম্বুরাশি। কোন্ সে অনাদি কাল হতে সদ্যোজাতা পৃথিবীর প্রথম জাগরণ-দিন থেকে এমনি উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত হয়ে দুলতে দুলতে উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে আর্ত্ত-চীৎকারে আছড়ে পড়তে পড়তে রাশি রাশি ফেণপুঞ্জ উদগার করে ছুটে এগিয়ে আসচে বালুতটের বুকের উপর, আবার কোন্ অনতিক্রমণীয় আকর্ষণের নিষ্ফল কান্নার হা হা শব্দে পিছিয়ে সরে যাচ্ছে নিজস্থানে!... এই ছুটে আসা আর ফিরে যাওয়ার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, শ্রান্তি নেই।...

'মানবের অবোধ্য ভাষায় হা হা রবে দিগন্ত মুখরিত করে কী জানাতে চায় সিন্ধু? কার তরে তার এই আকুল উন্মত্ততা, তা' কে বল্‌তে পারে?...

'গগন আর সাগর যেন এক মায়ের পেটের দু'টি ভাই-বোন। এদের রূপ-বৈচিত্র্যের সীমা নেই, অন্ত নেই।

'সন্ধ্যার সময় এবং জ্যোৎস্না-রাত্রে প্রায়ই স্বর্গদ্বারের পশ্চিমে মানব-বসতিহীন নির্জ্জন দিক্‌টায় গিয়ে একা বসে থাকি। উর্দ্ধে আকাশ, সম্মুখে সাগর, শূন্যে সিন্ধু শীকর-স্নিগ্ধ হাওয়া, আর পশ্চাতে ও উভয় পার্শ্বে ধূ ধূ বালুকারাশি আমার দৃষ্টি ও মনকে ঘিরে কি যেন এক নতুন স্বপ্ন-জাল রচনা ক'রে আমায় যেন বিধুর-বিকল করে তোলে।

'মাঝে মাঝে মনসা-কাঁটার ঝোপ, নুলিয়াদের মাছ্-ধরা জাল রাখবার ধানের মরাইয়ের গড়নের গোল গোল সুপারীপাতার 'পলাং', আর বালুকারই ক্ষুদ্র সংস্করণের ছোট ছোট পাহাড়। আর দেখা যায় রঙিন-চিত্র-বিচিত্র-করা মাছ্-ধরা নৌকা বালির উপর সারি সারি নোঙর-বাঁধা।

'প্রকৃতি-মায়ের এই নিরাভরণ বালুকা-গৈরিক-পরিহিত উদাসিনী বিধবা-বেশ প্রাণের মাঝে সব সময়েই একটা গম্ভীর উদাস-বৈরাগ্যের ভাব এবং অসীমের আভাস এনে দেয়। জ্যোৎস্না রাতে তাই সাগর-কূলে গিয়ে বসি, কিছু প্রাণের খোরাক সংগ্রহের জন্য।

'সহরে যন্ত্ররাজের প্রভুত্ব শক্তি এত বিস্তৃত হয়েচে যে, সেখানকার মানুষগুলি দেখলেও যেন এক-একটি চলৎশীল যন্ত্রমাত্র বলেই মনে হয়। প্রাণের সাড়া, প্রাণের আভাস, সহরের কর্ম্মকোলাহলময় রাজপথে খুঁজে পাওয়া নিতান্ত দায়। সকলেই চলেছে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, স্বার্থ নিয়ে— আপনার চেষ্টায়, আপনার কাজে। এইসব

তরুণ কিশোর, তরুণী কিশোরী, যাদের সমুদ্র-তীরে ঢেউয়ের সাথে ছুটাছুটি আর বালুর মাঝে ঝিনুক কুড়ানো দেখলে মনে হয়—সরলতা, সরসতা, প্রফুল্লতা ও আনন্দের মূর্ত্তিমন্ত ঝর্‌না, জীবন্ত (Life) প্রাণী!! এদেরই আবার যখন সহরের পথে পুস্তক-হাতে চলতে বা বালিকা-বিদ্যালয়ের খাঁচা-গাড়ীর মধ্যে সারিবন্দী হয়ে সুসজ্জিত মূর্ত্তিতে বসে থাকতে দেখি, তখন মনে হয়, এরা নিয়ম-চালিত স্কুল-কলেজের ডিগ্রী-অর্জ্জনের এক-একটি সচল-যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাণের সজীবতার সবুজ আভাস কোথায়ও খুঁজে পাইনে।

'জল-হাওয়া-মাটীর সঙ্গে এমন কাছাকাছি নৈকট্য সম্বন্ধ, প্রকাণ্ড ঘনিষ্ঠতা আবার যেন আদিম যুগের সেই বন্ধনমুক্ত উদার, অবাধ, স্বাধীন প্রাণকে তার গভীর সুপ্তি থেকে জাগিয়ে সভ্যতার কঠিন অঙ্গাবরণ, কৃত্রিমতার নিগড় ও সংস্কারের অচ্ছেদ্য জাল থেকে একটু একটু করে মুক্ত করে' সেই চির-পুরাতন হারানো জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চায়।

'এই সমুদ্র-বেলায় যত নর-নারীকে দেখতে পাই, কেমন যেন আপনা-আপনিই মনে হয়, এরা প্রত্যেকেই এক একটি মানুষ। এদের মধ্যে আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার স্বপ্ন-জড়ানো এক-একটি "প্রাণ" আছে। এরা কাউকে ভালবাসে ও ভালবাসা পেতে চায় অথবা পেয়েছে! সকলকারই চোখে দেখি সাগরের রূপের মুগ্ধতা-অঞ্জন আঁকা। নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিক ব্যক্তিও যদি এই চাঁদনী রাতে, একা সাগর-তীরে বালুশয্যার উপর এসে বসে, সিন্ধু তারও চোখে নিজের মায়ার কাজল না এঁকে দিয়ে ছাড়ে না।

'প্রবালপুরীর অধিবাসিনী তরুণীটিকে আমার সৌন্দর্য্যের জীবন্ত দেবী বলে মনে হয়। আমার কল্পনা-কেন্দ্রের শিল্পাধিষ্ঠাত্রী মানসী যেন রূপ পরিগ্রহ করে আজ এই জনহীন সাগর-তটে আমায় দেখা দিয়েছে।...

'নীলিকাকে আমার মূর্ত্তিমতী ঊষালক্ষ্মী বলে বোধ হয়; যখন তাকে অরুণোদয়ের পূর্ব্বে ফেণসিক্ত-চরণে সাগর-তটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, আর কবরীচ্যুত কেশগুচ্ছ চঞ্চল ভোরের বাতাসে তার স্বপ্ন-মাখা মুখের উপর এসে পড়ে! আবার সূর্য্যকিরণে ঢেউয়ের শিরে দোদুল্যমানা সাগর স্নান-রতা মূর্ত্তিতে যখন দেখি, তখন মনে হয়, সাগরের অতল তল হ'তে ঢেউয়েরই সাথে আলোর জগতে উঠে এসেছেন জলদেবী। আবার জ্যোৎস্নারাতে রজত-ঝিকিমিকি বালুচরে গীতপরায়ণা বা রত্নাকরের রত্নচয়নিকার মূর্ত্তিতে যখন দেখি তাকে, মনে হয় তখন "স্বপ্নদেবী" কল্পলোক ছেড়ে ঐ জ্যোৎস্নাধারা বেয়ে নেমে এসেছেন এই সাগরের উপকূলে।

'নামটিও তার ঠিক তারই রূপের উপযুক্ত! সত্যই শিউলী ফুলেরই মতো স্নিগ্ধ, সুন্দর, সুরভিময় সে। স্পর্শ করলে যেন ঝরে যাবে বলে মনে হয়।'

৫

মুকুরের বন্ধুটির ছুটি শেষ হওয়ায় ভাড়া বাটী ত্যাগ করে কলিকাতায় চলে গেলেন। মুকুর কোণারক খণ্ডগিরি উদয়গিরি ও দাক্ষিণাত্যের তীর্থগুলি দেখে আসবার ইচ্ছা থাকায় আরও দিনকতক পুরী থাকবে বলে মনস্থ করে 'প্যারাডাইস্ লজ্' হোটেলে গিয়ে উঠল।

সেদিন সকালবেলা বেড়াতে বেরিয়ে মুকুর স্বর্গদ্বারে তাদের পুরনো বাড়ী 'রত্নাকরে'র ওদিকে গিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ে তার সাঁতার-শিক্ষক সেই নুলিয়া-যুবকটিকে দেখতে পেল। সে তখন ২।৩টি ১০।১২ বৎসর বয়স্ক কৃষ্ণবর্ণ নুলিয়া-বালককে সমুদ্রে সাঁতার শেখাচ্ছিল। মুকুর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাদের ডুব-জলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউয়ের উপর ভেসে ওঠা ও ধাক্কা সামলানোর কায়দা দেখতে দেখতে তারও ঐ ঢেউয়ের মাথায় চড়ে অমনি করে সাঁতার শেখবার ইচ্ছা দুর্দ্দম হয়ে উঠলো। ধুতি পাঞ্জাবী গেঞ্জি খুলে একটি ধীবর-বালকের কাছে গচ্ছিত রেখে টুইলের 'ড্র-আর্' প'রে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রে।

নুলিয়া-যুবকটি তার পুরাতন প্রভু এবং সন্তরণ-ছাত্রকে দেখে খুশী-মনে এগিয়ে এসে তাকে সাঁতার শেখাতে লাগল। সাঁতার শেখবার হাল্কা কাঠ ও নুলিয়ার বাহু অবলম্বনে মুকুর অনেক দূরে এগিয়ে গিয়ে বড় বড় ঢেউয়ের উপরে মহাশব্দে সাঁতার বা ভেসে ওঠা শিখতে লাগল। প্রায় আধঘণ্টা পরে নুলিয়া যুবকটি মৎস্য-শিকারী যাত্রী ধীববগণের সন্ধানে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল।

মুকুর পিছিয়ে এসে ঢেউগুলির সঙ্গে সাঁতারের কায়দায় গা-ভাসান্ দিয়ে উঠা-নামা করতে লাগল।

একটু পরে চেয়ে দেখ্ল—নীলিকা, রীতি, তুহিন, জ্যাঠাইমা, বামুনঠাকুর ও নীলিকার সাথে গো-যান হতে যাকে নামতে দেখেছিল সেই যুবকটি, কেউ কোমরে গামছা বেঁধে, কেউ ইজের পরে, কেউ মালকোছা মেরে সমুদ্রে অবতরণ ক'রছেন। নীলিকার মোটা শাড়ীখানির আঁচল কোমরে শক্ত করে জড়ানো, গায়ে হাফ্‌হাতা খদ্দর সেমিজ।

আশেপাশে আরও পাঁচ-সাতজন হিন্দুস্থানী ও বাঙালী পুরুষ-নারী স্নান করছিল। নীলিকা মুকুরের প্রতি একটু কৌতূহল-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তার দশ-বারো হাত পাশ থেকে, সেই যুবকটির হাত ধরে দুটো 'ব্রেকার' পার হয়ে এল। মুকুর চেয়ে দেখল—যুবকটির বর্ণ ও মুখশ্রী অবিকল নীলিকারই অনুরূপ। হাসিটি পর্য্যন্ত ঠিক নীলিকার ছন্দের। তুহিন ও রীতির 'দাদা' 'দাদা' চীৎকারে মুকুর বুঝতে পারল, যুবকটি নীলিকার অগ্রজ হবে।

অল্পক্ষণের মধ্যে অসিতারাও সদলে এসে তাদের সঙ্গে স্নানে যোগ দিলে। জ্যাঠাইমা বালুর উপর আসনপীড়ি হয়ে থপ্ করে বসে পড়লেন। ঢেউগুলি এসে তাঁর গা ভিজিয়ে কোমর ডুবিয়ে দিয়ে চলে যেতে লাগল। ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ

করবার শক্তি ও সাহস তাঁর ছিল না। অসিতা নীলিকার পাশে এসে দাঁড়াতেই, নীলিকার দাদা বোনের হাত ছেড়ে দিয়ে একটু তফাতে সরে গেলেন। সকলেই নিজে নিজে স্নান করছিলেন, কারুরই সাথে 'নুলিয়া' ছিল না। অসিতা ও নীলিকা খুব উৎফুল্লতার সহিত ঢেউয়ের সহিত যুদ্ধ ক'রছিল।

অসিতা সেই জলের মধ্যেই দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ঢেউ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে অনর্গল বক্তৃতা করছিল। 'দেখ্ নীলা, ঢেউগুলি যেখানে "রোল" করে সেখানে ধাক্কা বেশী, তাই উল্টে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অল্প-জলেই বেশী। কিন্তু ঢেউগুলি একটু বেশী জলে যেখানে "ওয়াশ" হচ্ছে, সেখানে ধাক্কা মোটেই নেই, জলও বেশ পরিষ্কার, আর স্নান করেও তাই আরাম ওখানে বেশী। অবিশ্যি সমুদ্র "রাফ্" থাকলে বেশী জলে যাওয়া ঠিক নয়। সাধারণতঃ ঢেউগুলো বেশ "রেগুলারই"ই আসে; কিন্তু যখন জোয়ার আসে, সমুদ্র বেশী "রাফ্" হয়ে ওঠে, তখন ঢেউগুলোও বেজায় এলোমেলোভাবে আস্তে থাকে, তখন অবিশ্যি "ডেন্জার্" থাকে।' অসিতা বকতে বকতে মাঝে মাঝে নীলিকাকে ভীরু অপবাদ দিয়ে ঠাট্টা করছিল। নিজের অপবাদ খণ্ডন করতে করতে অসিতার সঙ্গে নীলিকা অনেকখানিই এগিয়ে পড়েছিল। সেই সময়ে বাতাস জোর হয়ে জোয়ার আসায় জলের টান্ ও ঘূর্ণী খুব বেড়ে উঠছিল। মুকুর মনে মনে এই বিবেচনা-শূন্যা অসাবধানী তরুণীদ্বয়ের জন্য মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠ্ছিল। কারণ, সেদিন চতুর্দ্দশী তিথি, সমুদ্রের টান ও বেগ বড় বেশী। জলও খুব শীঘ্র বেড়ে উঠ্চে এবং ঢেউগুলি উন্মত্তভাবে ছুটে আসচে। আজ সমুদ্রে স্নান বিশেষ নিরাপদ নয়। তা'ছাড়া আশেপাশে নুলিয়ারা কেউ একজনও নেই। তরঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মজ্জমান হলে, যে সকল বাঙালী, উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী স্নান করছে, তাদের দ্বারা কোনও সাহায্যের আশা নেই। মুকুর ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করতে করতে নীলিকা ও অসিতাদের প্রতি উদ্বিগ্ন-চিন্তিত মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল। নীলিকার দাদা তাঁর এক হিন্দুস্থানী বন্ধুর সহিত উচ্চ-হাস্য-চীৎকার সহকারে স্নান-মত্ত। তাঁরা অবশ্য সকলেই কাছাকাছি আছেন।

মুকুর দেখ্ল—হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড বড় ঢেউয়ের প্রচণ্ড ধাক্কা নীলিকা সামলাতে না পেরে পড়ে গেল এবং তার উপর দিয়ে আরও ঢেউ চলে গেল। নিমেষ মধ্যে মুকুর বুঝে নিল—ঐ উন্মত্ত বেগে যে প্রকাণ্ড ঢেউটা এগিয়ে আসছে ওটা কূলে প্রতিহত হয়ে ফিরবার সময়েও ভীষণ জোর-টানে ফিরে যাবে। নীলিকা পতন-বেগ সামলে জলের তলা হতে বড় বড় তরঙ্গগুলির চাপ ঠেলে উঠতে না উঠতে ঐ প্রত্যাবর্ত্তনমুখী ঢেউয়ের টানে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে আরও তলিয়ে যেতে পারে; এবং আরও বেশী দূরে গিয়ে পড়লে, বড় বড় ঢেউয়ের উঁচু প্রাচীরগুলি ডিঙিয়ে সেখান হ'তে নিজের শক্তিতে ফিবে আসা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে।

অসিতারা ততক্ষণে সেই বড় ঢেউটার ধাক্কায় ওলোট-পালোট খেয়ে, নাকে-মুখে জল ঢুকে সকলেই নিজের নিজের টাল্ সামলাতে সামলাতে প্রবল টানের

বিপরীত দিকে সরে আসতে ব্যস্ত। নীলিকার মুহূর্ত্ত অদর্শন তারা টের পায়নি।

এদিকে নিশ্বাসের জন্য প্রাণ ব্যাকুল, নাক ও মুখ দিয়ে প্রচুর লবণাক্ত জল পেটে প্রবেশ করছে, কানে জলেরই ঝম্‌ঝম্ গুম্‌গুম্ শব্দ, বাতাসের জন্য ব্যাকুলা নীলিকা মাথার উপর বড বড় ঢেউয়ের প্রবল চাপ ঠেলে কোনওমতেই জলের তলে উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। রুদ্ধ-নিশ্বাসে অর্দ্ধ-চেতনাবস্থায় জলের তলে লুটাপুটি খেতে খেতে সেই সময়ে সে যেন কার স্পর্শ পেল। অর্দ্ধ-সংজ্ঞাহীনা নীলিকা অসহায় ব্যাকুলভাবে প্রাণপণ বলে তাকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল।

নীলিকার বিপদ ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই অসিতারা বুঝতে না পারলেও, মুকুর খুব নিকটে স্নান করছিল এবং বিপদাশঙ্কায় তার প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল বলে, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্বে তার প্রাণনাশের সম্ভাবনা বুঝে সত্বর রক্ষা কর্ত্তে বা সাহায্য কর্ত্তে অগ্রসর হয়েছিল। ঢেউয়ের ধাক্কা ঠেলে নীলিকার দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে মুকুরের 'ডুব্‌ল — ডুব্‌ল—' চীৎকারে অসিতারা বিস্মিত ভীত নেত্রে সেইদিকে চেয়ে চেয়ে মুহূর্ত্তমধ্যেই বুঝতে পারল—নীলিকা ডুবে গিয়েছে। স্নানরতা সমস্ত পুরুষ ও নারীর ভীত ব্যাকুল কণ্ঠের যুগপৎ 'হায় হায়' 'কী সর্ব্বনাশ' 'গেল গেল' ইত্যাদি শব্দে সমুদ্রতট মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল এবং অনেকেই উচ্চ চীৎকারে 'নুলিয়া—নুলিয়া—' বলে চেঁচামেচি সুরু ক'রলেন— যদিও সেখানে নুলিয়ারা কেউ ছিল না।

তারপরে একবার মাত্র একটা বড় ঢেউয়ের শিরে নীলিকার দীর্ঘ কেশরাশিগুলি ছড়িয়ে পড়ে কৃষ্ণবর্ণ মাথার উর্দ্ধভাগটি চকিতে দেখা দিয়ে পরমুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল! মুকুর তখন তাকে ধরতে পেরেছে, কিন্তু চতুর্দ্দশীর জোয়ারে সেই উন্মত্ত ঢেউয়ের আক্রমণ-বেগ অতিক্রম করে কিছুতেই তাকে নিয়ে তীরের দিকে অগ্রসর হ'তে পারছিল না। আরও, নীলিকা তাকে প্রাণপণ বলে জড়িয়ে ধরছিল বলে, নীলিকার সাথে সে নিজেও প্রায় নিমজ্জিত হয়ে আস্‌ছিল। সেই মৃত্যু-ভীত বাহু-বেষ্টনীর কঠিন বন্ধনপাশ কোনওমতে ছিন্ন করতে না পেরে তরঙ্গ-যুদ্ধে শ্রান্ত-ক্লান্ত মুকুর যখন ক্রমশঃ অবসন্নপ্রায় ও হতাশ হয়ে' ভগবানের উপর নির্ভর করে মৃত্যুরই জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন নীলিকার বাহুপাশ ক্রমে শিথিল হয়ে আপনিই খুলে পড়ে গেল। এই সময়ে একটা বড় ঢেউ তাদের ধাক্কা দিয়ে খানিকটা তীরের দিকে এগিয়েও দিয়ে গেল। মুকুর শেষবার ঈশ্বরকে স্মরণ কর্ত্তে কর্ত্তে প্রাণপণ বলে শেষ শক্তি সংগ্রহ করে, নীলিকার একখানি শিথিল বাহু নিজের ডান হাতে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে তীরের দিকে ঝাঁপিয়ে এগিয়ে এল। ততক্ষণে কেউ কেউ তাদের সাহায্যার্থ এগিয়ে এসেচে। নীলিকার দাদা ও আরও জন-দুই যুবক তাদের ধরে বালুতটের উপর এনে ফেল্‌ল। নীলিকা তখন সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীনা; আর মুকুর আসন্ন নিঃশ্বাসের জন্য বার বার মুখ-ব্যাদান ক'রছে। নীলিকার ডান হাতখানি কিন্তু তখনও তার ডান হাতের দৃঢ় মুষ্টির মধ্যে বদ্ধ। তারপর একটু সম্বৃত হ'লে তাড়াতাড়ি মুকুর নীলিকার হাত ছেড়ে দিয়ে, বাহুতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বস্‌ল। নীলিকা তখনও অজ্ঞানাবস্থায়

পড়ে আছে। খদ্দরের শাড়ীখানি সমুদ্র ফিরিয়ে দেয়নি, খাকির 'ইজের-বডি'র উপর হাফ্-হাতা শাদা সেমিজ-পরা ক্ষীণ তনুলতা সিক্ত বালুর উপর শোয়ানো রয়েছে। চারিদিকে স্নানার্থীদের জনতা।—কখন সঙ্গোপনে মুকুর উঠে অনেক দূরে সরে গিয়ে উদ্বেগাকুল দৃষ্টিতে সেইদিকে চেয়ে ছিল। লোকের ভীড়ে নীলিকাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ক্রন্দনাকুলা জ্যাঠাইমা ও শঙ্কাকাতরা উদ্বেগাকুলা অসিতা প্রভৃতি সকলে একসঙ্গে 'চোখ মেলেছে, চোখ মেলেছে' 'জ্ঞান হয়েছে এবার' 'হাঁ করেছে' ইত্যাদি শব্দে হর্ষ প্রকাশ করে উঠায়, মুকুর বুঝ্‌ল এইবার নীলিকার সংজ্ঞা ফিরেছে।

মুকুর তখন আস্তে আস্তে শুষ্ক ধুতি ও পাঞ্জাবী কোনওরকমে গায়ে জড়িয়ে একজন উড়িয়াকে ডেকে পয়সা দিতে প্রতিশ্রুত হ'য়ে তার স্কন্ধে ভর দিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। এদিকে যখন নীলিকা সুস্থ হ'ল, তখন তাকে নিয়ে বাড়ী যাবার সময়ে মুকুরের কথা সকলের মনে পড়ল। কোথায় গেলেন তিনি? কিন্তু তখন মুকুরের কোনও চিহ্নই দেখা গেল না।

নীলিকার দাদা সুপ্রভাত নিতান্ত অপ্রতিভ, দুঃখিত এবং লজ্জিত হয়ে বার বার বলতে লাগলেন—'আমাদের নিতান্ত অন্যায় এবং অকৃতজ্ঞতা হ'ল কিন্তু তাঁর খবর না নিয়ে কেবলমাত্র নীলিকেই নিয়ে ব্যস্ত থাকা। ছি ছি ছি! নিতান্ত স্বার্থপর ও অভদ্রের মতো আমাদের ব্যবহারটা হয়েচে আজ। ভদ্রলোক নিজের জীবন বিপন্ন করে এগিয়ে না গেলে আজ যে আমাদের কি হয়ে যেত, তা' ভগবানই জানেন' ইত্যাদি।

অসিতার বৌদিদিরা এবং অসিতা বল্‌ল, 'আপনি অত ভাবছেন কেন? তিনি দু'বেলা এই সমুদ্রতীরে বেড়ান। আজ বিকেলেই হয়তো তাঁর দেখা পাবেন।'

৬

সেদিন বিকেলে শরীর ভাল না থাকায়—অল্প জ্বর-জ্বর ভাব হওয়ায়, মুকুর বেড়াতে বেরুল না। মনটা যদিও নীলিকার সুস্থ সংবাদ জানবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল, কিন্তু তবুও সে চুপ করে রইল।

নীলিকার দাদা সুপ্রভাত সমুদ্রতীরে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর পর্য্যন্ত খুঁজে ব্যর্থকাম হয়ে বাড়ী ফিরে এসে বললেন—'কৈ রে নীলি, আজ তো সমুদ্রতীরে সে ভদ্রলোকের দেখা পাওয়া গেল না। তাঁর বাড়ী কোথায় বলতে পারিস?'

রীতি অঙ্ক কষছিল—শ্লেট্‌খানা নামিয়ে রেখে সোৎসাহে বলে উঠ্‌ল, 'হ্যাঁ দাদা, পারি। তিনি খুব চমৎকার ছবি আঁকতে পারেন। আমাদের বাড়ী থেকে দেখা যায় দূরে ঐ—যে একখানা হল্‌দে রংয়ের একতালা বাড়ী দেখা যায় না—"রত্নাকর" যার নাম,—ঐ বাড়ীটায় উনি থাকেন দেখেচি।'

সুপ্রভাত ব'ল্‌ল—'কৈ? আজ দু'তিন দিন দেখ্‌চি তো 'রত্নাকর' নাম-লেখা

বাড়ীখানা চাবিবন্ধ,—ভাড়া দেবে লিখে দিয়েচে।’ নীলিকা এবার আস্তে আস্তে ব’লল, —‘তাঁকে দিন দুই আগে “প্যারাডাইস্ লজ্” হোটেলের দোতলার বারান্দায় পায়চারী করতে দেখেছিলুম। বোধ হয় প্যারাডাইস্ লজে আছেন।’

পরদিন সকালে সুপ্রভাত ‘প্যারাডাইস্ লজে’ মুকুরের খোঁজ করতে গিয়ে দেখল মুকুর নেমে আসছে সমুদ্র-তীরে। চাঁপা-রং গরদের পাঞ্জাবী, বেগুনে রেশমী পাড়ে ছোটো ছোট জরির ফুল তোলা মাদ্রাজী জরীপাড় ধুতি ও ঝকঝকে বাদামী রং-এর সেলিম-শু’তে তাকে চমৎকার মানাচ্ছিল। সুপ্রভাত এগিয়ে এসে মুকুরকে অভিবাদন ক’রল্। তারপর শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করে, গত দিনের সেই বিপদের পর মুকুরের উপযুক্ত সম্মান সম্বর্দ্ধনা ও যত্ন না করে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ স্বার্থপরের ন্যায় নীলিকাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার অমার্জ্জনীয় ত্রুটীর বারম্বার উল্লেখ করে ক্ষমা প্রার্থনা ক’রতে লাগল।

মুকুর লজ্জারুণ মুখে নিতান্ত অপ্রস্তুতভাবে হাত কচলিয়ে ও মাথা চুলকে, কি করে যে সুপ্রভাতের সেই বিনয়পূর্ণ দীর্ঘ বক্তৃতা বন্ধ কববে ঠিক করতে না পেরে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

নিতান্ত বিপন্নভাবে, ‘না,—না, ও-কথা কেন বলছেন ? ও’সব কথা বলে মিছামিছি আমায় অপরাধী করবেন না। আপনারা কোনও ত্রুটি করেননি আমার কাছে। আমি আর কি করেছি, শুধু উপলক্ষ্য মাত্র।’ ইত্যাদি নিতান্ত অসংলগ্নভাবে কথা বলে আরও লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠতে লাগল। আর বেশী কিছু কথা তাব মুখ দিয়ে বের হ’ল না।

তারপর সমুদ্রতীরে পদচারণা করতে করতে সুপ্রভাত মুকুরের পরিচয় নিয়ে এবং নিজের পরিচয় দিয়ে বলল,— ‘নীলি আমার ছোট বোন। আমার আপন সহোদরা বোন ঐ একটিমাত্র, আর ভাইবোন নেই। বাপ মা দু’জনেই মারা গেছেন। নীলি ভবানীপুরে আমার জ্যাঠামশাই জ্যাঠাইমার কাছে থাকে। গোখ্‌লে মেমোরিয়াল স্কুলে পড়ে। নেক্স্ট ইয়ারে’ ম্যাট্রিক্ দেবে। আমি কলকাতায় হোস্টেলে থাকি ‘এম এস্‌সি’, ল’ পড়ি।

মুকুর খুব সামান্যই কথা বল্‌ছিল। সুপ্রভাতের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর মাত্র। সুপ্রভাত একাই ক্রমাগত হাত পা নেড়ে অনর্গল বকে যাচ্ছিল।

শেষে বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত হ’লে সুপ্রভাত ব’লল,— ‘যাই হোক্, আপনার সঙ্গে আলাপে খুব খুশী হলেম। আপনিই যে নতুন আর্টিস্ট মুকুর সেন তা’ জানতেম না। ‘বঙ্গ-ভারতী’ পত্রিকায় আপনার অনেকগুলি খুব “নাইস্ সিনারী” দেখেচি। আপনার “সিনারি”গুলি আমি বড্ড “লাইক” করি।

‘আপনাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাবার আমার বড় ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এখানে তা’ আর ঘটে উঠ্‌ল না। আজই সন্ধ্যা সাড়ে ছটার এক্সপ্রেসে আমি কলকাতা ফিরবো— কাল কলেজ অ্যাটেণ্ড কর্ত্তে হবে। আপনার সঙ্গে ভাল করে আলাপ

করার সুবিধা এখানে হ'ল না, কিন্তু ক'লকাতায় গেলে আপনাকে আমাদের বাড়ী যেতে হবে কিন্তু। সে আমি সহজে ছাড়ছিনে—নিজে এসে ধরে নিয়ে যাব। এখানে আমার জ্যাঠতুতো ছোট ভাই-বোন দু'টি আর নীলিকে নিয়ে জ্যাঠাইমা এসেচেন, তাঁর পুরানো সরকার ও লোকজন নিয়ে। পুরুষ মানুষ এমন কেউই নেই যে আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে যাই। তা' চলুন না, জ্যাঠাইমা আর নীলির সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিয়ে যাব।' মুকুর নিতান্ত লজ্জায় রঞ্জিত হয়ে ঘোর আপত্তিতে অসম্মতি জানিয়ে বল্‌ল না—সে কলকাতায় গিয়ে যা হয় হ'বে। সেখানে গিয়ে সে সুপ্রভাতের সঙ্গে দেখা করবে এবং তাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ গ্রহণও ক'রতে পারে; কিন্তু এখানে পারবে না। মুকুরের মনে হ'ল, নীলিকা নিশ্চয়ই ভাববে—তার সঙ্গে আলাপ করবার একটু সুযোগ পাবা মাত্রই ছুটে এসেছে ঘনিষ্ঠতা কর্ত্তে! ছি ছি ছি—সে মরে গেলেও নীলিকার সম্মুখে গিয়ে অযাচিত আলাপ করবার জন্য দাঁড়াতে পারবে না। ছিঃ, নীলিকা কতই হীন ভাববে তা' হ'লে তাকে।

সুপ্রভাত পকেট থেকে নোট্‌বুক পেন্সিল বার করে বল্‌ল, 'আপনার কলকাতার ঠিকানাটা বলুন তা' হলে, লিখে নিই। এখানে চিঠিও লিখতে পাবি আপনাকে। কলকাতায় গেলে কিন্তু নিশ্চয়ই দেখা কর্ব্বেন এবং আমাদের বাড়ী যেতে হবে। এখন থেকে নিমন্ত্রণ রইল, তখন কোনওরকম ওজর-আপত্তি শুনব না।'

ঠিকানা লিখে নিয়ে প্রগাঢ় হৃদ্যতার সঙ্গে মুকুরের করমর্দ্দন করে বারম্বার কলকাতায় গিয়ে দেখা কর্ব্বার অনুরোধ করে সুপ্রভাত বিদায় গ্রহণ কবল।

যার অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি সমুদ্রতটে দু'বেলা তার দৃষ্টিকে বন্দিনী করে ফেলতো, যার কৃপায় এ-যাত্রায় সমুদ্র-সমাধি হতে সে রক্ষা পেয়েছে—নীলিকা তার দাদার মুখে শুন্‌ল, সে 'বঙ্গ-ভারতী'র প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী মুকুর সেন।

সুপ্রভাত বল্‌ল,—'লোকটিকে বেশ ভাল বলেই মনে হ'ল, তবে বেজায় লাজুক ও একেবারেই মুখচোরা। একটা কথা মুখ দিয়ে বেরোয় না—খালি মুচকে মুচকে মিষ্টি মিষ্টি হাস্‌ছিল। তোদের "কাব্যি ভাষা"য় যাকে "মৃদুমন্দ সলাজ হাস্য" বলে আর কি!' বলে সুপ্রভাত আপনার মনে খুব উচ্চঃস্বরে হাসতে লাগল। তারপর বল্‌ল—'যাই হোক, চেহারাটা কিন্তু ঠিক আর্টিস্টের মতো বলা যেতে পারে। "গ্রীক্ স্ট্যাচু"র মত অমন সুগঠিত বলিষ্ঠ পেশী-সংযুক্ত সুদীর্ঘ অবয়ব, অমন পরিষ্কার মুখের শ্রী, নাক চোখ ও তুলি-আঁকা ভ্রূ আমি তো বাঙালীর মধ্যে খুব কমই দেখেচি। চুলগুলি সুদ্ধ চমৎকার! রেশমের মত নরম চিকণ আর কোঁচকা-কোঁচকা। মোটের উপর মুকুর সেনের রং খুব ফরসা না হলেও তাকে সুপুরুষ বলা চলে। কি বলিস?'

নীলিকা অন্যমনস্কভাবে চেয়ারের উপর বসেছিল, সুপ্রভাতের প্রশ্নে নিতান্ত উদাসীনভাবে উত্তর ক'রল—'তা হবে।'

সেদিনকার ঘটনার পর নীলিকারা আর ক'দিন সমুদ্রস্নানে যায়নি। তারপরে

তারা শীঘ্র কলিকাতায় চলে যাবে বলে সমুদ্রের মায়া কাটিয়ে উঠতে না পেরে আবার একদিন স্নান ক'রতে গেল। জ্যাঠাইমা এবার ভয়ে নুলিয়া সঙ্গে নিয়ে তবে সমুদ্রে নামলেন ও বার বার নীলিকাকে সাবধান করে বলতে লাগলেন, 'বেশী দূরে এগিও না মা, অল্প জলেই স্নান করে উঠে এসো।'

অদূরে দু'খানা মাছ-ধরা নৌকা জলে ভাসানো হ'চ্ছিল, —তীরের উপর অনেক লোক দাঁড়িয়ে সেই নৌকা ভাসানো দেখছিল। তরঙ্গের প্রতিঘাতে নৌকা দু'খানি দু'হাত এগিয়ে পাঁচহাত পেছিয়ে আসছিল। আবার ঢেউ ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে যাচ্ছিল। এমনি করে একখানি তরঙ্গ-যুদ্ধে জয়লাভ করে এগিয়ে চলে গেল; আর একখানি তখনও ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝে অগ্রসর হচ্ছে। মুকুর সেই দর্শক দলের একপাশে দাঁড়িয়ে নৌকা ভাসানো দেখছিল। নুলিয়ার হাত ধরে সমুদ্রের মধ্যে নীলিকাকে দেখে মুকুরের মুখে ঈষৎ কৌতুক-স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল। তাতে অবশ্য বিদ্রূপের চিহ্ন ছিল না। নীলিকার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তে সে হাসিটা আর একটু যেন স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু মুকুর তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ভাসমান নৌকা দু'খানির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রল।

নীলিকা লজ্জায় অপমানে যেন অর্দ্ধমৃতা হয়ে গেল। লজ্জার চেয়ে অপমান এবং রাগই তার বেশী বোধ হচ্ছিল। সে নুলিয়ার হাত ছেড়ে দিয়ে, তাকে জ্যাঠাইমাকে স্নান করাতে আদেশ দিয়ে নিজেই স্নান করতে ঢেউয়ের মধ্যে এগিয়ে চল্‌ল।

নুলিয়া নীলিকার আদেশমত জ্যাঠাইমার কাছে এসে তাঁর স্থূল বাহুখানি ধরে তেলেগু ভাষায় 'ভয় নেই মা' 'ভয় নেই মা' বলে অভয় দিতে দিতে এগিয়ে নিয়ে চল্‌ল। নীলিকা তখন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে আরও অগ্রসর হয়ে চলেছে। সে তাচ্ছিল্য ভঙ্গীটুকু কিন্তু স্পষ্টই মুকুরকে লক্ষ্য করে। জ্যাঠাইমা শঙ্কিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—'ও নীলা, আর যাস্‌নে, একা অতদূরে যাস্‌নে, নুলিয়ার হাত ধর—', তিনি নুলিয়াকে সত্ত্বর তার রক্ষণাবেক্ষণে পাঠিয়ে দিলেন।

নীলিকা নুলিয়াকে হাত ধরতে নিষেধ করে গোটাতিনেক মাঝারি-ঢেউয়ে ডুব দিয়ে প্রতিকূল টান্ ঠেলে উপরে উঠে আসতে লাগল। মুখ তুলে সামনে চেয়ে দেখল—মুকুর অদূরে উপরে দাঁড়িয়ে তারই দিকে চেয়ে আছে। তার দৃষ্টিতে যুগপৎ ভর্ৎসনা ও ব্যথার আভাস ফুটে উঠেছে! নীলিকা তাড়াতাড়ি নিতান্ত লজ্জিত এবং অপরাধীভাবে মাথা নীচু করে দূরে চলে গেল।

সেইদিনই বিকেলবেলা স্বর্গদ্বারের সেই নির্জ্জন দিকটায়, কাঁটাবনগুলির ওধারে উঁচু বালির ঢিবিটার পাশে মুকুর বেলাবেলি রং তুলি প্যালেট্ নিয়ে ছবি আঁকবার জন্য গিয়ে বস্‌ল।

আজ দু'মাস ধরে 'বঙ্গ-ভারতী'র সম্পাদকের চিঠিতে চিঠিতে সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েচে। সমুদ্রতীরে উদার সৌন্দর্য্যের মাঝখানে থেকে ছবি আঁকবার এত খোরাক পাওয়া সত্ত্বেও মুকুর কেন যে 'বঙ্গ-ভারতী'কে তার চিত্র-সম্পদ্ থেকে বঞ্চিত

রেখেছে, বিনীতভাবে তার কৈফিয়ৎ প্রার্থনা করে করে মুকুরকে উদ্‌ব্যস্ত করে তুলেছেন তিনি। তাই মুকুর আজ বাড়ী থেকে দৃঢ়সংকল্প করে বেরিয়েছে, আজই একখানি ছবি আরম্ভ করে দু'তিনদিনের মধ্যে সে-খানি শেষ করে' এই সপ্তাহেই 'বঙ্গ-ভারতী'তে পাঠিয়ে দেবে।

বালির টিবির পাশে বসে মুকুর নিবিষ্ট চিত্তে আরব্ধ চিত্রখানির উপর ক্ষিপ্র হাতে তুলি টেনে যাচ্ছিল। শান্ত নীল সিন্ধুর বুকে গোধূলির স্বর্ণাভ আলোকধারা নেমে এসে, ময়ূরকণ্ঠী বেণারসী শাড়ীর মত ঝল্‌মল্‌ করছিল। মুকুর এক-একবার মাথা তুলে সামনের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রছিল। এবার মাথা তুলে চাইতেই দেখ্‌লে —নীলিকা তার সখী অসিতার সঙ্গে পাশাপাশি আসচে, সঙ্গে ছোট ভাই-বোন দু'টি।

ঢেউগুলি বিস্তীর্ণভাবে যেখানে আছড়ে আছড়ে ছুটে এগিয়ে এসে আবার ফিরে ফিরে চলে যাচ্ছিল, সেই ঝকঝকে সিমেন্টের মত মসৃণ সিক্ত বালুকাতটের উপর গোধূলির রাঙা আলো পড়ে আয়নার মতো ঝিকমিক্‌ ক'রছিল। সেই চক্‌চকে বালু-বেলায় শুভ্র পা' দু'খানি ধীরে ধীরে মৃদুতালে ফেলে নীলিকা এগিয়ে আসচে।

পরিধানে আজ তার সাগর-রংয়ের ঘন নীল প্লেন্‌-খোল বেণারসী শাড়ী। তার তিন আঙুল চওড়া ঢালা জরীর পেটা পাড়টি পিঠের উপর দিয়ে লম্বাভাবে এসে, সামনে বুকের উপর চওড়া ঢালা-জরীর আঁচলটা পড়েছে। হিন্দুস্থানী ধরণে শাড়ীখানি সামনে কোঁচাকরা ও ডান কাঁধে আঁচলখানি সোনার ব্রোচ দিয়ে আটকানো। সেই রংয়েরই একটি ছোট্ট হাতা জরির পেটা-পাড়-বসানো টাইট জামা গায়ের সঙ্গে সমান হয়ে বসে গেচে। শুভ্র ললাটের মাঝখানে রক্তবিন্দুর মতো সিন্দূর টিপটি অস্তগামী সূর্য্যেরই তুল্য মনোমুগ্ধকর।

মুকুর নীলিকাকে খদ্দর ব্যতীত অন্য কোনও বেশে আজ পর্য্যন্ত দেখেনি; সুতরাং তার এই সুসজ্জিত বেশ মুকুরের চক্ষে নিতান্ত শোভাময় ঠেক্‌ল।

অসিতাও একখানি ধোঁয়া-রংয়ের খোলে রূপালী জরীর বড় বড় পুষ্প-গুচ্ছ-অঙ্কিত বহুমূল্য বেণারসী-সুটে সজ্জিতা। তার পায়ে জরীর কারুকার্য্যময় ভেলভেট্‌ নাগরা, মুখে ও চুলে পাউডার। রীতি এবং তুহিনের পরিচ্ছদও যথেষ্ট মূল্যবান।

মুকুরের মুগ্ধ দৃষ্টি কিন্তু রীতি, তুহিন বা অসিতার প্রতি একবারও আকৃষ্ট হল না, সে নীলিকার প্রতি বিস্মিত আত্মবিস্মৃতভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে নীল সাগর-সৈকতে রঙিন সান্ধ্য আলোক-রেখাগুলির মাঝখানে, অকস্মাৎ তার শিল্প-মানসীর প্রত্যক্ষ দর্শন পেয়ে, যেন প্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল।

অসিতারা এসে মুকুর যে উঁচু পাড়ের উপর বালির টিবির আড়ালে বসে ছিল, তারই নিম্নভাগে দু'খানি সিল্কের রুমাল বিছিয়ে বসে পড়্‌ল। সেখান থেকে মুকুরের অস্তিত্ব জানা যায় না, কারণ পাড় অনেক উঁচু।

তুহিন ও রীতি ছুটাছুটি করে ঝিনুক ও 'জেলিফিশে'র হাড় সংগ্রহ কর্ত্তে ব্যস্ত হ্‌ল। 'জেলিফিশে্‌'র হাড়গুলি অন্ধকারে রাত্রে ঘরের মধ্যে আলোক বিকীর্ণ করে।

অসিতা ও নীলিকা দু'জনে নিভৃত আলাপে নিমগ্না হয়ে পড়ল।

মুকুর তরুণীদের নিভৃত আলাপ তাদের অগোচরে শ্রবণ করা নীতি-বিরুদ্ধ বিবেচনা করে, সেখান থেকে উঠে যাবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময়ে তাদের মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হ'তে শুনে কৌতূহলাক্রান্তভাবে আবার বসে পড়ল।

অসিতা প্রবল হাস্যোচ্ছ্বাসে পাউডার-চর্চ্চিত এলোচুলের মেম-ফ্যাশানে-বাঁধা প্রকাণ্ড কবরীসুদ্ধ ক্ষুদ্র মাথাটি দুলিয়ে বল্‌চে,—'বিখ্যাত আর্টিস্ট মুকুর সেন পুরীতে এসেছে—তা কে জান্‌তো?—যাই-ই বলো না তুমি, ব্যাপারটা কিন্তু আগাগোড়াই কি একটা মস্তবড় রোম্যান্স হয়ে আসচে না? এর চেয়ে বড় রোম্যাণ্টিক্‌ ব্যাপার তোমার "লাইফ্‌"-এ আর কীই বা তুমি আসা কর্ত্তে পার? এখন "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হ'লেই ভাল। "ট্রাজেডি"টা আমার মোটেই ভাল লাগে না, আমি মিলনান্তের একান্ত ভক্ত।'

সজোরে অসিতাকে ধাক্কা দিয়ে কৃত্রিম ক্রোধের সুরে নীলিকা ব'লল—'অতো যদি মিলনান্তের ভক্ত তুই, যা' না নিজেই কেন মিলিত হ' না গিয়ে! এর মধ্যে আবার রোম্যান্স্‌ যে কি খুঁজে পেলি তা একা তুই-ই জানিস্‌।'

কপট বিস্ময়ে চোখ-মুখ কপালে তুলে অসিতা বলে উঠল্‌—'হোয়াই মিস্‌ নীলা!! ইট ইজ যাস্ট লাইক্‌ এ নবেল। বাঙ্গালী মেয়ের জীবনে এর চেয়েও আব বেশী "রোম্যান্স্‌" কি হতে পারে বলো? সমুদ্রতীবে প্রত্যহ সাক্ষাৎ, দৃষ্টি-বিনিময় হ'তে আরম্ভ করে সমুদ্রে ডোবা এবং নিজের প্রাণ বিপন্ন করে উদ্ধার পর্য্যন্ত হয়ে গেল, এখনও বলিস্‌ কিনা বোম্যান্স্‌ কোথায়? কাব্যে, উপন্যাসে যা লেখে সবই ত "ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড" মিলে যাচ্ছে। মিলছে না শুধু নায়ক এখনও কেন নায়িকার সহিত আলাপ কর্ত্তে এলেন না? বিশেষতঃ, জলে ডোবা'র পর অমন সুন্দর সুলভ সুযোগ পেয়েও। এইখানটায়ই যা' একটু গরমিল ঠেক্‌ছে। তা হলেও আমার খুব ভরসা আছে শেষটা কখনই কাঁচবে না। সুপ্রভাতদা'র সঙ্গে আলাপটা তো করা রইলো!'

নীলিকা এবার সত্য সত্য রাগ করে উঠে দাঁড়াল—'আমি চলে যাচ্ছি সীতা! তুই যদি ক্রমাগত আমার সম্বন্ধে ঐরকমভাবে যা' তা বলিস, আর কোনওদিন তোর সঙ্গে বেড়াতে বেরুব না। তোর ঐ অতিরিক্ত ফাজ্‌লামির জ্বালাতেই আজকাল আর তোর সঙ্গে একত্রে বেড়াতে যাই না। আজ নেহাৎ নিমন্ত্রণ-বাড়ী গেলুম বলে তোকে ডেকে সঙ্গে নিয়েছিলুম।'

অসিতা উচ্ছ্বসিত-হাস্যে বল্‌ল—'তা এখন আর আমাকে সঙ্গে নেবে কেন বল? এখন তোমার বেড়াবার সঙ্গীর তো অভাব নেই; সুতরাং সঙ্গিনী না থাকলেও ক্ষতি নেই। যাই হোক, মুকুব সেন আর্টিস্ট লোক,—তোমার "কবিত্ব" নেহাৎ মাঠে মারা যাবে না,—মূল্য বুঝবে সে।' তারপর হাস্য সম্বরণ করে ব্যস্তভাবে ব'লল—'দ্যাখ ভাই নীলা! যেদিন সমুদ্রস্নানে তোর সোনার চুড়ী হারালো, সেইদিন মুকুর সেনেরও আংটী হারিয়েছিল—মনে আছে তোর? সেদিন আমারও ভাই একটি

মূল্যবান প্রিয় জিনিস সেই সমুদ্রস্নানের সময় খোয়া গেছে! তোমাদের অবশ্য এতদিন বলিনি।'

বিস্মিতকণ্ঠে নীলিকা ব'ল্‌ল—'তোর আবার কি হারিয়েছিল সেদিন?' কষ্টে গাম্ভীর্য্যে অসিতা দীর্ঘশ্বাস টেনে বলল—'আমার একটি বড় প্রিয় ছেলেবেলাকার নীলার লকেট সেদিন সমুদ্র-জলে হারিয়ে গেছে। সোনার "বডিটা" আছে, কিন্তু তার আসল চিজ্ নীলাখানি খোওয়া গেছে।' বলতে বলতে তার কৃত্রিম গম্ভীর মুখখানি কৌতুকহাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল।

নীলিকা আরক্তিম মুখে উঠে দাঁড়িয়ে ভর্ৎসনার সুরে বল্‌ল—'সীতা! তুই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে দেখছি একেবারেই উৎসন্ন গেছিস। তোদের "লোরেটো"য় কি শুধু বাংলা-কথার মধ্যে হাজারটা ইংরাজী বুক্‌নি আর ফজলামী-ইয়ার্কীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছাড়া আর কিছুই শেখায় না? ছিঃ!'

মুকুর এই অনূঢ়া তরুণীদ্বয়ের গোপন-আলাপ শুনতে আর একটুও ইচ্ছুক ছিল না। প্রথমে তার নিজের নাম শুনে কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে শুনতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু তাদের আলাপের কিয়দংশ শুনেই সে সেখান থেকে অন্যত্র উঠে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল; কিন্তু উঠে দাঁড়ালেই রীতি ও তুহিন তাকে দেখতে পাবে এবং নীলিকারা তার অবস্থিতি জানতে পারলে অত্যন্ত অপ্রতিভ হবে ভেবে উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়ার মাঝেও মুকুরের সমস্ত কান মুখে ঝাঁ-ঝাঁ করে যেন আগুন ছুটছিল।

অসিতা নীলিকার ক্রোধ শান্ত করে তাকে বসিয়ে তখন অন্য আলোচনা সুরু করেছিল। তারা এইমাত্র কোনও বন্ধুর বাটীতে উৎসবোপলক্ষে নিমন্ত্রিতা হয়ে গিয়েছিল, সেই উৎসবসভারই আলোচনা ক'রছিল তখন।

অল্পক্ষণ পরে তারা উঠে চলে গেল। রীতি ও তুহিন হাত ধরাধরি করে ছড়ার মত সুর করে গাইতে গাইতে চলেছিল '—দি সী, দি সী, দি ওপ্‌ন সী, দি ব্লু, দী ফ্রেশ্, অ্যান্‌ড্ এভার্ ফ্রী—'

তারা দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে গেলে মুকুর পাড়ের উপর থেকে নেমে এসে, নীচে যেখানটায় তারা রুমাল পেতে বসে ছিল, তারই অনতিদূরে বালির পাড়ে হেলান দিয়ে অর্দ্ধশায়িতভাবে বসে পড়ল। সেখানটা তখন এসেন্সের সুমিষ্ট সৌরভে আমোদিত। মুকুরের অন্তরের মাঝে তখন ঐ সমুদ্রেরই ঢেউগুলি যেন অশরীরীভাবে প্রবেশ করে তাদের উত্তাল নর্ত্তন-আন্দোলন সুরু কবে দিয়েচে। সে তার ছবি রং তুলি প্যালেটের কথা বিস্মৃত হয়ে, মুদিতনেত্রে শ্রান্ত অবসন্নভাবে বসে রইল। গভীর মন্দ্রে সাগর-গর্জ্জন আর তার সঙ্গে উদ্দাম সমুদ্র-হাওয়ার ঢেউয়ের সাথে মাতামাতির বিচিত্রধ্বনি, গোঁ গোঁ সোঁ সোঁ হু হু নানা সুরে নানা শব্দে, কখনও উন্মাদের অর্থহীন হাসির মতো, কখনও শত্রু-কারারুদ্ধ বীরের নিষ্ফল রুদ্র গর্জ্জনের মতো, কখনও সদ্যঃ-পুত্রহারা জননীর বুক-ফাটা আর্ত্ত কান্নার মতো শ্রবণ-পথে এসে ঠেকতে লাগল তার!

৭

নীলিকারা কলকাতায় ফিরে গেছে। মুকুর ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি ও কোণারকের সূর্য্যমন্দির দেখে দাক্ষিণাত্যে সীমাচলের দিকে যাত্রা ক'রল। দাক্ষিণাত্যের প্রায় সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান ও তীর্থগুলি পর্য্যটন করে কলকাতায় ফিরল যখন, তখন বন্ধুবান্ধব ও সচিত্র মাসিকের সম্পাদকবর্গ তার ভ্রমণকাহিনী ও কতগুলি ছবি এঁকে এনেছে শুনবার উদ্গ্রীবতায় তাকে অতিষ্ঠ করে তুলবার জোগাড় ক'রলেন এবং সকলেই, বৈশাখের 'বঙ্গ-ভারতী'তে তার যে 'সাগরলক্ষ্মী' চিত্রখানি প্রকাশিত হয়েছে, তার উচ্চ প্রশংসায় শতমুখ হয়ে উঠলেন। মুকুর শুন্‌ল 'সাগরলক্ষ্মী' ছোটবড় সমস্ত বাংলা সাপ্তাহিক ও মাসিকে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেচে।

বৈঠকখানায় টেবিলের উপর মুকুর দেখ্‌ল—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের 'বঙ্গ-ভারতী' মোড়ক-সুদ্ধ পড়ে রয়েছে। বই দু'খানার মোড়ক ছিঁড়ে, বৈশাখের সংখ্যা খুলে দেখ্‌ল—প্রথমেই তার অঙ্কিত 'সাগরলক্ষ্মী' ছবিখানি প্রকাশিত হয়েছে।

তন্বী তরুণী মূর্ত্তি। সিন্ধু-বারি-সিক্ত তনুলতা ও আলুলায়িত ঘন-নিবিড় আর্দ্র কুন্তলজাল হতে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় বারিকণা ঝরে ঝরে পড়চে। প্রবাল-নির্ম্মিত বিচিত্র মুকুট শিরে গলদেশে থরে থরে সপ্তনর মুক্তাহার, পায়ে মণিময় নূপুর, প্রকোষ্ঠে বৈদূর্য্য-বলয় প্রভৃতি মরকত অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ শোভা-দীপ্ত। শুক্তি খচিত অঞ্চল-কোণ, সবুজ-শৈবাল-বসনা 'সাগরলক্ষ্মী' একহাতে শুভ্র শঙ্খ, অপর হাতে সুধাপাত্র নিয়ে অরুণোদয়-মূহূর্ত্তে সুনীল সিন্ধু-বক্ষ হতে উঠে আসছেন তাঁর স্নিগ্ধ রূপপ্রভায় সাগর-কূল আলোকিত করে!

আকুল সিন্ধু লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ-বাহু বাড়িয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নেবার জন্য উম্মত্তবেগে অলক্তক-রঞ্জিত পায়ের উপর তাঁর আছড়ে পড়ে বেদনায় শুভ্র ফেণপুঞ্জ উদ্‌গার করছে। অদূরে সুনীল জলরাশি ভেদ করে কনককান্তি বালারুণ জ্যোতির্ম্ময় সপ্তাশ্ব-রথে গগন-পথে উঠে আসছেন।

চিত্রখানি সত্যই চমৎকার হয়েছে। মুকুর চেয়ারে বসে অপলক নেত্রে টেবিলের উপর খোলা 'বঙ্গ-ভারতী'র বক্ষোনিবদ্ধ ছবিখানির দিকে চেয়ে ছিল। ছবিটির মুখখানি সম্পূর্ণ স্পষ্ট না হলেও অঙ্গগঠন, হস্তপদ, কেশরাশি অবিকল কার মত হয়েচে? মুখখানি মুকুর চেষ্টা করেই অন্যরকম ছাঁচে আঁকতে চেয়েছিল; কিন্তু তবুও নাসিকাটি, দাড়ির কাছে ছোট্ট টোল্‌টি; নিটোল গণ্ডে'র কাছটি অবিকল সেই নীলিকার মতই হয়নি কি?

মুকুর যখন ছবিখানি পুরী হতে এঁকে 'বঙ্গ-ভারতী'তে পাঠায়, তখন সত্যই বুঝতে পারেনি 'সাগরলক্ষ্মী'তে নীলিকার এতখানি সাদৃশ্য এসে গেছে। তা'হলে হয়তো সে ছাপতে পাঠাতই না; কিন্তু তখন বুঝতে না পারলেও এখন বেশ বুঝতে পারল, চিত্রপটে অহরহঃ ঐ মূর্ত্তি ফুটে ওঠায় চিত্রকরের অজ্ঞাতেই চিত্রে এই সাদৃশ্য এসে গেছে। মুকুর শূন্য গৃহে আপনা আপনি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠছিল, ছবিখানিকে

আর যেন নিখুঁতভাবে পর্য্যবেক্ষণ কর্ত্তে পারছিল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বইখানির মলাট বন্ধ করে জ্যৈষ্ঠের সংখ্যাখানি টেনে নিয়ে পাতা উল্টে উল্টে চোখ বুলিয়ে চল্‌ল। একটি কবিতাব উর্দ্ধে রচয়িত্রীর নাম চোখে পডতে চমকিতভাবে থেমে গিয়ে আগ্রহেব সহিত চেয়ে দেখ্‌ল। কবিতাটির নাম 'সাগর-স্বপ্ন'। রচয়িত্রী কুমারী নীলিকা রায়। মুকুর রুদ্ধ-নিশ্বাসে কবিতাটি সমস্তটা পড়ে ফেলল। খুব বড় কবিতা নয়—মাঝারি। ছন্দটি অতি সুন্দর, যেন সমুদ্র-তরঙ্গেরই মতো চপল-নৃত্য-তালে বেয়ে চলেছে। প্রথমটা উদাস-উচ্ছ্বাস স্বপ্নময় ভাবের হ'য়ে শেষেব দিকটা বড করুণ শান্ত ও বেদনা-ঝঙ্কৃত।

দরজার বাইরে হতে ডাক এল, 'মিস্টাব সেন আছেন?' মুকুর উঠে গিয়ে দেখল—বাইরে সুপ্রভাত দাঁড়িয়ে আছে। মুকুরকে দেখে সে সজোরে তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিযে বলল—'এই যে এসেছেন আপনি? আমাদেব জানাতে হয়! চিঠি লিখলে তো আপনাব জবাবই পাওয়া যায় না। আর্টিস্ট মানুষ, আপনার শিল্প-স্বপ্নেই বিভোব।'

মুকুর অপ্রতিভভাবে সলজ্জ হাস্যে মৃদু প্রতিবাদ কবে কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করায় সুপ্রভাত বাধা দিযে বলল— 'আমি এসেচি আপনার কাছে একটা দরকারে। আমি মাঝে মাঝে প্রায়ই এসে আপনি এসেছেন কিনা খবর নিযে যাই। আজ সন্ধ্যায় আমাদের ওখানে আপনার নিমন্ত্রণ। আপনাকে নিয়ে আমাদের একটা তর্ক বেধেছে, আপনি নিজে গিয়ে সেই তর্কের মীমাংসা করে দেবেন। আচ্ছা—আপনার "সাগরলক্ষ্মী" ছবিখানা আপনি নীলিকে মডেল কবে আঁকেননি কি? আর পুরীতেই তো ওটা এঁকেছিলেন? যদিও মুখখানা নীলির মতো অবিকল ঠিক হয়নি, তবুও আমাদের তর্ক বেধেছে ওটা নীলিকেই মডেল করে আঁকা। ঠিক কি না বলুন তো?'...সুপ্রভাত তার বড় বড় সরল আঁখিদুটির চঞ্চল দৃষ্টি সোৎসুকভাবে মুকুরের মুখের প্রতি মেলে সপ্রশ্ন আগ্রহে চেয়ে রইল।

লজ্জারুণ মুকুর রঙিণ রুমাল দিয়ে বার বার মুখের ঘাম মুছতে মুছতে নিতান্ত বিপন্ন অপ্রতিভ ও অপরাধীভাবে নতমস্তকে মৃদুস্বরে আমতা আমতা করে বলল্‌ —'হ্যাঁ—না—তা' ঠিক নয়। তবে কি জানেন—অনেক সময়ে অনেক জিনিষ দেখে সেটা "ব্রেণে" এমন "ডীপ্‌-লি" "ইম্‌প্রেস্ট" হ'য়ে যায় যে, নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কোন সময়ে সেটা "নিজস্ব" বলে প্রকাশ হয়ে যায়, তা' টেরই পাওয়া যায় না। আমি ঠিক ওঁকে মডেল করে আঁকিনি, তবে সমুদ্রতীরে হয়তো অনেকবার ওঁকে বেড়াতে দেখে, ছবিখানা আঁকবার সময়, নিজের অজ্ঞাতেই ওঁর মত ভঙ্গী বা সাদৃশ্য এসে গিয়েছে।' মুকুর নিজের কৈফিয়তে নিজেই আরও আরক্ত হয়ে উঠছিল।

প্রসন্ন-হাস্য-স্মিত বদন সুপ্রভাত, টেবিলের উপর সজোবে চাপড় মেরে বিস্মিত উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল—'ভঙ্গী কি মুকুরবাবু? একেবারে হুবহু! আশ্চর্য্যি কিন্তু আপনার ক্ষমতা ! সামনে দাঁড় করিয়ে পোরট্রেট্‌ই কত সময়ে ঠিক হয় না, আর আপনি

নীলিকে "মডেল্" না করেও চমৎকার এঁকেছেন কিন্তু। যাই হোক্, তর্কে দেখচি জিত্‌টাই হবে ঠিক। আপনাকে কিন্তু আজ সন্ধ্যায় ভবানীপুরে আমাদের বাড়ী যেতে হবে। ঠিকানা জানেন তো?— নং রসা রোড। এই কার্ডখানা রেখে গেলুম—নিশ্চয় যাবেন। যাই, "অনুরূপ"কে তার বাড়ীতে খবরটা দিয়ে আসি। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার তারই আগ্রহ বেশী। নাম শুনেছেন বোধ হয়? ডাক্তার অনুরূপ মল্লিক, আমার খুব "ফ্রেন্‌ড্"। নীলির সঙ্গে তার বিয়ের "এন্‌গেজমেন্ট্" হয়ে গেছে। আমিই অবিশ্যি সব ঠিকঠাক করলুম। আসচে জুলাই-এ বিয়ে...আপনি যাবেন কিন্তু নিশ্চয়। অনুরূপ আপনার সঙ্গে আলাপের জন্য ভারী উৎসুক। যাবেন—ঠিক—নিশ্চয়ই—', সুপ্রভাত বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল। 'চল্লুম তা'হলে,— মনে রাখবেন—', সুপ্রভাত আরও কত কি অনর্গল বকে গেল, মুকুরের কানে শব্দগুলি প্রবেশ করলেও তার কিছু অর্থ বোধ হচ্ছিল না। শুধু শেষকালে—পুনঃ পুনঃ 'নিশ্চয় যাবেন' 'যাবেন তো?' শব্দে অর্থহীন বিমূঢ় দৃষ্টিতে যন্ত্রচালিতবৎ সম্মতিসূচক একটু ঘাড় হেলা'লো।

সুপ্রভাত একবার বিস্মিত নয়নে তার বিবর্ণ মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মুকুর রক্ত-লেশহীন বিবর্ণ মুখে নিশ্চলভাবে চেযারে বসে রইল। সামনে টেবিলের উপর জ্যৈষ্ঠের খোলা 'বঙ্গ-ভারতী'র পাতাগুলি বাতাসে ফরফর্ করে উল্টে যাচ্ছিল। মুকুরেব নিস্পলক দৃষ্টির উপরে বড় বড় হরফে হেডিং লেখা 'সাগর-স্বপ্ন'টি একবার জেগে উঠতেই, মুহূর্ত্ত মধ্যে আরও অনেকগুলি পাতা ফর্‌ফর্ করে তার উপর উল্টে পড়ে কোথায় তাকে মিলিয়ে দিল।

ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩।

ভাই-ফোঁটা

অ মা—মাগো, তুমি কোথায়? ভাঁড়ারঘরে না কি?... পেন্নাম ক'রবো—পা ছুঁতে পারি?

'...'

নন্তুবাবু! দিদিমাকে পেন্নাম করো। চিনু, জোনাকি, দিদিমাকে পেন্নাম কর রে।

'...'

হ্যাঁ মা, উপস্থিত সবাই ভালোই আছেন। তোমার জামাই বিন্ধ্যাচলে হাওয়া বদলে আসাব পর থেকে ডিসপেপশিয়াটা একটু কমেছে।

'...'

শাশুড়ীর শরীর ভালো নয়, সেইজন্যেই তো আসতে পারিনে মা! বুড়োমানুষ, বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছেন, তাঁকে ফেলে কি ক'রে আসি?

হ্যাঁ মা, দাদা কোথায়? নন্তু, ছুটে দেখে আয় তো—মামাবাবু বৈঠকখানায় আছেন কি না?

'...'

অ্যাঁ—দাদা বেরিয়ে গেছে? আচ্ছা, কিরকম ছেলে বাপু? কাল আমি এত করে বলে দিলুম—'দাদা, কাল সকালে বাড়ী থেকো, কোথাও বেড়িও না, আমি তোমাকে ফোঁটা দিতে যাব', তা' দাদার বুঝি একটা দিনও একটু তর সইল না? আচ্ছা আসুক আজ বাড়ী! 'কুঁদুলী' নাম তো দিয়েচেই, আজকে দেখাবো মজা।

'...'

তবুও মা, ছেলেটির তুমি বিয়ে দেবে না! এত বয়স হ'ল, সংসারের গোছগাছের দিকে একটুও দাদার মন হ'ল না। দিন-রাত্রি কাব্য কবিতা মাসিকপত্র আর সাহিত্যিক বন্ধুদল নিয়েই—ঐ যে বাবু আসছেন!...

আচ্ছা দাদা! তোমার আক্কেল কীরকম বলো তো? আজকের দিনেও কি তুমি একটু বাড়ী থাকতে পারলে না?

'...'

যাঃও, আমি তোমার কথা শুনতে চাই না। একটা মাত্তর ছোট বোন—তার জন্যে তুমি একটা দিনও বাড়ীতে অপেক্ষা করে থাকতে পারলে না! বন্ধুরা তোমার এতই বেশী আপনার! আমি তোমার কোনও কৈফিয়ৎ শুনবো না।

'...'

'হ্যাঁ—'রমা' নাম না রেখে 'রণচণ্ডী' নাম রাখলেই ঠিক হ'ত বৈকি। সত্যি কথা বললেই 'রণচণ্ডী' নাম হয়।

এখন দাঁড়াও দেখি, আজকের দিনে নমস্কার ক'রতে হয়। সতেরো মাসের

বড় বয়সে,—সেটা আজকে না-মেনে উপায় নেই।

'...'

নমস্কার করলুম, ঐ আশীর্ব্বাদ? 'অসংখ্য জোনাকির আলোকে গৃহ আলো হোক্।' নিজে বিয়ে করোনি, বেশী মেয়ে হওয়া যে কত বড় অভিসম্পাৎ তা' তুমি বুঝবে কি ক'রে? বাঙালীর ঘরে ঠাট্টাচ্ছলেও ও-কথা বলতে নেই!

'...'

বুড়ো বয়স অবধি আইবুড়ো রেখে মা'ই তোমার মাথা খাচ্ছেন। মনে ভাবো এখনও মায়েব সেই কচি খোকাটিই আছো! সব ভার মাযের উপর চাপিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্ত আছ। একটি শক্ত বৌয়ের হাতে পড়তে, তা'হলে দিনরাত্রি এত কাব্য-চর্চ্চায় মশ্‌গুল থাকা বেবিযে যেত!

'...'

দ্যাখো দাদা, আমাকে রাগিও না বল্‌ছি।

নাও, ঢেব হযেছে। ওপরে চলো দেখি! বেলা হয়ে গেছে ঢের। এই জোনাকি! মামাবাবুব কাঁধ থেকে নাম। বুড়ো-ধাড়ি মেয়ে—কাঁধে চড়তে লজ্জা কবে না বুঝি? মামাবাবুকে পেন্নাম করেছিস—বুড়ো মেয়ে, সবই কি শিখিয়ে দিতে হবে?

'...'

না দাদা! আমি আজই যাবো ভাই! শাশুড়ী বুড়োমানুষ, একলা আছেন। আমি না গেলে তাঁর কষ্ট হবে। তুমি ও-বেলায কিন্তু আমাদের ওখানে নিশ্চয় খেতে যেও, নইলে আমার শাশুড়ী ভাবী দুঃখু করবেন। তিনি একেই আজকাল দুঃখু করেন —'সরোজ আর মোটে আমার কাছে আসে না, আগে কত আসতো।'

'...'

হ্যাঁ ভাই, তিনি সত্যিই তোমায় বড় ভালবাসেন। সকলের কাছেই তোমার সুখ্যাতি করে বলেন—'আমার বৌমার ভাইটির মত সুন্দর স্বভাবের ছেলে দেখা যায় না!' তিনি কিন্তু ভাই তোমার বিয়ের জন্যে ভারী ব্যস্ত। বলেন —'আমার যদি আইবুড়ো মেয়ে থাকতো, সরোজকে জামাই করে সাধ মেটাতুম।'

'...'

তোমার দাদা, সবেতেই ঠাট্টা আর চালাকি!

'...'

না—দাদা, তুমি আমার ছেলে-পিলের সামনে আমাকে 'মেনি' বলে ডেকো না বলচি। কেন? রমা বলতে কি হয়?

'...'

না, দেশসুদ্ধ লোক সবাই 'রমা' বলচে, আর তুমিই শুধু পার্ব্বে না!

'...'

অ মা—মা—দ্যাখো না,—দাদা আমার ছেলেদের সামনে আমার নামের

ছেলেবেলাকার ছড়া'টা বলছে!

'...'

না বাবু, আমি ওসব দেখতে পারি না। বোসো না, তোমাব বিয়ে হোক, আমিও তোমার বৌয়েব কাছে তোমার নামের সেই— 'হাঁদুবাবু যাদু কিন্তু দুদু খেতে ক্রুদ্ধ' —ছড়াটা বলে দেবো অখন। ছেলেবেলায় এই ছড়াটায কেমন ক্ষেপতে, মনে আছে?

'...'

হ্যাঁ—বৌ আসবে কি না দেখে নেবো। সবাই-ই অমন বলে গো! শেষকালে আবার সেই বৌয়েবই পাঁইজোরেব পাকে এমন জড়িয়ে যায় যে, জোট ছাড়িয়ে খোলা শক্ত হযে ওঠে!

'...'

আচ্ছা—আচ্ছা—আমার পাঁইজোরেব পাকে কে জড়িয়েছে, তাব খববে তোমার কাজ নেই! জ্বালাতন কোরো না বলচি দাদা!

'...'

মুখবা হ'বো না তো কি? তুমি দিনবাত্রি আমার সঙ্গে লাগো কেন? আমি ছেলেবেলায কবে কি-করেচি না-কবেচি—কিসে বাগতুম কাঁদতুম,—সব কথা টুক-টুক কবে ভগ্নীপতিব কাছে লাগিয়ে এসো কেন? সেই নিয়ে আমাকে দিনবাত্রি ক্ষেপিয়ে তোলে।

এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে শুধু আমাব সঙ্গে লাগবে, না, ভাই-ফোঁটা নেবে—বলো? বেলা দশটা অবধি উপোস করে খালি বমা-পোড়ারমুখীকে বাগালেই পেট ভ'ববে কি?

'...'

দ্যাখো না মা,—দাদাই তো আজকেব দিনে ঝগড়া ক'রচে খালি-খালি!

মা, চিনু-নন্তু ওরা গেল কোথায়? ওরা ছাদে উঠেছে বুঝি? চিনু—ও চিনু, নেমে আয শীগগিব। মামাবাবুর এই আসন-টাসনগুলো ওপরে নিয়ে চ'।

'..'

না না ভাই, তোমায ক'রতে হবে না। ওবাই নিয়ে চলুক।

'...'

না মা, ঠাই আমিই কোরবো। আজ যে আমাকেই সব ক'রতে হয়। দাদাব জলখাবার আমি সব নিজের হাতে ঘবে তৈরী করে এনেছি। ও-বেলাকার রান্নাও আমি নিজে ক'ববো দাদাব জন্যে।

চিনু, তুই মা তোব মামাবাবুর আসনখানি আব গেলাস রেকাবি, বাটিগুলা ওপবে নিয়ে চল তো! আমি চন্দনের রেকাবি, মশলাব থালা এইগুলো গুছিয়ে নিয়ে যাচ্চি। দেখিস!! সাবধানে সিঁড়িতে উঠিস! শাদা পাথরের গেলাস আর আসনখানা না হয রেখে যা। রেকাবী আর বাটীগুলো আগে নিয়ে যা, তারপবে আসন গ্লাস নিয়ে যাবি।

এবার জয়পুর থেকে এই শাদা পাথরের বাসন-সেট্ দাদাকে ভাই-ফোঁটায় দেব বলে এনেছি মা! আর এই ধুতি-চাদর আমার নিজের হাতে-কাটা সুতোয় তৈরী!

'...'

ধুতিটা বড্ড মোটা হয়েচে, না দাদা? মুগা'ব পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে দ্যাখো তো—ঠিক হয় কি না? আমি তোমার সেই ছেঁড়া খদ্দরের পাঞ্জাবীটার মাপে এটা কেটেছি।... দেখি?...না—ঠিকই হয়েছে। ঝুলটা বোধ হয় একটু বড় হয়েছে, না? ও' বোধ হয় ধোপ পড়লে গুটিয়ে সমান হয়ে যাবে!

'...'

না দাদা! ও' আসন কেনা নয়। ও' তোমার চিনুর বোনা। মাঝখানে 'বন্দেমাতরম'টা আমি লিখে দিয়েছি। চারপাশের ফুল লতা চিনুই কবেছে। ছেলেমানুষ, এই প্রথম বুনেছে কি না, তত পরিষ্কার হয়নি!

'...'

না দাদা, ও' মোটে বিলিতী সুতো নয়। পি. সি. রাযের রংয়ের সুতো। খাঁটী দেশী। আমি কি জানি না বিলিতী হলে তোমাব ব্যবহারে লাগবে না!

দাদা, ওপরে চলো ভাই! ঢের বেলা হয়ে গেছে, তোমার তেষ্টা পেয়েছে নিশ্চয়।

'...'

তোমার এখনও চান কবা হয়নি? যাও যাও—নেয়ে এসো শীগগির। পুরুষ মানুষ এত বেলা অবধি জল না খেয়ে রয়েচো—কত কষ্ট হচ্চে। তুমি চট করে এসো, আমি ওপরে চল্লুম।

মা—পিদিম-পিলসুজ কি ভাঁড়ারঘরে আছে?

'...'

না—তোমায় আসতে হবে না, আমিই যাচ্চি।

'...'

না, এই যে আমি নেমে এসেছি। আমি পিদিম্ সাজিয়ে নিচ্চি। একটু গাওয়া ঘি চাই যে মা, পিদিমে দেব। আর, একটু তুলো—সলতে পাকাতে হবে। এই যে —শাঁখ এইখানেই আছে—পেয়েচি।

'...'

হ্যাঁ মা, সত্যি! দাদা ঘরখানার যা' অবস্থা করে রেখেছে, দেখলে যেন কান্না পায়! টেবিলটা যেমনি নোংরা, বইয়ের আলমারীগুলো তেমনি ধুলো-পড়া হাঁটকানো! জিনিষপত্র এলোমেলো ছড়ানো। ঘরখানা কী কাণ্ড করে রেখেছে তার ঠিক নেই। আমি আসচে রবিবার আসবো—এসে এই ঘর পরিষ্কার করে যাবো। আর কাপড়ের আলমারী বইয়ের আলমারীগুলো ঝেড়েঝুড়ে রোদ্দুরে দিয়ে গুছিয়ে রেখে যাবো। তোমার ছেলেটি কিন্তু বিশ্ব কুড়ে মা! তুমি ওর বিয়ে দিলে না, এর পরে তুমি অবর্ত্তমানে ওর কী অবস্থা হবে ভাবো দেখি? নিজের জামাকাপড় পর্য্যন্ত আজ

অবধি ও নিজে ঠিক করে রাখতে শিখলে না!

'...'

হ্যাঁ—তোমার ঐ এক-কথা! 'কি কববো? শোনে না!' তুমি কি চিবকালই সংসারে খাটবে নাকি? বুড়ো হযেচো—তোমার ছুটী নেবার সময় হয়নি কি? তোমারও কি একটু সেবা-যত্ন'র লোক চাই না? বুড়ো বয়সে বৌয়েব সেবা-যত্নও তো মানুষ আশা করে!

'...'

হ্যাঁ—আমি মাকে কুপরামর্শ দিচ্চিই তো! মা কি চিরকালই এমনি তোমার সেবা করবেন না কি?

কবিমশাই! তোমার সাহিত্যিক বন্ধু-টন্ধুরাও তো কৈ দেখেশুনে একটা বিয়ে-থা দিযে দেয় না! কারুর আইবুড়ো বোন-টোন নেই কি?

'...'

উহুহু,—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—বড্ড লাগে দাদা—আর ব'লব না। বাবা গো—এমনি চুলের মুঠি ধরেছো—মাথাটা টনটন ক'রছে! ভালো কথা বললুম, আমি 'রাক্কুসী পোড়ারমুখী' বৈকি!!

'...'

বেশ হয়েচে। মা ঐ ও-দালান থেকে বক্‌চেন তোমায়, শোনো। কেমন মজা? ...আব আমার চুলের মুঠি ধরবে? হি হি হি—

'...'

না না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি লক্ষ্মীটি! আর ক'রবো না! আমায় রাম-চিম্‌টি কেটো না। আমি তোমার রাম-চিম্‌টিকে বড় ভয় করি।

আচ্ছা, ছেলেবা কি ভাববে বলো দিকিন? বুড়ো মামা আর তাদের মায়েতেই যদি এমন খুনসুটি ঝগড়া করে, তা'হলে ওরাই বা লাঠালাঠি ক'ববে না কেন?

আচ্ছা আচ্ছা। এখন আজকে ভাইফোঁটা নিয়ে খাবে-দাবে কি না বলো? এসো এদিকে।

'...'

না ওখানে নয়। এই আসনের ওপর বোসো। ও চিনু, দেশলাইটা নিয়ে আয় তো মা, ঘিয়ের পিদিমটা জ্বালিয়ে দে। এক ছড়া শিউলিফুলের মালা এনেছিলুম, সেটা শুকিয়ে গেছে। কি আর হবে! এই শুকনো মালাছড়াই মাথায় গলিযে নিয়ম-রক্ষে করে নাও দাদা! কোরা ধুতি পরে গরম হচ্ছে বুঝি? আচ্ছা, ফোঁটা নেওয়া হলে উঠে ছেড়ে ফেলো অখন্। এই চিনু, শাঁখটা বাজা এইবার—

ভায়ের কপালে দিলুম ফোঁটা
যমের দ্বোরে পড়লো কাঁটা—

যমবাজ যেমন অমব—
(আমাব) ভাই তেমনি হোন অমব!

রোসো বোসো—খাওয়ার জন্যে অত ব্যস্ত কেন? আরও দু'বার মন্তোর বলে ফোঁটা দিতে হয় যে—

'...'

আঃহা, দাদা, তুমি ভারি পেটুক কিন্তু। আমাকে মন্তোবটা আর দু'বাব বলে ফোঁটা দিতে দাও।

ভাইযেব কপালে দিলুম ফোঁটা—

'...'

এই হয়েচে হয়েচে। আর একটিবার আছে—লক্ষ্মীটি দাঁড়াও।

ভাইযেব কপালে দিলুম ফোঁটা—

লক্ষ্মীটি ভাই, আর একটু থামো—বোসো—হাত পাতো—এই দুধ-গন্ডূষটা নাও—

ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভং।
প্রীতয়ে যমবাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ।।

ওটা চুমুক দিযে খেয়ে নাও। হ্যাঁ হয়েচে। বোসো, প্রণাম কবি আগে।

'...'

প্রণামে কি মন্তোব বল্লুম বলচো? মন্তোর কি আব বলবো? বল্লুম—জন্ম-জন্মান্তরে তোমাকেই যেন দাদা পাই। তোমার কপালে ফোঁটা দিতে দিতে যেন মবতে পারি।—

আচ্ছা, তুমি আমায কি আশীর্ব্বাদ ক'বলে বলো তো?

ভাবতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

'—হায়রে হৃদয়, তোমার সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথ-প্রান্তে ফেলে যেতে হয়!'

বাপ-মায়ে নাম রেখেছিল রাণী। সেই নামেই সারাজীবন কেটে গেল। নাম সার্থক হয়ে উঠেছিল কিনা জানা নেই।

ছেলেবেলায় গণৎকার এসে হাত দেখে বলত—এ মেয়ের রাজার ঘরে বিয়ে হবে—

রাণী হওয়ার পাট্টা তার হাতের তালুর রেখায় বিধাতা নাকি স্পষ্ট করে গোটা-গোটা অক্ষরে লিখে দিয়েছিলেন!...

মাথার চুল, গায়ের রং, মুখশ্রী থেকে তার হাঁটার ভঙ্গি, চোখের চাউনি, হাসির ধরণ সবেতেই নাকি রাণী হওয়ার সুলক্ষণ সুস্পষ্ট।—বাড়ির পুরানো দাসীরা—আশ্রিতা বিধবার দল থেকে আরম্ভ ক'রে গদির ম্যানেজার, আমলা, খাজাঞ্চি পর্যন্ত সকলেই এই এক কথা বলত।

কিন্তু ভাগ্যদেবীর খেয়াল হল অন্যরকম। ব্যবসায়ে প্রচুর লোকসান গেল। বছরখানেকের ঘূর্ণীপাকে সরকার, দ্বারবান, দাসদাসীর দলসুদ্ধ মস্তবড় বাড়িখানা —আর ম্যানেজার, গোমস্তা, নায়েব, খাজাঞ্চি, হিসাবনবিশ, নকলনবিশ প্রভৃতি সমেত কারবারটি কোথায় যে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল তার চিহ্নমাত্র রইল না!

অবশিষ্ট ঋণের রাশি, বিপুল অপমান ও মনোকষ্টের বোঝা এবং রাণী ও রাণীর মাকে নিয়ে—তার ব্যবসায়ী পিতা নেবুবাগানে একটি সরু গলির ভিতর দু'খানি একতলা ঘর ভাড়া করল।

তখনও রাণী রান্নাঘরের ভাতের দিকে যেতে পারে না। মোটা চালের ভাতের রাঙা রাঙা দানাগুলো পাতের উপরে বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে রেখে—ভারী মুখে 'ক্ষিদে নেই' বলে ছলছল চোখে আঁচাতে উঠে যায়!...বয়স সবে দশ বছর।

এমনি করে আরও একটা বছর কাটল বটে, কিন্তু রাণীর বাপের এত দুঃখ সইল না।

রাণীর মায়ের সিঁথির সিঁদুর, হাতের রুলি, শাড়ির পাড়টুকু মুছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেবুবাগানের ভাড়াকরা একতলা-ঘরের সংসারটুকু, যাবতীয় তৈজসপত্রসহ অন্তর্হিত হ'য়ে গেল।

এবার রাণীকে নিয়ে রাণীর মা এলো এক অতি দূরতম সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ি।

বাড়িটা রাজপ্রাসাদতুল্য বটে,—কিন্তু রাণীর সিংহাসন মিলল—রান্নাঘরের হেঁসেলে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ির উপর।... মা মাইনে নিয়ে রাঁধুনীর কাজে ভর্তি হল।

...মায়ের শরীর দিন দিন ভেঙে পড়ছে।...মাকে উঠিয়ে দিয়ে রাণী ধোঁয়ার কুণ্ডুলির ভিতরে নিজের হাতে হাতা খুন্তি নিয়ে হেঁসেল-রাজ্য পরিচালনা করে!

রাণীর মা'ও আর সইতে পারলে না। তারও খেয়া নৌকা পার-ঘাটে এসে ভিড়ল।... যাবার আগে মা তার মেয়েকে বুকে করে মাথায় হাত রেখে অনেকক্ষণ ধরে নীরবে আশীর্বাদ করে গেল!...বোধ হয় রাণী হওয়ারই আশীর্বাদ!...

মাসকতক রাণী অর্ধাহারে অনিদ্রায় আশঙ্কায় উদ্বেগে অশ্রান্ত অশ্রুজলে কাটালে!... তারপর কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি'র সিংহাসনে একচ্ছত্র কায়েমি অধিকার পেলে!—রাঁধুনীব কাজে এতদিন সে মায়ের সহকারিণী ছিল মাত্র!...

কিন্তু সময় তার কাজ করতে অবহেলা করলে না,—দুঃখী হলেও তার দান থেকে তো কেউ বঞ্চিত হয় না। রাণীর সারা অঙ্গে নূতন সৌন্দর্য সম্পদ্ বিকশিত হ'য়ে উঠছিল আপনা আপনিই!

বাটনা বেটে রান্না করে, হাত দু'খানি তার স্বাভাবিক কোমলতা অনেকখানি হারালেও, দশ আঙুলের নখ ক্ষয়ে ক্ষয়ে চতুর্থীর চন্দ্রেব সাদৃশ্য ধারণ কবলেও, চাঁপার বরণ গালে কিন্তু তার গোলাপ ফুটতে শুরু কবেছিল।...পুষ্পিতা মাধবীলতার মতো সারা তনু তার শোভন ও সাবলীল হয়ে উঠছিল। ডাগর চোখের কালো তারায় নূতনতর আবেশের সরম-রঙিন ছায়া ঘনিযে আসছিল।...

গৃহকর্ত্রী এই গলায়-পড়া 'মা-বাপ-খেগো' মেয়েটার জন্য উদ্বিগ্না হয়ে উঠলেন।

'হা-ঘরে' মেয়ের আবার এত রূপ কেন? রূপ নয়তো, যেন জ্বলন্ত অনলশিখা। ও' শুধু নিজে পুড়ে ছারখাব হয় না—অন্যকেও ছারখার করে দেয যে!...

—মেয়ে তো নয় যেন আগুনের ফুলকি!... অনেক আগে থেকেই তার বেটাছেলেদের পরিবেষণ করা বন্ধ হয়েছিল—এখন রাণীকে কড়া হুকুমে সতর্ক করা হল—খবরদার! বেটাছেলেদের ছায়া মাড়াবিনে!—

রাণী রান্না করে, বাটনা বাটে, দরকার হলে বাসনও মাজে। তার নাম কিন্তু আগেকার মতো এখনও 'রাণী'ই রইল,—তার আশৈশবের রাণী হওয়ার স্বপ্ন—সেটাও আগেকার মতো এখনও তার মন-রাজ্য জুড়েই রইল!...

দুপুর বেলা দোতলার বড় ঘরে শীতল পাটি'র উপরে নিদ্রিতা গৃহিণীর পাকা চুল তুলতে তুলতে রাণী খোলা জানালা-পথে বাইরের পানে তাকিয়ে থাকে!...

শরৎকালের রঙিন রৌদ্র-বিভাসিত স্বপ্ন-ভারাক্রান্ত স্তব্ধ অলস মধ্যাহ্ন। আকাশ স্বচ্ছ, গাঢ়-নীল। উজ্জ্বল সাদা মেঘপুঞ্জ এলো-মেলো বিক্ষিপ্তভাবে ভেসে চলেছে!...চিলগুলো ক্রমশ উঁচু হ'তে আরও উঁচুতে উঠে চলন্ত মেঘের নিচে পাক খেতে খেতে কম্পিত করুণ চিৎকারে ক'কিয়ে উঠছে!...

জানালার বাইরের নিমগাছটির সরু সরু পাতা স্বল্প বাতাসের মৃদু ছোঁয়ায় ঝিরঝির্ করে কাঁপছে। খিড়কির পুকুরের ওপারে ঘন বাঁশের অরণ্যে বাতাস কখনও করুণ সুরে বেণু বাজায়,—কখনও পল্লবে পল্লবে নূপুরের সুমিষ্ট শিঞ্জন তোলে!

...পুকুরের স্বচ্ছ থির জলের আধখানি, বনের গাঢ় ছায়ায় কালো,—অপরার্দ্ধ দুপুর-রৌদ্রে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে কেবলই চকচক করতে থাকে—যেন কার প্রতীক্ষায় তার গোপন অন্তরখানি উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে!

রাণী চেয়ে চেয়ে ভাবে—কত কীই ভাবে!... অতীতকে সে কোনওদিন ভাবতে শেখেনি...বর্ত্তমানকেও সে কখনও ভাবতে পাবতো না...ভবিষ্যৎ যে চিরদিন তাকে বাণীর মুকুট পরিয়ে বেখেছে!...শৈশব হ'তে আজ পর্যন্ত তার চোখের সামনে, জ্যোতিষ-নির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎই শুধু—বিচিত্র শোভায় সম্পদে সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে বস-পরিপূর্ণ হয়ে জেগে আছে!...ব্যর্থ অতীত তুচ্ছ বর্ত্তমান—তার দিকে নজর দেবার সময় কোথায়? আবশ্যকই বা কি?...

ভাবতে ভাবতে পাকাচুল বাছা বন্ধ হ'য়ে যায়,—নিদ্রিতা গৃহিণীর মাথায় হাতখানি রেখে বাণী স্তব্ধ আড়ষ্ট হ'য়ে বসে' থাকে!

রান্নাঘরেব ধোঁয়া-জালের আড়ালে, মাছে হলুদ মাখাতে মাখাতে, কিম্বা কোটা তরকারী জলে ধুতে ধুতে চিত্ত তার অকাবণে চঞ্চল অধীর হ'য়ে ওঠে!... মনে হয় কখন সে তাব নিজের সংসারের সুন্দর আসনখানিব উপরে গিয়ে বসতে পাবে! ...এই স্নেহ, প্রেম, করুণাহীন পবের ঘবের নীরস ঘর-কবণা—হেয়-দাসীবৃত্তির আর কত বাকী?... ...

—হঠাৎ দিন এলো।

মোতির মালা নিয়ে রাজপুত্র নয়,—সন্ধ্যার পর কাপড় কেচে ঘাট হ'তে ফিরবার পথে— কর্ত্তাব খাস ভৃত্য মধু খানসামা—হঠাৎ তার চলাব পথ রোধ করে' দাঁড়াল'। ফতুয়াব পকেট থেকে একজোড়া পাতলা সোনার পাত-মোড়া তামা'র শাঁখা বের করে'—মিনতি-করুণ সপ্রেম কণ্ঠে কি যেন নিবেদন ক'বল। তার একটা কথাও রাণীর কানে পৌঁছাল না। মধু তার হাত ধরবাব জন্য হাতখানি বাড়াতেই সে হঠাৎ ভয়বিহ্বল কাতরস্বরে চিৎকার করে' উঠল!

মধু তাড়াতাড়ি রাণীর মুখে হাত চাপা দিতে গেল, কিন্তু অকস্মাৎ পিছন দিক থেকে কে যেন মধুর ঘাডটা সজোরে চেপে ধরে মাটির দিকে নুইয়ে ধ'রল!

অতর্কিত আক্রমণে তার হাত হ'তে তামার শাঁখা দু'গাছা ছিটকে রাস্তায় পড়ে গেল।... পিঠেব উপরে সজোরে এক লাথি—আবার একটা লাথি!...

—হারামজাদা! এতবড় তোমার আস্পর্দ্ধা!!...

—দোহাই মেজবাবু! ছেড়ে দিন—আপনার পা' ছুঁয়ে বলছি, আব জীবনে কখনও এমন হবে না! গর্ভধারিণী মাযেব দিব্যি—

মধু ছাড়া পেয়ে দ্রুতপদে ছুটে পালাল।

ভয়বিহ্বলা কিশোরীর সিক্তবাস-মণ্ডিত কম্পিত তনুলতা—নয়নে শঙ্কা ও কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত কাতর ছায়া—

মেজবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ব'ললেন—তুমি বাড়ি চলে' যাও, ভয় নেই। সন্ধ্যাবেলা আর কখনও ঘাটের পথে একলা এসো না।

বাণী মাথা হেঁট করে' আস্তে আস্তে বাড়ির পানে চলে গেল।—শঙ্কা ও ভয় অন্তর্হিত হ'য়ে তখন রাজ্যের বিপুল লজ্জা তার সারা দেহ-মন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

কর্ত্রীর এই মেজ' ছেলে বিশ্বনাথ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। ছুটিতে সে বাড়ী এসেছে। ...হঠাৎ একদিন মায়ের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করে' বসল—বাণীকে সে বিয়ে করবে।

—সে কি রে? রাঁধুনীর মেয়েকে বিয়ে ক'রবি কি?

—কেন? ও তো চিরকাল রাঁধুনীর মেয়ে ছিল না।—রাঁধুনীর মেয়ে হ'য়ে জন্মায়নি।—জন্মেছিল তো বড়লোকের মেয়ে হ'য়েই—

—তা' বলে তুই নিজের বাড়ীর রাঁধুনীকে বিয়ে ক'রবি? তুই কি ক্ষেপেছিস বিশু?

—নিজের স্ত্রী কি নিজের বাড়ী রান্না করে না?

—চুপ কর, অমন কথা মুখেও আনিসনে—কর্ত্তা শুনলে অনর্থ করবেন।

বাণীর কানে কথাটা সেইদিনই গিয়ে পৌঁছেছিল। মেজদাদাবাবুর প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় তার তরুণ হৃদয়টা ভরে' উঠল। সে মনে মনে তাঁর পায়ে নমস্কার জানালে। কিন্তু কর্ত্তাও শুনলেন এবং অনর্থও ঘটল।

বিশু রাগ করে' কলিকাতায় চলে গেল এবং কর্ত্তাও রাগ করে' পড়ার খরচ পাঠানো বন্ধ করলেন।...

বাড়ীসুদ্ধ লোকের রাগটা গিয়ে পড়ল বাণী'র উপরেই।—বাণীও এ'জন্য নিজেকে অপরাধিনী মনে না করে' থাকতে পারলে না!...তারই জন্যে তো এমন দেবতুল্য মেজদাদাবাবুর কর্ত্তার সঙ্গে মনোমালিন্য হ'ল।...অনুতাপ ও ধিক্কারে তার অন্তর পূর্ণ হ'য়ে উঠলো!

মধু খানসামা কর্ত্তার কাছে সঙ্গোপনে বহু গোপন-তথ্য বিজ্ঞাপিত ক'রলে।... মেজবাবু'র চেয়ে বাণীরই দোষের ভাগ বেশী। কারণ সে'ই যখন-তখন ঘাটের পথে, বাগানে,—এ-ধারে সে-ধারে—সন্ধ্যার ছায়ায় মেজবাবুর সঙ্গে দেখা করতো।

এবারে মেজবাবু ক'লকাতা থেকে রাণীর জন্যে যে সোনা-বাঁধানো তামার শাখা এনে দিয়েছেন—সেটাও কর্ত্তাকে সে চুপি চুপি দেখাতে ভুলল না।

কর্ত্তা অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে ব'ললেন—দাও হারামজাদীকে জুতো মেরে তাড়িয়ে—গিন্নি ব'ললেন—চুপ করো, লোক হাসবে। ছেলেটা'র কেলেঙ্কারী জানাজানি হ'য়ে যাবে। নিজেদের জাত— ভদ্রঘরের মেয়ে—বের করে দিলে অধর্ম্ম হবে—যেখানে হোক দেখেশুনে একটা বিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দাও।—আপদ চুকবে—

রাণীকে গ্রহণ ক'রতে মনিবশ্রেণী হ'তে ভৃত্যশ্রেণী পর্য্যন্ত বাড়ির সকল পুরুষই মনে মনে রাজী ছিল,—কিন্তু তাদেব সঙ্গে জাতে-কুলে মিলবে না কিম্বা মর্য্যাদায় মিলবে না ব'লে বিয়ে ক'বতে কেউ অগ্রসর হ'ল না! সকলেই মনের ভাব গোপন ক'রে—মেজবাবু'ব এই নিম্নরুচি ও হীন অসংযত প্রবৃত্তির প্রতি বিপুল-বিস্ময় প্রকাশ ক'রতে লাগল।

বাণী কিন্তু এ'সব শুনে মবমে মবে গেল!

বাড়ির পুরানো বাজার-সবকাব নরহবি আইচ ব'ললে—তাব একটি ভাইপো আছে। ক'লকাতায় খিদিবপুরে'র জেটিতে জাহাজের কাজ কবে। মাইনে ছাব্বিশ টাকা,–কিন্তু উপরি মাসে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট! একটা বিয়ে করেছিল, সে বউটা গলায় দড়ি দিয়ে মবেছে। ছেলেপুলে নেই, বয়সও অল্প—

কর্ত্তা-গিন্নী সাগ্রহে ব'ললেন—এখুনি—এখুনি—

সেই মাসেবই সামনের লগ্নেই শাঁখ বাজিয়ে বাণীর বিয়ে হ'য়ে গেল!

রাণীর এবাব নূতন জীবন শুরু হ'য়েছে!

নবহবিব ভাইপো'র নাম ছিল ভূপতি।...দোজবরে' ভূপতিব গলায় মালা দিতে রাণী একটুও দুঃখিতা হয়নি, ববং মনে মনে বোধ হয খুসীই হ'য়েছিল—এইবার সে নিজেব ঘরে নিজের সংসার ক'রতে পাবে ভেবে!—

বিয়ের দিন বাব বার বাবাকে মাকে মনে প'ড়ে চোখদু'টি তাব কেবলই অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠেছিল! কিন্তু বিয়ের দিনে অশ্রুপাত ক'রলে পাছে স্বামী'র কোনও অশুভ হয সেই ভয়ে সে গোপন হৃদয়ের নিরুদ্ধ বেদনা-পুঞ্জ সযত্নে সংবরণ ক'রে নিয়েছিল, ধারাবর্ষণে তাকে উন্মুক্ত করে' দিয়ে নিজে'র বুকের ভার লঘু ক'রতে চায়নি।

ভূপতির চোয়াড়ে চেহারা—ঘাড় চাঁচা! সামনের লম্বা চুলে তৈলসিক্ত-টেরী,—বসা চোখ-মুখের ঔদ্ধত্যপূর্ণ চটুল ভাবটা রাণীকে মুগ্ধ না ক'রলেও বিরাগ-পূর্ণও করেনি। মোটের উপরে এটাকে সে গভীর বিশ্বাসে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ বলেই মেনে নিয়েছিল! সে যে তার স্বামী...এই চিন্তাই ভূপতির সব অসৌন্দর্য্য সকল রিক্ততা ঢেকে রাণীর চোখে তাকে সহনীয় করে' তুলেছিল।

স্বামীর প্রতি যে বিপুল অনবদ্য প্রেমরাশি তার তরুণ-মর্ম্মপাত্র ছাপিয়ে, দেবতার উদ্দেশে সাজানো পবিত্র অর্ঘ্যেরই মত উন্মুখ হ'য়েছিল...ভূপতির চেহারার দৈন্য তাকে ধূলিসাৎ করতে পারল না বরং সেই যৌবনেই বার্দ্ধক্যদশাপ্রাপ্ত অস্থিচর্ম্মসার স্বামীর প্রতি তার মায়া ও করুণা পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠতে লাগল!...আহা! ঘরে কেউ যত্ন করবার লোক নেই, তাই এমন রোগা চেহারা!...রাণী নিশ্চিন্ত-বিশ্বাসে মনে মনে ঈষৎ গর্ব্ব অনুভব করলে...আমার হাতের সেবা-শুশ্রূষায় যত্নে তদারকে এই কোলকুঁজো রোগা-চেহারা আবাব [illegible]

খিদিরপুরে একটা খোলার ঘরের বস্তিতে, করোগেট টিনের একখানি একতলা বাসাবাড়ীতে রাণীর সংসার রাজত্ব শুরু হ'ল!.

গণৎকারে'র ভবিষ্যৎদ্বাণী ফললো বোধ হয় শুধু তার ঐ স্বামীর নামটিতে!

রাণীর বিবাহিত জীবনের তখনও একটি বৎসর পূর্ণ হয়নি, ভূপতির রাত্রে বাড়ী ফিরে আসা ক্রমে বন্ধ হ'য়ে এল!...বিবাহের পূর্ব্বেকার উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল-জীবন আবার তাকে পেয়ে বসেছে'...

সুন্দরী তরুণী বধূর মোহে প্রথম কয়েকটা মাস তার জীবনের সুর একটু যেন বদলেছিল।... কিন্তু আবার যে-কে-সেই!

সেই ডক থেকে শূন্য পকেটে মত্তাবস্থায় শেষরাত্রে ফিরে আসা...বাড়ী ফিরে...চীৎকার...মাতলামি,...বমি...হাসি-কান্না...অশ্রাব্য গালমন্দ, প্রহার, হৈচৈ...বীভৎস ব্যাপার...

এ'পাড়ায় অবশ্য এ' কিছু নূতন ব্যাপার নয়। বস্তির প্রতি ঘরে-ঘরেই এই দৃশ্যাভিনয় চলেছে।...নূতনের মধ্যে এ' বস্তিতে রাণীর মত মেয়ের আবির্ভাব!... সে ঘর থেকে বেরোয় না,...বস্তির অন্যসব পুরুষদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে না,... প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে না! বস্তি'র স্ত্রীলোক কিম্বা পুরুষ একটি লোকের সঙ্গেও সে আজ পর্য্যন্ত কথা কয়নি!

এমন সু-চেহারার এবং এমন ভদ্র ধরণ-ধারণের মেয়েরা, এ'রকম বস্তিতে থাকার উপযুক্ত নয়, এটা তারা সকলেই জানতো!

আশ্চর্য্য হয়ে সকলেই ভাবত...ভূপতিটা এমন একটা খাসা-মেয়ে কি করে' কোথা থেকে বাগিয়ে আন্‌লে!

শনিবার রবিবার ভূপতি ডকেতেই রাত্রি কাটায়,...মাইনে পেলে আর দু'তিন-দিনই বাড়ী ফেরে না!

রাণী প্রতিবাদ করে।

প্রতিবাদের ফলে সর্ব্বত্র যা' ঘটে, এখানেও তাই-ই হয়!

মার-ধোর, লাথি...চুলের মুঠি...গালিগালাজ, কুকথা...

ভূপতির উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়েই চলেছে; ফলে অর্থাভাব...ধারকর্জ্জ...ঘটি বাটী বাঁধা ...রাণীর অর্দ্ধাহার...অনাহার...প্রহার...উপবাস...দুঃখ দৈন্য ও কষ্টের যেন সীমা নেই!...দিন যেন আর চলে না!

ক্রমে রাণীর ঘরের জানালার ধারে প্রেমের গান শোনা যেতে লাগল! ঘরের ভিতরে চিঠি...মিঠাপানে'র দোনা...ঠোঙাভরা মিষ্টি...আরও কত কি এসে পড়ে!...রাণী শঙ্কিত মনে একলাটি রাত কাটায়...সারাদিন সভয়ে থাকে!

ক্রমে চিঠির সঙ্গে টাকাকড়িও আসতে লাগল!...একদিন একছড়া রূপোর ঝক্‌ঝকে কোমরের ভারী গোট্ এলো,...রাণী কেঁদে ভূপতিকে দেখিয়ে...এ' পাড়া ছেড়ে অন্য

পাড়ায় গিয়ে বাসা ক'রতে অনুরোধ ক'রলে।

ভূপতি কতকগুলো কদর্য্য কুৎসিত কথা বলে' বাণীকে সেই গোটছড়া দিয়েই বেদম প্রহার ক'রল!...

যাবার সময় বলে গেল...তোর মত নষ্ট মেয়েমানুষদের রীতি আমার ঢের জানা আছে। এ' পাড়ায় আর মনের মানুষ মিলছে না বলে' এখন অন্য পাড়ায় উঠে যাবার মতলব!...বিপনেশালা'র সঙ্গে আর বনছে না বুঝি?...

এমন ধারা মার নূতন নয়, অশ্রাব্য গালিও নূতন নয়,...কিন্তু শেষের কথা ক'টা রাণীর বুকে শেলের মত গিয়ে বিঁধল!...

প্রহৃতা রাণী স্তম্ভিত মুখে চুপ করে' বসে রইল!...তিনদিন পেট ভরে' খাওয়া হয়নি, ক্ষুৎপিসাসায় প্রাণ তার টা' টা' করছিল,...তার উপরে এই লাঞ্ছনা!

...খোলা দরজার সামনে বিপিন এসে দাঁড়াল। নয়নে অপরিসীম সহানুভূতি, গলার স্বরে গভীর করুণা ঢেলে বল্‌লে—এমনি করে' নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ কেন বলো তো? কী ছিলে—দিন দিন কী হ'য়ে যাচ্ছ? নিজের আত্মাপুরুষকে কষ্ট দিলে ভগবান রুষ্ট হ'ন!...আমি যে তোমার জন্যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছি!...ওর কি? ও তো এখান থেকে বেরিয়ে ডকে'র কুলীমাগীদের নিয়ে দিব্যি ফুর্তি ক'রতে ক'রতে মহিম সা'র দোকানে গিয়ে ঢুক্‌ল।—

রাণী জ্বলন্ত চোখে বিপিনের দিকে চেয়ে ব'ললে—আমার সামনে থেকে দূর হ'য়ে যাও বল্‌ছি,—

—যাচ্ছি। কিন্তু আমার দশ ভরি'র রূপোর গোটছড়াটা তুমি দয়া করে' পোরো—আমার মাথা খাও। আমি তোমার নাম করেই গড়িয়ে এনেছি—

গোটছড়াটা তখনি ফিরিয়ে দেবার জন্য রাণী চেয়ে দেখলে গোটছড়া ঘরে নেই, ভূপতি নিয়ে চলে গেছে! কিন্তু রাণীর মুখে পিঠে বাহুতে গোটের প্রহার-চিহ্ন তখন লাল হ'য়ে দড়ির মত সব ফুলে উঠেছিল।—

সেইদিকে সহানুভূতিপূর্ণ করুণ নেত্রে তাকিয়ে বিপিন ব'ল্‌ল—ইস! একেবারে আধমরা করে' ফেলেছে যে!...বুঝিছি, হতভাগা তোমায় মেরে সেই গোট নিয়েই গোকুল মিস্ত্রীর ছোট মেয়েটার কাছে গেছে!...ওটা শয়তান।

কিছুক্ষণ সস্নেহ-নেত্রে রাণীর নিশ্চল মূর্ত্তির পানে তাকিয়ে থেকে বিপিন বল্‌ল—আচ্ছা, তোমার মনে এখন কষ্ট হয়েছে,—এখন আমি চল্‌লুম। ভাল করে' ভেবে দে'খো—একটু পরে আর একবার আসবো। আমি তোমারই ভালর জন্য ব'লছি! আমি তোমাকে সত্যিই খুব ভালবাসি—তাই সুখে রাখতে চাই! ভূ'পোটা তোমায় যা' কষ্ট দেয়—তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে চলো; আমি গাড়ী আন্‌ছি—

বিপিন চলে গেল। রাণী পাথরের পুতুলের মত নিথর হ'য়ে বসে'—সম্ভব অসম্ভব নানা ভাবনারাশির তলে তলিয়ে গেল!...

কতক্ষণ কেটে গেছে রাণী টের পায়নি।...সন্ধ্যা উৎরে এলো...রাত ঘনিয়ে আসছে ...সর্ব্বাঙ্গে প্রহারের টাটানি, অসহ্য ব্যথা, ক্ষুৎপিপাসায় শরীর ঝিমঝিম করছে, রাণী উঠে— হাঁড়িকুড়ি নেড়ে দেখলে—এক মুষ্টি ক্ষুদও আজ আর অবশিষ্ট নেই —বুকের ভেতরটা উন্মথিত করে' একটা চাপা কান্না ফুটে উঠলো—আর যে সহ্য হয় না ভগবান!

বিপিন আবার গাড়ী নিয়ে ফিরে এসে ব'ললে—আমি ছোটলোক নই। তোমাকে বস্তির আর পাঁচটা মেয়ের মত মনে করে' তোমার সঙ্গে যে বেয়াদপী করছি, সে জন্য মাফ চাচ্ছি! তুমি যদি না আসতে চাও—এসো না—কিন্তু এমন করে' না খেয়ে মরবে, সে আমি দেখতে পারবো না! আমি কিছু খাবাব কিনে এনেছি! এই নাও, কি খাবে বলো?...আমার সঙ্গে যে এলে না—নইলে তোমাকে কি এত দুঃখ সইতে হ'তো! রাণী'র মতো থাকতে!—

রাণী চমকে উঠে বিপিনের দিকে বিস্ময়বিমূঢ়ার মতো অনেকক্ষণ অপলক নেত্রে চেয়ে রইল।...তারপর কি ভেবে ধীরে ধীরে তার দুর্ব্বল দেহখানিকে টেনে নিয়ে শিথিলপদে ঘর থেকে বেরিয়ে নির্ব্বাক অবস্থায় এসে বিপিনের গাড়ীতে উঠে ব'স্‌ল!...

নিরুপমা বর্ষস্মৃতি, আশ্বিন ১৩৩৪

আলো—কোথায় ওরে আলো—

১

কাকিমার কক্ষ হইতে শিশুকণ্ঠের কাতর কান্না শুনিয়া অমলা ত্রস্ত ব্যস্তভাবে সেইদিকে অগ্রসর হইল। দালানের দক্ষিণদিকে পৌষ-প্রাতের সুমিষ্ট তপ্ত রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। কাকিমা শিশুপুত্র বাবলুর কচি হাত দু'খানি শক্ত মুঠায় ধরিয়া, চাপাগলায় তর্জন করিয়া বলিতেছেন—হ্যাঁ, তোকে সোয়েটার পরতেই হবে। নইলে খুন করে ফেলব।

দস্যু শিশু বাবলু উচ্চ ক্রন্দনের সঙ্গে মায়েব হাত হইতে প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে, মাথা নাড়িয়া সোয়েটার পরিধানে তার একান্ত আপত্তি জ্ঞাপন করিতেছিল। ধৈর্য্যচ্যুতা মা অবাধ্য পুত্রের গালে সজোরে ঘা'কতক চড় কশাইয়া দিলেন। প্রহৃত-শিশু দ্বিগুণ বেগে কাঁদিয়া উঠিল।

অমলা ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া আসিয়া কাকিমার হাত হইতে বাবলুকে কাড়িয়া কোলে লইতে লইতে করুণ অনুযোগপূর্ণ ভর্ৎসনার স্বরে বলিল—আহা! সকালবেলা উঠতে না উঠতেই ছেলেটাকে এমন নির্দ্দম করে মারছো কেন কাকিমা?

—ওর সঙ্গে আর পারিনে আমি। এতবড় একগুঁয়ে দস্যি ছেলে, সেই যে জেদ ধরেছে—সোয়েটার পরবো না—এ পর্য্যন্ত কোনওমতেই পরাতে পারলুম না।

—তা হোকগে। ছোট ছেলে, ওর জ্ঞান নেই। তুমি কি বলে বাচ্চাটাকে এমন করে মারলে? দেখ দেখি গালটা রাঙা হয়ে উঠলো!!

অমলার ভর্ৎসনায় ব্যথা ও ক্ষোভ ঝরিয়া পড়িল। কাকিমা হাসিয়া বলিলেন—ওরে, আমি বিয়ের আগে তোর মতন,—যারা ছেলে মারে তাদের উপরে রাগ কবতুম অমনি। নিজের পেটে হলে বুঝতে পারবি তখন। হাড়মাস ভাজা করে দেয় ঐ একরত্তি একরত্তি মানুষগুলি!—বজ্জাতিতে ওরা দশটা বুড়োমানুষকে হারিয়ে দিতে পারে!

অমলা তখন ভাইকে বুকে লইয়া নানা প্রবোধবাক্যে ভুলাইতেছিল। কাকিমার দিকে অভিমানপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া বলিল—তা বলে তুমি যেমন করে এদের মারো,—আমি হলে জীবনেও পারতুম না।

কাকিমার মুখে-চোখে কৌতুকরেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হাস্যতরল-কণ্ঠে বলিলেন—আচ্ছারে আচ্ছা, দেখা যাবে! আমিও ছেলেবেলায় ঠিক অমনিই ভাবতুম। রোস্ না—বিয়ে হোক—ছেলে হোক—তখন আবার বদলে যাবি।

অমলা বিদ্রোহী বাবলুকে আদরে ও সস্নেহবাক্যে বশ করিয়া রাঙা সোয়েটারটি পরাইতে পরাইতে সলজ্জ স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল—আচ্ছা দেখে নিও! আমি কখনও ছেলেদের কোনওরকম কষ্ট দেবো না।

ঘরের এক কোণের মশারী-ঢাকা খাটের ভিতর হইতে হাস্যতরল কণ্ঠে ডাক আসিল—অমল!

অমলা ত্রস্তে কাকিমার দিকে তাকাইয়া লজ্জারক্তমুখে মৃদুস্বরে বলিল—কাকাবাবু ঘরে রয়েছেন? তুমি আমায় বলোনি কাকিমা?

কাকিমা অমলার চেয়ে বছর চার-পাঁচের বড়। উভয়ের মধ্যে সখ্য ভাবটাই অধিক। কাকাকে সম্ভ্রম করিয়া চলিলেও সখী-প্রতিম কাকিমাকে সে মোটেই লজ্জা করিত না।

অমলের কাকাবাবু লেপের ভিতর হইতে বলিলেন—অমল! তোর ছেলে হলে তাদের কত যত্ন করবি, আমায় একটু নমুনা দিয়ে যা। বেজায় মাথা ধরে রয়েছে। মাথা ধরার অছিলায় কাকা শীতের শীতল-প্রাতে তপ্ত-কোমল শয্যা ছাড়িয়া তখনও উঠেন নাই।

কাকিমা সকৌতুক-হাস্যে অমলার দিকে চাহিলেন।

—তুমি কাকার মাথা টিপে দাওগে কাকিমা। আমি বাবলুকে নিয়ে চললুম। বলিয়া অমলা সেখান হইতে অন্তর্হিতা হইল।

২

পাঁচ বৎসর পরের কথা। অমলার বয়স এখন উনিশ। অনেকদিন হইল তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ফুলের মত সুন্দর-সুন্দর মেয়েও তার গুটি দুই-তিন হইয়াছিল, কিন্তু সবাই অকালে ঝরিয়া গিয়াছে—! এখন শুধু একটিমাত্র এক বৎসরের কন্যা আছে। তাহারও শরীর মোটেই ভাল নয়, আজন্ম-পীড়িতা! সম্প্রতি তার অসুখ আরও বাড়িয়াছে।

স্বামী হেমেন্দ্রনাথ পশ্চিমে মোরাদাবাদ শহবের বড় ডাক্তার, হাসপাতালের প্রধান কর্ত্তা। পশার এবং আয় ভালই। দেখিতে সুপুরুষ এবং একান্ত পত্নী-প্রেমিক।

অমলারা থাকে শহরের অল্প তফাতে কুশী নদীর ধারে একখানি সুন্দর সাহেবী বাংলোয়। সামনে ঘন-সবুজ টেনিস-গ্রাউণ্ড। আশেপাশে বিলাতী ও দেশী ফুলের গাছ এবং ক্রোটনের কেয়ারি। 'পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবিনম্রা' বিলাতী লতা, তার ঘন-কুসুমিত সবুজ বল্লরী বিস্তারে বাংলোর সম্মুখস্থ প্রাচীর ও উপরে রক্তবর্ণ টালির ঢালু-ছাদটির অর্দ্ধাংশ আবৃত করিয়াছে।

কাল সারারাত্রি ভীষণ ঝড়বৃষ্টির পর আজ ভোরের প্রকৃতি যেন নৃত্যক্লান্তা-নটীর মত অবসন্না হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে। সিক্ত সবুজ-বনানীর উপরে প্রভাত রশ্মির স্নিগ্ধ সম্পাত যেন কোন্ অশ্রুমুখী তরুণীর অধরপ্রান্তে সহসা জেগে-ওঠা ক্ষীণ হাসিরই মত চিত্তস্পর্শী!

অমলা সেই দুর্য্যোগ ঘন নিশীথের কোনও প্রহরেই কাল একবারও চক্ষু মুদিতে পারে নাই। রুগ্না কন্যার জ্বরতপ্ত ক্ষীণ তনুখানি বুকে লইয়া সমস্ত রাত্রি ভয়ে ভাবনায় আশঙ্কায় কাটাইয়াছে। শেষ-রাত্রি হইতে টেম্পারেচার কমিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে, ছটফট করা ক্রমশ কমিয়া আসিয়া ভোরের বেলায় খুকি শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

জাগরণ-ক্লান্তা অমলারও চোখের পাতা দু'খানি ভারী হইয়া জড়াইয়া আসিতেছিল, খুকির ছোট্ট বিছানাটির পাশে বাহুতে মাথা রাখিয়া সেও ভোরের বেলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

দাইয়ের ডাকাডাকিতে যখন অমলার ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেশ বেলা হইয়া গিয়াছে। জানালা দিয়া উত্তপ্ত রৌদ্র-কিরণ দেয়ালের গায়ে ও ঘরের মেঝেয় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অমলা উঠিয়া বসিয়া দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া চাহিয়া দেখিল—স্বামী হেমেন্দ্রনাথ ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া আছেন।

পুলকিত দৃষ্টিতে স্বামীর পানে তাকাইয়া বিস্ময় আনন্দ বিমিশ্র কণ্ঠে অমলা প্রশ্ন করিল—তুমি কখন এলে? এর মধ্যেই ফিরলে যে!

হেমেন্দ্রনাথ হাতের 'সার্জ্জারি কেস্'টি টেবিলের উপরে রাখিতে রাখিতে বলিলেন—এইমাত্র আসছি—

—খুকুর অসুখের খবর পেয়ে বুঝি ব্যস্ত হয়ে চলে এলে?

—না, সেখানকার কেস্‌টা মিটে—বলিতে বলিতে ঢোক গিলিয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া হেমেন্দ্রনাথ বলিলেন—হ্যাঁ, খুকির অসুখের খবর শুনেও মনটা বড় ব্যস্ত হল, তাই শীগগির চলে এলুম।

স্বামীর এই কথা-ঘুরাইয়া লওয়া লক্ষ্য না করিয়া অমলা চিন্তা-কাতর স্বরে বলিল—খুকুর জ্বর তো ক্রমশঃ বাড়ছে। মুখের ভিতর ঘায়ের জন্য ওষুধ খেতে ভারী কাঁদে। চোখের পূঁজ পড়াও বন্ধ হয়নি।

হেমেন্দ্রনাথ নিকটস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন—হুঁ।

—তুমি এখানে না থাকায় আমার যা ভাবনা হয়েছিল কি বলবো! তুমি এসেছো, বাঁচলুম।

খুকি ক্ষীণ স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। অমলা ত্রস্তভাবে গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

হেমেন্দ্রনাথ ঈষৎ বিরক্তভাবে বলিলেন—তুমি ওকে দিন-রাত্রি অত বেশী ঘাঁটাঘাটি কোরো না। ওর সর্ব্বাঙ্গে একজিমা হয়েছে,—বড় ছোঁয়াচে।

অমলা আহতস্বরে কহিল—আমি না দেখলে কে দেখবে? যে ক'টা দিন আছে একটু নেড়েচেড়ে নিই। থাকবে বলে তো আসেনি।

শেষের দিকের কথাগুলিতে তার গলার স্বর ভিজিয়া উঠিল। হেমেন্দ্রনাথ চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে শুধু বলিলেন—একটু সাবধানে থেকো।

খুকুকে আলগাভাবে বুকে চাপিয়া মৃদু দোলা দিতে দিতে অমলা বলিল, কোথায় যাচ্ছ?

—একবার বাইরে থেকে আসছি—

—খুকিকে একটু ভুলিয়ে আমি এখুনি যাচ্ছি,—তোমার চা জলখাবার সব তৈরী করে দেব। বেরিয়ে যেও না যেন।

—না, আমি বাইরেই আছি—বলিতে বলিতে হেমেন্দ্রনাথ এসেন্স সৌরভে দিক সুরভিত করিয়া, তাঁর জরীপাড় ধুতির ফিন্‌ফিনে ফুল কোঁচাটি ভূমিতে লুটাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

অমলা একদৃষ্টে সেইদিকে স্নিগ্ধ সপ্রেম নেত্রে তাকাইয়া রহিল। স্বামী দৃষ্টির অন্তরাল হইলে সে তার খুকুর শীর্ণ অধরে সন্তর্পণে একটি স্নেহগভীর চুম্বন আঁকিয়া দিয়া মৃদু স্বরে বলিল—খুকু—সোনা আমার—সর্ব্বস্বধন।

৩

—আর একটুখানি বোসো না অম্‌লু!

হেমেন্দ্রনাথ স্ত্রীর ডান হাতখানি চাপিয়া ধরিলেন।

—খুকুকে যে অনেকক্ষণ ফেলে এসেছি,—

—ফেলে এসেছো কই? তার কাছে তো দাই রয়েছে,—

ব্যথাকরুণ স্বরে অমলা বলিল—হ্যাঁগো, দাইয়ের কাছে ঐরকম রোগা মেয়ে ফেলে কি মা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে?

হেমেন্দ্রনাথ অপ্রতিভ হইয়া মিনতির সুরে বলিলেন—যাবেই তো এখুনি! এখন সে ঘুমুচ্ছে, ততক্ষণ আমার কাছে বসলে কি কিছু দোষ আছে?

স্বামীর অপ্রতিভ মুখভাব ও মিনতি-সুরের বাক্যে অমলা মনে আঘাত পাইল। সে আবার খাটের উপরে শায়িত স্বামীর কাছ ঘেঁষিয়া উঠিয়া বসিল এবং তাঁহার হাতের আঙুলগুলি আস্তে আস্তে টিপিয়া দিতে দিতে বলিল—আর বোধ হয় তোমার আঙ্গুলের গাঁটে একটুও ব্যথা নেই না? কোত্থেকে বাত নিয়ে এসে কী ভোগাই ভুগেছিলে বল তো গেল বছরটা? হেমেন্দ্রনাথ অভিমানের সুরে বলিলেন—এ বছরটাও বাত হলে বাঁচতুম। তবু তোমায় একটু কাছে পেতুম। এখন তো তোমার দেখা পাওয়ারই জো নেই।

বাহিরে অজস্র রূপালী-জ্যোৎস্না জামগাছগুলার উজ্জ্বল চক্‌চকে সবুজ পাতার উপরে অবিরাম পিছলাইয়া পড়িতেছিল। সমস্ত দিন অগ্নিময় 'লু' চলিয়া রাত্রে বাতাসটি অতি স্নিগ্ধতর বহিতেছিল। অমলার পাতলা দেশী সাড়ীর কাঁধের ও মাথার কাপড়টুকু বাতাসে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। হেমেন্দ্রনাথ তাঁর অনিন্দ্যসুন্দরী পত্নীর নবনীত কোমল হাতখানি ধরিয়া তাহার জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত মুখখানির পানে তাকাইয়া ছিলেন।

অমলা স্বামীর বিমুগ্ধ তৃষিত দৃষ্টিতে একটু সঙ্কুচিতা হইয়া উস্‌খুস্ করিয়া নড়িয়া চড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল—হ্যাঁগা, খুকুর গায়ে যে এক্‌জিমা না গরলের মত হয়েছে সেটা একবার দেখবে? মুখের ভিতরের ঘা-ও তো সারল না? আজ আবার দেখছি ডান চোখ দিয়ে কেবলই পূঁজ পড়ছে—তোমার বন্ধু ঐ বটু ডাক্তারটি কোনও কাজের নয় বাপু!

হেমেন্দ্রনাথ গভীর ঔদাস্যভরে বলিলেন—জন্মরুগ্ন হলে অমনি একটা না একটা লেগেই থাকে।

কথাটায় অমলা আহতা হইলেও কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল বেশি। তার সন্তান যে জন্মরুগ্নই হয় এবং সেজন্য স্বামীকে যে তার অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তার জন্য অমলা সর্ব্বদাই মনে মনে নিজেকে অপরাধিনী মনে করিত।

হেমেন্দ্রনাথ এবার সাভিমান অনুযোগের সুরে বলিলেন—ওর সেবা করে রাত জেগে জেগে তুমি নিজের শরীর মাটি করছো অমু! দেখ দেখি,—আগের চেয়ে কত রোগা হয়ে গেছ—চোখের কোলে যে কালি পড়েছে! তোমার কিন্তু এই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বিশেষ সাবধানে থাকাই উচিত।

কথাগুলি খুবই কাতর সুরে উচ্চারিত হইলেও অমলার ভাল লাগিল না। রুগ্না মৃতকল্পা কন্যার প্রতি অবহেলা করিয়া সুস্থ স্ত্রীর প্রতি হেমেন্দ্রনাথের এই অত্যধিক যত্ন তাহাকে কোনওদিনই তৃপ্ত করিতে পারিত না, বরং পীড়াই দিত বেশী।

হেমেন্দ্রনাথ অমলার ক্ষুণ্ন মুখভাব লক্ষ্য করিলেন। কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্য বলিলেন—গ্রীষ্মের ছুটিতে কিশোর এবার আসবে নাকি?

—হ্যাঁ।

—সে এলে তোমার খুকুর সেবাযত্নের খুব সুবিধা হবে।

হ্যাঁ, কিশোর বড় ভাল ছেলে। সেবা শুশ্রূষায় তার জুড়ি মেলা ভার।

হঠাৎ হেমেন্দ্রনাথ পত্নীকে একেবারে বুকের উপরে টানিয়া লইয়া গাঢ় সোহাগপূর্ণ স্বরে বলিলেন—তোমার জন্যে এবার শহর থেকে একটা চমৎকার জিনিষ এনেছি। এখনই তোমায় দিতে পারি—কিন্তু আমায় তুমি কি দেবে বলো?

অনেকক্ষণ খুকুকে দাইয়ের কাছে রাখিয়া আসায় অমলা মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল—এ সময়ে স্বামীর এইরূপ প্রেমাভিনয় তাহার একটুও ভাল লাগিল না। জোর করিয়া স্বামীর আলিঙ্গন-মুক্তা হইয়া নিরুৎসুক মুখের উপরে একটু শুষ্ক হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—আমি তোমায় কী আর দেবো বলো? এ পর্য্যন্ত তো শুধু শোক আর রোগের ঝঞ্ঝাটই তোমায় দিয়ে এলুম—

হেমেন্দ্রনাথ উঠিয়া মাথার বালিশের নীচে হইতে একটি ভেলভেটের সুদৃশ্য কেস্ বাহির করিয়া অমলার সম্মুখে ধরিল এবং স্প্রিংটি টিপিতেই বাক্সের ডালা খুলিয়া গিয়া ভিতরে একছড়া বহুমূল্য হীরক নেক্‌লেস্ চাঁদের আলোয় ঝলঝল্ করিয়া উঠিল।

অমলার মাথার কাপড় খুলিয়া দিয়া হার-ছড়াটা তাহার কণ্ঠে পরাইয়া দিতে দিতে হেমেন্দ্রনাথ মুগ্ধ বিহ্বল-কণ্ঠে বলিলেন—এমন গলা নইলে কি এ-হারের শোভা হয়?

খুকি পাশের ঘরে কাঁদিয়া উঠিল, অমলা ত্রস্তে উঠিতে যাইতেই হেমেন্দ্রনাথ আবার তাহাকে বাহু-বন্ধনে বন্দিনী করিয়া ফেলিলেন।

—ওগো—পায়ে পড়ি, এখন ছেড়ে দাও—খুকু কাঁদছে—

—যাবেই তো—কিন্তু আমার পাওনাটা—হেমেন্দ্রনাথ অমলাকে আরও নিবিড়ভাবে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

পাশবদ্ধা কুরঙ্গিনীর ন্যায় অমলা কাতরভাবে মুহূর্ত্তেক ছটফট করিয়া স্বামীর ব্যগ্র ওষ্ঠের উপরে পাওনার দাবী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চক্ষু বুজিয়া কোনওক্রমে এক নিমেষে শোধ করিয়া দিয়া—'ছাড়ো, মেয়েটা ককিয়ে গেল'—বলিতে বলিতে তাঁহার বাহু-মুক্তা হইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

৪

আরও কয়েক বৎসর পরের কথা। হেমেন্দ্রনাথ এখন এলাহাবাদে প্র্যাকটিস করেন। অমলার সেই খুকিটি মারা গিয়াছে। তাহার মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যে যে ছেলেটিকে সে কোলে পাইয়াছিল, সে-ই এখন তার একমাত্র সম্বল। কোনওরকমে তাহাকে সে আজ চার বৎসরের করিয়া তুলিয়াছে। তাহারও শরীর মোটেই ভাল নয়। কিছুদিন ধরিয়া চোখের অসুখে প্রায় শয্যাগত হইয়া আছে। অমলার নিজের শরীরও ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বারোমাস গলায় ঘা, জিভে ঘা, অরুচি, খাইতে পারে না। তাহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যও অনেকখানি ম্লান হইয়া পড়িয়াছে।

দুপুরবেলা অমলা সিক্ত কেশরাশি পিঠে এলাইয়া স্বামীর গরম পোষাকগুলি রৌদ্রে দিয়া 'ড্রেসিংরুম' সাফ করিতেছিল। পাশের ঘরে ছেলে কাঁদিয়া উঠিল—মা—

—কি বাবা? এই যে আমি—

অমলা ব্যগ্র ব্যাকুল মুখে শয়নকক্ষে ছুটিয়া গেল।

—মা, তুমি আমার কাছ থেকে উঠে যেও না। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না যে—

ছেলেকে সন্তর্পণে বুকে তুলিয়া লইয়া নিবিড় স্নেহে ললাট চুম্বন করিয়া গভীরস্বরে মা বলিল—কেন বাবা? আমি তো সব সময়েই তোমার কাছে আছি!—তুমি কি আজকে আরও ঝাপসা দেখছো?

—তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমার মুখটা ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না। আমার চশমার কাঁচদুটো পুঁছে দাও না মা—

অমলা ছেলের চোখ হইতে ক্ষুদ্র চশমাখানি খুলিয়া, মোটা পুরু কাঁচ দু'খানি আঁচল দিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া, ছেলের চোখে পরাইয়া দিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, —এইবার আমাকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছো, না বাবা?

বালক চক্ষু দুইটি বড় বড় করিয়া বিস্ফারিত করিয়া বলিল—কই, না তো! বাবাকে বোলো আমার চশমাটা আবার বদলে দিতে। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না ভাল করে—বালক কাঁদিয়া উঠিল।

অমলা কাতর মুখে ছেলের মুখে-চোখে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—ভয় কি বাবা? হরিকে ডাকো, তিনি তোমার চোখ ভাল করে দেবেন।

বালক মায়ের গলাটি দুই হাতে জড়াইয়া বুকে মাথা গুঁজিয়া বলিল—তুমি আমায় ফেলে উঠে যেও না মা—

ঘরের দরজায় একটি শ্যামবর্ণা সুশ্রী যুবতী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে স্থানীয় অন্যতম বাঙালী ডাক্তার নিত্যেশচন্দ্র বসুর স্ত্রী—প্রভাবতী।

ঘরের ভিতরে আসিয়া প্রভা অমলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—রোগা ছেলে তোমার, কেন তুমি আজ পোষাক রোদে দিতে গেলে দিদি?

—পোষাকগুলো অনেকদিন রোদে পড়েনি, ঘরখানা অনেকদিন ঝাড়া হয়নি, ধুলো জমে আছে।—উনি অপরিচ্ছন্নতা সইতে পারেন না। তাই গেছলুম একবার—

—তা ব'লে ঐ ছেলেকে ফেলে উঠলে কি করে?

—কি করবো ভাই? আমার ভাগ্নে কিশোরকে এর কাছে বসিয়ে রেখে উঠে গেছলুম। অসুখ তো আমার কপালে বারোমাসই লেগে আছে। ওঁর দেখা-শুনো সেবা-যত্ন কিছুই তেমন করতে পারিনে।...আর এই খোকার চোখ নিয়ে কি করি বলো তো দিদি? উনি তো এত ওষুধপত্র দিচ্ছেন,—ওঁর বন্ধু বটু ডাক্তারটিও তো কলকাতা থেকে এসে দেখে গেল—কিন্তু বাছার অসুখ তো দিন দিন বেড়েই চলেছে!—

প্রভা বলিল—আমাদের এখানে যে চোখের খুব বড় একজন 'স্পেশ্যালিস্ট' রয়েছেন, ডাক্তার এল. এল. ডেশাই। তাঁকে খোকার চোখ দেখিয়েছিলে কি?

—উনি এখানকার কোনও ডাক্তারকে দেখাতে কিছুতেই রাজী হন না। ওঁর ঐ একটা কেমন চিরদিনের খেয়ালের জেদ। নিজেই ছেলেদের চিকিৎসা করেন। যদি আমি বেশী ব্যস্ত হই, একেবারে কলকাতা থেকে ওঁর বন্ধু বটু ডাক্তারকে এখানেই আনেন—তবু এ-দেশী ডাক্তারদের দেখাতে চান না।

—বটু ডাক্তারের নাম শুনেছি বটে,—কলকাতায় সে মস্ত ডাক্তার, বত্রিশ টাকা তার ভিজিট। কিন্তু আমার মনে হয় ডাক্তার ডেশাইকে দেখালে, তোমার খোকার চোখ নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে দিদি।

—দেখি, —কিশোরের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে না হয় ডেশাইকেই আনব। উনি তো আজ দিল্লীতে 'কলে' চলে গেলেন। এ ক'দিন দেখবে শুনবেই বা কে?—

প্রভা মুখখানা ঘুরাইয়া বলিল—বেটাছেলেদের আর কী বলো? ওঁদের তো দশমাস পেটে ধরে ছেলেকে গড়ে তুলতে হয়নি—না খেয়ে না ঘুমিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করতেও হয়নি—ছেলের দরদ ওঁরা কি বুঝবেন?—

অমলা সখীর কথায় আঘাত পাইলেও প্রতিবাদ করিতে পারিল না। তাহার স্বামীর পত্নীর প্রতি যত্ন ও অনুরাগ আদর্শের মধ্যে গণনা করা যায়—কিন্তু সন্তানদের প্রতি তাঁহার অসীম ঔদাস্য—সে তো কোনওমতেই অস্বীকার করা চলে না।

৫

সেদিন সমস্ত রাত্রি চোখের অসহ্য যাতনায় খোকা ঘুমাইতে পারিল না। কিশোর সকালবেলায় বলিল—মামিমা, আমি ডাক্তার আনতে চললুম। মামাবাবু দিল্লী থেকে ফিরে আসা পর্য্যন্ত যদি তুমি অপেক্ষা করতে চাও—ছেলেটা জন্মের মত হয়তো দৃষ্টিহীন হয়ে যাবে!

শিহরিয়া অমলা বলিল—চুপ কর বাবা! ও'কথা বলতে নেই!—তুই ডাঃ ডেশাইকে আর ডাঃ নিত্যেশ বসুকে আজই ডেকে নিয়ে আয়।

মামীকে কিশোর যতটা ভালবাসিত ও শ্রদ্ধাভক্তি করিত, মামাকে তাহা করিত না,—বরং মামার উপরে তার যেন বেশ একটু বিরাগই ছিল। মোরাদাবাদে মামার চাকরী যাওয়ার পর সে আর এ পর্য্যন্ত মামার কাছে আসে নাই। অমলার একান্ত অনুরোধে এবার বড়দিনের ছুটিতে কলেজ বন্ধ হইলে এলাহাবাদে আসিয়াছে। এই অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণ ছেলেটিকে অমলা সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিত।

ডাক্তাররা যখন ছেলের চোখ পরীক্ষা করিতেছিলেন—অমলা পাশের ঘরে পর্দ্দার আড়ালে উৎকর্ণা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ডাঃ ডেশাই ইংরাজীতে কথা বলিতেছিলেন,— কথাগুলি বুঝিতে না পারিলেও নিত্যেশবাবুর ও কিশোরের মেঘাচ্ছন্ন মুখভাব ও কথাবার্ত্তার ভঙ্গী দেখিয়াই অমলা বুঝিতে পারিয়াছিল পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক নয়। তার পা দুটি ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মনে মনে তেত্রিশকোটি দেবদেবীকে স্মরণ করিতে করিতে সে তাহার খোকার চোখের আরোগ্য কামনা করিতে লাগিল।

অমলা আড়াল হইতে দেখিল—ডাঃ ডেশাই ও নিত্যেশ বসু অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে কথা কহিতেছেন এবং কিশোর ঘন অন্ধকার মুখে অপরাধীর ন্যায় মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

খোকা অস্ফুট-ক্রন্দনস্বরে বলিল—মা'র কাছে যাবো—

নিত্যেশবাবু তাহার প্রতি একবার ব্যথিত দৃষ্টিপাত করিয়া কিশোরকে বলিলেন —আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি,—খোকার মাকে আসতে বলুন।...আহা! নিরপরাধ কত শিশু যে এইরকম তাদের বাপের পাপে কষ্ট পাচ্ছে! হয় অকালে মরছে— না হয় ব্যাধিগ্রস্ত শরীর নিয়ে জীবন্মৃত হয়ে থাকছে!...এরা কি মানুষ? পশুর চেয়েও অধম এরা! —নিজে চিকিৎসক হয়ে—নিজের দেহ এই দুরারোগ্য ব্যাধির বিষে ভরা—এ-সমস্ত জেনেশুনেও—একটার পর একটা নরহত্যা—শিশুহত্যা করে চলেছে?...আপনার মামাবাবু এলে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

ডাক্তার ডেশাইয়ের সহিত নিত্যেশ বসু বাহির হইয়া গেলেন। পর্দ্দার ওপাশে অমলা ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

পরে কিশোরকে একটির পর একটি প্রশ্ন করিয়া অমলা যখন ব্যাপারটা সমস্ত

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল,—তখন এক মুহূর্ত্তেই তাহার চোখের সম্মুখ হইতে একটি ঘন-কালো পর্দ্দা যেন সহসা সরিয়া গিয়া—অতীতের অনেক কিছু ভীষণ উৎকট সত্য দৃষ্টিপথে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

মোরাদাবাদে যখন একটা স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপার উপলক্ষে হেমেন্দ্রনাথের চাকরি গেল—হেমেন্দ্রনাথ অমলাকে বুঝাইয়াছিল—বিদেশী বাঙালী এখানে এসে এত পশার করেছে, হাসপাতালের কর্ত্তা হয়েছে—সেই হিংসেয় হাসপাতালের লোকজনেরা 'নার্স'গুলোর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমার নামে এই কলঙ্ক দিচ্ছে। আমার চাকরী যাক দুঃখ নেই, কারণ, তুমি আমায় অবিশ্বাস করবে না জানি।

অমলা সেদিন স্বামীর সেই অপমানে—দুঃখে ও ব্যথায় আকুল হইয়াছিল। হিংসুক দুষ্ট লোকগুলিকে মনে মনে কত অভিশাপ দিয়াছিল। কিন্তু, আজ সে ব্যাপারটা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। এইরকম আরও কত ছোটবড় ঘটনা অমলার মনে পড়িল —যাহা তাহার চোখের সামনে নিরন্তর ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, কিন্তু সে অন্ধের চেয়েও অন্ধের মত সেদিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, তার দুশ্চরিত্র কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীর প্রেমে মুগ্ধা হইয়া একটির পর একটি সন্তান হত্যা করিয়া চলিয়াছে।

অমলা পক্ষাঘাতগ্রস্তের ন্যায় স্তম্ভিত নিথর হইয়া বসিয়া রহিল। ও-ঘরে খোকা ব্যাকুল স্বরে কাঁদিতে লাগিল—মা—মা—আমার কাছে এসো—

অমলা উঠিতে পারিল না। কিশোর মামিমার অবস্থা বুঝিয়া নিজেই খোকাকে ভুলাইতে গেল।

অমলার চোখের সামনে সুস্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল—তাহার প্রত্যেকটি সন্তানের মৃত্যু-দৃশ্য। ওঃ! তিল তিল করিয়া কী যাতনাই না তারা ভোগ করিয়াছে!... অমলা শিহরিয়া উঠিল,— তাদের সেই যাতনা—সেই কষ্টের জন্য সেও কি দায়ী নয়?...হ্যাঁ, দায়ী বৈকি! নিশ্চয়ই দায়ী।

সে মূর্খ অশিক্ষিতা নারী—জননী হইবার উপযুক্ত দায়িত্বজ্ঞান যাহার নাই—সে জননী হইয়াছিল কী ভরসায়? কোন স্পর্দ্ধায়?...স্বামীর আদরে সোহাগে প্রেমে সে অন্ধা হইয়াছিল। উঃ, কী ভীষণ স্বার্থপর নারী সে। এই নিরপরাধ শিশুগুলিকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করার কি তার প্রায়শ্চিত্ত আছে?...

স্বামী যে ভালবাসেন, সে কাহাকে? অমলাকে—না অমলার যৌবন-সুন্দর নিটোল দেহখানিকে—তার সেই অসাধারণ রূপ-লাবণ্যকে?...অমলা নিজের প্রতি তাকাইয়া ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল।

৬

হেমেন্দ্রনাথ দিল্লীর 'কল্' হইতে প্রচুর অর্থোর্জ্জন করিয়া উৎফুল্ল চিত্তে শিশ্ দিতে দিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁর কালো রংয়ের সাহেবী পোষাকের কোটের বুকে একটা টক্‌টকে লাল মস্তবড় গোলাপ 'পিন' করা রহিয়াছে।

হেমেন্দ্রনাথ তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়া সহাস্য মুখে সাহেবী ভঙ্গীতে পত্নীকে আলিঙ্গনার্থে উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইলেন।

ব্যাঘ্র-ভীতা হরিণীর ন্যায় ভীতি-কাতর নেত্রে সেইদিকে তাকাইয়া বিবর্ণ মুখে একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া অমলা সে ঘর হইতে প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিশোর তাহার চোখে আস্তে আস্তে 'হট্ কম্প্রেস্' দিয়া দিতেছে। অমলা মৃতের ন্যায় রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখে খোকার পাশে গিয়া বসিল। কিশোর মামীর মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে উঠিয়া গেল।

অমলা উম্মাদিনীর মত খোকার চোখের পুঁজ-লাগা নোংরা বোরিক্ তুলাগুলি মেঝে হইতে কুড়াইয়া লইয়া নিজের চোখে ঘসিতে ঘসিতে আপন মনে বলিতে লাগিল—বাবা আমার! তোর সঙ্গে আমিও অন্ধ হব! এতদিন ভুল করে অন্ধ হয়ে থাকায় তোদের এত কষ্ট দিয়েছি—আজ সত্যিকারের অন্ধ হব!

কিশোর তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া অমলার দিকে ব্যগ্রভাবে অগ্রসর হইয়া বলিল —করছো কি মামিমা? পাগল হয়েছ নাকি? ঐ বিষাক্ত তুলোগুলো নিয়ে নিজের চোখে লাগাচ্ছ?

—কিশোর হাত বাড়াইয়া অমলার হাতের তুলা কাড়িয়া লইতে গেল।

অমলা কিশোরের সেই প্রসারিত হাতখানি দেখিয়া সর্পদষ্টার ন্যায় শিহরিয়া ঘৃণাপূর্ণ নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল—ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না—তুমি, তুমি, ছেলে মেরেছো—না, না আমি—আমিই 'মা' হয়ে সন্তান হত্যা করিছি। অমলা কাঁদিয়া উঠিল।

তাহার কান্না শুনিয়া খোকাও কাঁদিয়া উঠিল—মা—মা

অমলা তাড়াতাড়ি খোকার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল—চুপ্—ও-কথা বলতে নেই! বাপ-মা কি কখনও সন্তানকে অন্ধ করে দিতে পারে?

কুন্তলীন পুরস্কার, ১৩৩৪

পরম-তৃষা

আদ্য

আশ্বিন মাস।

শিউলিবনের করুণ গন্ধে কিশোরী প্রভাত-লক্ষ্মীর শিশিরসিক্ত অঙ্গে একটি মধুর আবেশ জড়িয়ে আছে। কাঁচা সোনার মত স্নিগ্ধ রৌদ্রে যেন মিষ্ট-মাধুর্য্য ঝরে পড়ছে।

আঁচলভরা রাশীকৃত শিউলিফুলের শুভ্র পাপ্‌ড়ি হ'তে বাসন্তী বৃন্তগুলি ছিন্ন ক'রে পৃথক্‌ভাবে রাখতে রাখতে সুভা বল্‌লে—এবার পূজায় বৌমাকে বেণারসী শাড়ী আর পান্নার চিক্‌ দিতে হবে, বেয়াই!

নন্দ ছুরী দিয়ে আমের আঁঠি কেটে বাঁশী তৈরী করতে করতে বল্‌লে—অত পার্‌বো না। এবার বড্ড খরচপত্র হয়ে গেছে। তা' ছাড়া অজন্মার দরুণ মোটে খাজনা আদায় হয়নি।—

সুভাষিণী শুভ্র মোতির নোলকটি দুলিয়ে কচি টুলটুলে মুখখানি পাকাগিন্নীর মত ঘুরিয়ে বল্‌লে—ও'সব কথা শুনছি না। এবার পুজোয় তা হ'লে বৌ পাঠাবো না।

নন্দলাল কাকুতি-মিনতি ক'রে বল্‌লে—বেণারসী-শাড়ী পারবো না, একখানি বোম্বাই শাড়ী কিনে দেবো। আর পান্নার চিক্‌ আস্‌ছে বছর নিশ্চয় গড়িয়ে দেবো, বেয়ান।

সুভা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে শিউলির বোঁটাগুলি ক্ষুদ্র ডালাখানির উপরে সযত্নে মেলে রাখ্‌তে রাখ্‌তে বললে—তা হ'লে মেয়েও সেই আস্‌ছে-বছরেই নে' যেও, এ'বছরে হ্‌বে না—

পিছনদিকে সুভা'র মা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দু'টি বালক-বালিকার সংসারাভিনয়-খেলা স্নেহমুগ্ধ সতৃপ্ত নয়নে উপভোগ করছিলেন।

সুভা'র প্রবীণার মত উক্তিতে মা সশব্দে হেসে উঠে বল্‌লেন—গয়না-কাপড় না দিলে বৌকে বাপের বাড়ী পাঠাতে নেই, কোথা থেকে শিখ্‌লি বলতো, পোড়ারমুখি।—

সুভা মায়ের কণ্ঠস্বরে সচকিতে পিছন ফিরে তাকিয়ে লজ্জায় তাড়াতাড়ি মাথার অবগুণ্ঠনখানি টেনে ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর জানুদেশে নিজের মাথা গুঁজে সলজ্জ আবদারের সুরে বল্‌লে—যাঃও,—তুমি ভারী দুষ্টু মা, —তুমি কেন এখানে এলে?—

নন্দলাল এতক্ষণ তার পুতুল-কন্যার শাশুড়ী অর্থাৎ বেয়ানের পূজার তত্ত্বের ফর্দ্দে নিতান্ত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল, এইবার ভরসা-প্রফুল্ল মুখে এগিয়ে এসে দীপ্তকণ্ঠে বল্‌লে— দেখো না মা,—সুভি বল্‌চে পান্নার চিক্‌ আর বেণারসী-শাড়ী না দিলে এবার পুজোর সময় পদ্মকে আমার কাছে পাঠাবে না।

মা হাস্যতরল-কণ্ঠে বলে উঠ্‌লেন—'পদ্ম' আবার কে রে?

সুভা মায়ের আঁচলখানি শক্ত মুঠায় চেপে ধরে নন্দ'র মুখের পানে সকৌতুক-নেত্রে তাকিয়ে খিল্‌খিল্ ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—জানো না, মা? ওর মেয়ের নাম যে 'পদ্মরাণী'!

নন্দ সুভার হাসি এবং বলা'র ভঙ্গীতে অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়্‌ল। নিজের অপ্রতিভ ভাবটুকু ঢাক্‌বার জন্য ঠোঁট্ বেঁকিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বলে' উঠ্‌ল—তোর ছেলের নাম আমি বলে' দিতে পারি না বুঝি?—

মায়ের অঞ্চল-প্রান্ত মুঠা হ'তে ছেড়ে দিয়ে কলহের ঝাঁঝাল' সুরে সুভাও বল্‌লে—দে' না বলে'। তাতে ভয় কিসের?

মা এবার মেয়েকে সজোরে ধমক্ দিয়ে উঠ্‌লেন।— এই সুভি!— ফের্ নন্দকে তুই-তোকারি কর্চ্ছিস্?...বারণ করে' দিয়েছি না ওকে কখনো তুই-তোকারি ক'রবিনে!

সুভা ক্রন্দন-বিজড়িত স্বরে বল্‌লে—আর ও যে আমায় পোড়ারমুখী—রাক্ষুসী—বলে' গাল দেয়, চুলের মুঠি ধরে— তার বেলায় বুঝি কিচ্ছু নয়?...ভারী তো বর!! অমন বর আমি চাইনে—

সুভা 'চাইনে' শব্দটা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলে' সাভিমানরোষে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

নন্দলালও আর নিজের পৌরুষ প্রকাশ না করে' থাক্‌তে পার্‌লে না। বল্‌লে—আমিও তোর মতন ছাই বৌ চাই না।...দে, আমার পুতুল ফিরিয়ে দে। পুতুল-বিয়ে ভেঙে দিলুম।

সুভা এইবার ঝর্‌ঝর্ করে' কেঁদে ফেলে বল্‌লে—নে না ফিরিয়ে তোর পুতুল!...বড় ব'য়েই গেল।

তারপর মায়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে সুভা বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লে—মা, ও' আমার পুতুলের সঙ্গে ওর পুতুলের বিয়ে ফিরিয়ে নিয়েছে—তুমিও ওর সঙ্গে আমার বিয়ে ফিরিয়ে নাও! আমি ওর বৌ হতে পার্‌বো না,—কক্ষনো না—।

হাসির বেগ দমন করে' মা উভয়কেই ধমক্ দিলেন— ফের্ দুজনে তুই-তোকারি করে' ঝগড়া কর্‌ছিস্?...নন্দ,— সুভি,—দু'জনেই আমার কাছ থেকে আজ মার্ খাবি দেখ্‌ছি—

সুভা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গোঁ-ভরে বল্‌লে—কক্ষনো ওকে আমি 'তুমি' ব'ল্‌বো না।...মা, তুমি ওর সঙ্গে আমার বিয়ে ভেঙ্গে দাও বল্‌ছি—

মা এবার ওদের সাম্‌নেই হেসে ফেল্‌লেন। বল্‌লেন— আচ্ছা, তাই-ই হবে অখন্!...কিন্তু তুমি যদি নন্দ'র নাম ধরে ডাকো আর 'তুই' বলা অভ্যাস্ না ছাড়ো তা' হ'লে কিন্তু বিয়ে আর ভাঙবে না।—

ঘণ্টাকয়েক বাদে আহারের সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়। মা ডাকাডাকি করে' নন্দ বা সুভা কারুরই সন্ধান পান না।

চাকরদের অম্বেষণে পাঠালেন। তারা এসে খবর দিলে—সদরের বড় পুকুরে সুভাষিণী ও নন্দলাল মহানন্দে সন্তরণ প্রতিযোগিতায় নেমে হাস্যকলোচ্ছ্বাসে পুষ্করিণী তোলপাড় করে তুলেছে।

শুনে মা একটু হাস্‌লেন।

সাত বছরের বধূ—এগার বছরের বর। পুতুলের বিয়ে দেয়—লুকোচুরী খেলে—ছাদে উঠে আচার চুরি করে— মারামারি ঝগড়া করে—আবার ভাবও হয়।

না আছে তাদের সাজপোষাকের বালাই, না আছে লজ্জাসঙ্কোচের ধার—না আছে কথাবার্ত্তার শৃঙ্খলা।

রাগ হলে পরস্পর পরস্পরকে চিম্‌টি কাট্‌তে, চুলের মুঠি টান্‌তে, কিল বসাতেও ছাড়ে না।

মা এসে দু'জনকে ছাড়িয়ে তফাৎ করে' দেন।

কখনও মেয়েকে দু'-ঘা চড় মারেন, কখনও জামাইকে চোখ রাঙিয়ে ধমকান। জামাইকেও চড়টা কানমলাটা শাস্তি দিতে তাঁর আট্‌কায় না।

জামাই নন্দলাল তাঁর নিজেরই হাতের মানুষ করা ছেলে! সে তাঁর পেটের মেয়ে সুভারও বাড়া।

বেশী বয়স পর্য্যন্ত সন্তান-প্রতীক্ষায় কাটিয়ে সুভার মা যখন হতাশ হয়ে এসেছিলেন—সেই সময়ে তাঁর বিধবা বড় জা তাঁর মাতৃপিতৃহীন শিশু বোনপোটিকে সুভার বাপমায়ের হাতে সঁপে দিয়ে পরপারে যাত্রা করেন।

অপত্যহীন দম্পতি বাপ-মা-হারা এই একবছর বয়স্ক সুন্দর শিশুটিকে পেয়ে সন্তানের দুঃখ ভুলবার চেষ্টা করেছিলেন।

নন্দলালই তাঁদের পোষ্যপুত্ররূপে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ও পারলৌকিক জলপিণ্ডদানের অধিকারী হবে স্থির হ'য়ে গিয়েছিল। নানা বাধাবিঘ্নে তখন তাকে আইনতঃ পুত্ররূপে বরণ করা হ'য়ে ওঠেনি।

এমন সময়ে আকস্মিক আগমন কর্‌লে সুভা। নন্দলাল তখন চার বছরের।

সুভাষিণী কোন অজানা দেশ থেকে পৃথিবীতে তার মায়ের কোলে এলো বটে—কিন্তু তার অল্পদিন পরেই সুভার বাবা পৃথিবী হ'তে কোনও অজানা দেশে চিরদিনের জন্য চ'লে গেলেন।

বিসূচিকার দারুণ তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ কর্‌তে করতে সুভার বাবা মৃত্যুর পূর্ব্বে সুভার মাকে বলে' গেলেন—আমার নন্দকে যেন তুমি 'পর' করে দিও না। বিষয় থেকে বঞ্চিত কোরো না। সুভার সঙ্গে নন্দ'র বিয়ে দিও, তাহলে আর কোনো গোল হবে না।

সুভার বাবা আরও বলে' যান—যত শীঘ্র সম্ভব ওদের অল্পবয়সেই এই বিয়ে দিও। নইলে পরে হয়তো অনেক বাধাবিপত্তি ঘটতে পারে।

সুভার মা তাই মেয়ের সাত বছর পূর্ণ না হ'তেই নন্দর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

মধ্য

আষাঢ় মাসের মেঘ-বিষণ্ণ দুপুর।

আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনায় আকাশের মুখ ম্লান কালো। বাতাস স্তব্ধ গম্ভীর।

সুভাষিণীর দিনেরবেলায় ঘুম আসে না। দুপুরবেলা বসে' বসে' একরাশ সিল্কের ও ছিটের টুক্‌রা জুড়ে জুড়ে ছোট্ট ছোট্ট ফ্রক্ জামা বিছানা প্রভৃতি তৈয়ারী করে।

ঘরের ভিতরে সারিবন্দী আলমারীর কাচাবরণের মধ্যে—ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতম আকারের ও বৃহৎ হ'তে বৃহত্তম আকারের কাঁচের, সেলুলয়েডের, পোর্‌সিলেনের, পাথরের, হাতির দাঁতের অসংখ্য পুতুল সাজানো। তাদের অনেকগুলিই উৎকৃষ্ট বসন-ভূষণে কৃত্রিম মুক্তাহার প্রভৃতিতে সুভা-কর্ত্তৃক সুসজ্জিত।

সাত বছরের সুভা এখন সাতাশ বছরের, পরিপূর্ণযৌবনা। এগার বছরের বালক নন্দলাল এখন একত্রিশ বৎসরের যুবা।

দৌহিত্রের অতৃপ্ত সাধ নিয়ে মা স্বর্গে চলে' গেছেন।

সুভা ও নন্দ এখন সাবালক হ'য়ে স্টেটের উত্তরাধিকার পেয়েছে।

নন্দলাল কি একটা প্রয়োজনে ঘরে ঢুকে সুভার হাতের সিল্ক টুক্‌রাগুলির পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—কি তৈরী করা হচ্ছে?

সুভা কপাল ও চোখের উপরকার চূর্ণ চুলগুলি হাত দিয়ে সরাতে সরাতে মৃদু হেসে রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলে—তোমার নাতি-নাত্‌নীর বিছানা জামা তৈরী হচ্ছে।

নন্দলাল একটু উদাস হাসি হেসে বল্‌লে—হ্যাঁ-এ-জন্মটা ঐ পুতুল ছেলে-মেয়ে আর পুতুল নাতি-নাতনি নিয়ে কাটিয়ে দাও—!

সুভা'র হাসিভরা প্রফুল্ল মুখখানি হঠাৎ অত্যন্ত ম্লান হ'য়ে গেল। হাতের কাজে দৃষ্টি নত করে'—সূচের ফোঁড়্ তুলে যাচ্ছিল, কিন্তু আঙুলগুলি যেন শিথিল অবশ হ'য়ে এলিয়ে আস্‌ছিল।

নন্দলাল সুভা'র মলিন মুখের পানে তাকিয়ে সস্নেহ কণ্ঠে বল্‌লে—হ্যাঁরে সু, —ও'কথা বললুম বলে' মনে তোর কষ্ট হ'ল নাকি?

নিতান্ত আদর-করা'র স্থলে কিম্বা রহস্যচ্ছলে আজও নন্দলালের মুখ দিয়ে স্ত্রীকে 'তুই' সম্বোধন বেরিয়ে যায়।

সুভা প্রাণপণে চোখের জল চাপ্‌তে চাপ্‌তে হাসিভরা কণ্ঠে উত্তর দিলে—দুঃর্! তুমি পাগল নাকি? কষ্ট কিসের?

সুভা চেষ্টা করে' ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা টেনে আনল।

নন্দলাল নিশ্চিন্তচিত্তে শিষ্ দিতে দিতে বাহিরে চলে' গেল। সে জান্‌তেও পার্‌লে না—তার এই রহস্যচ্ছলে বলা ছোট্ট কথাটুকু—তার বন্ধ্যা-পত্নীর মর্ম্মের কোন্‌খানটিতে গিয়ে বিঁধে রইলো।...

প্রিয়জনের মুখের লঘু কথাটিও মানুষের বুকে কত গুরু হ'য়ে বাজে তা যদি তারা বুঝ্‌তো!

নন্দলাল চলে' গেলে সুভা হাতের রঙীন ছিটের টুক্‌রাগুলি ছুঁড়ে ছিটিয়ে ফেলে দিয়ে বিছানার উপরে উপুড় হ'য়ে ছোট বালিকার মত ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে কেঁদে উঠ্‌ল।

নিঃশব্দ ক্রন্দনের বেগে সর্ব্বাঙ্গ থর্‌থর্ করে' কেঁপে, ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌ল...।

কত সময়েই তো মানুষ খেলাচ্ছলে ধনুর্ব্বাণ ছোঁড়ে,—কোনও উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে নয়। তারা কি জানে তাদের সেই খেলার তীরটিই কোনও ঘন-শাখান্তরালের অসহায় ছোট পাখীর বুকে বিঁধে' গভীর ক্ষত ও রক্তপাত সৃষ্টি কর্‌তে পারে?

সুভাষিণী স্বামীর সঙ্গে তীর্থে গেল। তীর্থ গিয়ে কত বটবৃক্ষের তলায় ফল কামনায় আঁচল বিছিয়ে বসে থাকে। সাগরে নদীতে প্রদীপ ভাসায়।

সাধু-সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হয়—কবচ মাদুলি ধারণ করে। স্বামীকে লুকিয়ে কত ব্রত-উপবাস আচার-অনুষ্ঠান করে। ধরা পড়্‌লে লজ্জিত হয়,—অস্বীকার কর্‌তে চায়।

শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে সুভার এক দূরসম্পর্কীয়া দিদিমার সঙ্গে দেখা হ'ল। সঙ্গে তাঁর ষোল-সতেরো বছরের এক অনূঢ়া নাত্‌নী। নাম চিত্রা।

সমুদ্রের ধারে চক্রতীর্থে এক মস্তবড় জ্যোতিষী ভাগ্য-গণনা করেন। কর-কোষ্ঠী বিচার করেন।

সুভা গেল সেখানে হাত দেখাতে।

গিয়ে দেখে তার সেই দিদিমাও গেছেন অনূঢ়া নাত্‌নীর কর-রেখা দেখবার জন্য।

তরুণী মেয়েটার চাঁপাফুলের মত সুন্দর নরম হাতখানি জ্যোতিষীর মোটা কর্কশ হাতের উপরে তুলে দিতে দিতে তার দিদিমা বল্‌লে—বাবা, আমার এই নাত্‌নীটির কবে বিয়ে হবে বলে' দিন্ দয়া করে—

জ্যোতিষী মেয়েটার পল্লবের মত কচি হাতখানি নিজের বাম হাতে ধরে' ডান হাতে 'ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস্' নিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মেয়েটির কর-রেখা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

গম্ভীরমুখে এবং ততোধিক গম্ভীর কণ্ঠে জ্যোতিষী বল্‌লেন—এ'মেয়ে আপনার খুব সৌভাগ্যবতী হবে। খুব ধনীর ঘরে এর বিয়ে হবে—আর এর গর্ভে সুলক্ষণ দীর্ঘায়ু রাজচক্রবর্ত্তী ছেলে হবে। আপনার নাত্‌নীর স্বামী-সৌভাগ্যের চেয়েও সন্তান-সৌভাগ্য বেশী উজ্জ্বল।

সুভা সাগ্রহে শুন্‌লে। মেয়েটির প্রতি বার বার তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

তারপর নিজের বাম হাতখানি এগিয়ে ধরে' শুষ্ক করুণ কণ্ঠে বললে—ঠাকুর, দেখুন তো—আমার সন্তান-স্থানটা কি রকম?...

সুভার কণ্ঠস্বরে কুণ্ঠা যেন জড়িয়ে এল।

জ্যোতিষী মুহূর্ত্তেকের জন্য সুভার আপাদমস্তকে তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। সম্ভ্রান্ত ভদ্রঘরের মহিলা।—সুন্দর দৃঢ় গঠনের চেহারা।...মুখে চোখে একটি কাতর তৃষ্ণা বা অতৃপ্তির বেদনা মাখানো।

জ্যোতিষী সুভার হাতখানি নেড়েচেড়ে বল্‌তে লাগলেন—সন্তান-স্থান?...তা—সন্তান-স্থান তো তোমার তেমন ভালো দেখ্‌চিনে, মা! দুর্ব্বল—হ্যাঁ, খুবই দুর্ব্বল-উহুঁ—সন্তান তো মোটেই নেই! তাই তো?

জ্যোতিষী ভ্রূকুঞ্চিত করে' কিছুক্ষণ সুভার হস্ততালুর প্রতি স্থিরনেত্রে তাকিয়ে থেকে তারপর সুভার মুখের পানে চেয়ে প্রশ্ন কর্‌লেন,—হাঁ মা, তুমি কি বন্ধ্যা?

সুভা কিছু উত্তর দিলে না। জ্যোতিষীর হাতের ভিতর হ'তে নিজের হাতখানা টেনে নিয়ে উঠে চলে' এল।

পুরীর সুমদ্র-কিনারায় সুভা সকাল-সন্ধ্যা স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যেত।

সেই দূর-সম্পর্কীয়া মাসতুতো বোন্ চিত্রাকে বালু-বেলায় দেখ্‌তে পেত এক-একদিন।

তাকে দেখ্‌লেই সুভা যেন কেমন উন্মনা হ'য়ে পড়ত।

নন্দলাল পাশে চল্‌তে চল্‌তে হয়তো কোনও একটা প্রশ্ন করে' অন্যমনস্কা সুভার কাছ থেকে উত্তর পেত না। স্ত্রীর কাঁধখানি ছুঁয়ে কিম্বা হাতখানি ধরে' মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে নন্দ সকৌতুককণ্ঠে বল্‌ত—কি গো বেয়ান্ ঠাকুরাণি, সমুদ্রের ধারে এসে 'কবি' হ'য়ে উঠ্‌লে নাকি?—

সুভা অপ্রতিভ ও লজ্জিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি বলে—আঃ! কী যে ছেলে-মানুষি কর তুমি! লোকে শুনতে পেলে কি ভাব্‌বে বল তো?

পুরীতে সুভাদের বাড়ী চক্রতীর্থে।

স্বর্গদ্বার হ'তে খবর এল—সুভার সেই দিদিমার কলেরা হয়েছে। সুভা ও নন্দ গিয়ে বিদেশে আত্মীয়শূন্যা বৃদ্ধা আত্মীয়াটির দেখাশোনা সাহায্য তদারক কর্‌লে।

বৃদ্ধা ঘণ্টা কতকের মধ্যেই রোগ-যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে ভব-যন্ত্রণা এড়ালেন।

আপনার বল্‌তে তাদের কেউই বিশেষ নেই। চিত্রাকে সুভার হাতে সঁপে দিয়ে বৃদ্ধা বলে' গেলেন,— বোন, তুই রাজরাণী ভাগ্যিমানি—আমার অভাগী নাতনীটার যা হোক্ দেখেশুনে একটা গতি করে' দিস্—

মৃত্যুপথযাত্রিণীর মুখের কথাগুলি সুভার কানে পরিহাসের মত ঠেক্‌ল! জ্যোতিষীর কথাগুলি সুস্পষ্ট হ'য়ে কানে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল।

—হায়! সুভা না কি ভাগ্যিমানী!!...

সুভারা পুরী থেকে বাড়ী ফিরে এল। সঙ্গে এল চিত্রা।

চিত্রা মেয়েটি শান্ত লক্ষ্মী। তরুণ যৌবনের স্নিগ্ধ লাবণ্যে অপরূপ লাবণ্যময়ী!... সর্ব্বদাই একটি মধুর সঙ্কোচ বা ভীরু লজ্জা তার নয়নে বচনে ভঙ্গিমায় জড়িয়ে আছে।

তপ্ত কাঞ্চনবর্ণে ও সুঠাম গঠনে ক্ষীণ তনুখানি যেন সৌন্দর্য্যেরই আরতি-দীপের স্থির শিখাটি!

চিত্রা দিদির পাশে পাশে ছায়ার মত ফেরে। সেবাযত্নে, সংসারের গৃহকর্ম্মের মধ্যে তার সুন্দর হাত দু'খানি হতে—সুন্দরতর নিপুণতা ও কল্যাণশ্রী ঝরে' পড়ে।

নন্দলালের সাম্‌নে সে বেরোয় বটে কিন্তু খুব সামান্য সময়েই,—এবং সঙ্কুচিত-ভাবেই।

সুন্দর শরৎ-প্রভাতে বাদলান্ধকারের মত চিত্রার চোখেমুখে একটি করুণ বিষণ্ণতার ছায়া সকলকারই অন্তরের ব্যথিত সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

নন্দলালের জীবনে কখনও এরকম তরুণী নারীর সান্নিধ্য ঘটেনি, যার অপরূপ রূপ-লাবণ্য সর্ব্বদা মৃদু লজ্জার আবরণে অবগুণ্ঠিত! যার আচরণ, ভঙ্গী, চাহনি, কথা-কওয়া—সব-কিছুকেই যেন একটি স্নিগ্ধ মধুর রহস্যজাল ছেয়ে আছে!...যে-নব-যৌবনার প্রকৃতি ও আচরণ রহস্যাবৃত, তার স্বরূপটি জান্‌বার জন্য পুরুষের কৌতূহল অদম্য হ'য়ে ওঠে, বিস্ময় বিপুল হ'য়ে ওঠে!... তাহা পুরুষের ঊষর কঠিন চিত্তেও ভাবে'র রঙীন-ফুল গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়ে তোলে! পুরুষের নয়ন ও মন সুদূর স্বপ্ন-কল্পনায় আবিষ্ট করে' তোলে!...

...নন্দলালের জীবনে সুভাই একমাত্র নারী। সে নারী তাকে উপলব্ধি কর্‌বার বা জান্‌তে চাওয়ার অনেক আগেই নন্দর কাছে সম্পূর্ণরূপে সমস্ত দেহ-মন-চিত্তে ধরা দিয়েছে!...কিন্তু নারী যতই আপনার সৌন্দর্য্য ও আপনাকে আবরণে আবৃত রাখে, তার চিত্তের শোভা মাধুরী নিঃশেষে প্রকাশ না করে', আধ-প্রকাশ, আধ-অপ্রকাশের মধ্যে রাখে—ততই তার সৌন্দর্য্যের মূল্য বর্দ্ধিত হয়। পুরুষ তার চিরঅতৃপ্ত তৃষা নিয়ে তাকে আরও জান্‌বার জন্য— আরও নিঃশেষে পাওয়ার জন্য সাধনা করে। নারীর পক্ষে অত্যধিক প্রকাশ হওয়া নিঃশেষিত হওয়ারই সামিল।

সুভার হয়েছিল তাই। সুভার প্রতি তার স্বামীর কোনওদিন বিস্মিত দৃষ্টিনিক্ষেপের প্রয়োজন হয়নি!...

সে নন্দ'র সঙ্গে শৈশবে এক মায়েরই ক্রোড়ে লালিত হয়েছে!...বাল্যে খেলা-ধূলা-মারামারি করেছে!...যৌবনের পূর্ব্ব হ'তেই স্বামী-স্ত্রীভাবে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে বিনা মনোমালিন্যে গৃহধর্ম্ম যাপন ক'রেছে।

সুভা নন্দ'র জীবনে এমনি সহজ ও স্বাভাবিক। যেমন মানুষ তার দেহের কোনও একটি অংশ বিশেষ সম্বন্ধে অকারণে সর্ব্বদা সচেতন থাক্‌তে পারে না—তেমনি সুভা সম্বন্ধেও নন্দলালের চৈতন্য কোনওদিন বিশিষ্টভাবে জাগ্রত হ'য়ে উঠবার অবকাশ পায়নি!

সুভাষিণী যেন নন্দলালেরই দেহ মন ও চিন্তাযুক্ত জীবনের একটা অংশমাত্র। তার প্রতি বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপের কিম্বা মনোযোগ দেবার তাই কিছুই নেই।

তরুণী নারীর প্রতি পুরুষের যে একটি অননুভূত বিস্ময়পূর্ণ মুগ্ধ-দৃষ্টি— একটি আধস্বপ্ন আধসত্য ঘেরা বিচিত্র অনুভূতি যা চিত্তকে আচ্ছন্ন ও আবিষ্ট করে ফেলে— তার উপলব্ধি নন্দলালের জীবনে এই প্রথম।

অকারণে সমগ্র হৃদয়-মন তার কখনও বিপুল বেদনায় লুটিয়ে নুয়ে পড়ে —কখনও অকারণেই অদম্য পুলকে উছলিত হ'য়ে ওঠে।

এ-আনন্দ ও বিষাদের কোনও সঙ্গতি খুঁজে বের্ করা সুকঠিন।

সুভা বুঝতে পারে না অথচ আবার বুঝতেও পারে। ব্যথায় কাতর হ'য়ে পড়ে —অথচ নিজেকেই তিরস্কার করে। মনে করে তারই চিত্তের দুর্ব্বলতা এইসব সন্দেহ ও নানা অদ্ভুত কল্পনার সৃষ্টি ক'রছে বুঝি!—

চিত্রা আসার পর থেকে নন্দলাল অন্দরমহলে আসা খুবই সংক্ষিপ্ত ক'রে দিয়েছে।

আহারের সময় ও রাত্রে নিদ্রার পূর্ব্বে অন্দরে আসে।

রাত্রিবেলা স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি শুয়ে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে একটি নিঃশব্দ ব্যবধান কখন যে নিজের আয়তন উচ্চ হ'তে উচ্চতর করে' বাড়িয়ে তোলে, নিজেরাই তা' ধর্‌তে পারে না।

সুভা মাঝে মাঝে নিদ্রাহারা-নয়নে বিছানা ছেড়ে বাইরের বাবান্দায় গিয়ে দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হয় কে যেন তার নিশ্বাস রোধ করে' ধ'রছে!

মাঝে মাঝে বিনিদ্র রাত্রে একটি সুতীব্র আনন্দ-কল্পনা তার সমস্ত চিত্ত আকুল করে' তোলে!

তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র তৃতীয় ব্যক্তির কল্পনা!—যে তৃতীয়ের আবির্ভাব দুই সংখ্যাকে 'এক' করে। 'দুই' 'এক' হওয়াতেই যে এই 'তিন'-এর অস্তিত্ব!

সুভা বিছানা ছেড়ে মেঝের উপরে মাদুর বিছায়।

সুভা মেঝেয় থাক্‌লে নন্দ খাটের উপরে ঘুমাতে পারে না। অথচ তাকে জোর করে' খাটের উপরে নিয়ে আস্‌তেও ভরসায় কুলায় না।

অপরাধীর মত মৃদুকণ্ঠে সুভার পাশে দাঁড়িয়ে নন্দ ডাকে—মেঝেয় শুলে কেন? অসুখ কর্‌বে যে! খাটে উঠে শোও না!

সুভা সংক্ষেপে বলে—থাক। গরম হচ্ছে। এই বেশ আছি।

তারপরে নন্দলাল আর একটিও কথা বল্‌তে পারে না।

সুভার খুব কঠিন অসুখ হ'ল।

নন্দ একান্ত কাতর হ'য়ে পড়ে' দিনরাত্রি উদ্বিগ্নচিত্তে সুভার রোগ-পাণ্ডুর মুখের পানে তাকিয়ে বসে' থাক্‌ত।

চিত্রা অহোরাত্র নিঃশব্দে দিদির সেবা কর্‌ত। নিজের সহোদরা কিম্বা আত্মজাও বুঝি এমন আন্তরিক যত্নে ও আগ্রহে সেবা কর্‌তে পারে না।

নন্দ মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে বিমুগ্ধ-নয়নে তন্বী চিত্রার সেবারতা মূর্ত্তিখানির পানে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু পরমূহুর্ত্তেই ব্যথানুতপ্ত মুখে সুভার রোগ-শীর্ণ মুখখানির উপরে সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ত।

তন্দ্রাবিষ্টা সুভার ক্লান্ত করুণ মুখখানিতে, ললাটে, রুক্ষ চুলগুলিতে গভীর স্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে ব্যাকুলকণ্ঠে নন্দ ডেকে উঠ্‌ত—সু,—সু,—সুভি—

চিত্রা ধীরপদে এগিয়ে এসে শান্ত মৃদুকণ্ঠে বল্‌ত—এখন জাগাবেন না। অনেক কষ্টে এইমাত্র তন্দ্রাটুকু এসেছে।

নন্দ ঘোরতর অপরাধীর মত অত্যন্ত অপ্রস্তুত ও কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ত।

নন্দ ভাবত সুভা তারই দোষে বোধহয় মর্‌তে বসেছে!...কিন্তু সে নিজে স্পষ্ট কী যে ত্রুটি বা অপরাধ করেছে, তা ভেবে পেত না। অথচ নিজেকে অপরাধী মনে করে' সর্ব্বদাই যেন তার কুণ্ঠানুভূতি হ'ত।

সুভা একটু একটু করে' সেরে উঠ্‌ল।

নন্দলালের চিন্তাম্লান উদ্বেগকাতর মুখখানিতে আনন্দের স্বচ্ছহাসি আবার ফুটে উঠ্‌ল।

সুভাষিণী স্বামীর মুখের পানে তাকিয়ে ভাবত যেন একটা দুঃস্বপ্ন-রাত্রির পরে সুন্দর আলোভরা প্রভাতে আবার সে চোখ মেলেছে।

সুভা বল্‌ত—চিত্রা না থাক্‌লে এবার হয়তো বাঁচতুমই না। অদ্ভুত সেবা করেছে কিন্তু!

নন্দ চিত্রার প্রসঙ্গে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়্‌ত, সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিত—হ্যাঁ।

সুভা নন্দ'র মুখের দিকে চেয়ে বলত—চিত্রা যে আমাদের এত বেশী ভালোবাসে, সত্যিই জান্‌তুম না।

নন্দ এ প্রসঙ্গে চঞ্চল হ'য়ে উঠে কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে'র অবতারণার প্রয়াস কর্‌ত।

সুভা স্বামীর কথায় কান না দিয়ে নিজের কথাই বলে' চল্‌ত—ও খুব ভালো মেয়ে তা' জানতুমই। তবে ও যে আমাদের একান্তভাবে মর্ম্মে মর্ম্মে ভালোবেসেছে তা' উপলব্ধি করেছি এবারকার অসুখের মধ্যে!—

বারে বারে 'চিত্রা' ও 'ভালবাসে' শব্দদু'টি নন্দ'র শ্রবণপথে প্রবেশ করে' বক্ষঃশোণিতে নৃত্য তুল্‌ত। সে যেন দমবন্ধ বিবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ত।

শুষ্ক অসংলগ্ন কণ্ঠে সুভার কথার জবাব দিত—হ্যাঁ, খুব সেবা করেচে বটে! ব'লেই বল্‌ত—ভাগ্যিস অসুখের গোড়াতেই কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার আনিয়েছিলুম।

সুভা স্বামীর কথার উত্তর কিছু দিত না। অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে নির্মেঘ উজ্জ্বল আকাশের পানে তাকিয়ে থাক্‌ত।

নন্দ অল্পক্ষণ চুপ করে' থেকে, নীরবতা সহ্য কর্‌তে না পেরে বলে' উঠ্‌ত —কী ভাবচো অত?

সুভা এইবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে তাকিয়ে বললে—একটা কথা তোমায় বোল্‌বো!

নন্দ'র চোখেমুখে ভয়ের ছায়া সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। অকারণে বুক কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল।

সুভা স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে স্থির নয়নে স্বামীর দিকে চেয়ে সুগভীর কণ্ঠে বল্‌লে—আচ্ছা, চিত্রাকে তুমি বিয়ে ক'রলে কেমন হয়?—বেশ দুটি বোনে একত্রে থাকবো।... আব —আর—আমার তো—এই পর্য্যন্ত বলে' সুভা আর বল্‌তে পারে না।

স্বামীর কাছে নিজের বন্ধ্যাত্বের উল্লেখ করতে গিয়ে ওষ্ঠাগ্রে কথাটা এসেও আট্‌কে গেল!

নন্দ সুভার কথায় কেঁপে উঠল।

কী যেন একটা বলবার চেষ্টা করে, কিন্তু কণ্ঠস্বর একেবারে রুদ্ধ হ'য়ে যাওয়ায় কিছুই বল্‌তে পার্‌লে না। শুধু কাতর বিবর্ণমুখে সুগভীর-ব্যথাভরা দৃষ্টিতে সুভার মুখের পানে ছলছল করুণ নয়নে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল।

সুভা এবার স্বামীর দিকে ব্যথিত অথচ মমতা-স্নিগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে মৃদু-ভর্ৎসনার সুরে বল্‌লে—ছিঃ, অত কাতর হ'লে চলে কি? পুরুষ-মানুষ তুমি। ভাল করে সব-দিক্ ভেবে দেখ।...—আমরা দু'জনে তো চিরদিন থাক্‌বো না—বাবা-মার ইচ্ছে ছিল তুমিই তোমার পুরুষানুক্রমে তাঁদের এই সম্পত্তি ভোগ কর! সে কথাটা কি ভাবা উচিত নয়?

নন্দলাল রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লে—সুভা—

সুভা বল্‌লে—অত কাতর হচ্ছ কেন...তুমি আর আমি কি দুই? আমরা যে একই। আমি তো কাতর হইনি।

নন্দলাল ভয়-কুণ্ঠিত মুখে সকাতর স্বরে বল্‌লে—হ্যাঁরে সু,—আমি কি সত্যিই কিছু অপরাধ করেছি?

সুভা জিভ কেটে বল্‌লে—পাগল কি তুমি?...

অভিমান ভরে নন্দ বল্‌লে—তবে কেন তুই এসব কথা বল্‌ছিস্ বল্ তো?

সুভা বল্‌লে—আচ্ছা, তোমার যা কিছু জিনিষ, তা' আমার একান্ত নিজস্ব জিনিষ, এ কথা সত্যি কিনা জবাব দাও আগে!

নন্দ বিস্ময়াভিভূতস্বরে বল্‌লে—তাও কি আজ আবার নতুন করে বলে' দিতে হবে নাকি?

সুভা এইবার স্বামীর অনাবৃত-বাহুমূলে নিজের শীর্ণ মুখখানি লুকিয়ে গাঢ়স্বরে বল্‌লে—তোমার ছেলে তা'হলে আমারই ছেলে নিঃসন্দেহ!...হোক্ না সে চিত্রার ছেলে, কিন্তু সে-তো তোমারই। তোমার যা কিছু, সবই যে একান্তভাবে আমার।

অস্তু

নানান্ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে' সত্যিসত্যিই শেষে নন্দর সঙ্গে চিত্রার বিয়ে হ'য়ে গেল।

নন্দর শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবেরা 'ছি ছি' কর্‌লে।

নন্দ সানুযোগে সুভাকে বল্‌লে—তোমার জন্যই আমাকে এত দুর্নামের ভাগী হ'তে হ'ল!

সুভা করুণ হেসে বল্‌লে—কৃষ্ণ-কলঙ্কে কলঙ্কী হওয়ারও যে সুখ আছে।...চিত্রাকে পাওয়ার বদলে দুর্নাম সহ্য করা আর এমন বেশী কি!

নন্দ আরক্তিম মুখে অপ্রস্তুত হ'য়ে উঠলো।

প্রথম কিছুদিন সুভা প্রাণে যেন একটা মহৎ ঔদার্য্যের স্পর্শ পেত, নিজেকে সে সংসারের সমতলভূমি হ'তে উর্দ্ধে অবস্থিত বলে' উপলব্ধি কর্‌ত এবং তার জন্য একটু গর্ব্বও বোধ কর্‌ত। সংসারের সাধারণ নারীর সহিত তার নিজের যে অনেকখানিই পার্থক্য আছে—তার ত্যাগশক্তি, মহত্ত্ব ও নিঃস্বার্থতা যে এই স্বার্থপর সংসারে বহুমূল্য এবং মহার্ঘ্য—এটা যেন সে নিজেই সবচেয়ে বেশী উপলব্ধি করে' আত্মহারা হ'য়ে পড়ত।

কিন্তু এই উগ্র মাদকের মত অহঙ্কৃত আনন্দ বেশীদিন তার আত্মত্যাগের উদার সুখানুভূতিকে সচেতন রাখতে পারলে না, তাহা ক্রমশঃই পাতলা হয়ে আসতে লাগল। ...সঙ্গে সঙ্গে দারুণ অবসন্নতা ও শূন্যতাবোধ।

বিয়ের পর সুভা চিত্রাকে বেশী করে যত্ন-আদর করতে লাগল। কিন্তু মাত্র কয়েক মাস!...

নিজের হাতে সযত্নে কবরী রচনা করে' দিয়ে, মুখে ক্রিম্ পাউডার মাখিয়ে —কাপড়ে এসেন্স ঢেলে দিয়ে, সরমকুণ্ঠিতা আরক্তমুখী চিত্রাকে সুভা স্বামীর ঘরে গল্প কর্‌তে পাঠিয়ে দিত।

তারপর খানিক বাদে মৃদু হাসি-আঁকা সকৌতুক মুখে সুভা জানালার বাইরে খড়খড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আড়ি পাত্‌ত।

রুদ্ধদ্বার গৃহাভ্যন্তরে তখন একটি মধুর দৃশ্যের অভিনয় চলেছে।

লজ্জারুণা তরুণী চিত্রার ললাটের ভ্রূরেখা-অবধি নামানো নীলাম্বরী-অবগুণ্ঠনখানি উন্মোচনের জন্য নন্দলালের সে কী ব্যাকুল প্রয়াস।

প্রিয়ার মুখের একটিমাত্র বাণী শুনবার জন্য কি নিবিড় সাধ্যসাধনা!...

তাদের কথাবার্ত্তা বাইরে থেকে কিছু শোনা না গেলেও মধুর সুখবিহ্বল স্বপ্নাবিষ্ট চাহনি, অধরের হাসি, তৃষিত অথচ সলজ্জ ভঙ্গীটুকু সুস্পষ্টই দেখা যেত।

নন্দলালের পানে বিস্ফারিতনয়নে তাকিয়ে সুভার মনে হ'ত—এ নন্দলাল যেন আর একজন নতুন মানুষ। এর এই প্রেমাবিষ্ট চাহনি, সুখবিহ্বল হাসি, আত্মহারা

একাগ্র-তন্ময় মুখভাব—এর সঙ্গে ত সুভার আশৈশবের—আযৌবনের অতিপরিচিত নন্দলালের সাদৃশ্য নেই!

আর ঐ নূতন নন্দলালের বক্ষোনিবদ্ধা লতার মত এলিয়ে-পড়া, সলজ্জসুখাবেশে আধমুদিতনয়না মেয়েটি—এই কি নির্ব্বিকার মৌনপ্রকৃতি শান্তসংযতা বিষাদকরুণমুখী চিত্রা!

মিনিট পনেরো বাতায়নের ছিদ্রে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে —তারপর সুভা আর দাঁড়াতে পার্‌লে না। টল্‌তে টল্‌তে এসে নিজের শূন্যঘরের মেঝেয় অর্দ্ধমূর্চ্ছিতার মত লুটিয়ে পড়ল।

আজ সুভার প্রথম মনে হ'ল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি প্রেম সুন্দর ও সজীব হয়, তা'হলে তাদের মধ্যে চিরদিন নিত্যনবীনতা ও বৈচিত্র্যানুভূতিও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তারা কি কোনওদিন পরস্পর পবস্পরকে সম্পূর্ণ নূতন করে উপলব্ধি করতে পেরেছে? নিবিড় বিস্ময়ে একে অপরের পানে তাকিয়ে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পড়েছে?

যে-প্রেমে প্রেমাস্পদকে অপূর্ব্বরূপে দেখবার সুযোগ নেই—যাকে চাইবার আগেই পাওয়া যায়,—যার জন্য হৃদয়ে বেদনা, অভাব এবং ব্যাকুলতা অনুভবের অবকাশ ঘটে না—সে-প্রেম যত গভীরই হোক্ না কেন,—সে প্রেম বুঝি মানব-চিত্তে নিত্য নব-অমৃত পরিবেশন কর্‌তে পারে না!—তাহা জীবনকে পরম উপভোগ্য করে' তুল্‌তে বোধ হয় অসমর্থ!...

আজ অকস্মাৎ সুভাষিণীর মনে হ'ল—অখণ্ড-মিলনে মিলনের আনন্দ মলিন নিরুজ্জ্বল হ'য়ে যায়।

মিলনের আনন্দকে উজ্জ্বল ও রম্য ক'রে তুলতে হ'লে বিবহ-অনলে দীপালির প্রয়োজন!...স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরহ, সাময়িক মনোমালিন্য, অভিমান, রাগ, কলহ—এরা যে প্রেমকে আরও উজ্জ্বল প্রদীপ্ত ও ঘননিবিড় ক'রে তোলে এর একটা অস্পষ্ট ধারণা সুভার চিত্তে ছায়া বিস্তার করল।

সুভা চিত্রাকে স্বামীর সঙ্গে নূতন আলাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করত। কুণ্ঠিতা চিত্রা লজ্জাভারে নুয়ে পড়্‌ত। তার সর্ব্ব-অবয়বে গভীর লজ্জা ও গোপন-পুলকের বিচিত্র সংমিশ্রণে একটি অপরূপ-সৌন্দর্য্যশ্রী উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।

সুভা দেখ্‌ত স্বামীরও চোখেমুখে সলজ্জ গভীর আবেশের ছায়া!...নয়নের দৃষ্টি, —অধরের হাসি—তার অন্তরলোকের মধু-রজনীর বসন্ত-উৎসবের আভাস বাইরে এনে দিত।...

মনে হ'ত সে যেন মাদক পান করেছে।...চোখেমুখে তারই গোলাপী-নেশা জড়িয়ে আছে!...

সুভা ভাব্‌ত সে'ও তো তার নবযৌবন-প্রভাতে স্বামীর পাশেই ছিল। কিন্তু কোনওদিন তো স্বামীর নয়নে এ' স্বপ্ন-বিহ্বলতা দেখ্‌তে পায়নি!...

চিত্রা পান সাজত—নন্দ তার পাশ দিয়ে চলে' যেতে যেতে চট্ করে' অবগুণ্ঠনটা

খসিয়ে দিয়ে করবীর একটা কাঁটা খুলে দিয়ে চলে' যেত!

চিত্রার সুগৌর-মুখখানি রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ত। কপট ক্রোধে স্বামীর প্রতি ভ্রূকুটি করে—কিন্তু দৃষ্টিতে সপ্রেম হাসি উৎসারিত হ'য়ে আসত! অকারণ-প্রয়োজনের মিথ্যা-ছলে নন্দ কতবারই্ না অন্দরের ভিতরে আনাগোনা করত।

তার শ্রবণ যেন সর্ব্বদা উৎকর্ণ—দৃষ্টি যেন সদাই উন্মুখ, চঞ্চল—

কার জন্য?

দূর হ'তে হয়তো চিত্রার সঙ্গে এক নিমেষের তরে চোখা-চোখি হ'ত, উভয়েরই মুখে আনন্দের বিদ্যুৎ খেলে যেত।

সুভার সাম্‌নে কোনও অসতর্ক মূহূর্ত্তে ধরা পড়ে' গেলে উভয়েই রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ত। অপরাধীর মত অপ্রতিভ মুখে দু'দিকে সরে যেত।

সুভা অন্যমনস্ক চিত্তে ভাবত—সে তো কখনও নন্দকে দেখে অমনতর আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠেনি। কারুর সাম্‌নে ধরা পড়্‌লে মধুর লজ্জায় অমনতর রাঙা হ'য়ে ওঠেনি!..

অবগুণ্ঠনের আড়ালে থেকে সবাইকে লুকিয়ে চুবি করে' স্বামীকে দেখার গোপন পুলকের স্বাদ কেমন,—তা তো সে কখনও জান্‌তে পায়নি।

সে তার স্বামীকে পেয়েছে—দ্বিপ্রহরের অনাবৃত প্রখর আলোয়—সহস্র মানবের দৃষ্টির সাম্‌নে। সে-ক্ষণের আলোব দীপ্তি যতই থাকুক, মাধুর্য্য কিছু নেই।

ঊষার আলো-ছায়ার লুকোচুরির মধ্যে যখন সহস্র বর্ণের বিচিত্র লীলা—সে লগ্নে সবাব প্রখর দৃষ্টির অন্তরালে নির্জ্জনে স্বামীকে পেয়েছে চিত্রা!

চিত্রা হ'তে সে তার অনাস্বাদিত মাতৃজীবনের র্‌সাস্বাদন কর্‌তে পাবে, এই প্রলোভনেই চিত্রাকে স্বেচ্ছায় এবং একপ্রকার সাগ্রহেই সপত্নী করেছিল সুভা। কিন্তু চিত্রা এ কী অনাস্বাদিত জীবনের তৃষা জাগিয়ে তুললে তার!...যা' তার 'মা' হওয়ার সাধের চেয়েও আজ বড় হ'তে চাইছে!— যা' তার ইহজন্মে পূর্ণ হয়নি, হবে না এবং হ'তে পারেই না।

সুভা নিঃশব্দ-বেদনায় শরাহত পাখীর মত আপনার মর্ম্ম-কোটরের মধ্যে ছটফট কর্‌ত!... অভিমানক্ষুব্ধ আঁখি মেলে চারিদিকে অসহায়ভাবে তাকাত। মনে হ'ত তাকে 'আপনার' বলে একান্তভাবে কাছে টেনে নেবার কেউ নেই।

নিজেই মনে মনে ভাব্‌ত—সতীনের প্রতি ঈর্ষার জ্বালা হয়তো একেই বলে। এইই হয়তো হিংসা বিষ! সুভা ভয়ে আপনা আপনি চোখ বুজ্‌ত।

কায়মনোচিত্তে ভগবানকে স্মরণ কর্‌ত—হে ভগবান! আমি আর 'মা' হ'তে চাই না। আর ছেলেও চাই না,—স্বামীও চাই না। আমাকে পাপ হ'তে বাঁচাও, —নীচতা হ'তে রক্ষা কর, প্রভু!...তোমার সু-দর্শনচক্রে আমার দৃষ্টিতে সু-দর্শন এনে দাও—আমার মর্ম্মে সু-দর্শন দান কর—...আমার অন্তরের তৃষ্ণা চিত্রা ও চিত্রারই স্বামীর মধ্যে তৃপ্ত হ'য়ে অমৃত সৃষ্টি করুক। ঈর্ষার অনলে যেন বিষ হ'য়ে না

ওঠে। আমায় রক্ষা কর—রক্ষা কর দয়াময়—

নব-বিবাহের প্রথম বিহ্বলতার ঘোর কেটে এলে নন্দলালের মগ্ন চৈতন্যের তলদেশ হ'তে চিরসঙ্গিনী সুভা আবার ধীরে ধীরে ভেসে উঠ্‌তে লাগল।

নন্দলাল গভীর লজ্জায় দুঃখে বিবেকের তাড়নায় কাতর হ'য়ে উঠল। তাদের এই দীর্ঘকালের সম্বন্ধকে এমন করে' অপমান করার লজ্জায় সে ভেঙে পড়ল।

তার এই নিদারুণ লজ্জা ক্ষোভ ও বেদনা, প্রবল অভিমানের রূপ ধরে' সুভাষিণীর উপরে গিয়ে পড়ল। নিজের মনের দুর্ব্বলতাটাকে সে নিজের কাছেও স্বীকার করতে চাইত না। যেন তার স্বামীধর্ম্ম হ'তে চ্যুতিটা সমস্তই অপরের দোষ।

নন্দলাল ক্ষুব্ধ-অভিমানে বল্‌লে—তুমিই তো এর জন্য দায়ী!..

সুভা বিনা-তর্কে নিঃশব্দে স্বামীর অভিযোগ স্বীকার ক'রে নিলে। অনেক কথা বল্‌তে পারত, কিন্তু কিছুই বল্‌লে না।

নন্দলাল বল্‌লে—যদি সত্যিই তুমি তোমার স্বামীকে ভালোবাস্‌তে,—বা স্বামীকেই একান্তভাবে চাইতে,—তা'হ'লে এমন করে অনায়াসে নিজের স্বামীকে 'পর'কে বিলিয়ে দিতে কখনো পারতে না!—

সুভা বেদনা-বিবর্ণ মুখে নতনেত্রে চুপ করে' ভাব্‌তে লাগল। স্বামীর ভয়ঙ্কর-অভিযোগে'র প্রতিবাদ করল না।

অভিমানভরে নন্দ আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—স্বামীর প্রতি প্রেম না থাক্—কর্ত্তব্যও কি একটু থাক্‌তে নেই?... স্বামীর দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে—নিজের অতৃপ্ত সাধ পূর্ণ ক'রবার জন্য তাকে কর্ত্তব্যচ্যুত করা—স্বামী-ধর্ম্ম হ'তে স্খলিত করা—এটা কি ভাল করেছ?...

সুভা পাংশুমুখে বল্‌লে—ও'সব তুমি কী বোল্‌চো!...নন্দলাল চাপা কান্নার সুরে গর্জ্জে উঠে বলে' উঠ্‌ল—তুমি ছেলের লোভে চিত্রার কাছে স্বামীকে বিক্রী করনি?

সুভার সমস্ত মুখে কে যেন লজ্জার ও অপমানের নীল কালি লেপে দিলে। দু'হাতে মুখ ঢেকে সুভা আর্ত্তস্বরে ব'লে উঠ্‌ল—ওগো, চুপ কর। তার শাস্তি পেয়েছি। বিশ্বাস কর তুমি!

নন্দলাল শুষ্ক করুণ হেসে বল্‌লে—হ্যা, সবদিক্ দিয়ে ঠকলে তুমিই।

সুভা নন্দর বুকের কাছটিতে নিজের মাথাখানি নত করে ছুঁইয়ে বল্‌লে—না, না, চিত্রা ত শুধু আমার স্বামী কেড়ে নেয়নি—সে যে তোমায় নতুন ক'রে পেতে শিখিয়ে দিয়েছে।

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৫

বিস্তীর্ণ বারিধির একটি বুদ্বুদ

ছোটবয়স থেকেই মা বলতেন—কপালে অনেক দুর্গতি আছে। মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মতো নরম-সরম হবে, তা নয়কো,—সবেতেই পুরুষদের সঙ্গে সমান হতে চাওয়া।—সবেতেই ওর গোঁ,—অহঙ্কার! অত তেজ ভালো নয়।

বাপ সস্নেহে হেসে বলতেন—ও মেয়েটা একটু পাগলি। তা হোক, একটু তেজ থাকা ভালো। তোমার ঐ মেয়েমুখো ছেলে নাড়ুগোপালের মতো হওয়াও ভালো নয়।

মা দ্বিগুণ চটে বলতেন,—দেখে নিও তখন আমি বলে রাখছি, তোমার ঐ একগুঁয়ে মেয়ের কপালে ঢের দুঃখু আছে। নিজের স্বভাবের দোষে ওকে কষ্ট পেতে হবে।

বাপ গম্ভীর হয়ে বলতেন,—হ্যাঁ, সেটা গর্ভধারিণী মায়ের নিত্যকার প্রাতঃবাক্যে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে যেরকম, না ফলে যাবে কোথায়?—

মা মুখ ভার করে বলতেন,—আমার বয়ে গেছে। ভালোর জন্যেই বলি। স্বভাব শোধরালে নিজেরই ভালো, না শোধরায় নিজেই জ্বলে পুড়ে মরবে।

বাবা নিরুত্তরে অন্দর থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতেন।

মা রুষ্টকণ্ঠে স্বগতোক্তি করতে থাকতেন—পেটের মেয়ে তাই রক্ষে! সতীনের মেয়ে হলে লোকে আমাকেই ডাইনি বলে দুষ্‌তো!

অনেকগুলি ভাইবোন। গুটি আট-দশ হবে।

বোন গুটি চারেক। তার মধ্যে সেজ মেয়ে বিন্দু মায়ের দুশ্চিন্তা ও বিরাগের কারণ। বড় একগুঁয়ে জেদি মেয়ে সে।

ছোট মেয়ে ইন্দু তার চেয়ে ঢের বেশি দুষ্ট দুরন্ত চঞ্চল, কিন্তু সে বিন্দুর মতো অমন কঠিন একজেদি একগুঁয়ে নয়। ইন্দুকে কোনোরকমে বোঝানো চলে ভোলানো চলে, যে-কোনো উপায়ে তাকে স্ববশে ও স্বমতে আনা যায়, কিন্তু বিন্দুকে তার জো নেই। শৈশবে জ্ঞানোন্মেষ হতে কেউ কখনো খোসমোদে ভুলিয়ে বা ভুল বুঝিয়ে কার্যসিদ্ধি করে নিতে পারেনি এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি একজেদি মেয়েটির কাছে। সে তার বড়দিদি রেবতীর মতো বিরাট অবুঝ প্রকৃতি ও অকারণ অভিমানপ্রবণা কিংবা মেজদিদি রোহিণীর মতো একান্ত আলস্যপরায়ণা ও অকারণ মিথ্যাভাষিণী নয়। ছোটবোন ইন্দুর মতো চঞ্চলা ও মুখরাও নয়, তবুও বিন্দুর উপরে যে মা নিতান্ত অপ্রসন্না ছিলেন, তার প্রধান কারণই বোধ হয় বিন্দু কাউকে ফাঁকি দিতে পারে না যেমন, তেমনি ফাঁকি সইতেও নারাজ। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে মা,—মা হয়েও মাঝে মাঝে যেন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। বিন্দু মুখে

কিছু বলুক বা না বলুক, বুঝতে পারে যে সমস্তই—এইটাই বোধ হয় তার প্রধান অপরাধ ছিল এবং মায়ের অপছন্দ ছিল এইটাই।

বছর সাত-আট বয়স তখন বিন্দুর। মেজদিদি রোহিণীর সরষেফুল প্যাটার্নের সোনার চুড়ি গড়ে এল, একসঙ্গে চারখানি নীলাম্বরী ও ডুরে শাড়ি এল। বিন্দু বায়না ধরলে —আমারও এরকম শাড়ি চাই, চুড়ি চাই মেজদির মতন। বাপ বললেন,—সত্যিই তো! একটি মেয়েকে দিলে, অন্যটিকে দিলে না, এ তোমার কীরকম ব্যবস্থা!... ছেলেমানুষ, ওর চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে যে! মা উষ্ণস্বরে উত্তর দিলেন—করুক চোখ ছলছল্‌। এই বয়স থেকে অত সমানে-সমানে ভাগ নেওয়ার শিক্ষা আর দিও না। মেয়েমানুষ, পাঁচজনের ঘরে বিয়ে হলে তখন এমনি ভাগ চেয়ে বসবে নাকি? এখন নিজের বোনের হিংসে করছে,— তখন জা-জাওলিদের হিংসে করবে!— তা হলেই মেয়ের সুখ্যাতিতে শ্বশুরবাড়িতে ধন্য ধন্য সাড়া পড়বে অখন।

তারপর উষ্ণস্বর একটু উদাত্ত করে আবার বলতে শুরু করেন,—রোহিণীর বিয়ের সম্বন্ধ আসছে পাঁচ জায়গা থেকে, পুরানো ক্ষয়া রুলি দু'গাছা হাতে আর ওর ভালো দেখায় না, তাই নতুন চুড়ি গড়িয়ে দিলুম। সর্বদা ঘটক ঘটকী ওকে দেখতে আসে তাই চারখানা আটপৌরে রঙিন শাড়ি কিনে দিয়েচি। সময় আসুক, বিন্দিরও তখন হবে।

বিন্দু সহজেই শান্ত হলো মায়ের দীর্ঘ কৈফিয়ৎ শুনে। সেও যখন মেজদির মতন বড় হবে, তখন ঐরকম চুড়ি ও শাড়ি সেও পাবে—তার সত্যতা সম্বন্ধে একটুও সন্দিহান হলো না। প্রসন্ন হাসিতে শ্যামল মুখখানি উজ্জ্বল করে মেজদির নতুন চুড়ি ও শাড়িগুলি নেড়েচেড়ে দেখে সে খুশিই হলো। আর বায়না গণ্ডগোল করলে না।

স্কুলের মধ্যে বিন্দু পড়াশুনায় ভালো। শিক্ষয়িত্রীরা এই একগুঁয়ে মেয়েটিকে পাঠ দিয়ে এবং পাঠ্য হতে কূটতম কঠিন প্রশ্ন করে—সদুত্তরে সুখী হন। এই তীক্ষ্ণ মেধাশালিনী ছাত্রীটির উপরে তাঁরা প্রত্যেকেই প্রসন্ন। কিন্তু বারো বৎসর বয়স পূর্ণ হতে না হতেই মা তাকে স্কুল ছাড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কারণ, রোহিণীর বিয়ে হয়ে গেছে, এইবার বিন্দুর পালা। মেয়ে বারো বছর পূর্ণ হতে চললো, আর নাকি স্কুলে যাওয়া ভালো দেখায় না।

বিন্দু ভয়ঙ্কর আপত্তি বাধিয়ে বসল,— সে কোনোমতেই স্কুল ছাড়তে রাজি নয়। বাপ বললেন,—ঘরে বসিয়ে রেখে লাভ কি?

মা উত্তপ্ত সুরে জবাব দিলেন—ইস্কুলে পাঠিয়েই বা লাভ কি? পড়ে তো জজ-ব্যারিস্টার হবে না? বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন, জীবন তো কাটবে সংসারের ধামা কুলো হাঁড়ি কলসি আর ছেলের দুধের ঝিনুক কাঁথা নেড়ে চেড়ে! তা সে

রাজার ঘরেই বিয়ে হোক বা গেরস্থঘরেই হোক। দোয়াত কলম খাতা বই নিয়ে মেয়েমানুষের জীবন কাটে না।

বাপ হার মেনে ক্লান্ত সুরে বললেন,—তবে বাড়িতেই পড়ুক। মাস্টারমশাই ওকে সকালে তো পড়িয়ে যান, বলে দেব'খন, এবার থেকে যেন দু'বেলাই ওকে পড়িয়ে যান। পড়তে আগ্রহ আছে, মাথাও পড়াশুনায় ভালো, একেবারে ছাড়িয়ে দিয়ে কাজ নেই। মা বিরক্তস্বরে বললেন,—বুড়ো ধাড়ি মেয়ে, দিনরাত বই নিয়েই আছে, সংসারের কাজকর্ম শিখছে না, শ্বশুরবাড়ি গেলে আমাকেই তারা দুষবে! তোমার আর কি বলো!

বাপ উত্তর দিলেন না।

স্কুল ছাড়াতে বিন্দু কেঁদে-কেটে উপবাস করে অনর্থ বাধিয়ে বসল। পাঁচ-সাতদিন ধরে ভালো করে কিছুই খেলে না, অনবরত কেঁদে কেঁদে মুখ-চোখ ফুলিয়ে রাঙা করে তুললে। বাড়ির কারুর সঙ্গেই কথা কইলে না, অনাহারে অর্ধাহারে ঘরের কোণে শুয়ে রইল। ছোট ভাইবোনদের জামা পরানো, মায়ের ফরমাজ শোনা, বাপের কোর্টের পোশাক ঠিক করা, কলারে বোতাম পরিয়ে দেওয়া—কিছুই করলে না। এমনকি বুড়ো প্রাইভেট টিউটর প্রসন্নবাবু রোজ দু'বেলা এসে ফিরে যেতে লাগলেন, বিন্দু কিছুতেই তাঁর কাছে পড়তে গেল না, বিছানায় মুখ গুঁজে শক্ত কাঠ হয়ে পড়ে রইল।

বিন্দুর মনে পড়তে লাগল, তার বয়স যখন মাত্র পাঁচ বৎসর, সেদিনও তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমনি জোর করেই স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল। তার প্রতিদিনের সহস্র ওজর আপত্তি ও কান্না ঠিক এমনিভাবেই অভিভাবকদের অটল ইচ্ছার কাছে উপেক্ষিত ও ব্যর্থ হয়েছিল। আজও সেটা কিছুমাত্রও পরিবর্তিত হয়নি, অবিকৃতই আছে দেখে সে বিস্মিত হলো না, শুধু এইটুকু বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল, তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনোকিছুই দাম নেই তার জীবনে।

সময় সকল দুঃখই ভুলিয়ে দেয়।

বিন্দুও আবার নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া ও সংসারের কাজে-কর্মে মনোনিবেশ করলে, স্কুল ছাড়ার মর্মবেদনায় কিন্তু সে প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়াও ত্যাগ করলে। বাপ এ অভিমানের অর্থ বুঝলেও মা এতে খুশিই হলেন। কিন্তু খুব বেশিদিন সে এভাবে কাটাতে পারলে না,—আবার একটু একটু করে পড়াশুনা শুরু করলে। এবারে স্কুলে কিংবা প্রাইভেট টিউটরের কাছে নয়, নিজে নিজেই। বাপের কাছে কিংবা দাদাদের কাছে পড়ার কঠিন অংশ বুঝে নিত। এতে তার পড়া আরও দ্রুতই অগ্রসর হতে লাগল। একবছর পরে স্থির করলে, আর একবছর বাদে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবে। এর মধ্যে ঘটল এক ঘটনা। ছোটবোন ইন্দুর জন্য মা একটি বেনারসি সুট কিনলেন। বিন্দু জিজ্ঞাসা করলে— আমার কিনবে না মা?

মা উত্তর দিলেন—তোমার তো আজ পাত্র পাওয়া গেলে কালই বিয়ে হবে। বিয়ের সময়ে তো ঢের কাপড়-চোপড় বেনারসি সুট দিতেই হবে,—আগে থেকে কিনে নষ্ট করে কি হবে?

বিন্দু অভিমানে গর্জে উঠল,—মেজদির বেলা তো এ ব্যবস্থা ছিল না! আমি যখনই যা চাই, তুমি বলো 'বিয়ের সময়ে দেবো।' কেন? আমি যদি বিয়ের আগে মরেই যাই?

বস্তুতই ইদানিং মা বিন্দুর জন্য কোনোকিছুই তৈয়ার করাতেন না, একেবারে বিয়ের সময় সমস্ত দিতে হবে বলে।

মা রাগ করে বললেন,—চিরকাল মেজদির হিংসে করে এসেছ, এখন ছোটবোনটার হিংসে করতে লজ্জা করে না?— খুব করব,—আমার খুশি, আমি ইন্দুকে দেবো, তোকে দেবো না।

বিন্দু মায়ের এই কুৎসিত ঈর্ষার অভিযোগে স্তম্ভিত হয়ে চোখের জল চাপতে চাপতে সরে গেল। সে তার ছোটবোনটিকে যে কত বেশি ভালোবাসে মা তা কি জানেন না? এমন হীন অভিযোগ করতে তাঁর বাধল না। লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে বিন্দু সেইদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল,—জীবনে কখনো সে আর কারুর কাছে আবদার করে কিছু চাইবে না! যতই কেননা ন্যায্য প্রাপ্য তার হোক।

এলাহাবাদে একবৎসর চেষ্টা করেও পাত্র স্থির না হওয়ায় ঠিক হলো বিন্দু কলকাতায় মামারবাড়িতে গিয়ে থাকবে এবং সেখান থেকে তার বিয়ের স্থির হলে বাপ ছুটি নিয়ে কলকাতায় গিয়ে বিয়ে দিয়ে আসবেন।

এবারে বিন্দু সরাসরি বাপের কাছে গিয়ে স্পষ্টভাবে দৃঢ় আপত্তি জানিয়ে মাথা নেড়ে বললে,—বাবা, আমি কলকাতায় যাব না। বাপ সস্নেহ হেসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, —কেন রে পাগলি? নতুন শহরে যাবি, কত কি নতুন ব্যাপার, নতুন জিনিস দেখবি! যাবি না কেন?

বিন্দু বললে—আমি আসছে বছর প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবো ঠিক করেছি বাবা, কলকাতায় গেলে আমার সব মাটি হয়ে যাবে। আমি যাব না।

বাপ একটু চিন্তিতভাবে চুপ করে রইলেন। তাঁর উত্তর দেওয়ার আগেই বিন্দু বাপের কোলের ভিতর মুখ গুঁজে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল,— বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার বিয়ে এখন দিও না। আমার একটুও ভালো লাগে না ওসব।

বাপ মেয়ের চূর্ণ-চুলগুলি সস্নেহে গুছিয়ে দিতে দিতে প্রশান্ত হাসিতে মুখখানি উজ্জ্বল করে বললেন—তা হয় না যে মা! আমি দিন দিন বুড়ো হচ্ছি, স্বাস্থ্যও তেমন সুবিধের নয়, কবে কি হয় ঠিক নেই। তোকে আর ইন্দুকে সৎপাত্রে দিয়ে যেতে পারলে আমার কত স্বস্তি সে তুই এখন বুঝবিনে।

তারপর খুব হালকাভাবে উৎসাহের সুরে বললেন,—আচ্ছা, তোর এগ্‌জামিনের ক্ষতির জন্যই তো বিয়ের আপত্তি? বেশ তো,—কলকাতাতে মামারবাড়িতেও নিজে

নিজে এখানকার মতো পড়াশুনা করবি! পড়ে জেনে নেবার যা দরকার মামাবাবুদের কাছে জেনে নিবি, তারপর বিয়ে তো আর আজই ঠিক হয়ে যাচ্চে না, যদিই তোর এগ্‌জামিনের আগেই বিয়ে স্থির হয়, আমি বিয়ে দিয়ে তোকে আমার সঙ্গে এলাহাবাদে নিয়ে চলে আসব, শ্বশুরবাড়ি পাঠাবো না। এখানে এসে তুই এগজামিন দিবি!

বিন্দু মাথা নেড়ে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে,—আমার বিয়েই মোটে দিও না বাবা! আমি তাহলে বোধ হয় বাঁচব না।

বাপ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—চুপ, ও-কথা বলতে নেই। বাপের অন্ধকার মুখের দিকে চেয়ে বিন্দু একটু ভীত হয়েই সরে গেল।

কলকাতায় মামারবাড়ি এসে বিন্দুর লেখাপড়ার একেবারেই সুবিধা রইল না।

এ-বাড়িতে তার সমবয়সী মেয়েরা ও বৌয়েরা কেউই লেখাপড়া করে না। বাড়িতে কোনোখানে একটু নিরিবিলি স্থান নেই যেখানে বসে সে নিজের পড়াশুনা করে। এ-বাড়ির মেয়েরা সদা সর্বদা কেবল সাবান মাখা, গা ধোয়া, চুল বাঁধা, শাড়ি ব্লাউজ বদলানো, সাজগোজ নিয়ে ও থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখতে যাওয়া এবং তার সমালোচনা তর্কাতর্কি নিয়ে সময় কাটায়। বইয়ের বড় কেউ একটা ধার ধারে না, যাও-বা পড়ে সে অপাঠ্য বাজে বাংলা নভেল!

বড়লোকের বাড়ি। সংসারের সব কাজ বামুন-চাকর-দাসীরাই করে। বিন্দু দেখলে তার সঙ্গে মামারবাড়ির তরুণী ও কিশোরীদের পার্থক্য অনেক। এমনকি সে মামার-বাড়ির তরুণী দাসী সুবাসী ও প্রৌঢ়া দাসী শশীর ফরসা ফরসা চওড়া পাড় শাড়ি গহনা, কেশ ও বেশের পারিপাট্য দেখে বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকত! তাদের এলাহাবাদের দাইদের সঙ্গে কলকাতার 'ঝি'-দের প্রভেদ ভাবত।

মামারবাড়ির বৌ-ঝিরা ঘুম থেকে উঠে বিছানা ছেড়ে ওঠে আটটা সাড়ে আটটায়, কেউ কেউ বা নটাতেও। দুপুরে প্রত্যেকে দীর্ঘ দিবানিদ্রা দেয়, অবসরকাল শুধু বরের গল্প, বাপের বাড়ির কিংবা শ্বশুরবাড়ির ঐশ্বর্যের গল্প, গহনাগাঁটি কাপড়-চোপড়ের নতুন হালফ্যাশানের আলোচনা এই সমস্ত নিয়ে, কিংবা সখিতে সখিতে নানারকম হাস্য পরিহাস ইঙ্গিত ইশারা নিয়ে সময় কাটায়। সে-সব হাস্য-পরিহাস ও ঈঙ্গিত ইশারা প্রায়ই শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করেই চলে, তার বুঝতে দেরি হলো না।

বিন্দুকে নিয়ে তারা প্রায়ই ইঙ্গিতপূর্ণ রসিকতা করে। বিন্দু সুস্পষ্টভাবে প্রত্যেক কথার অর্থ না বুঝলেও আন্দাজে কিছু বোঝে!

তরুণী ও কিশোরীর দল হেসে গড়িয়ে পড়ে— কী লো। এ যে একেবারে বনবাসিনী কপালকুণ্ডলা দেখছি। ভাজা মাছখানি উল্টে খেতে জানেন না!

বিন্দুর মুখ লজ্জায় অপমানে বিরক্তিতে রাঙা হয়ে ওঠে।

সম্বন্ধ হলো।

কনে পছন্দ, নগদ টাকার দর-কষাকষি, গহনাগাঁটি ও বরাভরণ দানসামগ্রীর রফা ইত্যাদির পর পাকা দেখা চুকে, বিয়ের প্রথম পর্ব হয়ে—দিনস্থির লগ্ন নির্ণয় হয়ে গেল।

এলাহাবাদ থেকে মা ও ভাইবোনদের নিয়ে বাবা এলেন সাতদিনের ছুটিতে বিয়ে দিয়ে যেতে।

বিন্দু নিরিবিলি কোনো এক সময়ে বাপের কাছে কেঁদে বললে—দুটি পায়ে পড়ি বাবা, এসব বন্ধ করে দাও। কি জানি, আমার যেন দম আটকে আসছে বলে মনে হচ্চে। বিয়েতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই বাবা, বিশ্বাস করো। বাপ সস্নেহ হেসে বললেন,—ছিঃ, ওরকম বলতে নেই। এখন এ বিয়ে বন্ধ হতে পারে না। বিন্দু বললে—আচ্ছা, আসছে হপ্তায় তোমরা যখন এলাহাবাদে ফিরবে, আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে বলো?

বাবা বললেন,—আচ্ছা, তোর শ্বশুরকে বলে দেখব। এখন তো আর আমার মতামত চলবে না মা, এখন যে তুমি তাঁদের জিনিস হবে! তাঁরা যদি অনুমতি দেন, পাঠাতে চান, তবেই নিয়ে যেতে পারব।

বিন্দু উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল,— তোমার মেয়েকে তুমি ইচ্ছে করলেও নিজের কাছে একবার নিয়ে যেতে পারবে না?—কেন? তুমি কি আমায় তাঁদের কাছে বিক্রি করে দিচ্চ বাবা?

বাপ ম্লান হেসে বললেন,—বিক্রি নয়, তবে নিঃস্বত্ব হয়ে দান করছি যে মা! আর তো তোমার উপরে আমার কোনো দাবি-দাওয়া থাকবে না।

বিন্দু আকুলকণ্ঠে বলে উঠল—পায়ে পড়ি বাবা, এমন করে আমাকে তুমি পরের হাতে বিলিয়ে দিও না। আমি সেখানে যাব না।

বাপ বললেন,—ছিঃ। ওসব কথা এখন বলতে নেই, চুপ করো। বড় হয়েচ, দেখচ তো, মেয়েদের শ্বশুরবাড়িই নিজের ঘর। বাপের বাড়ি কেউ চিরকাল থাকে না।

বিয়ে যথাকালে যথানিয়মেই সম্পন্ন হয়ে গেল।

বিয়ের পরে বিন্দুর বাবা, মা ও অন্য ভাইবোনেরা যখন এলাহাবাদে ফিরবার আয়োজন করছেন,—বিন্দু জেদ ধরলে—আমিও যাব।

কিন্তু তার শ্বশুর ও দাদাশ্বশুর এখনি অত দূরে পাঠাতে রাজি হলেন না। তাঁরা নাকি বয়স্থা মেয়ে দেখে বৌ করেছেন, বাপের বাড়িতে বেশি রাখতে পারবেন না বলেই, তাঁদের সংসারে গিন্নি নেই, বিন্দুর শাশুড়ি মারা গেছেন, কাজেই বিন্দুকেই এখন থেকে একটু একটু করে সংসারের 'চার্জ' বুঝে নিতে হবে।

বাপ-মা যখন চলে গেলেন,—বিন্দু একটুও কাঁদলে না, শুষ্ক চোখে স্থিরভাবেই বিদায় দিলে। আত্মীয়ারা সকলে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতে আড়ালে বলতে লাগলে,—হাজার

হোক, ডাগর মেয়ে তো! নতুন বিয়ে হয়েছে, নতুন বরের সঙ্গে ভাব হয়েছে দেখ না,—বাপ-মা ভাইবোন চলে গেল—এক ফোঁটা চোখের জল পড়ল না।

কিন্তু বিন্দু যে কাঁদল না তার কারণ তা নয়। একান্ত ইচ্ছা বিফল হওয়া এবং একান্ত অনিচ্ছাই সফল হওয়া— সে জ্ঞানাবধি নিজের জীবনে ঘটে আসতে দেখছে। তাই আজ এলাহাবাদ যাওয়ার ঐকান্তিক আগ্রহ পূর্ণ না হওয়াটা যেন সহজই ঠেকল। বোধ হয় সেইজন্যই তার উদাস শুষ্ক চোখে অশ্রু এলো না।

লেখাপড়া ঘুচে গেল। ম্যাট্রিক এগ্‌জামিনের স্বপ্ন মিলিয়ে গেল।

বিন্দু শ্বশুরবাড়িতে নিরলসা লক্ষ্মী বধূ হয়ে, ঘোমটা দিয়ে বৃদ্ধ দাদাশ্বশুর থেকে আড়াই বছরের দুর্দান্ত দুষ্ট ভাসুরপোটি ও বাড়ির পুরানো ঝি-টির পর্যন্ত মনযোগানো কাজে মনোনিবেশ করলে।

দেখতে দেখতে মাস সাতেক কেটে গেল। শ্বশুরবাড়িতে বিন্দুর বেশ মন বসেছে। বর্তমানের বধূজীবনকে সে অন্তরের সহিত গ্রহণ করতে পেরেছে। শ্বশুরবাড়ির প্রত্যেকে তার গুণে মুগ্ধ। স্বামী কলকাতার হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করেন, ছুটিছাটায় বাড়ি আসেন। স্বামীর ভালোবাসায় সে গত জীবনের ব্যর্থতা বিস্মৃত হয়েছে।

হঠাৎ একদিন নিতান্তই অতর্কিতে খবর এলো, বিন্দু বিধবা হয়েছে। আগের দিন শুক্রবার রাত্রে এশিয়াটিক কলেরায় তার স্বামী কলিকাতার হস্টেলেই মারা গেছেন। বিদ্যুৎস্পৃষ্টেরই মতো সমস্ত পরিবারটা একবার খুব চমকে উঠে—পরক্ষণেই ছোট-বড় সকলে মিলে তুমুল শোকার্তনাদে বুকফাটা কান্নারোল তুলল। বিন্দু তাদের দিকে নিস্পলক চোখে তাকিয়ে স্তম্ভিত আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল।

এক বিধবা পিস্‌শাশুড়ি তাকে স্নান করিয়ে বিধবায় রূপান্তরিত করবার কঠিন-কর্তব্য পালন করতে এগিয়ে এলেন। বিন্দুর সিঁথার উজ্জ্বল সিঁদুরলেখা ঘষে উঠিয়ে দিতে দিতে আপন কপালে করাঘাত করে সক্রন্দনে বলতে লাগলেন—হায় হায়, এখনো পনেরো বছর বয়স পুরো হয়নি,—কচি দুধের মেয়ে! বিয়ের বছর পার হলো না—কপাল পুড়লো—এমন হতভাগী—আহা-হা—

বিন্দু অপলক চক্ষে বিধবা পিস্‌শাশুড়ির পরুষকঠোর শুষ্ক দেহ, ছোট ছোট চুল ছাঁটা শ্রীহীন মাথা, লাবণ্যহীন মুখ, নিরাভরণ কর্ম-কঠোর কর্কশ হাত দু'খানির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কেঁদে উঠে প্রবলভাবে আপত্তি-সূচক মাথা নেড়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললে,—আমি বিধবা হতে পারব না,—আমায় ছেড়ে দাও পিসিমা! আমায় তোমার মতন করে দিও না,—আমি এমনিই থাকব।

যেদিন তার সিঁথিতে ঐ সিঁদুরলেখা আঁকা হয়েছিল এবং সুন্দব শাড়ি ও গহনায় সাজানো হয়েছিল, সেদিন যেমন তার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা খাটেনি,—আজ যখন সে নিরাভরণ-অঙ্গে সাদা থান পরে স্নানান্তে ঘরে এলো —আজও তার এই নূতন সাজে ও নূতন জীবনারম্ভে তার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা একটুও কার্যকরী হলো না।

স্কুলে ভর্তি হওয়া এবং স্কুল ছাড়া, কৌমার্য হতে বিবাহিত জীবন এবং সধবা হতে বৈধব্য জীবন—সবগুলিই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপত্তি সত্ত্বেও এসেছে। বৈধব্যের বোঝা ঘাড়ে নিতেই হলো তাকে। এবার সে শুনছে এ বোঝা নাকি স্বয়ং ভগবানের মারফৎ এসেছে!

সেইজন্যই বোধ হয় বিন্দু নিঃশব্দে কঠোর আচারেই বৈধব্য পালন শুরু করলে। কেউ দুঃখ করলে—কেউ সহানুভূতি জানালে, কেউ বা আপত্তি করতে লাগল। —এখন থেকেই অত কেন? ক্রমে ক্রমে কোরো।

বিন্দু শুধু কঠিন হাসি হাসে, কিছু উত্তর দেয় না কাউকে। কারণ, এবার সে মনে মনে স্থির করেছে সে প্রকৃতপক্ষে যা কামনা করে, ঠিক তার উল্টোটাই চাওয়ার অভ্যাস করবে। সে দেখতে চায় তার ইচ্ছা ব্যর্থ হয়েও সার্থক হয় কিনা! যা চায়, তার বিপরীতটাই কামনা করলে—হয়তো সত্য কামনাটাই ফলে যাবে, —সে ফলাবার কর্তা শরীরী মানুষেরাই হোক,—কিংবা অশরীরী নিয়তিই হোক, তাতে তার কিছু আসে-যায় না।

বিন্দু অকপট অন্তরে অখণ্ড মনযোগে নানাবিধ ব্রতোপবাস নির্জলা একাদশী হবিষ্যান্ন আহার শুরু করলে, মেঘের মতো চুলের রাশ নিঃশেষে কেটে ফেলল। পরনে রইল শুধু একখানি থানধুতি মাত্র।

এবার সে তার ভাগ্য-পরীক্ষায় বদ্ধপরিকর। সে দেখতে চায় এবার কার ইচ্ছার জয় হয়! নিজেকে নিষ্ঠুর দণ্ড দিয়ে মনে মনে হাসে আর ভাবে—এর কর্তা কে? ভগবান না মানুষ?—জীবনটা আমার নিজের, সুখ-দুঃখ ভোগ করব আমি,—অথচ এর নিয়ন্তা অন্য সকলে! এর অর্থ কি? আমার ভালোমন্দ শুভাশুভের দায়িত্ব আমার নিজের নেই কেন? দুঃখ যদি ভোগ করতেই হয়, নিজের হাতেই তা গ্রহণ করব, স্বেচ্ছায় গ্রহণ করব,—অন্যে কেন তার নিয়ন্তা হয়?

আত্মীয়েরা সকলে মিলে বিন্দুকে বোঝায়—কি করবে,—মানুষের হাত তো নেই, অদৃষ্ট—নিয়তি—

বিন্দুর মন তা স্বীকার করে না। তার নির্বাক মুখে বিদ্রূপের কঠিন চাপা হাসির মতো কয়েকটি রেখা ফুটে উঠে সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায়। আবার নারী পুরুষ সকলে মিলে অকাট্য যুক্তিদ্বারা সূক্ষ্ম বিচারে বুঝিয়ে দেয়—এসবের মধ্যে মানুষের নাকি তিলমাত্রও হাত নেই।

বিন্দু কিছুই বলে না, না ভালো না মন্দ। কিন্তু এই পনেরো বছর বয়সেই সমস্ত অন্তর তার যেন কারুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়!—সে মানুষই হোক —ভগবানই হোক—সমাজই হোক—নিয়তিই হোক—

নিরুপমা-বর্ষস্মৃতি, শারদীয়া ১৩৩৮

'—শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে—'

নহবত্ বড় করুণ সুরে বাজছে।—

অন্তরের নিতল আলোড়িত করে' ভাষাতীত এক উদাস বেদনা জেগে উঠছে তার কাতর-কোমল তানে।—যেন সবার চেয়ে প্রাণ যাকে চায় সে আজ আসেনি। ...অভিমানে বুঝি কে চিরদিনের তরে চলে গেছে!... তারই নিবিড়-বিরহ-ব্যথা সমস্ত আকাশ বাতাস অশ্রুভারাতুর করে' সানাইয়ের সুরধারায় কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়ছে!...বাঁশী যেন বলতে চায় তার কান্নাভরা মিনতির সুরে,—ওগো, সে কোথায়? যে-বিহনে এই উৎসব-আয়োজন, এই ফুলের গন্ধ, বাঁশীর তান, হাসির প্রবাহ—সবই ব্যর্থ—সবই মিথ্যা!

বিয়েবাড়ী।

চারতলার প্রকাণ্ড ছাদ জুড়ে হোগ্‌লার ম্যারাপ্ বাঁধা হয়েছে। তার নীচে একধারে মিষ্টান্নের ভিয়ান্ বসেছে। ঘৃত ও ছানা-ক্ষীরের সুগন্ধে ম্যারাপের নীচেটা আচ্ছন্ন। গোলাপী রংয়ের ধুতি ও বাসন্তী রংয়ের উত্তরীধারী চাকর-বাকর নানা কাজের ভীড়ে ত্রস্ত-ব্যস্তভাবে হাজারবার উপর-নীচেয় ওঠানামা ছুটাছুটি করে' হাঁপিয়ে পড়ছে। ঝিয়েরা গলায় সোনার হেলেহার, বাহুতে রূপার তাগা এবং রং-করা কাপড় পরে কেউ তীক্ষ্ণ কণ্ঠের তীব্র আওয়াজে সারা বাড়ী সরগরম করছে, কেউ-বা বড় বড় শীল পেতে সশব্দে বাটনা বাটতে বসে গেছে।

বৈঠকখানায় কর্ত্তাবাবু তাঁর ছোট ভায়েদের এবং উপযুক্ত ছেলে ও জামাইদের নিয়ে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে ফুলশয্যার তত্ত্বের ফর্দ্দ প্রস্তুত করাচ্ছেন আলবোলার দীর্ঘ নল মুখে দিয়ে।

বা'রবাড়ীর অন্য একখানি ঘরে তরুণ যুবাদের মজলিশ্ বসেছে। ধূমায়মান গরম চায়ের পেয়ালা ও সিগারেটের ধোঁয়ায় চলচ্চিত্রের রাজধানী 'হলিউডে'র 'স্টার' অভিনেত্রীদের সৌন্দর্য্য ও অভিনয়-নৈপুণ্যের সমালোচনা প্রসঙ্গ সেখানে বেশ জমাট্ বেঁধে উঠেছে।

উপরে দোতলার এক মহলে বর্ষীয়সী নারীরা স্তূপীকৃত কাঁচা আনাজের পাহাড় নিয়ে কুট্‌নো কুটতে বসে গেছেন। প্রকাণ্ড দালানখানি জুড়ে বঁটী পড়ে গেছে প্রায় খান-কুড়িবাইশ! কে কতো বড় বড় কুমড়ো বাগিয়ে ধ'রে বেগুনের মতো অনায়াসে দু'ফালা করে ফেলতে পারে তাই নিয়ে বেধে গেছে বিরাট বিতর্ক!

অন্য মহলে কিশোরী ও তরুণীদের ভীড়। বরপক্ষীয়ের প্রেরিত গায়ে-হলুদের তত্ত্বের উপহার সম্ভারে বড় বড় দু'খানি ঘর পূর্ণ হ'য়ে গেছে। ঝক্‌ঝকে রূপার বাসন, রূপার প্রসাধন সামগ্রী, রূপার খেলনা হ'তে সুরু করে'—বেণারসী, কাশ্মিরী,

সুরাটী, মারাঠী, গুজরাটী, ম্যাড্রাসী, মুর্শিদাবাদী, ঢাকাই প্রভৃতি নানা দেশের নানা ডিজাইনের বিচিত্র শাড়ী, ব্লাউজ, একাধিক ট্রে-ভর্ত্তি সুরভি প্রসাধন সামগ্রী, নানারকম সৌখীন, প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য,—খেলনা পুতুল, মিষ্টান্ন, ফলমূল ইত্যাদিতে ঘরের মেজেতে পা রাখবার স্থান নেই।

একটি ষোড়শী তন্বী মরালের মতো শুভ্র সরু ঘাড়ের উপরে কালোচুলের প্রকাণ্ড এলো খোঁপা বেঁধে, ছোট্ট মাথাটি নেড়ে নেড়ে হাতের লম্বা কাগজের লিস্টের সাথে নম্বর-আঁটা ট্রে-গুলির দ্রব্যসামগ্রী মিলিয়ে নিচ্ছে। ঝকঝকে সোনালী মুগার ডুরে শাড়ীখানি তার সর্ব্বাঙ্গে জড়ানো। আঁচলটা শক্ত করে কোমরে আঁটা।

বছর সাতাশ-আটাশ বয়সের একটি হৃষ্টপুষ্টা যুবতী, গায়ে আঁটসাঁট্ চিকণের সেমিজ, পরনে রেশমীপাড় শান্তিপুরে শাড়ী। প্রকোষ্ঠে ঝক্‌ঝকে ভাটিয়া প্যাটার্ণের সরু সোনার চুড়ীর গোছায় মধুর ঝণাৎকার তুলে সমস্ত ট্রে'র জিনিষগুলি নেড়েচেড়ে একটির পর একটি নাম বলে বলে ফর্দ্দ মেলানোয় সাহায্য করছে।

খদ্দরের শাড়ী এবং খদ্দরেরই এমব্রয়ডারীদার খাটো-ব্লাউজ-পরা শ্যামবর্ণা একটি মেয়ে ফর্দ্দের সাথে মেলানো ট্রে-গুলি একদিকে সরিয়ে রেখে, না মেলানো ট্রে-গুলি অন্যদিক থেকে এনে এগিয়ে ধরছে।—

অগুন্তি সধবা ও কুমারী বধূ ও কন্যা মুখে উৎফুল্ল হাসি, সোৎসাহ-কলগুঞ্জরণ, দু'চোখে উৎসবের আনন্দ কণ্ঠে ভরে নিয়ে সেখানে প্রত্যেকটি জিনিষ নেড়েচেড়ে লক্ষ্য ক'রে দেখছে।

তা'দের বিচিত্র শাড়ীব বাহার, সুগন্ধি এসেন্সের সুরভি ও অলঙ্কারের ঝিকিমিকি, স্থানটিকে উজ্জ্বল মাধুর্য্যময় ও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। লুব্ধ পুরুষ আত্মীয়েরা অনেকেই কারণে ও অকারণে এক একবার এসে সেখানে উঁকি মেরে যাচ্ছেন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সেজেগুজে রঙীন প্রজাপতিরই মতো লঘু চঞ্চল পদে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা'দের আনন্দ-প্রদীপ্ত মুখে একটা বিপুল উৎসাহের উত্তেজনা। অকারণ সিঁড়ি ওঠানামার যেন আর তা'দের বিরাম নেই।

তেতালাটি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন।

একটি ঘরে অল্প মাসকয়েক মাত্র বিবাহিত এক নবদম্পতী এই গণ্ডগোল-ভীড়ের অবকাশে সুযোগমত চুপি চুপি মিলিত হয়েছে।

তরুণীটি তা'র প্রিয়ের বক্তব্য সত্বর-সমাপন ক'রতে তাড়া দিচ্ছিল, কারণ, কেউ জানতে পারলে তাকে নাকি ভয়ঙ্কর লজ্জায় প'ড়তে হবে। ত্রস্তা প্রিয়ার কোমল হাত দু'খানি দৃঢ়মুঠিতে চেপে তরুণ যুবা কেবলই অভয় দিচ্ছে এবং তার বক্তব্যের বাকীটুকু—যা' হয়তো সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি ধ'রে বললেও তার বলা শেষ হবে না, সেই চির অসম্পূর্ণ বাণীর শেষটুকু শুনে যাওয়ার জন্য ঐকান্তিক অনুনয় করছে।

তা'দের অধরপুটে সলজ্জ ও সানন্দ মধুর হাসির রেখা! আঁখিতলে অতলগভীর স্নিগ্ধ আবেশ! রসনার চেয়ে চাহনিই তাদের অধিকতর মুখর। কথার অপেক্ষা হাসির

ভাষাই যেন বেশী সুস্পষ্ট।

তেতালার আর একখানি ঘরে স্কুলের ছাত্রছাত্রী জন-চারপাঁচ ছেলেমেয়ে মিলে একজোড়া তাস সংগ্রহ করে নিরিবিলি আসর জমিয়ে বসেছে। তারই অনতিদূরে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে একখানি মস্ত 'ক্যারাম্‌বোর্ড্' পেতে একান্ত মনোযোগে লক্ষ্যভেদে ব্যস্ত।

তেতলার সিঁড়ির ঘরের পাশের দিকে করোগেট্ টীন ছাওয়া রৌদ্রতপ্ত একটি ছোট কুঠুরীর অতি নির্জ্জন একটি কোণে দু'টি বছর চৌদ্দ-পনেরো বয়সের কুমারী মেয়ে কোথা হতে একখানি তাদের পাঠনিষিদ্ধ বই সংগ্রহ করে অতি সঙ্গোপনে পরস্পর পরস্পরের কাঁধে কাঁধ, মাথায় মাথা ঠেকিয়ে পাশাপাশি বসে, একান্ত নিবিষ্টচিত্তে রুদ্ধশ্বাসে পাঠ করছে।

একজনের পিঠে এক ঝলক্ বৈশাখী রৌদ্র এসে পড়েছে, সে দাহে তার খেয়ালও নেই।

বইখানি তা'রা কোন্ এক বৌদিদির ড্রয়ার হ'তে অভাবিত রূপে হঠাৎ আবিষ্কার করে' ফেলে'—পড়বার লোভ সম্বরণ করতে না পারায় চুরি করে' নিয়ে এই নিরিবিলি কোণে দু'জনে পালিয়ে এসেছে। যথাসম্ভব শীঘ্র পড়া শেষ করে আবার যথাস্থানে চুপি চুপি রেখে দিয়ে আসতে হবে। তাদের চোখে-মুখে একটা বিপুল কৌতূহল এবং গোপন রহস্য-আবিষ্কারের বিস্ময়মায়া স্পষ্ট ঘনিয়ে উঠেছে।

বয়স্থা গৃহিণীরা একতলা ও দোতলার চারিদিক ঘুরে ঘুরে তদারক করে বেড়াচ্ছেন এবং কাজকর্ম্মের নির্দ্দেশ ক'রছেন।

দোতলার একখানি ঘরে ইলেক্‌ট্রিক্ পাখা ঘুরছে, তার তলায় ঈজিচেয়ারে শুয়ে আছে একটি তরুণী কিশোরী। পরনে লাল ক্রেপের পাতলা বেনারসী শাড়ী, কপালে চন্দনের পত্রলেখা, পায়ের তলা দু'টি আলতায় টুক্‌টুকে রাঙা। গলায় বেলফুলের প্রকাণ্ড গোড়ে মালা হাঁটুর 'পরে লুটিয়ে এসেছে,—সর্ব্বাঙ্গে পালিশ-উজ্জ্বল নতুন সোনার গহনা, হাতের মুঠিতে সোনার ছোট্ট কাজললতা!

তাকে ঘিরে তার সমবয়সী অনেকগুলি মেয়ে উচ্ছল হাসি ও রহস্যালাপের আবর্ত্ত রচনা করেছে।

মেয়েটির চোখে মুখে একটি অতি মধুর আনন্দ স্নিগ্ধ লজ্জার ছায়া লেগে আছে। চাহনির তলে যেন একটি অপূর্ব্ব স্বপ্নমায়া ঘনিয়ে নেমেছে। তার চলাফেরা নড়াচড়ায় এমন একটি মধুর লালিত্য এবং সর্ব্বাঙ্গে এমন একটি সুকুমার শ্রী ফুটে উঠছে যে, যা'রা প্রতিদ্দিন তাকে সদাসর্ব্বদা চোখের সামনে দেখেও চেয়ে দেখার আবশ্যকতা অনুভব করেনি, তা'রাও আজ বারেবারে আনন্দ-বিস্ময়ভরা দৃষ্টি তুলে তা'র পানে তাকিয়ে দেখছে! যেন তা'কে আজই এই প্রথম দেখতে পেল তা'রা।

দেউড়ীর নহবতে ভোর থেকে ভৈরবী রামকেলী আশোয়ারী তোড়ী ভীমপলশ্রী একের

পর একে বিচিত্র মূর্চ্ছনায় বেজে চলেছে। নহবত বড় করুণ সুরে বাজছে।

অন্তরের নিতল আলোড়িত করে' ভাষাতীত এক উদাস বেদনা জেগে উঠছে তার কাতর-কোমল তানে!...যেন সবার চেয়ে প্রাণ যা'কে চায় সে আজ আসেনি!...অভিমানে বুঝি কে চিরদিনের তরে চলে গেছে!...তারই নিবিড় বিরহ-ব্যথা সমস্ত আকাশ-বাতাস অশ্রু-ভারাতুর করে' সানাইয়ের সুরধারায় কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়ছে!...ওগো সে কোথায়?

যে-বিহনে এই উৎসব-আয়োজন, এই ফুলের গন্ধ, বাঁশীর তান, হাসির প্রবাহ—সবই ব্যর্থ—সবই মিথ্যা।

উৎসব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখবার জন্য যে তরুণী মেয়েটি উৎসবের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দকে প্রাণপণে এড়িয়ে চলছিল, সে বিধবা।

তার চারিদিক বেষ্টন করে' উৎসবের এই ঘূর্ণীপাক কিন্তু বারম্বার তার দৃষ্টি ও মনকে সেদিকে আকৃষ্ট করছিল।

অল্প বয়সে বিবাহিতা হ'য়ে বৎসরের মধ্যেই তার সাংসারিক জীবনের দেনা-পাওনার প্রাপ্তির হিসাবটা একেবারেই চুকে গেছে, দেনার দিক্‌টাকেই দীর্ঘতর করে দিয়ে।

তার নিজের জীবন সম্বন্ধে এতবড় ব্যাপারটা যখন নিঃশেষে চুকে গিয়েছিল, তখন তার অপরিণত বালিকাচিত্ত কেবলমাত্র একটা নূতনত্বের বিস্ময় ছাড়া অন্য কিছুই উপলব্ধি করতে পারেনি। অবশ্য তা'র নিজ-জীবনধারা গ্রহণ সম্বন্ধে তার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা মতামতের মূল্য কোনওদিন কিছু ছিল না এবং আজও তা নেই!

মেয়েটির গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। এ' রংয়ে মত্ততা নেই, আছে স্নিগ্ধ-শীতলতা।

নববর্ষার ছোঁয়ায় প্রান্তরের সবুজ দূর্ব্বার যে সিক্ত-সৌন্দর্য্য, প্রথম আষাঢ়ের মেঘচ্ছায়াতলে বনানীর যে স্নিগ্ধ-গভীর-রূপশ্রী, তারই আভাস যেন এই মেয়েটির শান্ত রূপের মাঝে মিশিয়ে রয়েছে।

ঘন কালো তার চুলের রাশি। ক্ষুদ্র ললাটখানি অবারিত করে' চুলগুলি সাধাসিধা-ভাবে আঁচড়ানো এবং ঘাড়ের অল্প উঁচুতে নরম করে সহজ হাত-ফেরানো খোঁপা বাধা।

পরনে দেশী কালোপাড় শাড়ী। গায়ে ফিকে বাদামী রংয়ের ব্লাউজ। প্রকোষ্ঠে চারগাছি করে' তীরকাটা সোনার চুড়ী, গলায় সরু সোনার হার, কানে দু'টি মুক্তার টাপ।

ভাবহীন উদাস-মুখশ্রীতে আনন্দ কিম্বা নিরানন্দ কোনোটাই সুস্পষ্ট নয়। চোখ-দু'টি যেন কোন্ বহু-দূর-পথের দিশাহারা তীর্থ-পথিক!

শিথিলপদে, ততোধিক শিথিল মন নিয়ে চারতলা থেকে একতলা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র

অনির্দ্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে। তেতালার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নামছে যখন, —একদল তরুণী এসে তার গতিপথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বলল—

—কোথায় ছিলি ভাই সাবু? সারা বাড়ী তোকে খুঁজে মরছি আমরা।

বিধবা মেয়েটি সপ্রশ্ন চোখে তাদের পানে তাকিয়ে রইল।

—শোন্ ভাই সাবিত্রী, তোকে একটা কাজ করতে হবে। তুই ছাড়া আর কারুর দ্বারা এ' কাজ হবে না।

সাবিত্রী বিস্মিতস্বরে বলে—কী?—

—আমাদের ভারী ক্ষিধে পেয়েছে। গোটাকতক টাট্‌কা গরম গরম লেডীকেনি সন্দেশ ঐ মেজঠাকুর্দ্দা বুড়োর কাছ থেকে আদায় করতে পারবি? সরকারমশাই একলা যদি ভিয়ানের তদারকে থাকতেন, তা'হলে ঠিক আদায় করে' আনতে পারতুম ভাই! মুস্কিল হয়েচে, জ্যাঠামশাই তাঁর হুতুমপ্যাঁচা মামাটিকে ওখানে দরোয়ান করে বসিয়ে রেখেচেন যে!—

চারতলার উপরে ভিয়ানের কাছে কারুর ঘেঁষ্‌বার জো' নেই। গৃহকর্ত্তার মেজমামাবাবু বেজায় কড়া ও রাশভারী লোক। রোমবহুল প্রকাণ্ড পর্ব্বতের মত দেহ নিয়ে ভিয়ানের সামনেই মোড়া পেতে বসে গুড়গুড়ি টানছেন। তা' ছাড়া পুরানো সরকারমশায়ও ভিয়ানের 'চার্জ্জে' আছেন তাঁর সহকারীরূপে।

ভিয়ান্-ম্যানেজার মেজমামার নাত্‌নী সম্পর্কীয়া জনকতক তরুণী মধুর হাসি, মধুর বাক্য, মধুর আবদার প্রভৃতি অনেক কিছু আয়ুধ প্রয়োগ করেও নীরস গম্ভীর মেজমামার কাছ থেকে একটিও টাটকা মিষ্টান্ন আদায় করতে না পেরে ক্ষুণ্নমনে নেমে আসছিল। তারাই এবার সবাই মিলে সাবিত্রীকে সুপারিশ ধরলে।

সাবিত্রী কুণ্ঠিতভাবে বল্‌লে—আমাকে দেবেন কেন?

—হ্যাঁ দেবে, নিশ্চয় দেবে। আমাদের তাড়িয়ে দিলে ব'লে তোকে কি কখনও তাড়িয়ে দিতে পারে? তুই পাগল নাকি সাবু?

—যা' না ভাই! একবার গিয়েই দেখ না! তারপর যদি না দেয়,—না-ই দেবে!

—ঈশ! সাবুদি চাইলে দেবে না বৈকি? মেজঠাকুর্দ্দার ঘাড় দেবে। জ্যাঠামশাই যদি শোনেন, সাবুদি টাট্‌কা মিষ্টি চেয়ে পায়নি, তা'হলে রক্ষে রাখবেন কিনা!!

সাবিত্রীর দিদি শকুন্তলা এগিয়ে এসে সাবিত্রীর হাত ধরে বলে—যা' না সাবি! আমরা সকলে মিলে এত করে বল্‌ছি—

সাবিত্রী ম্লান হেসে চারতলার দিকে রওনা হয়।

ভিয়ানের কাছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সারাদিনই মৌমাছির মতো ঘুর্‌ঘুর্ করছে।

কোন্ মিষ্টিটা কেমন তৈরী হচ্ছে, আমসন্দেশ উৎকৃষ্ট না দেলখোস্ সন্দেশ উৎকৃষ্ট, রসগোল্লার চেয়ে লেডীকেনি শ্রেষ্ঠ, বালুসাইয়ের চেয়ে দরবেশ অধিকতর সুস্বাদু কিনা, কে একসঙ্গে ক'গণ্ডা সন্দেশ বা লেডীকেনি অনায়াসেই উদরসাৎ করতে

পারে—এই সকল গবেষণা ও তর্কে চারতলার ছাদ সর্‌গরম।

সাবিত্রী এসে কুণ্ঠিতপদে মেজমামার মোড়ার কাছে দাঁড়ায়। গুড়্গুড়ির কাঠের নলটা মুখ থেকে নামিয়ে গম্ভীরমুখে হাসির রেখা টেনে মেজমামা বলেন,—

—এই যে—সাবুদিদি যে! কী মনে করে?

সাবিত্রী একটু অপ্রতিভ হেসে সকুণ্ঠস্বরে বলে—কিছু মিষ্টি দরকার হয়েছে মেজঠাকুর্দ্দা! এখন দেবার সুবিধা হবে কি?

—মিষ্টি চাই? তোমার নিজের চাই, না ঐ শুকু, লক্ষ্মী, মেন্তিদের জন্যে চাইতে এসেচ, সত্যি কর বলো তো দিদি?—

সাবিত্রীর উদ্দেশ্য যেন ধরে ফেলেছে এমনিতর অর্থপূর্ণ মৃদুহাস্য মেজঠাকুরদাদার মুখ চোখে ফুটে ওঠে।

সরকারমশায় জোরে হেসে উঠে বলেন—যার জন্যেই হোক্, ছোটমা যখন নিজে দরবার করতে এসেছেন, তার উপরে আর অন্য কোনও কথা চল্‌বে না মেজমামাবাবু! আপনি হুকুম দিয়ে দিন্।

সাবিত্রী কুণ্ঠিত নতমুখে নিরুত্তরে পায়ের আঙুল দিয়ে মেজেতে দাগ টানতে থাকে।

মেজমামা বলেন—কত মিষ্টি চাই দিদি?—

সাবিত্রী আস্তে আস্তে বলে—সামান্য কিছু দিন্—

সরকারমশায় উচ্চহাস্যে বলে ওঠেন—আমরা যদি তোমায় গুণে দু'টি সন্দেশ মাত্র দিই, তা'তে কি তোমার হবে মা?

একটু ভেবে নিয়ে সাবিত্রী বলে—সবরকম মিষ্টি গোটা আষ্টেক ক'রে না হ'লে যে কুলুবে না!—

মেজমামা হাঃ হাঃ শব্দে হেসে উঠে বলেন—এত মিষ্টি তো তুমি একলা খেতে পারবে না সাবুদি!

সাবিত্রী উত্তর দেয় না, সলজ্জ মৃদু হাসে মাত্র।

বামুনদের প্রতি হুকুম হয়ে যায়। তাদের মধ্যে একজন একখানি থালায় দু'রকম সন্দেশ, লেডীকেনি, রসগোল্লা, দরবেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন সাজিয়ে নিয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে নীচের তলায় গিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে আসে।

উল্লসিতা তরুণীর দল সাবিত্রীর জয়ধ্বনি করে'— মিষ্টান্নের থালাখানি ঘিরে চক্রাকারে বসে।

সাবিত্রী নীরবে চলে যায়।

তা'রা সাবিত্রীকে ডাকে,—চলে যাচ্চিস্ কেন সাবু? আয় না, আমাদের সঙ্গে একত্রে খাবি।

সাবিত্রী ম্লানমুখে সংক্ষেপে মাথা নেড়ে বলে—না। তোমরা খাও।

মেয়েরা তবু তাকে সাধাসাধি করে।

সাবিত্রী বলে—মিষ্টি তো আমি খেতে পারিনে, জানো।

সে চলে গেলে সবাই বলাবলি করে—সাবু যত বড় হচ্ছে, ততই দিনদিন যেন শুখিয়ে যাচ্চে। দেখেচিস্ ভাই? ওর সেই ছেলেবেলাকার স্ফূর্ত্তি, হাসি এখন যেন একেবারে মুছে গেছে।

সাবিত্রীর চেয়ে দু'বছরের বড় তার দিদি শকুন্তলা একটি চপ্‌সন্দেশে কামড় দিতে দিতে বলে—হাজার হোক্, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অবস্থা তো বুঝতে পারছে দিন-দিন। যতই কেননা ওকে আইবুড়ো মেয়ের মতন গয়না কাপড় পরিয়ে রাখো আর আদর-যত্ন করো! মনটাতে যে ওর সুখ নেই, সে তো বোঝাই যায়।

সাবিত্রী তখন একটু নিরিবিলিতে গিয়ে তার ক্লান্ত তনু এলিয়ে দেবার জন্য স্থান খোঁজে। সকাল থেকে সমস্তক্ষণই সে কাজে এবং বিনা কাজে, প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে লক্ষ্যহীনভাবে সারা বাড়ীময় ঘুরে ঘুরে উপরে নীচেয় ওঠানামা করে এখন একটু শ্রান্তি বোধ করছে!

কোনও কঠিন কাজের ভার তাকে কেউ দেয়নি।

সে যেই প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাদের সঙ্গে কুট্‌নো কুটতে গেছে, —তাঁরা সকলেই সমস্বরে হাঁ হাঁ করে' উঠেছেন।

—না সাবু! তোকে এখানে বসে কুট্‌নো কুটতে হবে না। কেন? তোর সমবয়সী খেলুনীরা, তোব বৌদিরা, দিদিরা সকলে যেখানে রয়েছে, তুইও সেখান গিয়ে তাদের সঙ্গে হাস্‌গে খেল্‌গে। তোকে এখানে বসে কুটনো কুটতে দেখলে তোর জ্যাঠামশাইরা রক্ষে রাখবেন না।

সাবিত্রী একবার মৃদু আপত্তি জানিয়ে হেসে বলে—না পিসিমা, আমি যে কুটনো কুট্‌তে ভালোবাসি!—

কিন্তু বর্ষীয়সীদের মহলে তার সে যুক্তি টেঁকে না। উপরন্তু—'বাছারে—' 'আহা—' 'কোথায় আজ সবাইকার সঙ্গে হেসে খেলে বেড়াবে—তা' যেমন পোড়া বরাত্—' ইত্যাদি হা-হুতাশ ও অঞ্চল-প্রান্তে শুষ্ক চক্ষু-মার্জ্জনা পর্য্যন্ত সুরু হয়ে যায় দেখে সাবিত্রী সভয়ে সে-মহল থেকে সরে পালায়।

তাকে নিয়ে এই হা-হুতাশ, তাকে যত্ন আদর করার এই যে বিশেষতব সতর্কতা, তার দুর্ভাগ্যের প্রতি এই যে সকলের দয়ার্দ্র করুণা ও সহানুভূতি—এইটাই তার বর্ত্তমান জীবনের যেন অসহ্য-অপমান ও অসহনীয় বেদনার হেতু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তার দিন ও রাত্রিকে যেন অভিশপ্ত ক'রে তুলেছে।

দোতলায় যেখানে গায়ে-হলুদের তত্ত্ব সবাই দেখছে ও ফর্দ্দ মিলিয়ে নিয়ে তুলে রাখা হচ্ছে, সেখানে সে গিয়ে দাঁড়াতেই দম্‌কা বাতাসে দীপ নিবে যাওয়ার মতো একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত আলোচনা হঠাৎ যেন থেমে গেল।

সাবিত্রী স্পষ্ট লক্ষ্য করলে তা'র ন'বৌদিদি তাঁর বেল-ফুলের মালা জড়ানো সযত্নরচিত কবরীটির উপরে ত্রস্তে অঞ্চলভাগ ঢাকা দিতে দিতে ব'লে উঠলেন—যাক্‌গে যাক, যা' দিয়েচে, বেশই দিয়েচে। এ' নিয়ে এত তর্কাতর্কির কী আর

আছে? নে, তোরা চট্‌পট্ সব তুলে ফেল্ দিকি! ঢের কাজ এখনও বাকী পড়ে আছে!—

ন'বৌদির চোখ টিপে আলোচনা বন্ধ করার ইশারাটুকুও সাবিত্রীর দৃষ্টি এড়ায়নি। কারণ, তার নির্ব্বোধ জ্যাঠতুতো বোন রমা তখনও পাঁচ এয়োর ডালার নিখুঁত সুন্দর উপহার সামগ্রীগুলির মূল্যাধিক্য ও সূক্ষ্ম সৌখীনতা সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসায় রসনাবেগ সংযত করতে পারেনি।

পাঁচ এয়োর ডালাতে সধবাদের জন্য বরপক্ষীয়েরা শুধু শাড়ী ব্লাউজ্ শেমিজ-রুমাল, টোয়ালে-গামছা, আয়না চিরুণী সিঁদুর, সুরভি তৈল, তরল আলতা, এসেন্স, ক্রীম্ স্নো ইত্যাদিই পাঠান্‌নি, প্রত্যেক ডালায় এক-একছড়া ক'রে বেলফুলের বড় গোড়ে মালা, এক-এক ডিবা সোনালী তবক্ মোড়া সুভাসিত মিঠা পান,—এক রেকাবী ক'রে উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন দিয়ে জলখাবার পর্য্যন্ত সাজিয়ে পাঠিয়েছেন!

সেই পাঁচছড়া বেলফুলের গোড়ে ছিঁড়ে আকারে ছোট ছোট করে প্রায় পনেরো-কুড়িজন সধবা তরুণী তাদের খোঁপায় জড়িয়েচে। জলখাবারের রেকাবীগুলিও সকলে মিলে নিঃশেষিত করে তবক্-মোড়া মিঠা পান চিবাতে চিবাতে পানের রসে টুকটুকে রাঙা ঠোঁটে খুশী ও তৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে সকলে তখন তাঁদের এয়োতি-সৌভাগ্যের সুখ-সুবিধার গর্ব্বে মুখর।

এমন সময়ে সাবিত্রী সেখানে এসে পড়ায় সকলেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে বাক্যস্রোত রুদ্ধ করে। ছোট্ট একটু সকরুণ নিঃশ্বাস ফেলে কেউ কেউ। ন'বৌদি ডাকেন —ছোট-ঠাকুরঝি! এতক্ষণ কোথায় ছিলি ভাই? আয় না, রূপোর খেল্‌না-টেল্‌না, টয়লেটের রূপোর সামগ্রীগুলো শো-কেসের মধ্যে উঠিয়ে রাখ। তোর বেয়াইম'শায়ের কিন্তু ভাই নজর উঁচু আছে। সাবানদানীটি পর্য্যন্ত খাঁটি রূপোর গড়িয়ে দিয়েছে দেখেচিস্?—একটিও কিছু ইলেক্‌ট্রোপ্লেট্ নয়!—নে, এ'সব তো তোরই দেখেশুনে তুলবার গুছুবার কথা ভাই! তা' নয়, তুই কোথায় ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্—'

তারপরে যে মেয়েরা জিনিষপত্রগুলি তুলে কাঁচের আলমারীর মধ্যে সাজিয়ে রাখছিল, তা'দের ন'বৌদি অহেতুক তাড়া দিয়ে বলেন—তোরা সর্ দিকি বাপু! এই লক্ষ্মী! তুই এ'দিকে উঠে আয়। ও'গুলো সব ছোট্ ঠাকুরঝি তুলবে। ও' ঐ সমস্ত জিনিষ বেশ সুন্দর সাজাতে গোছাতে পারে।

সকলেই একবাক্যে বলে ওঠে—হাঁ, হাঁ, সাবিত্রীকেই ঐ কাজের ভার দেওয়া উচিত! তাদের প্রত্যেকের চোখে সদয়-করুণা সুস্পষ্ট।

সাবিত্রী ম্লান হেসে সত্বর সেখান থেকে সরে যায়। তার অবস্থার প্রতি নির্ব্বিশেষ সকল মানুষের এই সানুগ্রহ-অনুকম্পা তাকে যে কতো নিষ্ঠুরভাবে পীড়িত করে এ'কথা তারা কেউ বোঝে না।

গাত্রহরিদ্রার পর আল্‌পনা আঁকা পিঁড়ির 'পরে কণে' যে ঘরে বসে আছে সাবিত্রী সেই ঘরে প্রবেশ করে।

তার পরম স্নেহাস্পদা প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ।

সাবিত্রীর অন্তরে আজ সত্যই আনন্দ ও তৃপ্তির সীমা নেই। এই উৎসব তার কাছে কতো আনন্দের, কতো উৎসাহের, সে কথা সে বাইরের মানুষকে বোঝাতে অক্ষম। —কিন্তু ঐ উৎসবে সে আনন্দিত হবে কী করে? প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেকেই যে তাকে তাদের অহেতুক সমবেদনার ভারে সচেতন করে দিচ্ছে,—এই উৎসবের মধ্যে আর সমস্ত মেয়ে হতে তার আসন বহুদূরে—পৃথক। সে এই উৎসবের কেউ নয়; ঐ উৎসবে যে তার সহজ অধিকার নেই, এ-কথা প্রত্যেকের অতি সতর্ক করুণাপূর্ণ ব্যবহারে সে বিশেষ করেই উপলব্ধি করতে পারছে।

সাবিত্রী ক'ণে'র কাছে গিয়ে দেখে—সখীবেষ্টিতা শোভারাণীর কবরী-রচনার আয়োজন হচ্ছে! তারই সেজদিদি শকুন্তলা, জরী-ফিতে কাঁটা চিরুণী গন্ধতৈল ইত্যাদি সরঞ্জাম নিয়ে কণে'র চুল বেঁধে দিতে বসেছে।

সাবিত্রী সেখানে গিয়ে একধারে বসে' কণে'র দিকে চেয়ে সস্মিত মুখে বলে —কাল এমন সময়ে আমাদের ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী চলে যাবি শোভন?—

শোভারাণী লজ্জানত মুখে মৃদু হাসে।

শকুন্তলা শোভার চুলে চিরুণী চালনা করতে করতে বলে ওঠে—তুই সবাইকার চুল বেঁধে দিতে ভালোবাসিস্ সাবি,—দে' না তুই আজ তোর শোভনের চুল বেঁধে!—

সাবিত্রী সচকিত হয়ে উঠে ধীরে বলে—তুমিও তো চুল বেঁধে দিতে কম ভালোবাসো না সেজদি—

—হ্যাঁ, আমিও চুল বেঁধে দিতে ভালোবাসি বটে! তা'হলেও, তুই-ই দে না আজ ভাই! আমি উঠছি—

শোভার সখীদের মধ্য হতে কে একটি সদ্যঃবিবাহিতা কিশোরী মেয়ে বলে ওঠে— ও মা! তা কি হয়? সাবিত্রী পিসিমা আজ আর কি ক'রে চুল বেঁধে দেবেন? গায়েহলুদের পর থেকে কণে'কে আর বিধবাদের ছুঁতে নেই যে!!

শকুন্তলা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সমস্ত মেয়েরা, এমন-কি কণে' শোভারাণী পর্য্যন্ত সকলে একসঙ্গে তর্জ্জন ক'রে—নির্ব্বোধ মেয়েটিকে ধমক দিয়ে উঠলো।

—কে বল্লে তোকে? ভারী গিন্নী হয়েছেন!! নে নে চুপ কর,—যতোসব বাজে-কথা! ছুঁতে নেই না হাতী!—

এমনিধারা কত কি মন্তব্য একসঙ্গে ঘরের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

কে একজন বলে উঠল—পাড়াগাঁয়ে বিয়ে হয়ে মেন্তিটার কথাবার্ত্তা বুদ্ধিশুদ্ধি সবই যেন পাড়াগেঁয়েদের মতন হয়ে গেছে!

মেন্তি বেচারী কথাটা ফস্ করে বলে ফেলে—সকলকার ভাবভঙ্গী দেখে মহা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। ধমকে বকুনিতে উপহাসে বিদ্রূপে সে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে আসে।

সাবিত্রী তাকে সস্নেহ-বাহুপাশে জড়িয়ে ধ'রে বলে—অপ্রিয় হলেও তুমি সত্যি কথাই বলেচো মেন্তু! এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই।

—হ্যাঁঃ! সত্যি না ছাই!! কেন? ছুঁলে হয় আবার কী?—

সাবিত্রী শকুন্তলার কথার কোনও উত্তর দেয় না।—শোভা জেদ্ করে বলে —আমি আজ ছোটপিসিমার কাছেই চুল বাঁধবো। আর কারুর কাছেই বাঁধবো না। সেজপিসিমা, তুমি ওঠো।

শকুন্তলা হাসতে হাসতে শোভার চুলের জট্ ছাড়ানো বন্ধ করে সরে' বসে, বলে—আয় সাবি! তুই নইলে শোভা আর কারুর কাছে চুল বাঁধবে না!—

সাবিত্রীর শান্তমুখ হঠাৎ কঠিন হয়ে ওঠে। তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়।

সে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে কঠিন স্বরেই বলে যায়—আমাকে যা' করতে নেই, আমি তা' করি না। এ তো জানো তোমরা—

সাবিত্রীর চলে যাওয়ার পানে শোভা হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে থাকে।

শকুন্তলা সরে এসে চিরুণীখানি হাতে তুলে নিতে নিতে বলে—সরে আয় শোভা! বেলা গড়িয়ে আসছে! সাবি কখন যে কী মেজাজে থাকে বোঝবার জো' নেই বাপু!

একটি বয়স্থা কুমারী মেয়ে টিপ্পনী কেটে বলে—জ্যাঠামশাইরা থেকে দাদারা থেকে বাড়ীসুদ্ধ সক্কলে সাবিদি'কে এত ক'রে আদর করছে, যত্ন করছে,—মাথায় তুলে রেখেছে,—সাবিদির বাপু কিছুতেই যেন মন ওঠে না। দিনরাত্রি মুখ গম্ভীর করেই আছে—

শোভা চুল বাঁধতে বাঁধতে ধমক্ দিয়ে ওঠে—তোমরা থাম' দিকি! ছোটপিসিমাকে নিয়ে তোমাদের অতো আলোচনা করতে হবে না।

আর একটি সধবা ঝিউড়ী মুরুব্বিয়ানার সুরে বলে— কেন? সত্যিকথা বলবেনাই বা কিসের জন্যে?

শোভা বলে—ঠাকুর্দ্দারা, বাবা-কাকারা সকলে ওকে যত্ন করেন সেই হিংসেতেই তোমরা গেলে বাপু!—

ওধার থেকে আর একটি যুবতী ফোঁস্ ক'রে ব'লে ওঠে—বালাই! ও' সধবা-মেয়ে, ও' কোন্ দুঃখে সাবিত্রী ঠাকুর্ঝির হিংসে করতে যাবে? ব'য়ে গেছে!...তবে সাবিত্রী ঠাকুর্ঝি যে মানুষটা একটু দেমাকে, এ-কথা সকলেই বলবে,—তা' যা'ই বল!

এ'কথার পর সাহস পেয়ে আর একটি মুখরা মেয়ে বলে ওঠে—তা' আর বলতে?—কথার রকম শুনলে না? 'যা' আমায় করতে নেই তা' আমি করিনি—', তা' যদি না-ই করো তবে শাড়ী চুড়ী গহনাগুলো গায়ে রেখেছো কেমন করে?—

বাধা দিয়ে শোভা রাগ করে কী যেন উত্তর দিতে যায়, শকুন্তলা তাড়াতাড়ি

থামিয়ে দেয়!—চুপ্ চুপ্, আজ রেগে উঠতে নেই শোভা! আজ তোকে কারুর সাথে তর্ক করতে নেই।

সাবিত্রী তেতলার ঘরগুলি একটু নিরিবিলি ব'লে সেইদিক পানে চলেছে।

অন্যমনস্কভাবে চলায় সে লক্ষ্য করেনি যে, তেতলার সিঁড়ির ডান পাশের ঘরেই তার ছোটদাদা শিশির চুপি চুপি তরুণী-বধূর সাথে বিশ্রম্ভালাপে মত্ত।

হঠাৎ সাবিত্রীর কানে এল, শিশির চাপাস্বরে বল্‌ছে— সবো মিনু,—আমি পালাই। সাবু তেতলায় এসেছে। ও' যদি আমাকে এখন তোমার কাছে দেখতে পায়,—ভারী অপ্রস্তুত হবো তা'হলে!

বধূ দুষ্টামীর স্বরে উত্তর দেয়—কেন? তুমি তো বলো তুমি নাকি দুনিয়ার কাউকেই লজ্জা করো না!... ইচ্ছা করলে বাড়ীসুদ্ধ লোকের সামনেই নাকি তুমি আমায় আদর করতে পার? এতই যদি বীর তুমি,—তবে কেন ছোটবোনের ভয়ে লজ্জায় পালাচ্ছ?—

শিশিরের ঈষৎ গম্ভীর অথচ চাপা স্বর আবার শোনা যায়। সে বলো—না মিনু, সবার সামনেই পারি, কিন্তু সাবিত্রীর সামনে তোমাকে আদর সোহাগ করতে আমি লজ্জা পাই,—দারুণ লজ্জা পাই,—ব্যথাও পাই। ও আমার চেয়ে অ-নেক ছোট,—কিন্তু ওর 'পরে আমরা হাজারো রকম বিধিনিষেধ চাপিয়ে দিয়ে—নিজেরা এই—

বাকী কথাগুলি স্পষ্ট সবটা শোনা গেল না। সাবিত্রীর শোনার প্রবৃত্তিও ছিল না।

অপমানে ক্ষোভে তার সমস্ত দেহের মধ্যে একটা নিদারুণ অস্বস্তি অনুভূত হচ্ছিল।

পৃথিবীসুদ্ধ মানুষের এই আহা-উহু-বাণী ও করুণাপূর্ণ দয়া আর সে সহ্য করতে পারে না।

যদি ওরা এতই দুঃখিত, এতই কাতর, সাবিত্রীর বর্ত্তমান অবস্থায়, তাহলে দিক্ না কেন অবস্থান্তর ঘটিয়ে!

আজীবন অনবরত সকলকারই দয়া ও করুণার পাত্রী হ'য়ে থাকা—এ যে কী অভিশাপ এবং কতো বড়ো লাঞ্ছনা সে চুপ করে ভাবতে থাকে।

নিজের অবস্থায় সে তো একটুও দুঃখিত কিম্বা অসন্তুষ্ট নয়, সে তো বেশ সহজভাবেই সকলের সাথে মিশতে চায়; কিন্তু ওরা তা' দেয় কৈ?—তার জন্য যে ওদের বিশেষ যত্ন, বিশেষ স্নেহ, বিশেষ করুণা, বিশেষতর সদয়-সহানুভূতি—সে-ই তো ওর অবস্থার দৈন্যকে সবার সম্মুখে অহর্নিশি সুস্পষ্ট করে রেখেছে এবং ওকেও সর্ব্বদা সচেতন করে দিচ্ছে ওর নিজের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে।

মেজঠাকুর্দ্দা তাকে যদি আর সকল মেয়েদের মতই মিষ্টান্ন না দিয়ে প্রত্যাখ্যান করতেন, সে যে তা'তে কতো স্বাচ্ছন্দ্যের শান্তি পেতো তা' কে বুঝবে?—সে যে এই উৎসববাড়ীর সমস্ত মেয়ে হ'তে পৃথক, এ-কথা, একদণ্ড তাকে কেউই ভুলতে দিতে রাজী নয় যেন!

সাবিত্রী নিজের কুমারী বেশের পানে তাকিয়ে ঘৃণায় হাসে। ভাবে—ছিছি!—কতো বড়ো মিথ্যা এ' সাজ!... ওরা কি কেউ এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবতে পারছে সে কুমারী!—নামমাত্র বিবাহিত জীবন তার কুমারীজীবনে কিছুমাত্র ছায়াপাত করেনি!!—

ওদের মনের মধ্যে অহর্নিশি জেগে আছে সাবিত্রীর বৈধব্য, যে বৈধব্য সাবিত্রীর চেতন-সাপেক্ষ ঘটেনি,—অথচ ওদের সেই একান্ত সত্যকে মিথ্যার আবরণে আবৃত করে রাখার জন্যই ওরা সাবিত্রীকে পরিয়ে রেখেচে কুমারীর সাজ!...এ-সাজ ওদের কাছে একটুও যদি সত্য হত, তা'হলে আজকের এই উৎসব আনন্দের মাঝখানে এককণাও সহজ অধিকার সাবিত্রীর মিলতো!

তবে এ'সব পরে থাকা কেন? এ-ও ওদেরই করুণার দান বৈ-তো নয়?—

না—ওদের একবিন্দুও করুণা সে আর সইতে পারবে না!...বইতে পারবে না।

সাবিত্রী হঠাৎ ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর দীপ্ত চোখে গিয়ে বড় আয়নার সামনে দাঁড়ায়।

প্রকোষ্ঠের চুড়িগুলি, গলার হারছড়া ও কানের টাপ্ দু'টি খুলে নিরাভরণা হয়ে—সিমলার কালোপাড় শাড়ীর উভয় প্রান্ত হ'তে কুচকুচে কালো পাড় দু'খানি ছিঁড়ে ফেলে দেয়। একখানা কাঁচি সংগ্রহ করে এলো-খোঁপাসুদ্ধ ঘন কালো চুলের রাশি মুঠা করে বাম হাতে চেপে ধরে—ডানহাতে কাঁচি চালিয়ে খোঁপাসমেত চুলের রাশি নির্ম্মূল করে ফেলে।

উৎসব মণ্ডপের তোরণ-শীর্ষে নহবতে তখন পূরবী রাগিণী বেজে উঠেছে। সাবিত্রী বড় আরশির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বৈধব্য-বেশের প্রতি বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে যেন!

ক্ষণ পরে তার ডাগর চোখের কোল বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ে। সবিস্ময়ে ভাবতে থাকে—আয়নায় ও কা'র ছায়া; কা'র মৃত্যুর ছবি তার সর্ব্বাঙ্গে ফুটে উঠলো? সে কে? সে কে?

নহবত্ বড় করুণসুরে বাজছে।

অন্তরের নিতল আলোড়িত করে ভাষাতীত এক উদাস বেদনা জেগে উঠেছে তার কাতর-কোমল তানে।—যেন সবার চেয়ে প্রাণ যাকে চায় সে আজ আসেনি!...অভিমানে বুঝি কে চিরদিনের তরে চলে গেছে।—তারই নিবিড় বিরহব্যথা সমস্ত আকাশ বাতাস অশ্রুভারাতুর করে' সানাইয়ের সুরধারায় কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়ছে!... বাঁশী যেন বলতে চায় তার কান্নাভরা মিনতির সুরে—ওগো, সে কোথায়? —যে-বিহনে এই উৎসব-আয়োজন, এই ফুলের গন্ধ, বাঁশীর তান, হাসির প্রবাহ— সবই ব্যর্থ—সবই মিথ্যা!

ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৩৯

গতানুগতিক

মামারবাড়িতে মানুষ, মাতৃহীনা কালো মেয়ে মলিনা। শ্বশুরবাড়িতে বধূ-জীবন যাপন করছে চৌদ্দবছর বয়স থেকে। এখন বয়স আটাশ।

স্বামী সওদাগরি অফিসে সামান্য মাহিনায় চাকরি করেন। শাশুড়ি শুচিবাই নিয়ে থাকেন। বিধবা ননদ নিজের দুঃখ-জর্জর জীবনের তিক্তবিষ যতটা পারেন ভ্রাতৃবধূর উপরে নিজের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ছড়িয়ে দিয়ে অন্তরের জ্বালা কতকটা উপশমের চেষ্টা করেন। বৃদ্ধা পিস্‌শাশুড়ি চোখে এখন আর ভালো দেখতে পান না; বধূর কাছে বধূর মনের মতো, ভাইঝির কাছে ভাইঝির মনের মতো, গৃহকর্ত্রীর কাছে তাঁরই মনের মতো বিভিন্ন রকম কথা কয়ে সবাইকার মন রেখে চলতে চেষ্টা করেন।

বধূ সংসারে পরিশ্রম করে উদয়াস্ত। একাধারে দাসী, রাঁধুনী, শুশ্রূষাকারিণী ও কুললক্ষ্মীর কাজ তার যেন নিতান্ত সহজ অভ্যাস হয়ে গেছে। কষ্ট হয় না।

স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক তার আল্‌তো-আল্‌তো গোছের, বাইরের। অন্তরের কোনো নিবিড় সম্বন্ধ সেখানে গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে ওঠেনি। অফিসটাইমে ঘড়ি ধরে ভাত দেওয়া, শার্টে বোতাম পরিয়ে রাখা, জামার পকেটে ট্রামের মান্থলি টিকিট, বিড়ি-দেশলাই ঠিক আছে কিনা দেখে দেওয়া, জামাকাপড় বা বিছানা-মশারি ছিঁড়ে গেলে সেলাই করা, ময়লা হলে সাবান সিদ্ধ করে ফরসা করে দেওয়া,— খুব জোর রাত্রে ক্বচিৎ কোনোদিন স্বামীর পা কামড়ালে বা মাথা ধরলে—টিপে দেওয়া ছাড়া এর বেশি স্বামীর প্রতি কর্তব্যের তার প্রয়োজন হয় না।

শেমিজ ছিঁড়ে গেলে মার্কিনের থান কিনে দেওয়া, আটপৌরে কাপড় ছিঁড়লে বঙ্গলক্ষ্মী মিলের চওড়া-পাড় শাড়ি কিনে দেওয়া—খুব জোর পূজার সময় এক শিশি তরল আলতা ও সুগন্ধি তেল কিনে দেওয়া, এর চেয়ে বেশি কিছু কর্তব্য করবার স্বামীরও অবকাশ নেই, ইচ্ছা নেই এবং অর্থও নেই।

বেশির মধ্যে, বধূ মাঝে মাঝে শাশুড়ি-ননদের দুর্ব্যবহারের নিষ্ফল অভিযোগ স্বামীর কাছে জানায় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের সম্পূর্ণ নির্দোষিতা সপ্রমাণের হীন প্রচেষ্টাও করে থাকে। স্বামী বড় বেশি কান দেন না। স্ত্রীর কথাতে সায় দিয়ে যান মাত্র। কিন্তু ঘুমের ব্যাঘাত হলে তিরস্কার করেন।

বধূ যখন সংসারের সমস্ত পাট চুকিয়ে শয়নকক্ষে আসে, শ্রমক্লান্ত স্বামী থাকেন তখন গভীর নিদ্রায় অসাড়। ভোরের দিকে স্বামী যখন জেগে ওঠেন, স্ত্রী তখন জানালার ফাঁকে ভোরের আলো কতখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আন্দাজ করতে করতে তীব্র ব্যস্ততায় বিছানা ছেড়ে উনুনে আগুন দিতে চলে যায়। সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে অফিসের ভাত দেওয়ার দায়িত্বের মধ্যে যে সত্যের গুরুত্ব আছে—ভোরের

আলোয় বিছানায় শুয়ে স্বামীর সাথে নিরর্থক লঘু আলাপের মধ্যে সে গুরুত্ব যে নেই স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তা জানে।

পাশের বাড়িতে একটি বছর-পনের বয়সের কুমারী মেয়ে হার্মোনিয়ামের সাথে গলা মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গায়। গলাটি যেমনি মিষ্টি তেমনি গাঢ় দরদভরা। 'বর্ষা-মঙ্গল', 'শারদোৎসব', 'ঋতুরঙ্গে'র কত গানই না সে গায়! প্রত্যেকটি গানের কথাগুলি মেয়েটির স্বরে ও সুরে প্রাণবন্ত সজীব হয়ে ওঠে যেন।

ও-বাড়ির মেয়েটি যখনই গান গায়,—এ-বাড়ির সদা পরিশ্রমশীলা, সদা গম্ভীরা বধূটির নীরস মুখভাব যেন মুহূর্তের জন্য পরিবর্তিত হয়ে ওঠে।

বধূর মনে পড়ে যায় তখন তার কুমারীকালের কথা। মামারবাড়ি ছিল তার পশ্চিমে, এলাহাবাদে। সেখানে সে মেয়েস্কুলে পড়ত মামাতো বোনদেরই সাথে।

স্কুলে সরস্বতী পূজায় কিম্বা কোনো প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে সে একাধিকবার নানা কবিতা, গাথা, নাটকাংশ প্রভৃতি আবৃত্তি ও অভিনয় করেছে। গানও গেয়েছে অনেকবার।

পাশের বাড়ির মেয়েটি যে গানগুলি গায়, তার অনেকগুলি গানই সে কুমারীকালে শিখেছিল গাইতে।

ছোটবেলাকার সেই স্কুলের জীবনটা তার কাছে লাগে এখন যেন একটুকরো মিষ্টি-মধুর স্বপ্ন! শ্রাবণ-সন্ধ্যায় ঘনকাজল মেঘপুঞ্জের ফাঁকে অস্তরবির একঝলক কিরণরশ্মি!

এখন কল্পনাশক্তিও তার মনে আর সে মাধুর্য সৃষ্টি করতে পারে না।

মামা মারা গেছেন।

মামাতো ভাই এলাহাবাদের বাস উঠিয়ে ঢাকায় চাকরি-স্থানে চলে গেছে। তাদের খবর চিঠিপত্রে কদাচিৎ পায়।

বিকালে পাশের বাড়ির মেয়েটি অর্গ্যানে গান ধরে—'আমি চঞ্চল হে— সুদূরের আমি পিয়াসী'—

বধূ কলতলায় একরাশ বাসন মাজতে মাজতে মনে করে—গানের দিকে কান দেবো না—কাজের দেরি হয়ে যায় বড়!

ডেকচির পিছনদিকের কালি ঘষে তুলতে তুলতে হঠাৎ মনে পড়ে যায়, —এলাহাবাদে তাদের মেয়েস্কুলে একবার সব মেয়েরা মিলে অভিনয় করেছিল রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'। তখন ছিল তার স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ, ছিপ্‌ছিপে গড়ন, ছোট্ট চেহারা। ভাষা-ভাষা শান্ত সুন্দর চোখ, ভোমরা কোঁকড়া রেশমি চুল। তা ছাড়া, তার মিষ্টি কণ্ঠস্বরের ও অভিনয়শক্তির সুখ্যাতি ছিল বলে—তাকে নিতে হয়েছিল ডাকঘরের 'সুধা'র ভূমিকায়। আর একটি ফুট্‌ফুটে ফর্সা মেয়ে, নাম সুমিত্রা, সে হয়েছিল 'অমল'।

মাধবদত্তে'র ভূমিকা নিয়েছিল বড় মামাতো বোন। 'ঠাকুর্দা'র ভূমিকা নিয়েছিল খুব একটি মোটা মেয়ে, নাম কিন্তু তার—জ্যোৎস্নাময়ী মিত্র।

বধূর মঠির ছাই মাখানো শালপাতার নুটী শিথিল হয়ে আসে। ডেকচির উপরে অন্যমনস্কে শুধু হাত বুলিয়ে চলে। চোখের সামনে বায়োস্কোপের ছবির চেয়েও সুন্দর ও দ্রুততরভাবে বহু ছবি ফুটে উঠতে থাকে। 'মোড়ল' সেজেছিল ফার্স্ট ক্লাশের মেয়ে বীণাদি। উঃ, বীণাদি কী লম্বাই না ছিল! স্কুলে সব মেয়ের চেয়ে মাথায় উঁচু! বেটাছেলের মতো কাঠ-কাঠ চেহারা!

মনে পড়ে যায়, সে 'সুধা' সেজে পরেছিল, একখানি ফিকে গোলাপি রংয়ের সবুজ ডুরে ছোট্ট শাড়ি। হাতে পরেছিল মকরমুখো বালা, পায়ে ঘুঙুর-গাঁথা মল, মাথার থোপাথোপা চুলগুলি বেড়ে একগাছি মল্লিকাফুলের মালা।

বধূ ভুলে যায় তার বর্তমান। মুহূর্তের তরে তার মন বিচিত্র কোন্ এক স্বপ্ন-পারাবার উত্তীর্ণ হয়ে উড়ে যায় সুদুর নিরুদ্দেশে।

সে ভুলে যায় তার পড়ে আছে অসংখ্য গৃহকর্ম, ভুলে যায় হাতের অসম্পূর্ণ কাজ—দেখতে পায় না ছাইমাখা বাসনের রাশি শুকিয়ে দাগ ধরে যাচ্ছে, শুনতে পায় না পাশের বাড়ির মেয়েটি সে গান শেষ ক'রে 'ঋতুমঙ্গলে'র নতুন গান ধরেছে।

নতমুখে মাটিব দিকে চেয়ে পুতুলের মতো বসে থাকে। তার জীবনযাত্রার সহজ সত্য থেকে ক্ষণকালের জন্য তার মন বিচ্যুত হওয়ায় সে যেন অন্যলোকের মানুষ হয়ে গেছে।

রৌদ্রে দেওয়া আচারের পাত্রে কাকে মুখ দিতে পারে, এ সম্বন্ধে শাশুড়ির উচ্চ সতর্ক কণ্ঠের সাবধান বাণী ঘোষণা ও ঘুঁটেওয়ালির সাথে ঘুঁটের দাম নিয়ে ননদের সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের তীব্র বচসা হঠাৎ কানে এসে পৌঁছয়। বধূ সচকিতে চেয়ে দেখে বেলা আর বেশি নেই। নিমেষের মধ্যেই সমস্ত স্বপ্ন স্বপ্নেরই মতো মিলিয়ে যায়। দ্বিগুণতর জোরে থালাবাটিগুলি ছাই দিয়ে তাড়াতাড়ি করে ঘসতে ঘসতে সে আপনা-আপনিই স্বগতোক্তি করে— মাগো, কত বেলাই যে হয়ে গেল ক'খানা বাসন মাজতে! কখন উনুনে আঁচ দেবো, কখনই যে ঘর-দোরে ঝাঁট-পাট বিছানা-মাদুর সারবো —ঠিক নেই!

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে স্বামীর সাথে দেখা হয়। অফিস থেকে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে পাড়ার দৈনন্দিন তাসের আড্ডায় বেরুচ্ছেন। বধূ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে স্বামীর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—শোনো একটা কথা।

স্বামী সপ্রশ্ন চোখে বধূর পানে তাকিয়ে থেমে দাঁড়ান। বধূ বলে—পাশের বাড়ির মেয়েটি বেশ গান গায়। শুনেছ?

স্বামী এ অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনতে মোটেই আশা করেননি, তাই একটু বিস্মিতভাবেই বধূর দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর কৌতুকপূর্ণ মৃদুহাস্যে বলেন—

হ্যাঁ, শুনেছি, তাতে কি হয়েছে?

বধূ অকস্মাৎ লজ্জায় মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। বাইরের সপ্রতিভ ভাব বজায় রাখবার চেষ্টা করতে করতে অপ্রতিভ স্বরে বলে—না—এমনিই জিগ্যেস করছি। ওর গান কেমন লাগে তোমার?

স্বামী আরও আশ্চর্য ও কৌতুক অনুভব করেন। মুখে বলেন—ভালোই লাগে।

বধূ অকস্মাৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে ওঠে—ভালো না ছাই। তারপর অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের সহিত ঠোঁট উল্টে সিঁড়ি বেয়ে উপরে যেতে যেতে বলতে থাকে—মেয়েমানুষ গৃহস্থঘরে গান নিয়ে যেন ধুয়ে খাবেন।

গল্পলহরী, কার্তিক ১৩৩৯

অন্যান্য রচনা

‘মহিলা’র জন্য মহিলার গল্প

মহিলাব আসবে সত্যকার একজন মহীযসী মহিলা সম্বন্ধে গল্প বলি একটি। বানানো গল্প নয়।

সন-সাল ঠিক মনে নেই। তখন বাংলাদেশে লীগ-গভর্ণমেণ্টেব আমল। সাখাওযাৎ মেমোবিয্যাল গার্লস স্কুলে একটি মহিলা সভাব আযোজন হয়েছিল। মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনেব মহিলা শাখাব সভা ছিল সেটি।

সভাব সম্পাদিকা বেগম শামসুন্নাহাব এবং সভানেত্রী ছিলেন বোধ হয মিসেস মোমিন। বহু মুসলিম পর্দ্দানসীন মহিলাবা সেই সভায সমবেত হযেছিলেন। আমিও আমন্ত্রিত হযেছিলাম। সভায প্রধানা অতিথিরূপে মাননীযা সবোজিনী নাইডুকে নিয়ে এসে সংবর্ধনাব আযোজন কবা হযেছিল।

সাখাওযাৎ স্কুলেব উঁচু প্রাচীবঘেবা কম্পাউণ্ডেব মধ্যে বিস্তৃত সবুজ মাঠে সভাব সুন্দব আযোজন হযেছিল। হুড়মুড় কবে হঠাৎ নেমে এলো বৃষ্টি।

ওঠ—ওঠ—ছোট—ছোট—সবাই পালাতে লাগলো ছাদেব তলায। বেশ চেপেই জল নামলো। সাজানো চেযাব টেবিল ফুলদানি, প্রধানা অতিথিব সুদৃশা আসন, সমস্ত তুলে আনতে হল একটি হলঘবেব মধ্যে। কোনওবকমে ঠেলাঠেলি কবে বিভিন্ন ঘব থেকে বেঞ্চি চেযাব টেনে এনে যথাসম্ভব ব্যবস্থা কবে বসা হল। খানিক বাদে এলেন শ্রীমতী নাইডু। বৃষ্টিব জন্য হলেব মধ্যে আকস্মিক আশ্রয নিতে বাধ্য হওয়ায একটু ঠেসাঠেসি গোলমালেব মধ্যেই সভা আবম্ভ হল।

মিসেস মোমিন উর্দুভাষায সভাস্থ সকলকে স্থিব-ধীব হযে বাক্যালাপ বন্ধ কবে যথাস্থানে আসন গ্রহণ কবাব জন্যে বিনীত মিষ্ট অনুবোধ কবতে লাগলেন। তাবপব মিসেস শামসুন্নাহাব তাঁব বাংলায মুদ্রিত অভিভাষণটি পড়লেন। সভায কতক মহিলা বাংলায এবং কতক উর্দুতে কথাবার্তা কইছিলেন। শ্রীমতী নাইডু তাঁব স্বভাবসুলভ কৌতুক-হাসি-উজ্জ্বলমুখে সভা-পবিচালনা এবং সমবেত মহিলাদেব লক্ষ্য কবছিলেন। আমি শ্রীমতী নাইডুব পাশেব চেযাবে ছিলুম। তিনি আমাব পানে তাকিয়ে ইংবাজীতে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন কবলেন—এখানে অনেকেই উর্দুতে কথা বলছেন শুনছি। এঁবা কি বাংলাভাষী নন? উত্তব দিলুম—ঠিক জানি না আমি। তিনি স্বগতঃকণ্ঠে বললেন —কিন্তু সম্পাদিকা ভাষণ তো বাংলাতে দিলেন এবং ভাষণটি ছাপাও হযেছে দেখছি বাংলাতেই।

আমাদেব প্রত্যেকেব হাতে মিসেস নাহাবেব মুদ্রিত অভিভাষণ পুস্তিকা এক-এক খণ্ড কবে ছিল। শ্রীমতী নাইডুব হাতেও ছিল।

আমি হেসে বললুম—আপনাব একটু অসুবিধা হল হযতো।

শ্রীমতী নাইডু তাঁব পবিচিত মধুব অথচ কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে হেসে বললেন

—খুব বেশী নয়। মেয়েদের বেশী সময়ই অজানা ভাষা পড়ে নিতে হয় যে!— যে-কোনও না-জানা এবং না-শেখা ভাষা বুঝে নিতে মেয়েরা ওস্তাদ! তারপর আমার পানে গভীর অর্থব্যঞ্জক হাসি-উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—তাই নয় কি?

তাঁর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুমান করে নিতে পারলেও—আমি ইচ্ছা করেই সবিনয়ে বললুম—দয়া করে আরেকটু সুস্পষ্ট করে বলুন। তিনি হেসে উঠলেন, বললেন—

ভাবভঙ্গী দেখেই কি নারীরা বুঝতে পারে না মানুষ কী বলতে চায় বা পেতে ইচ্ছা করে?

সমর্থনসূচক মাথা হেলালুম আমি। তারপরে আবার বললেন, শিশু-যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে যে-কোনও মানুষের মনের ভাব মেয়েরা অত্যন্ত সহজেই বুঝতে পারে।

আমি হেসে বললুম,—কিন্তু, বক্তৃতা-সভা তো সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার।

স্বভাবসিদ্ধ সরসভাষায় সকৌতুক হাসিতে ঝলমল করে উঠে বলতে লাগলেন —যে-কোনও রাজনৈতিক মতবাদী দলের লোকেরা তাদের সভায় কী বলবে, যে-কোনও সামাজিক-সমস্যার সভায় তারা কী বলবে, বিশেষ করে—ভারতবর্ষের নবজাগ্রত মহিলাদের সভায় মহিলারা কী বলবেন—এ সমস্তই কি খানিকটা আগে থেকেই সিলেবাস নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের মতনই সুনির্দ্দিষ্ট নয়? আসল বক্তব্য বিষয়ের সার কথাটা আগে থেকে জানা থাকলে—তারপরে সেটা যে-কোনও ভাষায় যত রকমই কথার জাল রচনা করে বা কথার ফুলঝুরি ঝরিয়ে বলা হোক না—বুঝে নিতে কিছু মুস্কিল হয় না। ভারতবর্ষের যে-কোনও ভাষায় যৎসামান্যমাত্র জ্ঞান নিয়েও আমার যে-কোনও সভার বক্তৃতা বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় না। কারণ, ভারতবর্ষের মোটামুটি মূল সমস্যাগুলোই তো হরদম ব্যাকরণের সূত্রের মতন মুখস্থ করতে হয় কি না আমাদের!

শ্রীমতী নাইডু বাংলা বলতে পারতেন না। উর্দু ও হিন্দুস্থানী পরিষ্কার অনর্গল বলতে পারতেন। পাশের একটি মহিলা উর্দুভাষার গুণ এবং সর্বভারতীয় ভাষা হওয়ার যোগ্যতা সম্বন্ধে উর্দুতেই বাক্যালাপ আরম্ভ করলেন। শ্রীমতী নাইডু মৃদু মৃদু হাসছেন এবং মাথা দোলাচ্ছেন।

এমন সময়ে একটি স্বেচ্ছাসেবিকা বালিকা আমাদের কাছাকাছি কোনও এক মিসেস অমুককে খুঁজতে লাগলেন। টেলিফোন এসেছে মিসেসের আয়া জানাচ্ছে —তাঁর শিশুকন্যাটির কান্না সে কোনওমতে থামাতে পারছে না।

শ্রীমতী নাইডুর কানে কথাটা পৌঁছতেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে সামনের দিকে ঝুঁকে তিনি ব্যস্তস্বরে প্রশ্ন করলেন—বাচ্চী রোতি থী?...বাচ্চী বাংলেঁমে রোতী না —উর্দুমে রোতী—পুছ লেও তো বহন্!

কথাটা এমন অদ্ভুত গম্ভীর ভঙ্গীতে তিনি বললেন,—প্রথমটা সকলেই একটু

থতমত খেয়ে গেলেন। তারপরে সকলে বুঝতে পেরে খুব হাসতে লাগলেন! গভীর অর্থব্যঞ্জক রহস্যটির দ্বারা তিনি মেয়েদের মধ্যে যে ভাষাভেদ নিয়ে তর্ক উঠেছিল তার সহজ মীমাংসা করে দিলেন।

শ্রীমতী সরোজিনী ছিলেন অসাধারণ ধীশক্তিশালিনী স্নিগ্ধ মাধুর্য্যময়ী, অথচ প্রখর বুদ্ধিমতী ও ব্যক্তিত্বশালিনী নারী। তাঁর প্রকৃতি এবং মুখের সহজ ভাষা ছিল কবিত্বময়। ভারতবর্ষে তাঁর মত জাতীয় বৈশিষ্ট্যশালিনী বিদুষী নারী আর দেখিনি।

মহিলা, সপ্তম বর্ষ (শারদ সংখ্যা)

অতীতের এক টুক্‌রো

'লেখা আমি সত্যিই ছেড়ে দিয়েছি।' লেখার জন্যে তাগাদা এলে এ কথা যখন বলি, কেউ কান দিতে চান্ না, সকলেরই এক কথা, 'যা হোক, দু'চার লাইন লিখে দিতেইহবে।'

যখন বলি, 'এখন ক্ষমতাই চলে গেছে। লিখতে আর পারি না আমি। শক্তি নেই।' বিশ্বাস করতে চান না কেউ।

'মহিলা'র প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ আছে। এ স্নেহ অস্বাভাবিক নয়। নিজেদের ব্যাপার তো। যেমনই হোক না, 'মহিলা' 'জয়শ্রী' 'মহিলা মহল' 'অঙ্গনা' 'ঘবে বাইরে' 'বলাকা' এদের প্রতি যেন অন্তরের পক্ষপাত উপলব্ধি করি। কেউ বরাবর বাড়ীতে আসছে, কেউ মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে, কাবও সাথে বা পথেঘাটে পরের বাড়ীতে কদাচিৎ দেখা হয়ে যায়। দেখলেই কিন্তু যত্ন করে উল্টেপাল্টে সবটুকুই দেখি, ইচ্ছে হয়। ওদের মাঝে আমিও আসি বসি, হাসি কাঁদি, প্রাণ খুলে সুখ দুঃখের কথা কই। কিন্তু, ভাগ্য মন্দ। কলম যে সেই মৌনী হয়ে বসেছে,—কিছুতেই তার আর মুখ খুলতে পারিনে। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি এখন।

কেউ বলে 'অহঙ্কারী', কেউ বলে 'কুঁড়ে', কেউ বা হয়তো বলে 'বাজে, বাজে, একেবারেই কিচ্ছু নয়।'

জনান্তিকের মনোভাব বুঝতে পারি। উপায় নেই চুপ করে থাকা ছাড়া। সত্যিই আমি অপরাধী।

বহুদিন থেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছি 'মহিলা'র কাছে। লেখা দেবোই দেবো। 'মহিলা'র ধৈর্য্য অসীম, সৌজন্য তারও চেয়ে বেশি।

লিখতে বসে কোনও বিষয়বস্তুই পছন্দ হয় না। সাহিত্য, সমাজ, ভ্রমণ-কাহিনী?

সবেতেই মনে হয় কী হবে লিখে? 'ঘুরে ফিরে সেই' একই কথা তো।

ভাবতে ভাবতে মনে পড়লো অল্পবয়সের অনেক নির্বুদ্ধিতার কথা।

নিজের নির্বুদ্ধিতা বা অজ্ঞানতার কথা তো কেউ কখনও লেখে না। সেইটাই না হয় লিখে ফেলি এবার। মহিলার পাতে দেবার মতন স্বাদু সামগ্রী হলেও হতে পারে। মেয়েদের নাকি সুখ্যাতির চেয়ে অখ্যাতিই বেশি মুখরোচক!

অল্পবয়সের নির্বুদ্ধিতার কথা পরিণত বয়সে অনেকেরই হয়তো মনে পড়ে। এখন সে কথা বলতে বা লিখতে কেন, ভাবতেও লজ্জায় মাথা হেঁট হয়। তখন যদিও বিপুল উৎসাহে চারিদিকে দৌড়োদৌড়ি করে বেড়িয়েছিলাম নিঃসঙ্কোচেই।

আমার সেদিনের দুঃসাহসের সাক্ষী যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ পরলোকে। এখনও একজন প্রত্যক্ষদর্শী বেঁচে আছেন, ভক্তিভাজনীয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। এই বামন হয়ে চাঁদ ধরার চেষ্টায়, তিনি কিন্তু আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ এবং ভরসা দিয়েছিলেন। সাহায্যও করেছেন।

করণীয় বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা অনেকখানিই অস্পষ্ট থাকলে, তবে মানুষ এমন একটা কাজ 'আমি করবো' বলে এগিয়ে যেতে পারে। এখন ভাবতে গেলেই লজ্জায় আর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হই নিজেই।

ভণিতা রেখে ব্যাপারটি বলেই ফেলি। উঠেপড়ে লেগেছিলুম এক সময়ে আমি গুরুদেবের জীবনী লিখবো বলে।

স্পর্ধাটি আন্দাজ করে মেপে দেখুন!

জীবনীর জন্যে প্রথমেই দরকার তাঁর শৈশব এবং বাল্যের কাহিনী। তারপরে তাঁর পরবর্তী জীবনের অংশ। গুরুদেবের কাছে অনুমতি নিয়ে এই মহান কর্মে সগৌরবে এগিয়ে চললুম। একক কাঠবিড়ালী চললো উত্তাল সমুদ্রে সেতুরচনা করতে। হয়তো কাঠবিড়ালীরও পিঠ-ঝাড়া ধুলো এর চেয়ে বেশী উপযোগী ছিল সমুদ্র বন্ধনে, এ জ্ঞান তখনও হয়নি।

দেখা হলেই গুরুদেবের কৌতুক পরিহাসের শরসন্ধান! কতোদূর সংগ্রহ হল তোমার ঝুলিতে?

হতোদ্যম না হয়ে বরং দ্বিগুণ উৎসাহে আনাগোনা করে বেড়াতুম নানা জায়গায়। সস্নেহ উপদেশ পেতুম চৌধুরীমশায়ের কাছে—স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী। অকৃপণ সাহায্য এবং নির্দেশ পেতুম পরম শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কাছে।

কবি বলতেন, আমার শৈশবটা অদৃশ্যই রয়ে গেলো। বাল্যের যতোখানি আমার স্মৃতিতে আছে ততখানি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমার কথা আমার চেয়েও যারা ভালো জানতো, তাদের কাছেই খবর মিলবার কথা। আমার কথা আমারই কাছে খবর নিতে আসো কেন?

ছোটোবেলার গল্পের জন্যে বলেছিলেন, আমার ভাগনে সত্যপ্রকাশের কাছে যেও, অনেক খবর পাবে। আর পাবে যোগেনবাবুর কাছে। যোগেন চট্টোপাধ্যায়।

অবনরাও কতক কতক বলতে পারবে, কিন্তু ওরা তো আমার কতক পরই জন্মেছে কিনা। তুমি বরং মেজবৌঠানের কাছে যেতে পারো।

অবনবাবু বললেন—ন'খুড়ীর কাছে তোমাকে নিয়ে যাবো অখন। ন'খুড়ী রবিকা'র ছোটোবেলার গল্প বলতে পারবেন। আর কেই বা আছে বেঁচে? অনেক দেরীতে তোমরা খবর নিতে এসেছো।

হপ্তায় দু'দিন করে দিন ঠিক হল। আমি যেতুম দশটা সাড়ে দশটার সময়ে জোড়াসাঁকোয় অবনবাবুর বাড়ী, তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিজে নিয়ে যেতেন বলেন্দ্রনাথের মায়ের মহলে।—কৈ গো ন' খুড়ী! তোমার সেকেলে গল্পের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে, ভাঙাচুরো যা আছে বের করো দিকি এর কাছে!

অবনীন্দ্রনাথের সেই নিজস্ব অপূর্ব ভঙ্গীর বাচন। বলেন্দ্রনাথের মা তাঁর কাছটিতে বসিয়ে যত্ন করে খেতে দিতেন পাথরের গেলাস ভরে একগ্লাস ডাবের জল। তারপর বলতেন তাঁর প্রথম বধূজীবনের গল্প। রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগেই তিনি ঠাকুরবাড়ীতে বৌ হয়ে এসেছিলেন। খুব বেশিদিন আগে নয় অবিশ্যি, বছর খানেক আগে।

বলে যেতেন ধীরে ধীরে তিনি স্মৃতি মন্থন করে তাঁর বাল্যকালের ঠাকুরবাড়ীর কথা। পুরোনো আমলের কর্তা-গিন্নীদের গল্প। আদবকায়দা নিয়মকানুনের কাহিনী। বলেন্দ্রনাথের কথা বাব বার এসে পড়তো কবির কথা বলতে গিয়ে। 'বলু' আর 'রবি'। মহর্ষি-পত্নী সারদাদেবীর গল্প অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতেন।

সানি পার্কে স্বর্ণকুমারী দেবীর কাছে কয়েক দিন গিয়েছিলুম নোট লিখে নিতে। 'মে ফেয়ারে' প্রমথ চৌধুরী মশায়ের বাড়ীতে বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে দেখা হয়েচে। তাঁর কাছেও কবির বাল্যজীবনের বা শৈশবের খেলাধুলোর কাহিনীর নোট্ পাওয়া গেছে। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ী লালবাংলোয় গিয়েছি স্বর্গীয়া জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছে। ইন্দিরা দেবী সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন মায়ের কাছে। রবীন্দ্রনাথের জন্মের অল্পকাল পরেই জ্ঞানদানন্দিনী এসেছিলেন বধূ হয়ে ঠাকুরবাড়ী। অনেক মজার কথা নোট নিতুম মনে আছে। একটু নমুনা দিই জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মুখের কথার:

'আমার শাশুড়ীর গর্ভই ছিল খুব সুন্দর। তোমরা রবিকে অতো সুন্দর বলো এখন শুনি। আমার শাশুড়ীর কাছে রবি তো ছিলো তাঁর "ময়লা রং ছেলে"। শাশুড়ী ফর্সা রং খুব পছন্দ করতেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা প্রায় সকলেই ছিল ফর্সা। তার মধ্যে রবিই ছিলো নিরেশ রং। ছোটোবেলায় ওকে বেশি কোলে নিতেন না। বাড়ীর দাসীরা আর ঝি-বৌয়েরা হাসাহাসি করে বলতো, হ্যাংলা আর ময়লা বলে এ ছেলেকে বেশি কোলে নেন না গিন্নীমা। ফর্সাদের উনি কোলে নেন। সেটা অবশ্য সত্যি ঠিক নয় যদিও, তবে আমার শাশুড়ীর সুন্দরের উপরে ঝোঁক ছিল সত্যি। আমার ন' দেওরের রং ছিলো যে শাঁখের মত সাদা। রাঙা দেওরের রূপের জলুষ

এতো ছিলো মানুষ অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতো। কচি বয়সে রবির রূপের নামডাক ছিলো না আমাদের বাড়ী। ছোটো থেকে ওর গলার তারিফ করতো সকলেই। গানের গলা বরাবর চমৎকার সরেস ছিলো ওর।

'বড়ো হলে দেশসুদ্ধ পাঁচজনের মুখে আমরা শুনলুম রবি নাকি পরম সুপুরুষ! তার মানে এরা তো ঠাকুরবাড়ীর আগেকার পুরুষদের রূপ দেখেনিকো।'

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী আমার কাজের সাহায্য হবে বলে তাঁদের 'পরিবারিক খাতা' বা খেয়ালখাতা নামে ঐতিহাসিক খাতাখানি দীর্ঘকাল আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। এখন সে-খাতা বোধ হয় রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। তাতে ঠাকুরবাড়ির সেকালের আবহাওয়া ও মানসিকতার আলোবাতাস অনেকখানি পাওয়া যায়।

আমি অল্পকাল এই সংগ্রহ করে বেড়াবার পরে বুঝতে পারলুম এ কাজ কত গুরুতর। পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনও এর চেয়ে অনেক সহজ। এই জীবনী রচনার প্রথমদিন অনেকেরই কাছে উৎসাহ পেয়েছিলুম, কিন্তু দৃষ্টি পড়েনি শুধু নিজের দিকে। জীবনে অনেক কথাই এখন লজ্জার সঙ্গে স্মরণ করি, এটি তার মধ্যে বিশেষ অন্যতম।

মহিলা, নবম বর্ষ : পঞ্চম সংখ্যা

'পরিপূর্ণতার সুধা নানা স্বাদে'

অল্পবয়সে গুরুদেবের কাছে যখন যেতাম, তাঁর কাছাকাছি অনেক বিশিষ্ট মানুষকে লক্ষ্য করতাম। তার মধ্যে একজন ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। অনেক মানুষের ভীড়ে এক-একজন মানুষ নিজস্ব ব্যক্তিত্বে কেমন যেন আলগা আছোঁয়া থেকে যান; প্রশান্তচন্দ্রের মধ্যে সেই কাছে থেকেও দূরে থাকার ব্যক্তিত্ব ছিল। সহজাত সৌজন্যসুন্দর একটি পরিশীলিত রুচি তাঁর আচরণের মধ্যে বিকীর্ণ হতো। কথাবার্তা অতি সংক্ষিপ্ত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি অক্ষর নয়। মেয়ে-মহলে আড়ালে হাসাহাসির আসরে তাঁর বাক্যালাপের ভাষ্য হতো—'টেলিগ্রামের কোড', 'মৌখিক —শর্টহ্যাণ্ড'। মুখে বাক্য ছিল না, কিন্তু নির্বাক ব্যঞ্জনা ছিল।

মেয়েদের দল গুরুদেবকে মৌমাছির মতো ঘিরে গুঞ্জন করতে থাকেন। কাজের মানুষ প্রশান্তবাবুর সময়বিশেষে সেটা যে পছন্দসই ছিল না মেয়েরা সবাই জানতেন। তিনি গুরুদেবের দিকে এগিয়ে আসছেন দূর থেকে দেখা গেলে মেয়েদের মধ্যে ফিসফাস্ উঠতো—'ঐরে, প্রশান্তবাবু আসছেন, এইবার পালাতে হবে।' তখনই হাসি কৌতুকের উচ্ছলতা থামিয়ে সবাই সম্বৃত হতেন চাপল্য থেকে। অথচ, মেয়েদের

প্রতি অকৃত্রিম সৌজন্যপূর্ণ মর্যাদার অভিব্যক্তি প্রশান্তচন্দ্রের আচার-আচরণে সর্বদা ফুটে থাকতো।

মানুষটির মধ্যে সাধারণত্ব অল্পই ছিল। তাই, সাধারণ মানুষ নিজেদের চেনা-ফ্রেমের মধ্যে না দেখতে পাওয়ায় তাঁকে ঝাপসা দেখতেন। এই দেখায় ভুলও যে জমতো না তা নয়। কতকলোক ভাবতেন, তিনি বুঝি বেশ অহংকারী। মানবচরিত্রে অভিজ্ঞ প্রশান্তচন্দ্র নিজের সম্বন্ধে অন্যলোকের ভুল ভাঙাবার জন্য উদ্বিগ্ন হতেন না। আসলে, তিনি ছিলেন অন্তর্মুখী মানুষ। বাইরে নয়, মনের মধ্যেই বাক্যস্রোত চিন্তায বইতো।

মানুষের বহিবঙ্গটা যে খোলসমাত্র, তা জানতেন। তাই, তার প্রতি আকৃষ্ট হননি কোনোদিন। ভিতরের সারবস্তুর দিকেই ছিল অন্তর্ভেদী প্রজ্ঞাদৃষ্টি। ছাত্রদের মধ্য থেকে সম্ভাবনাময় ছেলে তিনি সহজেই চিনে নিতে পারতেন। তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য, উৎসাহ উদ্দীপনা জুগিয়ে বিজ্ঞানেব উঁচু শিখরের দিকে টেনে নিতে সহায়তা করতেন। অপবিণত সম্ভাবনাকে যথোপযুক্ত সহায়তায পরিণতিদান করা—তাঁর সাবাজীবনেব মহৎ লক্ষ্য ছিল।

সহধর্মিণী নির্বাচনেও তাঁর এই অন্তর্মুখিনতার পরিচয় সুস্পষ্ট। সদ্বংশের, সর্বজনসম্মানিত সৎপিতামাতার সুশিক্ষিতা কন্যা নির্মলকুমারী প্রশান্তচন্দ্রদেবই ঐতিহ্য সংস্কার ও সংস্কৃতিব মধ্যে মানুষ হয়েছেন। ভারতীয় বিবাহ দুটি ব্যক্তিমানুষেই একান্ত সীমাবদ্ধ নয়। বৃহৎ সমাজ, নিজেদের পরিবার, পূর্বপুরুষ আর বিশেষ করে উত্তবপুরুষরা এর সঙ্গে জড়িত, তিনি বিশ্বাস করতেন। মানুষ স্বয়ম্ভূ নয়, পূর্বপুরুষ তাব শিকড়, উত্তবপুরুষ শাখাপ্রশাখা ফুলফল। পাশ্চাত্যের বিবাহবিধিকে গুরুদেব 'বাণিজ্যিক বিবাহ' 'জীবধর্মী বিবাহ' বলতেন। কবির মুখে অনেকবার শুনেছি, 'ওর (প্রশান্তচন্দ্র) বৈজ্ঞানিকদৃষ্টি মোহমুক্ত। কোনও আচ্ছন্নতা নেই কিনা, তাই সুস্পষ্ট সবটা দেখতে পায়।'

এতবড়ো বৈজ্ঞানিক আর দামীনামী মানুষ হয়েও, নিজের পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে খণ্ডিত হয়ে কেবলমাত্র বৃহত্তর বিশ্বেব আন্তর্জাতিকতায় নিজের মূল্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চাননি। ঘর আর বাহির, নিজের সমাজ আর বিশ্বমানবসমাজ সর্বত্রই মানবিক দায়িত্ব প্রসন্ন ধৈর্যে, সহিষ্ণু নিষ্ঠায় পালন করে গেছেন সারাজীবন।

প্রশান্তচন্দ্রের পারলৌকিক শ্রদ্ধাবাসরে স্মরণিকা পুস্তিকায় তাঁব সহধর্মিণীর মুখে শুনি—'মনে করলে অবাক লাগে যে আমার মতো অতি নগণ্য একজন মেয়েকে এই বিরাট পুরুষ তাঁর জীবনসঙ্গিনী হবার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তার চেয়েও বেশি আশ্চর্য এই যে, কোনোদিন আমাকে অনুভব করতে দেননি যে আমি তাঁর সমকক্ষ নই। অতি সহজে বিনা লজ্জায় জগৎজোড়া বিদ্বজ্জনসভায় আমাকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। কাউকে মনে করতে দেননি যে আমি কিছুমাত্র কম। নিজেব যোগ্যতা না থেকেও এতটা সম্মান সারাজীবন পেয়েছি আমার স্বামীর কাছ থেকে,

এটা যে কেবলমাত্র আমার পিতৃমাতৃপুণ্য বলেই ঘটেছে এ বিষয়ে মনে কোনো সন্দেহ নেই।'

সন্তানের কৃতিত্বে, মহত্ত্বে, সার্থকতায় পিতামাতা পুণ্যবান গণ্য হন নিঃসন্দেহ। সুতরাং, পুণ্যবান পিতামাতার সন্তান কেবল নির্মলকুমারীই নন, প্রশান্তচন্দ্রও অবশ্যই। কারণ, তিনি সমাজের সর্বজনসমক্ষে 'ধর্মে চার্থে চ কামে চ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েয়ম' পবিত্র প্রতিজ্ঞা স্বীকার করে যাঁকে অর্ধাঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, সারাজীবন তিনি তাঁর প্রতি সে শপথ পালন করে গেছেন।

দাম্পত্যজীবনে দুজনের প্রকৃতি পরস্পরের পরিপূরক ছিল। একজন সম্পূর্ণ মননজীবী বুদ্ধিপ্রধান মানুষ, স্থির, গম্ভীর , বিবেচনা করে মেপে কথা বলেন। অন্যজন হৃদয়জীবী ভাবপ্রধান মানুষ, আনন্দ-উচ্ছল প্রকৃতি ; মনে ও মুখে এক, সরল হৃদয়ে কথার ঝর্ণাধারা বইয়ে দেন। একজন বিরল বৈদগ্ধ্যের জ্যোতিতে সর্বত্রই সুদূর, বুদ্ধির স্তরসাম্য না ঘটলে অন্তরঙ্গতা সম্ভব হয় না ; অন্যজন তাঁর বিরল হৃদয়বত্তার কোমল উষ্ণতায় সামান্য-অসামান্য নির্বিশেষে সকল মানুষেরই কাছাকাছি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বোদেনস্টাইন, বার্ট্রাণ্ড রাসেল থেকে বাড়ির নির্বোধ মালীটি, বুড়ো গয়লাটি পর্যন্ত সবার সঙ্গেই বন্ধুত্বস্থাপন তাঁর পক্ষে সহজ। রবীন্দ্রনাথ বলতেন—'ওরা দুজনে পরস্পরের পরিপূরক। দুজন মিলে ওরা সম্পূর্ণ একটি মানুষ।'

সত্যনিষ্ঠ সত্যবাক পিতার সুযোগ্য কন্যা নির্মলকুমারী। তাঁর স্পষ্টবাদিতা থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও রেহাই পাননি। 'কারুর মন রেখে কথা বলা রাণীর স্বভাবে নেই'—কবিরই প্রশ্রয়-সস্নেহভাষণে শুনেছি। ইংরেজিতে যাকে বলে 'ট্যাকট', সেই নাগরিক-নৈপুণ্য তাঁর অকৃত্রিম বাকভঙ্গিকে ভারাক্রান্ত করেনি। প্রশান্তচন্দ্র নিজে এর বিপরীত প্রকৃতির হলেও, রাণীর প্রকৃতিগত স্বচ্ছন্দতায় কখনও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি। পত্নীর স্বকীয় স্বাভাবিক প্রকৃতির গতি পরিবর্তনের চেষ্টা করেননি। এখানে তাঁর মানবিক প্রজ্ঞা এবং প্রিয় মানুষটিকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মানুষ হিসেবেই ভালবাসতে পারার শক্তি পরিস্ফুট।

রবীন্দ্রনাথও রাণীর এই অকৃত্রিম সহজ সরল সদাপ্রফুল্ল স্বভাবগুণটির অকপট অনুরাগী ছিলেন। একটু বুঝি ভয়ও করতেন, কখন রাণী কোন স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দেবে ঠিক কি? এ নিয়ে কিন্তু প্রশান্ত-মানুষ প্রশান্তচন্দ্রকে উদ্বিগ্ন বিচলিত হতে দেখা যায়নি। এই সুখী দম্পতি কবির জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত তাঁর ঘনিষ্ঠ গভীর স্নেহ ও প্রসন্ন আশীর্বাদ লাভ করেছেন অবিচ্ছিন্ন ধারায়। যে-কোনোও দুরূহ সমস্যায় গুরুদেবের পরামর্শের স্থান প্রশান্ত। আর তাঁর নিশ্চিন্ত বিশ্রাম ও আরামের আশ্রয় রাণী। মাঝেমাঝেই তাই এঁদের সংসারে রাণীর নিপুণ স্নিগ্ধ সেবার আওতায় গিয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। সেখানে পেতেন তিনি পূর্ণ বিশ্রাম।

এখানে রাণীর তুলনা নেই। দুটি বিরাট পুরুষ তাঁর স্নিগ্ধ সাহচর্যে ও কুশল হাতের সেবায় আরাম পেয়েছেন, প্রশান্তচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রকৃতির অকৃত্রিমতাই

এই কৃতিত্বের মূলে। যেমন তাঁর দুধেল গরুগুলির যত্ন নিতে তিনি পটু, তেমনি তিনি বোঝেন ধানের শীষে কখন দুধ আসছে, তেমনি তিনি সহজ দক্ষতায় বুঝে নিতেন প্রশান্তচন্দ্রের প্রযোজনগুলি, গুরুদেবের খেয়ালখুশির মুড। রাণীর অসামান্যতা তাঁর অমোঘ আন্তরিকতায়।

প্রশান্তচন্দ্র সোনা চিনতে ভুল করেননি। তাঁর হাতে গড়া ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর কর্মী নির্বাচনেও এই একই অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন বারবার। কাকে দিয়ে কী কাজ পাওয়া যেতে পারে, কার মূল্য কোথায় এবং কিসের জন্য —সেটা বুঝে নিতে সময় লাগতো না। যেমন সুষ্ঠুভাবে তিনি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট গড়ে তুলেছিলেন যোগ্য সহকর্মী নির্বাচন করে, তেমনিই সুষ্ঠুভাবে নিজের পারিবারিক জীবন তিনি রচনা করেছিলেন সুগৃহিণী সখী সচিব সহধর্মিণী নির্বাচন করে।

প্রশান্তচন্দ্র ও নির্মলকুমারী আমাদের চোখে একটি আদর্শ দম্পতি। যাঁদের সংযুক্ত জীবনে সমাজ বা সংসারের কেউ কখনও অবহেলিত অস্বীকৃত হননি। তাঁদের গৃহের আতিথ্য যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা জানেন এঁদের সংসার কত সুশৃঙ্খল সুরুচি-সুন্দর আর সুখের ছিল। সেখানে এমন একটি নির্মল পরিবেশ ছিল, যার মধ্যে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এলে মন হালকা শুচিস্নিগ্ধ হয়ে উঠতো।

আমার কন্যা নবনীতার কাছে একটা ভারী মজার গল্প শুনেছিলাম প্রশান্তবাবুর তিরোধানের অল্প কিছুদিন আগে।

এক তরুণ কবি 'হদিশ' শব্দের সঙ্গে 'প্রশান্ত মহলানবিশ' মিলিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। বক্তব্য বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথে যে কতবার 'তুমি'র ব্যবহার আছে তার সংখ্যা কেউ বলতে পারে না, এমনকি, প্রশান্ত মহলানবিশও। এই কবিতাটি ডঃ অশোক মিত্র প্রশান্তবাবুকে পাঠিয়ে দিয়ে পরিহাস করে লেখেন—'এতদিন বাদে কবির খপ্পরে পড়ে আপনি শহীদ হলেন। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বটির কী হবে, আপনার ঝুলিতে রবীন্দ্রনাথের "তুমি" ব্যবহারের হিসেব না থাকলে দুযো খেতে হবে আমাদের সবাইকে।'

এর উত্তরে কি হলো শুনুন। ডঃ অশোক মিত্রের জবানীতেই জানাই।

'ভুলেই গিয়েছিলাম প্রায়। হঠাৎ মাসদুয়েক বাদে লেফাফায় মোড়া নিচের তুমি-আমির পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব এসে হাজির। পরদিন সকালে নিজেই টেলিফোন করলেন, পেলাম কিনা জেনে নিশ্চিন্ত হলেন।

'বহুবিচিত্র মানুষ ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, স্পষ্টত বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়েও হিসেবে মেতেছিলেন। প্রতিটি গ্রন্থের, প্রতিটি অনুচ্ছেদের, প্রতিটি পঙক্তির মধ্যে নিহিত আমি-তুমির অন্বেষা। যেটা ধরতেন, একেবারে গহনে ঢুকে গিয়ে আবিষ্কারে মাততেন।'..

সাধারণের কৌতূহল চরিতার্থে আমি সেই 'আমি-তুমি'র সংখ্যানিরূপণ পাঠকদের সামনে রাখছি। এখানে শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, বঙ্কিমচন্দ্রেরও 'আমি-তুমি' বর্তমান।

Use of 'Ami' (I) and 'Tumi' (You) and total number of words in the following books by 'Sal' (Bengali era)

RABINDRANATH

Sl No	Sal (Bengali era)	Name of books	Total number of words used	use of 'ami'	Use of 'tumi'	per thousand 'ami'	per thousand 'tumi'	Ratio of ami/tumi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1289	*Bowthakuranir Hat*	35768	335	111	9 37	3 10	3 02
2	1293	*Rajarshi*	29875	307	118	10 28	3 95	2 60
3	1309	*Chokher Bali*	54359	505	352	9 29	6 48	1 43
4	1312-1313	*Noukadubi*	64709	679	309	10 49	4 78	2 20
5	1316	*Gora*	122470	1119	472	9 14	3 85	2 37
6	1322	*Chaturanga*	17586	220	63	12 51	3 58	3 49
7	1322	*Ghare Baire*	54019	1041	168	19 27	3 11	6 20
8	1329	*Lipika*	18348	102	44	5 56	2 40	2 32
9	1336	*Jogajog*	56766	241	175	4 25	3 08	1 38
10	1336	*Shesher Kabita*	26533	114	123	4 30	4 64	0 93
11	1339	*Dui Bon*	13816	43	29	3 11	2 10	1 48
12	1340	*Malancha*	12393	123	106	9.92	8 55	1 16
13	1341	*Char Adhyay*	15815	133	110	8 41	6 96	1 21
14	1344	*Se*	19329	187	112	9 67	5 79	1 67
15	1291-1300	*Galpaguchha, 1st part*	65161	426	126	6 47	1 91	3 38
16	1301-1309	*Galpaguchha, 2nd part*	99285	679	200	6 84	2 01	3 40
17	1310-1340	*Galpaguchha, 3rd part*	87783	974	262	11 10	2 98	3 72
18	Before 1291 & after 1340	*Galpaguchha, 4th part*	68598	509	267	7 42	3 89	1 91
	Total		**863313**	**7737**	**3147**	**8.96**	**3.65**	**2.46**

এই ছোট্ট ঘটনাটিতে তাঁর রসবোধের সঙ্গে সঙ্গে আপন কর্মনিষ্ঠায যে প্রচ্ছন্ন গৌরববোধটির আভাস পাওয়া যায় তা অতুলনীয়।

প্রশান্তবাবুর লাজুক স্বভাবের একটু গল্প বলি। ১৯২৮-২৯ সালে কার্সিয়ঙে গ্রীষ্মযাপনে গিয়েছি আমাব বাবার সঙ্গে। কার্সিয়ঙ থেকে আমরা মাঝেমাঝে দার্জিলিঙে বেড়াতে যেতাম। কবি তখন দার্জিলিঙে। কবির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বেয়ারা খবর নিয়ে গেল। বাইরের প্রশস্ত ড্রয়িংরূপে প্রশান্তবাবু ভিতরদিক থেকে বেরিয়ে এসে দরজার মুখে দর্শনার্থিনী দেখে বেশ একটু অপ্রতিভভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন—'গুরুদেব একটু বাইরে বেরিয়েছেন।' তারপর নতচক্ষে একখানি গদীআঁটা চেয়ার নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। তাঁর নির্বাক ভঙ্গিতে মনে হলো আমাকেই বসার জন্য বোধহয় ইঙ্গিত করছেন। আমিও তখন মোটে চটপটে নই, পর্দানশীন ঘরের মেয়ে। বসবো কি বসবো না দোলায়িতচিত্তে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে, হলঘরের কোণে দূরে নতচক্ষু, নম্রমুখশ্রী, দীর্ঘদেহ যুবকটির দিকে চকিতমাত্র দৃষ্টিপাত করে কোনোরকমে অস্পষ্ট কণ্ঠে 'আচ্ছা, আমি আজ যাই' বলে আস্তে আস্তে পিঠটান দিলাম।

এখনও আমার হাসি পায় তাঁর সেই শূন্য বাড়িতে অপরিচিতা তরুণীকে অভ্যর্থনা করার বিব্রত সৌজন্যের নির্বাক অভিব্যক্তি যখন মনে পড়ে।

Use of 'Ami' (I) and 'Tumi' (You) and total number of words in the following books by 'Sal' (Bengali era)

BANKIMCHANDRA

Sl No.	Sal A D	Name of books	Total number of words used	use of 'ami'	Use of 'tumi'	per thousand 'ami'/'tumi'		Ratio of ami/tumi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1865	*Durgesnandini*	33785	217	173	6 42	5 12	1 25
2	1866	*Kapalkundala*	19382	107	88	5 52	4.54	1 22
3.	1869	*Mrinalini*	25069	309	213	12 33	8 50	1 45
4	1873	*Indira*	18586	424	101	22 81	5 43	4 20
5	1873	*Bishbriksha*	35248	321	193	9 11	5 48	1 66
6	1874	*Jugalanguria*	4030	57	28	14 14	6 95	2 04
7	1875	*Chandrasekhar*	30335	260	185	8 57	6 10	1 41
8	1875	*Radharani*	5624	61	18	10 85	3 20	3 39
9	1877	*Rajani*	19390	503	190	25 98	9.80	2 65
10	1878	*Krishnakanter Will*	27410	267	143	9 74	5.22	1 87
11	1882	*Rajsingha*	41559	432	207	10 39	4 98	2 09
12	1882	*Anandamath*	28472	240	186	8 43	6.53	1 29
13	1884	*Debi Chowdhurani*	33108	357	211	10 78	6 37	1 69
14	1887	*Sitaram*	38360	331	168	8 63	4 38	1 97
	Total		**360358**	**3886**	**2104**	**10.78**	**5.84**	**1.85**

আর একবার মজা হয়েছিল। বরানগরে শশীভিলাতে কবির নতুন রচনা পড়া হচ্ছে। 'দুই বোন' কিংবা 'মালঞ্চ' ঠিক মনে পড়ছে না। আমরা শ্রোতারা, কলকাতার সাহিত্যিকরা, রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশিষ্ট রসিকরা আর মহিলাপুঞ্জ জমা হয়েছি দোতলার প্রশস্ত ঘর ভর্তি করে। কবি নিজে পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাচ্ছেন। মন্ত্রমোহিত নিস্তব্ধ ঘরে শুধু কবির বীণার তারের মতো কণ্ঠধ্বনি বাজছে। গল্পের পাত্রপাত্রীদের সংলাপগুলি তাঁর কণ্ঠে নাট্যশিল্পের রসে জীবন্ত প্রাণময় হয়ে উঠছে। পড়া শেষ হলো। তারপরে আলোচনা চললো অল্পক্ষণ। কবিকে প্রণাম করে সকলে উঠে আসছি। নিচে নেমে, একতলায় দেখা গেল টেবিলের ওপর দুখানি বড় ট্রে-ভর্তি স্তূপীকৃত প্রচুর উৎকৃষ্ট সন্দেশ। অতিথিদের মিষ্টিমুখের জন্য। প্রশান্তবাবু সেখানে বিনীত হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। পাশে ট্রেতে অনেক কাচের গ্লাস ভর্তি জল আর জলভর্তি কাচের জাগ। তাঁর মুখে কোনও কথা নেই, কিন্তু মুখের ভাবে 'একটু মিষ্টিমুখ করে যান' প্রকাশিত। আমার স্বামী হেসে বললেন—'গৃহস্বামী সন্দেশের পাহারাদার না সন্দেশের সদ্ব্যবহারপ্রার্থী, বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু।' অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে ব্যগ্র মৃদুকণ্ঠে বললেন —'সব্বাই যে চলে যাচ্ছেন, আপনি একটু ওঁদের বলুন না—'

আমার স্বামী হেসে উঠে অতিথিদের ডাকলেন—'ওহে,—তোমরা সন্দেশের

পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছো কিরকম? এখানে সম্মান না দিয়ে চলে গেলে অসৌজন্য হবে না কি?'

অনেকেই হাসতে হাসতে হৈ হৈ করে ফিরে এসে টেবিল ঘিরে দাঁড়ালেন। জমে উঠলো কৌতুক রঙ্গপরিহাসের ক্ষুদ্র চক্র। প্রশান্তচন্দ্রও তাঁদের বক্তব্য ও উত্তর-প্রত্যুত্তরের পালায় প্রসন্নহাস্যে মৃদুকণ্ঠে যোগ দিলেন। একটু বাদেই নেমে এলেন ডঃ কালিদাস নাগ, অমল হোম, জীবনময় রায়। ওঁরা এসে টেবিল ঘিরে দাঁড়াতে মনে হলো প্রশান্তবাবু যেন হাঁফ্ ছেড়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠলেন। অন্তরঙ্গ হাসি পরিহাস ভালো করে জমে উঠলো। অপরিচিত অতিথিদের প্রতি আড়ষ্টভাব কেটে গেল।

বরানগরে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে প্রশান্তচন্দ্রের সত্তর বৎসর পূর্তির জন্মোৎসব করেছিলেন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক, ছাত্র ও কর্মীরা আর তাঁর অনুরাগী বন্ধু কয়েকজন। মনোরম অনুষ্ঠান হয়েছিল। অতি সুন্দর। প্রকাণ্ড সবুজ লন ভর্তি তাঁর বন্ধুবান্ধব অনুরাগীবৃন্দ দেশী বিদেশী অনেক মানুষ। আমরাও স্বামীস্ত্রী নিমন্ত্রিত। যুঁইফুলের দু'গাছি গোড়েমালা নিয়ে গেছি আমরা ওঁদের দুজনের জন্য। রাণীদির গলায় মালাগাছি পরিয়ে দিলে খোলাগলায় হেসে উঠে রাণীদি সকৌতুকে বললেন —'তারপর?' চোখের ইসারায় দ্বিতীয় মালাগাছির দিকে তাকিয়ে বললেন—'এইবার দেখি দ্বিতীয় মালাটি কেমন পরানো হয়'—

আমি হেসে আমার স্বামীর হাতে মালা তুলে দিয়ে বললাম—'তুমি এটা প্রশান্তবাবুকে পরিয়ে দাও। ওঁকে নিয়ে এমন চমৎকার উৎসব, গলায় ওঁর মালা নেই, এটা মানাচ্ছে না।'

রাণীদি তেমনি ঝর্ণার কল্লোলে উচ্ছসিত হাসতে হাসতে বললেন—'হ্যাঁ, আমরাও একবার দেখি।'

প্রশান্তবাবু দূরে ছিলেন, আমার স্বামী মালা হাতে তাঁর দিকে এগিয়ে চলেছেন দেখে, ব্যস্ত হয়ে নিজেই তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন এবং বেশ কিছুটা দূর থেকেই আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে তাঁর হাত থেকে খপ করে মালাগাছি নিয়ে নিলেন, পাছে গলায় এসে পড়ে। এদিকে সে দৃশ্যে রাণীদি তখন হেসে কুটিপাটি। স্মিত মুখে প্রশান্তচন্দ্র ততক্ষণে মালাগাছি নিজের বাঁ হাতে জড়িয়ে ফেলেছেন বিজয়ীর ভঙ্গিতে। রাণীদি বললেন—'এত লোকের সামনে গলায় মালা পরে দাঁড়াবার মানুষই বটে। মালাপরা জীবনে সেই একবার মাত্রই হয়ে গেছে। চুকে গেছে।'

এই প্রশান্তচন্দ্রের ঘরোয়া ছবি। বিখ্যাত অবিখ্যাত ছোটো বড়ো শতশত মানুষের মধ্যে ফুলের মালা গলায় পরে দাঁড়ানো তাঁর পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু, ভালোবেসে আনা মালা তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করতে জানতেন। চরিত্রের এই সম্মিতি তাঁর মানবিক মহত্ত্বের একটি জরুরী দিক।

সংবাদধবম্, ১২ জুন, ১৯৭৪

শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র

সময়টা উনিশশো চৌত্রিশ থেকে সাঁইত্রিশেব মধ্যে হবে। সঠিক সন-তাবিখ আমাব মনে নেই। একদিন বিকেলবেলায আমবা দুজনে অশ্বিনী দত্ত বোডে শবৎদাব কাছে বেডাতে গেছি—দেখি তিনি সেজেগুজে চুল আঁচড়ে, কোট পবে লাঠি হাতে নিয়ে একতলাব বৈঠকখানায ইজিচেযাবে বসে আছেন। অচিবেই কোথাও বেরুবাব জন্যে তৈবী।

আমাদেব আসতে দেখে ব্যস্তসমস্ত হযে বললেন,—'তাই তো, তোমবা এখন এলে। মুশকিল হলো, আমি যে এখুনি বেরুচ্চি। একটা জরুবী মীটিং-এ যেতেই হবে, সুভাষ এখুনি এসে পডবে, আমাকে নিযে যাচ্চে সে। তোমবা এলে, অথচ আমি থাকতে পাবচি না—'

শবৎদাকে ব্যস্ত হযে পডতে দেখে আমাব স্বামী বললেন—'তাতে কি হযেছে! বিকেলে আজ কোথাও যাবাব ছিল না, তাই এলুম। কোনো কাজে তো আসিনি। আপনি যেমন যাচ্চেন যান, আমবা অন্য কোথাও ঘুবে আসি।' তখন শবৎদা বললেন —'তা হলে যতক্ষণ সুভাষ না আসে, ততক্ষণ অন্ততঃ বোসো।'

আমবা বসলুম। গল্প কবতে কবতেই গেটেব সামনে মোটব এসে দাঁড়ালো। গাড়ীব দোব খুলে নামলেন সুভাষচন্দ্র। শবৎদা ভীষণ ব্যস্ত হযে দৌড়ে গেলেন —'আবে আবে সুভাষ, তুমি কেন নামলে, তুমি কেন নামলে, আমি তো বেডি! একদম বেডি হযেই বসে আছি তোমাব জন্যে। তুমি আবাব কষ্ট কবে নেমে আসচো কেন—আমি তো যাচ্চিই।'

শবৎদাব অতিবিক্ত ব্যস্ততায সুভাষচন্দ্র একটু বিব্রত বোধ কবলেন বলে মনে হলো। মুখে বললেন—'আমি একটু জল খেতে নামলুম দাদা!' শবৎদাব তখন আবও ব্যস্ততা বৃদ্ধি পেলো। এক গ্লাস জলেব জন্য চেঁচামেচি ছুটোছুটি শুরু কবে দিলেন। অন্দবেব দিক থেকে জল আনতে নিজেই ছুটলেন। তাঁকে নিবৃত্ত কবতে আমি গেলাম জলেব ব্যবস্থায। জল এলো। শবৎচন্দ্র আব সুভাষচন্দ্র ততক্ষণে বৈঠকখানায বসে কংগ্রেসেব তৎকালীন সমস্যা নিযে জরুবী আলোচনায ডুবে গেছেন, প্রদেশ কংগ্রেসেব ভিতবে তখন বেশ উত্তেজনাপূর্ণ সময চলছে। শবৎদাব বিচলিত কণ্ঠে সেই দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, উত্তেজনা প্রতিফলিত হচ্ছে। সুভাষচন্দ্রেব মুখেব ভাবটি কিন্তু যেমন প্রশান্ত, তাঁব বাচনভঙ্গিও তেমনি সুস্থিব, অনুত্তেজিত। তিনি স্মিত মুখে, শান্ত স্ববে আলোচনা কবে চলেছেন। শবৎদাব অঙ্গভঙ্গিতে, মুখাবযবে, কণ্ঠস্ববে সর্বতঃ চাঞ্চল্য পবিস্ফুট।

বযস্ক মানুষটিব অনুপাতে অল্পবযসী মানুষটিকেই বেশী স্বস্থ, শান্ত দেখে সেদিন আমাদেব যেন একটু লজ্জাই কবতে লাগলো। কিন্তু শবৎদাব কোনদিকে দৃকপাত

নেই। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তিনি এমন ভাবে বাক্যালাপ করছেন যেন তিনি একটি ছোট, সামান্য দীনহীন ব্যক্তি, সুভাষচন্দ্রের মতো মহৎ নেতাব সান্নিধ্যে আসতে পেয়ে ধন্য হয়েছেন। এই বিসদৃশ আচরণ যে কেবল আমাদের মতো নীরব দর্শকদের পক্ষেই অস্বস্তিজনক ঠেকেছিল তা নয়; সুভাষচন্দ্রকেও কম পীড়িত করছিল না শরৎচন্দ্রের এই আত্মহারা কাণ্ডজ্ঞানহীনতা। কনিষ্ঠের প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধায় তিনি নিজের বয়স ও পদের মর্যাদা বিস্মৃত হয়েছিলেন।

সামাজিক রীতিনীতির চিরাচরিত মানদণ্ডটি শরৎচন্দ্রের স্বভাবের ধারে-কাছেও স্থান পায়নি। লেখক হিসেবে তাঁর হীনমন্যতা ছিল না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো লেখকের চেয়ে তিনি নিজেকে নিম্নজ্ঞান কবতেন না। কিন্তু জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যাঁরা সার্থক ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন—তাঁদের প্রত্যেকের তুলনাতেই শরৎচন্দ্র নিজেকে তুচ্ছ, দীনাতিদীন অনুভব করতেন, এ জন্যে আমাদের মনে দুঃখ ও ক্ষোভের অন্ত ছিল না।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তুলনা করা অর্থহীন। সুভাষচন্দ্রের স্বীয় ক্ষেত্রে তাঁর মহত্ত্বের বীর্যের নিশ্চয় তুলনা খুঁজতে যাবো না। কিন্তু, শরৎদার ক্ষেত্র তো ভিন্ন। সেখানে তিনিও ছিলেন অনন্য। অথচ নিজেকে তিনি সেদিন সুভাষচন্দ্রের কাছে যেভাবে স্বেচ্ছায় নীচে নামিয়ে রাখছিলেন, তাতে সুভাষচন্দ্রেরও যথেষ্ট অস্বস্তি ও সংকোচের কারণ ঘটেছিল। সুভাষচন্দ্রের ভদ্র বিনীত আচরণে সেই অস্বস্তি চাপা ছিল না। জল পাওয়ার পরে আরও কযেক মিনিট রাজনীতি আলোচনা করে ওঁবা দুজনে উঠতে গেলেন গাড়ীতে। শরৎদা সমানেই সুভাষচন্দ্রকে প্রথমে গাড়ীতে ওঠার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন,—প্রায় সেই প্রবাদ-কথিত লক্ষ্ণৌয়ের লৌকিকতার মতোই দেখাতে লাগলো ব্যাপারটা। শেষ পর্যন্ত গাড়ীতে দুজনে উপবিষ্ট হলেন, গাড়ীটি রওনা হয়ে গেল।

এই ঘটনাটি পরে আমরা স্বামী-স্ত্রীতে অনেকবার আলোচনা করেছি। দুজনের চরিত্রের আশ্চর্য বৈপরীত্য এমন ফুটে উঠেছিল সেদিন, সেই বিকেলের আচরণে। একজন সংযত, ধীর-স্থির—অথচ তিনিই কর্মব্যস্ত, সক্রিয় সৈনিক। অন্যজন বাহ্যত অস্থির, চঞ্চল—কার্যতঃ যদিও তিনি ধ্যানী, শিল্প-তপস্বী।

জয়শ্রী, আশ্বিন ১৩৮২

পুজোর স্মৃতি

আমার ছেলেবেলা, কৈশোর কেটেছে উত্তরবঙ্গে। চারদিকে নদী, মাঝখানে একটা দ্বীপ যেন, সেখানে আমরা থাকতাম। জায়গার নাম মাথাভাঙা। বাবা ছিলেন জেলার হাকিম। আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি গ্রামের হাটে দুর্গাঠাকুর। মাটির প্রতিমা, একচালার। পেছনে সুন্দর চালচিত্র। ধূপ-ধুনোয় দেবীমূর্তির চেহারাই যেত বদলে। ঢাকি, ঢাকের বাদ্যি, পুরোহিত, তন্ত্রধারকদের গমগমে গলায় মন্ত্রপাঠ, সব মিলিয়ে দারুণ। সবাই নতুন জামা-কাপড় পরত। আমরাও। কলকাতা থেকে পার্সেলে শাড়ি আসত আমাদের, ডুরে পাড়, রঙিন সুতোয় বোনা শান্তিপুরি। কলকাতা থেকে আত্মীয়রা পাঠাতেন। একখানি করেই শাড়ি হত আমাদের, তা নিয়েই কত আনন্দ। চারদিন ধরে সেই শাড়ি পরেই ঘোরা। আবার বাড়ি এসে সেটাকে সুন্দর পাট করে গুছিয়ে রাখা। আরও ছেলেবেলায় আসত পাছাপেড়ে শাড়ি। ভাইয়েদের জন্যে নতুন ধুতি। আর আসত কলকাতা থেকে নতুন জুতো। পায়ের মাপ-ছাপ তুলে পাঠানো হত, তারপর পার্সেলে চলে আসত জুতো। সারা বছর অবশ্য আমরা আশপাশের দিশি মুচিদের তৈরি জুতো কিনতাম। এমনি সময়, আর পুজোতেও মা খুব চওড়া পাড়, শাদা শাড়ি পরতেন।

পুজোর আগে আগে বাবা বস্তা বোঝাই ধুতি শাড়ি আনতেন। কালো পাড় শাড়ি, নরুন পাড় ধুতি, থান—সবই আসত। বাড়ির চাকর-বাকররা সেই কাপড় তো পেতই, ঢাকি-ঢুলি, মুচি-মেথর সবাই পেত সেই কাপড়। আমাদের বাড়ি এক হিন্দুস্তানি মহিলা ডাল ভাঙতেন যাঁতায়। লঙ্কা ধুয়ে মাচায় শুকিয়ে গুঁড়িয়ে নেয়া হত, তিনিই সেসব করতেন। ডালভাঙানি সেই মহিলাও কাপড় পেতেন। আমাদের বাড়ির যিনি দাই ছিলেন, পুজোয় তিনিও নতুন কাপড় পেতেন। বাড়ির কাজের লোকেদের কাপড় মা হলুদ বা গোলাপি রঙে ছুপিয়ে দিতেন। যাতে রঙিন, বর্ণালী হয়ে ওঠে পুজোর দিনগুলি।

তখন, সেইসব পুজোর দিনে, আমরা খুশি থাকতাম একটা শাড়িতেই। অথচ এ-যুগে দেখি জামার ওপর জামা, শাড়ির ওপর শাড়ি, পোশাকের ওপর পোশাক, অথচ কারুর মুখেই সেই হাসির ঝলক নেই, যা আমরা দেখেছি ছোটবেলায়। আমাদের বাল্যবয়সে বাড়ির কাজের লোকেদেরও কোনো জিনিস দিলে তারা কত খুশি হত। এখন সব একেবারে বদলে গেছে।

হাটের পুজো ছাড়াও পুজো হত জোতদারদের বাড়ি। সকলের নেমন্তন্ন হত, আমাদেরও। আমরা যেতাম না। সে বাড়ি থেকে সিধে আসত। বড় রুই মাছ, গলায় দড়ি বাঁধা আস্ত পাঁঠা, চ্যাঙারি বোঝাই খাবার-দাবার, ঝুড়িভর্তি লাউ-কুমড়ো। কোনো কোনো সময় মোকদ্দমা তদ্‌বিরের জন্যেও এসব জিনিস পাঠাত বড়লোকেরা। বাবা বলেই দিয়েছিলেন মাকে—তাঁকে না জিজ্ঞেস করে যেন কখনোও কিছু ঘরে

না তোলা হয়। মা তাই বাইরে থেকে আসা কোনো জিনিস ছুঁতেন না। অনেক সময়েই বাবার কথামতো এসব ফেরত যেত, যেখান থেকে এসেছে সেখানেই। আর যারা মোকদ্দমা তদ্‌বিরের জন্যে ভেট পাঠাত, তাদের কেস আরও খারাপ হয়ে যেত।

হাটে পুজোর সময় যাত্রা হত, পুতুলনাচ, কবিগান। অনেক রাতে কবিগানের আসর। রাত গভীর হয়ে গেলে দেখা হত না। তখনকার কুচবিহার স্টেটের রাজার আরাধ্য দেবতা মদনমোহন। প্রতি মহকুমায় মদনমোহনের মন্দির আছে। তার সামনেও যাত্রা দেখেছি। শরৎদার (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) জন্ম শতবার্ষিকীতে আমায় নিয়ে গেছিল উত্তরবঙ্গে। মাথাভাঙায় নিয়ে যাবে, এই শর্তে গেছিলাম। বহুদিন বাদে কত চেনা জায়গা! সেইসব পরিচিত মানুষেরা অনেকেই নেই, তাঁদের ছেলেরা এসেছে, নাতিরা এসেছে। কি খাতির আমাকে!

মাথাভাঙায় পুজোব সময় যাত্রা হত বাড়ির সামনের হলে। মা, দিদি, ডাক্তারবাবু, উকিলবাবুর বৌরা বসতেন চিকের আড়ালে। যাত্রা দেখতে দেখতে কারোর কোলের বাচ্চা কেঁদে উঠলেই চলে আসতেন আমাদের বাড়ির ভেতরে। আমাদের বাড়িতে এই কদিন বড় কড়াইয়ে দুধ জ্বাল দিয়ে রাখা হত। ঐ দুধ খেতে দেয়া হত বাচ্চাদের। বাচ্চাকে খাইয়ে, চুপ করিয়ে, মায়েরা আবার এসে বসতেন চিকের আড়ালে যাত্রা দেখতে।

মাথাভাঙায় পুজোর সময় হাতি চড়ে বেড়াতাম আমরা ছ-ভাই ছ-বোন। শুঁড় বেয়ে উঠতাম পিঠে। বাবার টমটমও ছিল। মা খুব পবিশ্রম করতেন। আমাদের তেমনভাবে দেখাশুনা করতে পারতেন না। আমরা মানুষ হযেছি ঝি-মাসির কাছে। তার নাম ছিল তুলসীমঞ্জরী। বয়েস হয়ে যাওয়ার পর কাশী যেতে চেয়েছিল তুলসীমঞ্জরী, বাবা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। খুব ভালোবাসত আমার সেজো ভাইকে। তুলসীমঞ্জরী কলকাতায় এসে মারা যায়। আমার ভাইয়েরা চারদিন পর গঙ্গাঘাটে তার শ্রাদ্ধ করে, এই কদিন তারা মাছ খায়নি। কত যে মার খেয়েছি তুলসীমঞ্জরীর হাতে।

কলকাতায় হাটখোলার বিখ্যাত দত্তবাড়ি ছিল আমার মামাবাড়ি। সে বাড়িতে ধূমধামের পুজো হত। আমি অবশ্য সেই পুজো দেখিনি। বিয়ের পর সিঙ্গুরে মামাশ্বশুর সুরেন মল্লিকের বাড়ি দুর্গাপুজোয় গেছি। বাড়ির আটচালায় পুজো হত। একচালির ঠাকুর। অনেক লোকজন খেত। পেটপুরে খেত সমস্ত প্রজারা। দীয়তাং ভুজ্যতাং বলে যে কথাটা চালু আছে, তা এখানে এসে দেখেছি। মাথাভাঙাতেও দেখেছি খাওয়া-দাওয়ার মেলা। মাথাভাঙায় আমাদের বাড়িতে কোনো কাজ হলে রাজবংশী কোচেরা এসে ভেজা চিঁড়ের সঙ্গে টক দই মেখে খুব আনন্দের সঙ্গে খেত। তার সঙ্গে আবার শুকনো লঙ্কা। শেষে শুকনো গুড়। সিঙ্গুরে মামাশ্বশুর বাড়ি দুর্গাপুজোয় নারকেলের শাদা নাড়ু হত। ক্ষীরের নাড়ুও। হাঁড়ি ভর্তি ভর্তি রসকড়া তৈরি হত

বাড়িতেই। খাওয়ার আয়োজনে প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু রকমারি ছিল না।

বিয়ের পর কলকাতায় এসে কেনাকাটার এত ঘটা দেখিনি। যা কেনার পুরুষমানুষরাই কিনে আনতেন। আমরা পেতাম, ব্যবহার করতাম। তখন যা পেয়েছি, তাতেই আনন্দ। যে কোনো নতুন জিনিস পেলেই বিস্মিত হতাম। এখনকার ছেলেমেয়েরা কোনো ব্যাপারেই অবাক হয় না। এটা বোধহয় ভালো নয়।

বিজয়ার পর রাস্তায় একজন পুরুষমানুষ অন্য পরিচিত পুরুষমানুষকে দেখলেই আলিঙ্গনাবদ্ধ হতেন। এখন এ দৃশ্য দেখি না। মেয়েরা ঘরে খাবার তৈরি করত। ক্ষীরের নাড়ু, নারকেলের নাড়ু, সিঙাড়া। বড়লোকের বাড়ি বড়লোকি খাবার, গেরস্তের ঘরে গেরস্ত খাবার। এখন সেসব আর চোখে পড়ে না। আর হত বিজয়া সম্মিলনী।

আমি প্রথম যে পুজোসংখ্যায় লিখি, তার নাম 'শরতের ফুল'। বের করেছিলেন নলিনী পণ্ডিত। আমার গল্পের নাম ছিল 'মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য'। মফস্বল শহরের কোনো সমৃদ্ধ লাইব্রেরিতে গেলে এখনও সেইসব সংখ্যা বাঁধানো পাওয়া যেতে পারে। 'নিরুপমা বর্ষস্মৃতি' নামে একটা শারদীয় সংখ্যা বেরত, তাতে গল্প লিখেছি। 'বসুমতী শারদীয়া'তেও। জাহানারা চৌধুরী বার করতেন 'বর্ষবাণী', তার বিশেষ সংখ্যা বেরত পুজোর সময়েই, তাতেও লিখেছি।

তখনকার লেখকরা লিখে পয়সা পেতেন না, এমন-কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও না। আজকাল মন খুব খারাপ হয়ে যায়, যখন দেখি চারপাশে বাণিজ্যিক সাহিত্যের ছড়াছড়ি। তখনকার দিনে অন্যকে বড় করে দেখানো, অন্যকে ভালো বলে তুলে ধরার একটা রীতি ছিল, এখন তা নেই।

দুঃখ হয় এই দেখে, আজকাল লেখক এবং প্রকাশক উভয়েই অর্থের জন্যে সাহিত্য লেখেন, সাহিত্য ছাপান। আমরা দেখেছি তখন সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি ছিল প্রকাশকের। লেখক হিসেবে অখ্যাত শরৎচন্দ্রকে বর্মা থেকে জাহাজ ভাড়া দিয়ে, তাঁর সব ধার শোধ করে নিয়ে আসেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। মাসে একশো টাকা মাসোহারা দেয়া হত শরৎদাকে, ওঁদের পাবলিশিং হাউস থেকে। কোথায় গেল সেসব দিন!

প্রতিক্ষণ, ২-১৬ অক্টোবর ১৯৮৫

বাদ-প্রতিবাদ

'নারী বিদ্রোহের মূল'

(প্রতিবাদ)

বিগত ১৪ই ভাদ্র ৭ম সংখ্যক 'নবযুগ' সাপ্তাহিকে জনৈক 'পুরুষ' কর্ত্তৃক যে "নারী বিদ্রোহের মূল" লিখিত বা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিচারে মানিয়া লওয়া বোধহয় প্রত্যেক নারীর পক্ষে একটু অসম্ভব, তাই এই প্রতিবাদের অবতারণা।

'পুরুষ' নারী-বিদ্রোহের মূল কারণ যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নারীজাতির পক্ষে কতদূর যে মিথ্যা কলঙ্কাভিযোগ এবং অপমানকর বিষয়, তাহা যদি লেখক মহাশয় কিছুমাত্রও বুঝিতে সমর্থ হইতেন তাহা হইলে নিজের মাতৃজাতি সম্বন্ধে এইরূপ নীচোক্তি কখনও তাঁহার লেখনীমুখে প্রকাশ করিতেন না। তিনি যে নারীচরিত্র ও নারীজাতির প্রকৃত স্বরূপ কিছুই অবগত নহেন সেটা তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তি হইতে স্পষ্ট ধরা পড়ে। তিনি বলিতেছেন : 'আধুনিক নারী-বিদ্রোহের কারণ হচ্ছে, আজীবন এক-পতিত্ব-ব্রত পালন করা ও পতির বহু নারী সংস্পর্শে বাধা দিবার ক্ষমতাহীনতা। আঘাতের প্রত্যুত্তরে আঘাত দিবার ক্ষমতা না থাকায়, সমগ্র নারীজাতির মধ্যে আজ বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে—বিশেষতঃ, এই বঙ্গদেশের হিন্দু-সমাজ, যেখানে বিধবা বিবাহ, বিবাহচ্ছেদ, স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণের রীতি এখনও সুপ্রচলিত হয় নাই।' 'পুরুষ' (?) তাঁর এই কদর্য্যোক্তি দ্বারা সমগ্র নারীজাতিকে এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের হিন্দুনারীকে প্রকাশ্যভাবে অপমান করিয়াছেন।

শুধু ইহাই নহে, 'পুরুষ' লিখিত এই "নারী-বিদ্রোহের মূল" প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত সারহীন ও যুক্তিশূন্য তো বটেই, অধিকন্তু কেবলমাত্র স্বার্থ-সঞ্জাত গোঁড়ামি এবং নকল পুরুষত্বের গর্ব্ব ও অহঙ্কার প্রসূত বলিযা মনে হয়। অধ্যাপক এ. আর. ওয়াদিয়ার *The Ethics of Feminism*-এর চর্ব্বিত-চর্ব্বণও খানিকটা নজরে পড়ে।—

'পুরুষ' বলিতেছেন,—'বাস্তব-জগতে যে সমস্ত নরনারী আমরা দেখি, তন্মধ্যে আদর্শ নর বা আদর্শ নারীর অস্তিত্ব এত অল্প যে তাহা গণনার বহির্ভূত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।' ইহা পাঠে সকলেরই বোধহয় হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর হইবে। কেননা 'আদর্শ' যে কোনওদিনই বাস্তব হয় না এবং যদি দৈবাৎ কখনও বাস্তব হইয়া পড়ে তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সে যে আর 'আদর্শ' থাকে না এ-কথা বোধহয় উক্ত লেখক ছাড়া আর সকলেরই জানা আছে!

'আদর্শই' সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল কারণ। আদর্শই মানবকে দেবতায় পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। এক একটি জাতিকে, এক একটি বিষয়ে উন্নত ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিতে সাহায্য করে সেই জাতির আদর্শ।

এ দেশের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই গর্ব্ব করিয়া থাকেন, ভারতীয় হিন্দুনারী সতীত্বে ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মে জগতে শীর্ষস্থানীয়া অতুলনীয়া। ইহা যদি সত্যই হয়, তাহা হইলে

কি স্বীকার করিতে হইবে না, এই সতীত্বের প্রধান এবং মূল কারণ, আমাদের দেশের সতী-আদর্শ বা পাতিব্রত্য দৃষ্টান্ত। সতীর দেহত্যাগ, গৌরীর তপস্যা, রতি শচী লক্ষ্মী প্রভৃতি স্বর্গের দেবীগণের পাতিব্রত্য-দৃষ্টান্ত ও সেই সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ দেবতাগণের বহু-পতীত্ব, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র চন্দ্রাদির স্বেচ্ছাচারিতা লাম্পট্য ও কামুকতার দৃষ্টান্ত বা আদর্শই, হিন্দুনারীকে পুরাকাল হইতে, যোগ্য বা অযোগ্য পতির সর্ব্বপ্রকার স্বেচ্ছচারিতা লাম্পট্য অনাচার ও অত্যাচার সহ্য করিবার অটল ক্ষমতা প্রদান করিয়া, নির্ব্বিবাদ ও নির্ব্বিচার পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে বা পতিভক্তিতে অবিচলিতা রাখে নাই কি? পৌরাণিক সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভদ্রা, চিন্তা, গান্ধারী, অরুন্ধতী, শর্ম্মিষ্ঠা, বেহুলা এবং আরও শত শত রাজকন্যা ঋষিকন্যা ঋষিপত্নীদিগের বিস্ময়কর মহান সতীত্ব দৃষ্টান্ত অতি শিশুকাল হইতে, জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুনারীর চিত্তমধ্যে প্রতিফলিত এবং সুগভীর বিশ্বাসের উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া, একনিষ্ঠ বিচার-বিহীন পতিভক্তিতে আবহমানকাল তাহাদের অটল রাখে নাই কি?

পত্নীর সর্ব্বপ্রকার প্রাপ্যদানে অসমর্থ বা বিমুখ স্বামী, প্রেমহীন নিষ্ঠুর স্বামী, দুর্দান্ত মদ্যপ লম্পট স্বামী, পাশব-প্রকৃতি নিষ্ঠুর স্বামী, কুৎসিত দর্শন, কদর্য্য বোগগ্রস্ত স্বামী, কিম্বা এককালীন বহুপত্নীক বা পিতামহতুল্য জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ স্বামীকে এদেশের হিন্দুনারীগণ বিচার-বিহীন হইয়া নির্ব্বিবাদে সর্ব্বপ্রকারে মানিয়া চলিয়া, পাতিব্রত্য অথবা সতীধর্ম্ম যে অক্ষুণ্ন রাখিয়া থাকেন, তাহারও প্রধান ও মূল কাবণ, ওই পূর্ব্বতন সতীগণের আদর্শের প্রভাব নয় কি? প্রতীচ্যের ইতিহাসে, নারীগণেব তেজস্বিতা, বুদ্ধিমত্তা, পুরুষ-সুলভ কঠোব শ্রমসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত অধিক, সুতবাং আদর্শানুযায়ীই পাশ্চাত্য দেশে নারীসমাজে ঐ সকল গুণগুলিই অধিক বর্ত্তিয়াছে।

'নবযুগে'র 'পুরুষ' তাঁহাদেব হস্তের ক্রীড়াপুত্তলী নারীগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, নাম-প্রকরণ করিয়াছেন—'মুগ্ধা', 'মধ্যা' ও 'প্রগলভা'। এই তিন শ্রেণীর নারী-সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিতেছেন—

'মুগ্ধা—নারীত্বের পূর্ণ প্রতীক। ইহারা পুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, পুরুষের আনুগত্য স্বীকার করে, গৃহের লক্ষ্মী-স্বরূপিণী হয়, সন্তানের জননী হইয়া, শান্তি ও সুখদায়িনীরূপে বিরাজমানা থাকে। মধ্যা—ইঁহারা মুগ্ধা চরিত্রের সহিত কিঞ্চিৎ ভাব-মিশ্রণে গঠিতা, ইঁহারা স্বল্প ক্রোধবতী, গীতানুরক্তা, সহচরী, সংসর্গকামিনী, কথোপকথনাভিলাষিণী, অথচ পুরুষের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীলা, এবং তাঁহারা সম্পূর্ণ বশ্যতা-স্বীকার না করিলেও, প্রায়শঃই পুরুষের বিরুদ্ধাচারিণী নহেন। প্রগল্‌ভা, —কলহপ্রিয়া, কর্কশভাষিণী, কঠিন হৃদয়া, পুরুষভাবাপন্না, বহুভাষিণী, পুরুষের প্রতিকূলচারিণী ;—এই শ্রেণীর নারীরাই স্বভাবতঃই স্বাধীনতাকামিনী হ'য়ে থাকেন এবং স্ত্রী-ভাবাপন্না পুরুষগণ ইহাদের সেই প্রবৃত্তি অনলে ইন্ধন জোগাইতে থাকেন।'

'পুরুষ' মহাশয় (স্বকপোলভাবিত শাস্ত্রমতে) কহিতেছেন যে, 'নারীত্বের পূর্ণ প্রতীক'—অর্থাৎ পরিপূর্ণ নারীত্বের প্রকাশ বা পরিণতি হইতেছে—পুরুষের নিকট

সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার এবং পুরুষের উপর পূর্ণ নির্ভরশীলতা! এ কথাটা এই নবযুগে শুনিতে একটু বিসদৃশ ঠেকিলেও 'পুরুষ' নাম-সহিযুক্ত প্রবন্ধের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণই উপযোগী হইয়াছে। সভা সমিতিতে ও বাহিরের পাঁচজনের সমক্ষে নারীজাতির উন্নতি সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া, গৃহ-প্রত্যাগত পুরুষেরা তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যে, ব্যবহারে, বাক্যে, নিয়মে ও শাসনে বঙ্গনারীর প্রতি যে বিধির প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এই 'পুরুষ' মহাশয় তাহাই লেখনীমুখে নগ্নভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তবে কয়েকটি কথা লেখকের নিকট জিজ্ঞাস্য আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তিনি এই কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিলে, বিশেষ বাধিতা হইব।

—১ম—মুগ্ধা চরিত্রই যদি 'নারীত্বের পূর্ণ প্রতীক' হয়, তাহা হইলে পুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা, এবং পুরুষের আনুগত্য স্বীকারই কি নারীত্বের পূর্ণ প্রতীক?

২য় প্রশ্ন—অপর দুই শ্রেণীর নারীগণ কি শান্তিসুখদায়িনী এমন-কি 'সন্তানের জননী'ও হ'য়েন না?—তবে কি কেবল পুরুষের আনুগত্য স্বীকার ও নির্ভরশীলতাই নারীকে সন্তানের জননীত্ব, গৃহলক্ষ্মীত্ব ও শান্তি সুখ প্রদানের ক্ষমতা দান করে? এবং পুরুষেব উপর পূর্ণ নির্ভরশীলা না হইলে নারী 'শান্তিসুখদায়িনী' বা 'সন্তানের জননী' হইতে পারেন না?

তাহার পর তিনি 'মধ্যা' চরিত্রের বর্ণনা করিয়াছেন, মধ্যা, আদর্শ নারী, বা নারীত্বের পূর্ণ প্রতীক নহে, সেইজন্যই বোধহয় 'মধ্যা' নাম দেওয়া হইয়াছে। 'গীতানুরক্তা' 'কথোপকথনাভিলাষিণী' এইগুলি তাঁর মতে নারীত্বের পূর্ণ প্রতীকেব সীমানার বহির্ভূত!!

সর্ব্বশেষে তিনি 'প্রগলভা' বা স্বাধীনতাভিলাষিণী নামে যাঁহাদের অভিহিত কবিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহার কেবলমাত্র একটি দিক লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চাহেন না; ত্রুটী, দুর্ব্বলতা, জড়ত্ব, পঙ্গুত্ব অপসারিত করিয়া, নারীত্বের পূর্ণ পবিণতি লাভে যাঁহার উৎসুক—সর্ব্বদিক দিয়া স্নিগ্ধ-কোমল-মধুর, স্নেহ-করুণ-পবিত্র, দৃপ্ত-মহিম-শক্তিশালিনী ও দীপ্ত-তেজোময়ী রূপে দেবী লক্ষ্মীর ঝাঁপি, অন্নপূর্ণার অন্নপাত্র, বাগদেবীর বীণা ও দনুজদলনীর কৃপাণ—এই চারিটিই যাঁহারা গ্রহণ করিয়া, নারীত্বের বা মাতৃত্বের পূর্ণতাভিলাষিণী তাঁহাদিগকে 'পুরুষ' 'কলহপ্রিয়া' 'কর্কশভাষিণী' 'কঠিন-হৃদয়া' 'বহুভাষিণী' এবং 'পুরুষভাবাপন্না' ও 'পুরুষের প্রতিকূলচারিণী' এই ছয়টি বিশেষণে বিভূষিতা করিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন,—'এই শ্রেণীর নারীরা স্বাধীনতা-কামিনী হইয়া থাকেন, আর স্ত্রীস্বভাবাপন্ন পুরুষগণ ইঁহাদের সেই প্রবৃত্তির অনলে ইন্ধন যোগাইতে থাকেন।' শেষোক্ত উক্তিটিই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান,—কারণ এই বাক্যদ্বারা সমগ্র পাশ্চাত্য দেশ, য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি আধুনিক সভ্য-জগতের পুরুষগণ সকলেই যে ভীষণতর স্ত্রীস্বভাবাপন্ন ইহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইতেছে! লেখক একজন মেধাবী 'পুরুষ' বটে!

তাহার পর লেখক বলিতেছেন,—'নারী-সমস্যায় পুরুষেরা নারীদের প্রতিকূলতা

বা প্রতিবন্ধকতার কারণ নহেন,—নারীজাতির মধ্যে যাঁহার মুগ্ধা, অর্থাৎ পূর্ণ নারী-ভাব বিশিষ্টা তাঁহারাই এই আন্দোলনের বিরুদ্ধাচারিণী না হইলেও, প্রতিবন্ধকতার মূল। আবার "মধ্যা" শ্রেণীরাও এই আন্দোলনে উৎসাহবতী নহেন, সুতরাং মাত্র প্রগল্‌ভা শ্রেণী দ্বারা,—যাঁহাদের সংখ্যা নারীজাতির তুলনায় অতি স্বল্প ভগ্নাংশমাত্র, —এই আন্দোলন সফলকাম হওয়া সম্ভবপর নহে।'

নারী-সমস্যার সমাধানে বা নারীদের সংস্কারের প্রতিবন্ধক যে কেবলমাত্র পুরুষই ইহা কেহ কোনওদিনই মনে করে নাই; সুতরাং তাঁহার এই উপযাচক হইয়া সাফাই গাহিবার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। তবে পুরুষ যে আদৌ প্রতিবন্ধক বা বাধাদায়ক নহেন তাঁর এ-কথাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। নারী যেমনভাবে নিজেদের জীবন গঠন করিতে বা যে ধারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক পুরুষের পক্ষে তাহা আপাততঃ সুবিধাজনক ও মনোমত নহে বলিয়াই তাঁহাদের তরফ হইতে 'নারী'দের 'অধিকার গ্রহণে' 'বাধা প্রদান'টা স্বার্থানুরোধে খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু লেখক 'পুরুষ' মহাশয় সংবাদ রাখেন কি, যে এই 'মুগ্ধা'-শ্রেণী নারীদের মধ্যেও অনেকখানি যুগধর্ম্ম বা কালের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে ও হইতেছে এবং হইবেও; ইহা আন্দোলনের অপেক্ষা রাখে না এবং এজন্য চেষ্টা চরিত্রের আবশ্যকতা হয় না। 'পুরুষ' যতই সাবধানে ইঁহাদের অশিক্ষিতা অবস্থায় 'দেবী' বা 'আদর্শ নারী' উপাধি দিয়া ঢাকিয়া রাখুন না, যুগের প্রভাব কোনওক্রমেই কাহাকেও অতিক্রম করিয়া যাইবে না এবং যাইতেছেও না ইহা সুনিশ্চিত। দীর্ঘকালের পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনীকে মুক্তি দিলেও সে আকাশে উড়িতে প্রথমটা ইতস্ততঃ করে, এমন-কি অনেকে তাঁহাদের পিঞ্জর ছাড়িয়া যাইতে ভয় পায়। 'মুগ্ধা'দের অবস্থা কতকটা তাই।

অবশেষে 'পুরুষ' লিখিয়াছেন,—'আমার মনে হয়, আজকাল, অন্ততঃ সহর অঞ্চলে নারীরা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা ভোগ কর্চ্ছেন এবং আজকালের পুরুষেরা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী কায়িক পরিশ্রম, মানসিক অস্বাচ্ছন্দতা ও সাংসারিক অশান্তির ভারে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং নারী স্বাধীনতার মূল ঐ সকল বাহ্যিক অবস্থা লইয়া নহে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পুরুষেরা কেবল এক বিষয়ে নারীদের চেয়ে বেশী স্বাধীনতা ভোগ করেন, সেটা হচ্ছে, বহুনারী-সংসর্গ, সেটা অবশ্য গর্হিত। কিন্তু নারীরা একপতিত্বে আজিও বাধ্য। যদিও অন্যান্য দেশে এই একপতিত্ব চিরস্থায়ী না হইয়া সাময়িকভাবে প্রযুক্ত হয়। সুতরাং ইহা সহজেই বুঝা যায়, আধুনিক নারী-বিদ্রোহের কারণ হচ্ছে একপতিত্ব ব্রত পালন করা ও পতির বহুনারী সংসর্গে বাধা দিবার ক্ষমতাহীনতা। আঘাতের প্রত্যুত্তরে আঘাত দিবার ক্ষমতা না থাকায়, সমগ্র নারীজাতির মধ্যে আজ বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে, —বিশেষতঃ, এই বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজ, যেখানে বিধবা বিবাহ, বিবাহচ্ছেদ, স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণের রীতি এখনও সুপ্রচলিত হয় নাই।'

এই 'পুরুষ প্রবর' বোধহয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে যে-দেশে সর্ব্বপ্রথম এই

নারী বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল সে-দেশের নারীসমাজ দাম্পত্য জীবনের কোনও সুবিধাই পুরুষের অপেক্ষা কম পায় নাই। তবু কেন তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম বিদ্রোহী হইয়াছেন? পুরুষ মানুষটির এই অজ্ঞতা হয়ত মার্জ্জনা করা যাইতে পারিত, কিন্তু তাঁর শোচনীয় অভদ্রতা একেবারেই অমার্জ্জনীয়। তিনি সমগ্র নারীজাতিকে এবং বিশিষ্টভাবে বঙ্গনারীকে তাঁরই নীচ কদর্য্য-ইঙ্গিতের দ্বারা কিরূপ অপমানিতা করিয়াছেন তাহা পুরুষ-সমাজেরই বিচার্য্য।

লেখক 'পুরুষ' যে 'মুগ্ধা' চরিত্রে এত জোর দিয়াছেন, পুরুষানুগত্য ও পুরুষোপরি নির্ভরশীলতাই 'নারীত্বের পূর্ণ প্রতীক' বলিয়া ঔচিত্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, —তাহা হইলে, আজকাল এই বাংলাদেশের সর্ব্বত্রই, 'নারীর অসম্মান' 'নারী হরণ' 'নারীর উপর অত্যাচার' প্রতি পদে পদে হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ ওই পুরুষের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীলতা (যাহা লেখকের মতে নারীত্বের আদর্শ!) নহে কি? এই যে প্রতিদিন এদেশে স্বামী-শয্যা হইতে স্ত্রী, ভ্রাতার আশ্রয় হইতে ভগিনী, পিতার নিরাপদ ক্রোড় হইতে কন্যা জীবনের শ্রেষ্ঠতম রত্ন হারাইয়া, দুর্ব্বৃত্ত নরপশু কর্ত্তৃক ধর্ষিত হইয়া, মৃত্যুরও অধিক ভীষণতর অবস্থায় নিপতিত হইতেছে, তাহার একটা প্রধান কারণ কি পরিপূর্ণভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা (লেখকের ভাষায় 'মুগ্ধাত্ব') নহে?

আশা করি 'পুরুষ' মহাশয় তদ্‌লিখিত বাক্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রবন্ধে, তাঁহারই মাতৃজাতির প্রতি মর্য্যাদাহানিকর ঐ কয়েক লাইন প্রত্যাহার করিযা মাতৃকুলের আশীষভাজন হইতে কুণ্ঠাবোধ করিবেন না।

নবযুগ, প্রথম বর্ষ : একাদশ সংখ্যা, ১১ আশ্বিন ১৩৩১

সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক?

(প্রতিবাদ)

শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিগত ফাল্গুন মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত লিখিত "সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের প্রারম্ভে লেখিকা আক্ষেপ করিয়াছেন যে 'সতীত্ব' কথাটা লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে আজকাল বিপুল বাগ্‌যুদ্ধ চলিতেছে, কিন্তু এই '"সতীত্ব" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি এবং সতীরই বা প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা এ পর্য্যন্ত খোলাখুলিভাবে কোথায়ও আলোচিত হয় নাই।' উক্ত প্রবন্ধে তিনি এই বিষয়ের খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিয়া নারীর সতীত্ব-সমস্যার

যে সমাধান প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও সৎসাহসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার এই সমাধান তাঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা বিদুষী রমণীর পক্ষে সত্য হইলেও, তাহা যে আমাদের নারী-সমাজের ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক নারীর পক্ষেই সত্য, এ কথা কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। আমার বোধ হয়, লেখিকা এ কথা অবগত নহেন যে, অনেক সময়ে দেশ-কাল-পাত্রাদিভেদে, বিশেষতঃ সামাজিক ব্যাপারসমূহে, প্রকৃত সত্য যাহা,—সমাজের মঙ্গল হেতু, অন্ততঃ প্রকাশের জন্য সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করিয়া,—তাহাও কিছু সময়ের জন্য অপ্রকাশ রাখিতে হয়; নতুবা সামাজিক অবস্থা সকলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, এবং দেশ-কাল-পাত্রাদি বিবেচনা না করিয়া, অসাময়িক সত্য প্রকাশের ফলে, জগতের ইতিহাসে, সত্যের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয়াধিক্য হইয়া মানব-সমাজে কতবার কত যে ভীষণ অকল্যাণ সংঘটিত হইতে শুনা গিয়াছে তাহার সীমা নাই।

যে আশঙ্কার কথা আমি বলিলাম, সেই আশঙ্কা যে লেখিকার মনেও প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে অতর্কিতে দুই একবার উঁকি মারে নাই, তাহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায়? তিনি যে 'আকৃতি' বা মনোধর্ম্মের প্রভাব বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—'প্রবৃত্তির স্রোতে গা-ভাসাইয়া দেওয়ার স্বপক্ষে তিনি কিছু বলেন নাই, এবং পাঠক-পাঠিকারাও যেন সেরূপ মনে না কবেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে',—তাঁহাব এ সকল উক্তির তাৎপর্য্য কি? ইহাতে তো স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সমাজের অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার এই সত্য প্রকাশ করিতে তিনিও মনে একটু আশঙ্কা ও সংশয় অনুভব করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আজ যখন নারী-সমাজ হইতেই কোনও উচ্চশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা কর্ত্তৃক ঐ সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তখন তাহাতে আনন্দিত হইবারই কথা। কিন্তু আনন্দের পবিবর্ত্তে আমার মনে যুগপৎ যে সংশয় ও আশঙ্কার উদ্রেক হইয়াছে, সম্যক্‌ভাবে আলোচনা দ্বারা তাহা দূর করিয়া কোনও স্থির মীমাংসায় উপনীত হইবার ইচ্ছায়, লেখিকার প্রকাশিত সত্য সম্বন্ধে যাহা আমি সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। আমার বক্তব্য এই যে, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের সমাজে নারীগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সম্যক উন্নতি হইয়া, তাঁহারা সভ্য ও শিক্ষিত জগতের অন্যান্য নারী-সম্প্রদায়ের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মের প্রতিযোগিতায় সমকক্ষ হইয়া সর্ব্বপ্রকারে পুরুষের সাহায্যকারিণী হইতে এবং অত্যাচার নির্য্যাতন প্রভৃতি হইতে বুদ্ধি ও কৌশলে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থা না হয়েন, ততদিন পর্য্যন্ত লেখিকার প্রকাশিত সত্য বর্ত্তমান নারীসমাজে প্রচারিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত নহে। কেননা, শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব হেতু, অশিক্ষিতা দুর্ব্বলচেতা নারী তাঁহার এই সত্যের প্রকৃত মর্য্যাদা না বুঝিয়া, পুরুষের স্বতঃ-চিত্তাকর্ষী দেবোপম কোনও মহৎ গুণে আকৃষ্ট হইলে, এবং দেহ ও মনের পবিত্রতা রক্ষা করতঃ সেই গুণের আদর

বা পূজা করিবার জন্য উন্মুক্ত বাতাসে স্বাধীনভাবে বাহির হইতে পারিলে, যে, প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবে না, তাহাতে বিশ্বাস কি? সুতরাং লেখিকা তাঁহার এই সত্য বর্ত্তমান সমাজে প্রকাশিত করিয়া সঙ্গত কি অসঙ্গত আচরণ করিয়াছেন, তাহার বিচারের ভার স্বয়ং লেখিকা এবং 'ভারতবর্ষে'র অন্যান্য পাঠক-পাঠিকাগণের উপর ন্যস্ত করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। এক্ষণে তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন লেখিকার প্রবন্ধের তাৎপর্য্য, আমার বক্তব্য বিষয়, এবং আমাদের বর্ত্তমান দুর্ব্বল নারীসমাজের সকল প্রকার হীনাবস্থার বিষয়, বিশেষভাবে বিবেচনা ও বিচার করিয়া তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করেন।

প্রবন্ধের শেষভাগে লেখিকা কবীন্দ্র রবীন্দ্রের ভাষায় কুসংস্কার-প্রপীড়িত দুর্ভাগ্য দেশের মঙ্গল কামনাচ্ছলে, তাঁহার আপন প্রাণের অতি উচ্চ গোপন আকাঙ্ক্ষা, ভগবানের নিকট কাতরভাবে জানাইয়া যে প্রার্থনা করতঃ প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন, তাহাতে আরও মনে হয় যে, তিনি শুধু উচ্চ শিক্ষিতা নহেন, তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাসও আছে; তবে দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি বোধ হয় আমাদের নারী-সমাজের সমগ্র নাবীকেই তাঁহার কল্পিত আদর্শে গড়িয়া লইয়াছেন; নতুবা, তাঁহার এই সতীত্ব সমস্যার সমাধান কখনই তিনি সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতে সাহসী হইতেন না। আমাদের নারী-সমাজের অধিকাংশই অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা। তাঁহারা এই সত্যের মর্য্যাদা বুঝিয়া, দেহ-মনের পবিত্রতা রক্ষা করতঃ, তাঁহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মজীবনের সমস্ত আচার ব্যবহার সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে সমর্থা আছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। পরন্তু লেখিকা যদি তাঁহার এই সত্য প্রকাশিত করিবার জন্য ব্যগ্র না হইয়া উহা মনে মনে রাখিতেন, এবং অন্যান্য নারীগণকে উহার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদের গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি কর্ম্মে ও আচার ব্যবহারে এই সত্যের সম্যক্ অনুষ্ঠান ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা সাধন করিতে মৌখিক উপদেশ প্রদানে যত্নবতী হইতেন, তাহা হইলে মনে হয়, তাঁহার এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং মহৎ উদ্দেশ্য কালে পরিপূর্ণ হইবার আশা সুদূর হইলেও খুব সুনিশ্চিত হইত। লেখিকা বলিয়াছেন যে, প্রকৃত মহত্ত্ব বা গুণের আদর বা পূজা করিলে তাহাতে নারীর সতীত্বের হানি হয় না—যদি না তাহাতে অভিভূতা হইয়া পড়া যায়। কিন্তু এ কথা তাঁহার বুঝা উচিত যে, শিক্ষিতা নারীর ন্যায়, অশিক্ষিতা নারীর মনোধর্ম্মগুলি শিক্ষার অভাব হেতু সুসংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত না হওয়ায়, সে কখনই বিবেকবুদ্ধির বলে সেই অভিভূত অবস্থা বা আসক্তি হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থা হয় না; এবং কেবলমাত্র সামাজিক কঠোর শাসনের ভয়ে ভিন্ন, জ্ঞানের প্রভাবে স্বামীকে ব্রহ্মের প্রতীক বা ঈশ্বরের সাকার বিগ্রহ-স্বরূপ উচ্চ ভাব হৃদয়ে পোষণ করতঃ তাঁহাতে অটল অচল ও সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা সুগভীর স্বামী-প্রেমে এক নিষ্ঠাবতী হইতেও পারে না। সুতরাং এইরূপ অশিক্ষিতা নারী উন্মুক্ত বাতাসে স্বাধীনভাবে

বেড়াইবার অধিকারও পাইতে পারে না; নতুবা যিনি স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ সুগভীর প্রেম অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখিতে সমর্থা, তিনি দেহ মনের পবিত্রতা রক্ষা করতঃ উম্মুক্ত বাতাসে বেড়াইবার স্বাধীনতা পাইবারও যোগ্যা এবং তিনি স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের কোনও মহৎ গুণের পূজা বা আদর করিয়াও স্বামীর কাছে প্রত্যবায়ভাগিনী হয়েন না এবং সমাজেও তাঁহার আচার ব্যবহার দূষণীয় বিবেচিত হয় না; কিন্তু যেখানে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, সেইখানেই চারিদিক হইতে আপত্তি ও সোরগোল হইতে থাকে। কেননা সমাজ কখনও ব্যভিচার সহ্য করিতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত তো আমরা প্রতিদিনই সমাজে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

আর একটী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। লেখিকা বলিয়াছেন যে, অন্যান্য দেশের নারী-সমাজের তুলনায় আমাদের নারী-সমাজে সতী নারীর সংখ্যা যে শতকরা হিসাবে অনেক বেশী, তাহাতে আমাদের আনন্দে অধীর হইবার বা গর্ব্ব প্রকাশ করিবার কোন কারণ নাই। কেননা আমাদের দেশের নারীর সতীত্বে গোঁজামিল, গলদ ও ফাঁকির মাত্রাও খুব বেশী। কিন্তু যদিও এ কথা অনেকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন, তথাপি খুব অল্প লোকেই তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সাহসী হইবেন। নারী-সমাজের সে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া কোন লাভ নাই, বরং ঘরের কথা পরের কাছে প্রকাশ না করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। ইহাতে আমাদের সৎসাহসের অভাব আছে বলিয়াও লেখিকার আক্ষেপের কোনও কারণ দেখি না। যাহা হউক, লেখিকার এই কথাটী সত্য হইলেও, এ সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে, আমাদের নারীগণের সতীত্বে যে সকল গোঁজামিল, গলদ ও ফাঁকি বর্ত্তমানে দেখা যায়, তাহার জন্য আমাদের দেশের বহুদর্শী ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য মুনিঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রণীত শাস্ত্রসকল ও প্রাচীন কালের সামাজিক বিধিবিধানসমূহ সম্পূর্ণ দায়ী নহে। আমাদের শাস্ত্র ও সামাজিক বিধিবিধানসকল, যাহা আধুনিক শিক্ষিত সমাজে কুসংস্কার বলিয়া বিবেচিত ও উপেক্ষিত হয়, তাহা এক সময়ে নারীর সতীত্বের যে অতি উচ্চ মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, কালপ্রভাবে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সতীত্বের সে মহান্ আদর্শের ভাব আমাদের বর্ত্তমান নারী-সমাজ হইতে ক্রমশঃই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এবং ইহাই, অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অনুকরণ যে সতীত্বের গোঁজামিল, গলদ ও ফাঁকির মাত্রাধিক্যের অন্যতম প্রধান কারণ, এ কথা বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য। আমাদের দেশের নারীর শিক্ষা সভ্যতা ও কর্ম্ম আমাদের দেশের উপযোগী হওয়াই উচিত। বিদেশীয় ভাষা শিক্ষায় কোন দোষ হয় না, কিন্তু বিদেশীয় আচার ব্যবহার ও সামাজিক রীতিনীতির অনুকরণ করিলে মানব-সমাজে কিরূপ শোচনীয় অধঃপতিত অবস্থায় থাকিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত হতভাগ্য বঙ্গসন্তান, ততোধিক তাহাদের অশিক্ষিত দুর্ব্বল নারী-সমাজ। বর্ত্তমানে যতই গোঁজামিল, ফাঁকি, গলদ আমাদের দেশের নারীর সতীত্বে দেখা যাক্ না কেন, লোকে যখন সুদৃঢ় সমাজ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া সমাজের বিধি, নিষেধ

ও শাসন সকল মানিয়া চলিত, সমাজ-বন্ধন যখন এত শিথিল ছিল না, সেই প্রাচীনকালের কথা বাদ দিলেও, বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় সভ্য ও শিক্ষিত জাতির নারী-সমাজের তুলনায় ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের নারী-সমাজেই প্রকৃত সতী নারীর সংখ্যা অধিক, এবং বর্ত্তমান যুগে প্রকৃত সতীত্বের আদর্শ যদি জগতে কোথাও কিছু থাকে, তবে তাহা এই বঙ্গদেশেই আছে। নারীমাত্রেই সৃষ্টির আদি কারণভূত মহা আদ্যাশক্তির অংশ বিশেষ। বিশেষতঃ ভারতের মধ্যে বঙ্গনারীতে সেই মহাশক্তির যে কি মহাবিকাশ আছে, তাহা যেদিন বঙ্গের নারী-সম্প্রদায় সুশিক্ষার প্রভাবে সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, সেইদিন হইতেই বাস্তবিক ভারতের আবার সুদিন ফিরিয়া আসিবার সূত্রপাত হইতে থাকিবে। আমার বোধ হয়, এইজন্যই বুঝি, বঙ্গের নারী-শক্তির প্রভাব ও মর্য্যাদা অনুভব করিয়া, স্বার্থত্যাগী মহানুভব দেশবন্ধু দাস মনোমোহন নাটমন্দিরের রঙ্গমঞ্চে স্বর্গীয় মহাকবি গিরিশচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতিকল্পে আহূত কোনও এক সভাতে কবিবরের কোনও একখানি প্রসিদ্ধ সামাজিক নাটকের সমালোচনায় কথা প্রসঙ্গে বক্তৃতাচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর অন্য সকল দেশের নারী-জাতির তুলনায় আমাদের বঙ্গনারীর এমন কোনও বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা অন্য দেশের নারীতে নাই; আর এইজন্যই বোধ হয়, বর্ত্তমান সময়ে ভারতব্যাপী গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের সহিত ভারতীয় নারী-সমাজ-সমস্যার সমাধানেরও তীব্র আন্দোলন ও আলোচনার সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। অধঃপতিত পরাধীন জাতির পক্ষে তাহাদের নারী-সমাজের এই মহাজাগরণ যে সত্যই অদূর-ভবিষ্যতে শক্তি ও স্বাধীনতা লাভের নিদর্শন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের কর্ত্তব্য এখন, নারী-সমাজের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করতঃ নারীগণকে যোগ্যতানুসারে স্বাধীনতা এবং কর্ম্মক্ষেত্রে নারীজনোচিত সকল প্রকার কর্ম্মের প্রতিযোগিতায় প্রবেশাধিকার দেওয়া। তাহা হইলে তাঁহারা বিপদকালে আত্মরক্ষা করিতে এবং পুরুষ-সমাজকে সকল প্রকার কার্য্যে সহায়তা প্রদান করিতে পারিবেন। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কুসংস্কারের সীমাবদ্ধ গণ্ডী সকল কালমাহাত্ম্যে আপনা হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। নতুবা অসময়ে গর্ব্ব ও অহঙ্কারের সহিত জোর পূর্ব্বক তাহাদের উচ্ছেদসাধন করিতে গেলে, বরং বিপরীত ফল ফলিবারই সম্ভাবনা অধিক। যতদিন আমাদের নারী-সমাজ সম্যক রূপে সুশিক্ষিতা হইয়া স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য না হইতেছেন, ততদিন সামাজিক কুসংস্কারের উচ্ছেদসাধন করতঃ তাহাদিগকে অন্যায় স্বাধীনতা দিয়া এবং লেখিকার প্রকাশিত সতীত্ব-সমস্যার সমাধান নারী-সমাজে প্রচারিত করিয়া দিলে, বহুদিনের পুরাতন বাঁধ ভাঙ্গিয়া দুর্ব্বল নারী-সমাজের উপর দিয়া যখন স্বাধীনতার প্রবল বন্যার প্রবাহ বহিতে থাকিবে, তখন অধিকাংশ অশিক্ষিতা নারীই যে লেখিকার এই সত্য-সমাধানের দোহাই দিয়া উচ্ছৃঙ্খল-বৃত্তি-পরায়ণা ও যথেচ্ছাচারিণী হইয়া সেই প্রবাহের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে দিশেহারা হইয়া যাইবে, তাহার পরিণতিই বা কি হইবে, কে বলিতে পারে? লেখিকা কি তখন

তাহাদিগকে সেই প্রবল প্রবাহের মুখ হইতে ফিরাইয়া রক্ষা করিতে পারিবেন? যদি না পারেন, তবে আমাদের নারী-সমাজের মধ্যে সতীত্বের যে গোঁজামিল, গলদ ও ফাঁকি দেখিয়া তিনি আশঙ্কিত হইয়াছেন, তাহার মাত্রা যে আরও অধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে এবং তাহার পরিণাম নারী-সমাজের পক্ষে যে কি ভয়াবহ হইয়া উঠিবে, তাহা কি তিনি একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? আমার মনে হয়, তিনি যে মহান সত্য প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই মহাসত্যের অনাবিল আনন্দে ও মত্ততায় এত অধিক পরিমাণে অধীরা ও আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, এতদূর ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিবার শক্তি তাঁহার তখন ছিল না, অথবা থাকিলেও তিনি সে বিবেচনা করিবার কোন আবশ্যকতাই বোধ করেন নাই। আমাদের দেশের নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে যদি এইরূপ শাস্ত্রীয় কঠোর বিধি-বিধানের দ্বারা নিয়ম ও সংযমের মধ্য দিয়া সামাজিক সুশাসন ও সুশৃঙ্খলার ব্যবস্থা না থাকিত, তাহা হইলে এ অধঃপতিত পরাধীন দেশের অশিক্ষিত দুর্ব্বল নারী-সমাজের আজ যে আরও কত ভীষণ শোচনীয় দুরবস্থা চোখে দেখিতে হইত, তাহা কল্পনা করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে! তাই আবার বলি, যতদিন আমাদের নারী-সমাজ সম্যক্‌রূপে শিক্ষিতা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বলবতী হইয়া আত্মরক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে সমর্থা না হয়, ততদিন লেখিকার প্রকাশিত সতীত্ব-সমস্যার এই সমাধান সমাজে প্রচারিত হইয়া নারী সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত বা প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহার ফল সমাজের পক্ষে কখনই শুভজনক হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত।

ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৩১

সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক?

(প্রতিবাদ)

শ্রীসুনীতি দেবী

গত ফাল্গুনের ভারতবর্ষে "সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক?" এই শিরোনাম দিয়া একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে—লেখিকা শ্রীরাধারাণী দত্ত। আমি সেই লেখিকাকেই উদ্দেশ্য করিয়া কয়েকটি কথা বলিব!

শ্রীমতী লেখিকা, তুমি যে মনোধর্ম্মের স্বাভাবিক দিক্ দর্শন করাইয়াছ, ঐ দিক্-দর্শনই তোমার ভ্রান্তি। তুমি সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের রহস্য বুঝ নাই, মনোধর্ম্মের বিচিত্রতা বুঝিতে চেষ্টা কর নাই,—কেবল একটা বিকৃত শিক্ষালব্ধ ভাবের টানে প্রবন্ধ লিখিয়াছ। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি বুঝিয়াছ—জগতের মানব-মাত্রেরই মনোধর্ম্ম

একইভাবে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে? সৌন্দর্য্য-বোধ কি সর্ব্বত্র একইভাবে ফুটিয়া উঠিয়া থাকে? সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব জাতি কি একইভাবে মহত্ত্বের অনুভূতি করে? জগতের মানুষ-মাত্রেই কি একই প্রকারে দেবত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে? কৈ, তাহা ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এই যে দেখিতে পাইতেছ, দেশভেদে, কালভেদে, জাতিভেদে, স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে, এমন কি ব্যক্তিভেদে পর্য্যন্ত রুচি-বৈচিত্র্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহার কোন্‌টা স্বাভাবিক, কোনটা অস্বাভাবিক, তাহা তুমি বলিয়া দিতে পার কি? তুমি কি বলিবে—আমি যে তোমার লেখা দেখিয়া লজ্জা অনুভব করিতেছি, আমার এ মনোধর্ম্ম অস্বাভাবিক? আর তুমি হিন্দু রমণীর স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের অপঘাত ঘটাইয়া তাহার স্থানে বলপূর্ব্বক যে বিদেশীয় মনোধর্ম্মের আসন স্থাপন করিয়াছ, এইটা কি স্বাভাবিক?

ঐ যে আমার বাড়ীর শালগ্রাম-শিলায় আমি দেবত্বের বিকাশ দেখিতেছি, সর্ব্বেশ্বরের অধিষ্ঠান দেখিতেছি,—ভক্তিপূত চিত্তে যদি তাঁহার দ্বারে মস্তক অবনত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আত্মাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি, তাঁহার কৃপায় কত বিপদের হাতে রক্ষা পাইতেছি, কত অমঙ্গল দূর হইয়া যাইতেছে; —আছে কি অন্য কোন জাতির শক্তি এমন দেবত্বানুভবে? বলিয়া দাও দেখি— কোনটা স্বাভাবিক?

সতীত্বের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ যাহাই হউক, হিন্দু রমণীর মধ্যে তাহা পাতিব্রত্য অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লেখিকা কি ব্রতনিয়ম কাহাকে বলে তাহা অবগত আছেন? লেখিকা যখন স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের স্ফুরণে মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখিয়াছেন, তখন সংযমই যে মানুষে ও পশুতে পার্থক্যের বেষ্টনী, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিবেন না। তবে লেখিকা যে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতেও, সংযমের বেষ্টনী-বন্ধনই যে মানুষের শিক্ষার উদ্দেশ্য, আর এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় না বলিয়াই মানুষের আইন, কানুন, স্তুতি, নিন্দা, সামাজিক, পারিবারিক শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ে মানুষকে সংযমের বেষ্টনীর মধ্যে রক্ষার প্রয়োজন হইয়া থাকে— ইহা তিনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। লেখিকা স্বাভাবিক মনোধর্ম্ম ও শরীর-ধর্ম্মের বিকাশে মনুষ্যত্বের সন্ধান-পাইলেও, জগতের কোন সভ্য মানুষই তাহা পায় নাই—ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। কারণ, জগতে কোন মানুষই নিজের পুত্র কন্যাগণকে স্বাভাবিক মনোধর্ম্ম ও শরীর-ধর্ম্ম পরিপোষণের জন্য অবাধ-অধিকার দেয় না; তাহার সংযমের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। তবে হিন্দু ছাড়া সে ব্যবস্থায় অধিক সফল অন্য মানুষ এ পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই। হিন্দুর মত সংযমের মাহাত্ম্য আর কেহ বুঝিতেও পারে নাই। যাউক, সে কথার এ স্থান নহে।

কায়মনোবাক্য পবিত্র ও সংযত করিয়া দেবারাধনার নাম ব্রত। ব্রতের প্রধান অংশই সংযম। কাজেই পবিত্র শরীরে সুনৃত বাক্যে সংযত চিত্তে পতি-দেবতার সেবাই পাতিব্রত্য বা সতীত্ব। এই ব্রতের সংস্কার হিন্দু রমণীর হৃদয়ে স্বভাবতই ফুটিয়া

উঠে ; শিক্ষায় উপদেশে সংসর্গে তাহা পরিপুষ্ট হয়। সৌভাগ্যবলে ব্রতাচরণের সুযোগ ঘটিলে ক্রমে অনুষ্ঠান দ্বারা তাহা দৃঢ় হইয়া যায়।

স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের অনুসরণে ছুটিয়া বেড়াইলে তাহা লাভ করা যায় না। স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের অনুপ্রেরণায়—সৌন্দর্য্যের পায়ে দেহ উপঢৌকন দিলেও এ মহাব্রত পালন করা যায় না।

আমি দর্শন জানি না। তবুও একটু আধটু যাহা শুনিয়াছি, তাহাতেই বলিতে পারি, সাংখ্য-দর্শনের জড়ের আকৃতির কথা লেখিকা মোটেই বুঝিতে পারেন নাই। যদি বুঝিতেন, তাহা হইলে জড়ের আকৃতির সহিত স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের সাম্য স্থাপন করিয়া স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের বিকাশ ঘটান কর্ত্তব্য বুঝিতেন না। সাংখ্য-দর্শনে সৃষ্টি-কার্য্যে জড়ের আকৃতিকে যত প্রাধান্য দান করা হইয়াছে, অন্য কোন দর্শনে তাহা দেওয়া হয় নাই। আবার স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের নিগ্রহকে সাংখ্য মতে যত উচ্চ স্থানে স্থাপন করা হইয়াছে, তাহাও অন্য কোন দর্শনে করা হয় নাই। সাংখ্য-দর্শনেই বলা হইয়াছে, ত্রিবিধ দুঃখের (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক) অত্যন্ত নিবৃত্তি পুরুষার্থ—অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজন। তাহা লাভ করিতে হইলে চাই বিষয়-বিতৃষ্ণা, চাই যোগ, চাই তপস্যা, চাই ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ—মনো-নিগ্রহ। ইহার সহিত স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের সম্বন্ধ কতটা? লেখিকা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, 'আমি প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবার সপক্ষে কথা বলি নাই' ইত্যাদি ; আর এক স্থানে বলিয়াছেন, 'যাহাকে প্রকৃত সত্য বলিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারা যায়, তাহা অকপটে স্বীকার করাই মনুষ্যত্ব।' আবার সত্যং শিবং সুন্দরংও তিনি এক স্থানেই দেখিতে চাহিয়াছেন। সত্যং শিবং সুন্দরং কথা কয়টি লেখিকা যে শাস্ত্র ঘাঁটিয়া বাহির করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রেই বলিতেছে, ত্রিজগতে যাহা কিছু সৃষ্ট বস্তু সব অসত্য, সমস্ত অশিব ও অসুন্দর। তবে এই জগতের সৌন্দর্য্যের পায়ে লুটাইয়া লেখিকা সত্য উপলব্ধি করিবেন কি করিয়া? দেহ ও মন স্বভাবের পায়ে উপঢৌকন দিয়া প্রবৃত্তির স্রোতে উজান বাহিতে চান—কোন শক্তিতে?

ভাবতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৩২

কেশববাবুর প্রতিবাদের উত্তর

শ্রীরাধারাণী দত্ত

গত মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার মতের সমর্থন করিয়াও যে দুই একটি আপত্তি জানাইয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কিছু আছে।

তাঁহার মতে আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য হইলেও, ঐ সত্য প্রকাশের না কি এখনও সময় হয় নাই! তিনি বলিয়াছেন,—

'উক্ত প্রবন্ধে লেখিকা এই বিষয়ের খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিয়া নারীর সতীত্ব-সমস্যার যে সমাধান প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও সৎসাহসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার এই সমাধান তাঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা বিদুষী রমণীর পক্ষে সত্য হইলেও, তাহা যে আমাদের নারী-সমাজের ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক নারীর পক্ষেই সত্য, এ কথা কোনওমতে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।'

তিনি বিশ্বাস না করিলেও, তাঁহার এই কথার উত্তরে আমি বলিতে চাই—যাহা সত্য, তাহা সর্ব্বকালে সর্ব্ব অবস্থায় সকলকার পক্ষেই সত্য; কারণ, সত্য কখনও ব্যষ্টি বা সমষ্টির সুবিধা-অসুবিধার অপেক্ষা রাখিয়া প্রকাশিত হয় না। সত্য নিজগুণে স্বতঃসিদ্ধ, স্বতোদ্ভাষিত এবং স্বয়ম্প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা ঢাকিয়া রাখা চলে না এবং ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেও তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। সত্য 'ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক নারীর পক্ষেই' স্বরূপে সুপরিস্ফুট হইবে অথচ তাহার বিপরীত দিকের ছায়া-সম্পাত ঘটিবে না, এইরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। কারণ, আলোকের পশ্চাতেই যেমন অন্ধকার, সেইরূপ সত্যের বিপরীত মিথ্যাও জগতে চিরকালই আছে; এবং জগতে কোনও বিষয়ই ও কোন সত্যই 'ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক' লোকের উপর সমান প্রভাব বিস্তার করিয়া একই ফল প্রসব করিতে পারে না; কারণ, প্রত্যেক মানবের স্বভাব রুচি ও মনের ক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারের; সুতরাং সর্ব্বত্রই একই প্রকার সুফল বা কুফল আশা করা বিড়ম্বনা।

ইহার পর কেশববাবু লিখিতেছেন, 'আজ যখন নারী-সমাজ হইতেই কোনও উচ্চ-শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা কর্ত্তৃক ঐ সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তখন তাহাতে আনন্দিত হইবারই কথা। কিন্তু আনন্দের পরিবর্ত্তে আমার মনে যুগপৎ সংশয় ও আশঙ্কার উদ্রেক হইয়াছে।'

লেখক মহাশয়ের মতে—যে-সত্য অপ্রিয়, তাহা প্রকাশেও তিনি বিরূপ নহেন, এবং মিথ্যার আবরণে এই সত্য আবৃত করিবারও তিনি প্রয়াসী নহেন, বরং আনন্দিত হওয়া উচিত বিবেচনা করেন। সুতরাং 'আশঙ্কা'র উদ্বেগে 'সংশয়' সন্দেহের দ্বিধায় সত্যের অবমাননা অথবা সত্য-গোপন করার এই উপদেশ দেওয়া তাঁহার ন্যায় সত্যগ্রাহীর পক্ষে আদৌ সুশোভন হয় নাই বলিয়া আমি মনে করি। তা' ছাড়া, তিনি আমাকে যেভাবে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা যে বর্ত্তমান অবস্থারই একেবারে গোড়ার কথা, ও সংস্কার সাহিত্যের মূল-ভিত্তি —এই সাধারণ তথ্যটুকুও অন্ততঃ তাঁর জানা উচিত ছিল।

সত্যের আর একটি নাম 'স্বয়ম্প্রকাশ'। উহা কাহারও চেষ্টায় অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না। আর প্রকৃত সত্যের অনুসরণ করিতে পারিলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের

আশঙ্কা নাই ; কারণ, 'সৎ' শব্দ হইতে 'সত্য' শব্দের উৎপত্তি। 'সৎ' শব্দ শুভবাচক, —যাহা সৎ তাহা শুভ। সুতরাং সত্য হইতে অশুভের আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক। যাঁহারা সত্য প্রকাশের ভয়ে অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহারা সত্য-সন্দর্শনে নানা কল্পিত অমঙ্গলের আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া উঠিবেন, সন্দেহ নাই। সে কথা স্বতন্ত্র।

কেশববাবুর মতে—'সভ্য ও শিক্ষিত জগতের অন্যান্য নারী-সম্প্রদায়ের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মের প্রতিযোগিতায় সমকক্ষ হইয়া, সর্ব্ব প্রকারে পুরুষের সাহায্যকারিণী হইতে এবং অত্যাচার নির্য্যাতন প্রভৃতি হইতে বুদ্ধি ও কৌশলে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থা না হওয়া পর্য্যন্ত এ সত্য বর্ত্তমান নারী-সমাজে প্রচারিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত নহে। কেননা, শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব হেতু অশিক্ষিত দুর্ব্বলচেতা নারী এই সত্যের প্রকৃত মর্য্যাদা না বুঝিয়া...প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবে না তাহাতে বিশ্বাস কি?'

তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণ স্বীকার্য্য হইলেও, তাঁহার যুক্তি সমীচীন নহে। তিনি একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে সমর্থ হইবেন যে এই সত্য যদি ঐ সভ্য-জগতের নারী-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশ করা যায়, অর্থাৎ—যাঁহাদের কর্ম্ম, জ্ঞান, শিক্ষা, দীক্ষায় সমকক্ষ হইতে পারিলে আমাদের 'অশিক্ষিতা বঙ্গনারী সমাজ' এই সত্য-গ্রহণের উপযুক্তা হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, সেই তথাকথিত 'উচ্চশিক্ষায়' শিক্ষিতা নারী সম্প্রদায় মধ্যেও 'ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক নারীর পক্ষেই' এই সত্যের প্রকৃত মর্য্যাদার উপলব্ধি ও আদর আমাদের বর্ত্তমান নারীগণ অপেক্ষা অধিক-মাত্রায় হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এই সকল তথাকথিত শিক্ষা, জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা থাকিলেই যে তাঁহারা সকলেই এই সত্যের প্রকৃত মর্ম্মাবধারণ করিতে বা উহার মর্য্যাদা বুঝিতে সমর্থা হইবেন, ইহার অন্যথা হইবে না—এরূপ মনে করা অন্যায়। সত্যের মর্য্যাদা যদি কেহ বুঝাইতে সমর্থ হয়, ইহার অকৃত্রিম স্বরূপ নারীর হৃদয় মধ্যে প্রকাশ করিতে যদি কেহ সমর্থ হয়, তবে সে একমাত্র তাহার বিবেক। এই বিবেক-বুদ্ধি মানুষের সহজাত। শিক্ষার দ্বারা তাহার উৎকর্ষতা হয় ত' সম্ভব, কিন্তু তাহা অর্জ্জন করা অসম্ভব।

আধুনিক সভ্য-জগতের জ্ঞানবতী শিক্ষিতা নারীগণ কেবলমাত্র তাঁহাদের শিক্ষা ও জ্ঞান দ্বারা ইহার সত্য স্বরূপ কখনই গ্রহণ করিতে সমর্থা হইবেন না, যদি তাঁহাদের বিবেক স্বাধীন ও জাগ্রত না থাকে। সত্য হইতে মানুষকে বিচলিত বা ভ্রমাত্মক পথে পরিচালিত করে মানুষের চিত্তবল ও সংযমের অভাব। আমাদের দেশে অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা নারীদের মধ্যে যে অসাধারণ আত্মসংযমের প্রকাশ দেখা যায়, তাহা আধুনিক সভ্য-জগতের বিদুষী সুশিক্ষিতা নারীদের অপেক্ষা যে অনেক অধিক পূজনীয় 'দেশবন্ধু'র উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কেশববাবুও ইহা বলিয়াছেন।

আমার মনে হয়, যে সকল নারীর মধ্যে বিবেকের বিকাশ অধিক স্ফুটতর

এবং সংযমের প্রকাশ অধিক গভীরতর, তাঁহারাই এই সত্য গ্রহণের সম্পূর্ণ অধিকারিণী ও উপযুক্তা। আর যে নারী-সমাজের মধ্যে সংযমের অভাব অধিক এবং বিবেকও স্বাধীন ও পূর্ণ সচেতন নহে, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে সুশিক্ষিতা, বিদুষী, জ্ঞানবতী হইলেও এই কঠিন সত্যের সম্পূর্ণ অনধিকারিণী এবং অনুপযুক্তা। পুরুষোচিত গুণের বিচারে ও শিক্ষাভেদে যে এ সত্য নারী-সমাজে প্রকাশ্য, অন্যথা নহে—এরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক; কারণ, একমাত্র সংযম ও বিবেকের তারতম্যানুসারে ইহা সুফল বা কুফলপ্রদ। আমার মনে হয়, বাংলার নারী-সমাজ সভ্য-জগতের নারীগণের তুলনায় শিক্ষা, জ্ঞান ও কর্ম্মনিপুণতা প্রভৃতি অনেক মহৎগুণের প্রতিযোগিতায় তাঁহাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেও, এই সত্য গ্রহণে তাঁহারা একটুও অনুপযুক্তা বা অনধিকারিণী নহেন—যেহেতু বিবেক ও সংযমের উচ্চতাগর্ব্বে তাঁহারা পৃথিবীর সকল নারীর অপেক্ষা ভাগ্যবতী। সুতরাং লেখক মহাশয় যে আমাদের দেশের নারীগণের শিক্ষা-হীনতার ছল ধরিয়া এই সত্য 'মনে মনে রাখা' এবং 'প্রকাশ না করা' উচিত ছিল বলিয়াছেন, তাহা আমি মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। আধুনিক যুগে বাংলার নারী-সমাজে ঐ সত্যের উন্মেষ-সূচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যতকাল ইহা গোপন থাকা সম্ভব ছিল—ততকাল তাহা থাকিয়াছে; কিন্তু আজ সত্য যখন আপনিই আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তখন আর গোপন রাখা সম্ভবপর নহে। সত্য গোপনের প্রাণান্তকর চেষ্টাতেই আজ আমরা এতটা দুর্ব্বল, অসহায় ও অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছি।

লেখক অতীতের যে আদর্শ স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান নারী-সমাজের অযোগ্যতার জন্য আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এবং আধুনিক শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কারকে সেজন্য অপরাধী করিয়াছেন, আমার মনে হয় এখানেও তিনি একটি মারাত্মক ভ্রমে পড়িয়াছেন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর্য্যুপরি বিপর্য্যয় যে এ দেশের নারী-সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য কতখানি দায়ী, এ কথা বোধ হয় তিনি একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। অতীতের আদর্শ বলিতে যে পাঁচ-সাতশত বৎসর পূর্ব্বের ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থা নহে, উহা যে তাহারও অনেক আগেকার কথা, এইটি রক্ষণশীল বা পরিবর্ত্তন-বিরোধী দলের ধারণার মধ্যে সকল সময়ে থাকে না বলিয়াই তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, বর্ত্তমান শিক্ষা, দীক্ষা, আদর্শ বা নীতি ভারত-নারীর দুরবস্থার জন্য কিছুমাত্র দায়ী নহে। অতীতেই আমরা আমাদের প্রাচীন আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়াছিলাম; এবং বহুকাল আর সে পূর্ব্ব-রীতিনীতির অনুসরণ না করিয়া সেকালের নব-রচিত স্মৃতির অনুশাসন মানিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম বলিয়াই, আজ এতটা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী যে সকল বিধি-নিষেধের তখন প্রয়োজন হইয়াছিল, আজও যে অবস্থা ঠিক তাহাই আছে, এ কথা, আশা করি, কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না। অতীতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বর্ত্তমানকে অস্বীকার করা যে

মৃত্যুরই রূপান্তর মাত্র, এ কথা এসিয়ার অন্যান্য মহাজাতিরা সময় থাকিতে বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই আজও তাঁহারা আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন; নতুবা আমাদেরই মত বেহাল আজ তাঁহাদেরও হইতে হইত।

লেখক মহাশয় যে স্থির করিয়াছেন পাঁজি পুঁথি দেখিয়া শুভ দিন ও শুভ লগ্ন স্থির করিয়া তবে যথাকালে যথাসময়ে সত্য প্রচারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, আমার মনে হয়, সে সুদিনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে আমাদের জীবনের মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবার পরেও সে সুযোগ আসিবে কি না সন্দেহ। সত্য প্রচার যে যোগ্যতা অর্জ্জনে জাতিকে সাহায্য করে, ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ লেখক গত পঁচিশ বৎসরের রুষ-ইতিহাস পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। সুতরাং অসময়ে সত্য প্রচার করিলে যে মহাপ্রলয় হইবে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিতেছেন, তাহা একেবারেই ভিত্তিহীন। ঐ সত্য প্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই, বহু-দিনের-ঢাকিয়া-রাখা সত্য আপনিই সুপ্রকাশ হইতেছে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, যে সমাজের পুরুষেরা নারীকে কঠোর বিধি-নিষেধের লৌহ-বেষ্টনীর মধ্যে পুরিয়া, অবরোধের উচ্চ-প্রাচীরে ঘিরিয়া, চারিদিকে কড়া পাহারা বসাইয়া, অন্তরীণের আসামীর মতো তাহার সতীত্ব-রক্ষার আয়োজন করে, তাহারা কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, আমাদের এই কাপুরুষ জাতি ভিন্ন জগতের অন্য কোনও দেশে নারীর এতখানি অবমাননা দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশের পুরুষেরা বঙ্গমহিলার গুণ-কীর্ত্তনে 'পঞ্চমুখ'কেও পরাস্ত করেন বটে, কিন্তু আপন জননী, জায়া, ভগিনী ও দুহিতাকে নিতান্ত হীনচেতা ও নির্ল্লজ্জের মতো সর্ব্ব প্রকারে অবিশ্বাস করিতে এবং তজ্জনিত অবমাননা করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না! ইহাও সমস্যা!

ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৩২

আমার শেষ কথা

শ্রীরাধারাণী দত্ত

বৈশাখের 'ভারতবর্ষে' দেখিলাম আমার প্রবন্ধের আরও একটি প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, এবার প্রতিবাদকারিণী একজন বিদুষী নারী। ইনি দেখিতেছি নিখিল মানবধর্ম্মপ্লুত মনোধর্ম্মটাকেই প্রায় অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন।

মানবের মনোধর্ম্ম যে সকলকারই মধ্যে একই ধারায় এবং একই রূপে'র মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে, এমন কথা আমার প্রবন্ধে কোথাও বলা হয় নাই।

আমি মনোধর্ম্মের স্বভাব—সৎ, সুন্দর ও আনন্দের প্রতি আকৃষ্ট বা অবনত হওয়া, ইহাই মাত্র বলিয়াছি।

সকল মানব যে একই বস্তুর মধ্যে—এই সুন্দরত্ব, দেবত্ব ও আনন্দের সন্ধান পাইয়া থাকেন, ইহা আমি বলি নাই!

মনোধর্ম্ম বলিতে আমি মহত্ত্ব, দেবত্ব, উচ্চ গুণবিশিষ্ট অসাধারণ চরিত্র এবং সুন্দর ও আনন্দের প্রতি মানবের স্বাভাবিক আকর্ষণ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহার প্রকৃত অর্থ প্রতিবাদকারিণী আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। উহার মোটামুটি একটা কদর্থ অনুমান করিয়া, ক্রোধান্ধ চিত্তে প্রতিবাদ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। প্রতিবাদকারিণী শালগ্রাম শিলার প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও প্রেম ভক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রবন্ধোক্ত মনোধর্ম্মকে 'ভ্রান্তি' এবং 'বিকৃত-শিক্ষালব্ধ ফল' বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন, অথচ প্রবন্ধ কথিত 'সুন্দরের প্রতি স্বাভাবিক-আকর্ষণে' তিনিও জড়িতা হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ শালগ্রাম শিলার মধ্যেই তিনি প্রবন্ধ-কথিত 'দেবত্ব' 'সুন্দরত্ব' এবং 'আনন্দে'র সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়াই সেখানে অবনতা হইয়াছেন।

প্রতিবাদকারিণী 'সৎ ও সুন্দরের প্রতি মনের স্বাভাবিক-আকর্ষণে অবনত হওয়া' অর্থে কেবলমাত্র 'পুরুষ' বা 'পরপুরুষ' বলিয়া বুঝিয়াছেন এইরূপ মনে হয়। কিন্তু বাস্তব-জগতে জীবন্ত-মানবের চেয়ে মানুষ যে অনেক সময়ে কল্পনায় মানব বা দেবতা সৃষ্টি করিয়া অনেক বেশী সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও আনন্দ উপভোগ করে, ইহা তাঁহার শালগ্রাম-প্রীতি হইতেই সপ্রমাণ হয়। ইহা ব্যতীত জগতে সর্ব্বপ্রকার পৌত্তলিক ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিতে এবং ভারতবর্ষে হিন্দু মহাজাতি বিদ্যমান থাকিতে এ সত্যটি এখানে কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। রাজরাণী মীরাবাঈ স্বামী, সংসার ও রাজ্যসুখভোগ ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারিণী হইয়া বৃন্দাবনের পানে ছুটিয়াছিলেন কাহার সন্ধানে? কিসের প্রেরণায়? সেও কি সুন্দরেরই, আনন্দেরই, সত্যেরই আকর্ষণে নহে?

মনোধর্ম্মের মূলই হইতেছে আনন্দ ও সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। ইহা জাতি সমাজ শিক্ষা ও দেশকালানুযায়ী ভাবে মানবের মধ্যে তাহাদের Tradition অনুসারে বিভিন্নতর রূপে ও বিভিন্ন ধারায় বিকশিত হইয়া থাকে। শালগ্রাম শিলার চরণে প্রণতা হইলে শ্রীমতী সুনীতি দেবীর প্রাণ স্বর্গীয় ভাবে এবং ভক্তি ও শান্তিরসে প্লুত হয় কেন? তাহার কারণ উহাই তাঁহার জ্ঞানোন্মেষ হইতে শিক্ষা, সংস্কার, ধারণা, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন এবং জাতি ও রক্তগত সংস্কার।

একজন হিন্দু নারীর মনোবিকাশে এবং তাঁহার মনোধর্ম্মের আকর্ষণীয় বস্তুতে, আর একজন খৃষ্টান মহিলার মনোবিকাশে ও তাঁহার মনোধর্ম্মের আকর্ষণীয় বস্তুতে, এবং আর একজন Atheist রমণীর মনোবিকাশে ও তাঁহার মনোধর্ম্মের আকর্ষণকারী বস্তুতে অনেকখানি পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও এই তিন সম্প্রদায়ের মহিলাই ঈশ্বর-সৃষ্ট একই নারী এবং মনোধর্ম্মের স্বভাবও ইঁহাদের মূলতঃ এক থাকিলেও,

চিত্ত-আকর্ষণকারী বস্তু নির্ব্বাচনে তাঁহাদের এই যে অনেকখানি প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহার কারণ তাঁহাদের পরস্পরের বিভিন্ন শিক্ষা, ধারণা, সংস্কার এবং জাতি ও ধর্ম্মগত Tradition।

সংযম এবং বিবেক এই দুইটি বৃত্তি মানুষের মধ্যে জাগ্রত থাকিয়া মানুষে এবং ইতর প্রাণীতে পার্থক্য বজায় রাখিয়াছে। এই মনোধর্ম্মকে যদি সম্পূর্ণ হত্যা করা বা জয় করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে এত বেদ-বেদান্ত উপনিষৎ শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ কোরাণ বাইবেল ঘাঁটিবার ও তপশ্চর্য্যা, কৃচ্ছ্রসাধন প্রভৃতি করার প্রয়োজন হইত না।

সংসারে সাধারণ নারীর পক্ষে সম্পূর্ণ মনোজয় বা মনোনিবৃত্তি যখন সম্ভবপর নহে, তখন মনোধর্ম্মকে অস্বীকার না করিয়া ভণ্ডামীর মুখোসটি উন্মোচনপূর্ব্বক * সহজ ও সরলভাবে সত্য স্বীকার করা এবং ঐ মনোধর্ম্মকে সংযতভাবে বিবেকানুমোদিত পথে পরিচালিত করাই কল্যাণকর এবং মনুষ্যত্ব, ইহাই আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। মনোধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়া সংযম বিবেক হিতাহিত কর্ত্তব্যজ্ঞান সব জলাঞ্জলি দিয়া মনেরই অনুসরণ কর, অর্থাৎ 'স্বেচ্ছাচারে গা ভাসান দাও'—এত বড় অশুভকর বাণী কোনও মানুষ, কোনও নারী, এবং বিশেষ করিয়া কোনও হিন্দুনারীর পক্ষে প্রচার করা যে সম্ভব, ইহা যাঁহারা কল্পনা করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের বোধশক্তির আমি প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। এবং তাঁহারা যে আমার বক্তব্য বিষয়টিকে নিতান্তই ভুল বুঝিয়াছেন, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

পুরুষের মতো নারীরও সর্ব্বপ্রথম পরিচয় 'মানুষ'। বিশ্বে পরিচয় দিতে হইলে তাহাকে প্রথমেই বলিতে হইবে 'আমি মানুষ', তাহার পরে 'আমি নারী' এবং তাহার পরে তাহার জাতি ও ধর্ম্মের পরিচয় দিতে হইবে। সুতরাং—সর্ব্বপ্রথম যদি আমরা 'মানুষ' বলিয়াই আত্মপরিচয় দিই অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে যদি মনুষ্যত্বেরই দাবী করি, তাহা হইলে মনুষ্যত্বকেই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং প্রধান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহার পর 'নারী'-পরিচয়ে 'কন্যাত্ব' 'ভগ্নীত্ব' 'পত্নীত্ব' ও 'মাতৃত্ব' এই রূপ-চতুষ্টয়ের পূর্ণ-বিকাশে নিজের সার্থকতা এবং পরিচয় জ্ঞাপন করিতে হইবে। তাহার পরে 'হিন্দুনারী' পরিচয়ে আমাদের সমাজ জাতি ও দেশানুযায়ী সতীত্ব-সংজ্ঞায় নিজেদের পরিচয় এবং সার্থকতা জানাইতে হইবে।

অতএব মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্বই হইতেছে সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সতীত্ব কিছুতেই মনুষ্যত্বের উর্দ্ধে স্থানলাভ করিতে পারে না। কারণ উহা পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের একটা প্রধান অঙ্গ মাত্র। মনুষ্যত্বশূন্য সতীত্বও পৃথিবীতে আছে বটে, কিন্তু তাহা কখনও সর্ব্বোচ্চ স্থানলাভ করিতে পারে না। 'মনুষ্যত্বশূন্য সতীত্ব' কথাটা বলিলাম বলিয়া কেহ হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইবেন না, ধীরভাবে এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

---

* কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে।। গীতা, ৩য় অধ্যায়।

যেহেতু সতীত্বের স্বরূপতঃ কোনও মূল সংজ্ঞা বা নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই। যুগে যুগে 'সতীত্ব' বিভিন্ন রূপে এবং বিভিন্ন প্রথায় পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে এবং আসিতেছে, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের অসংখ্য শাস্ত্র পুরাণ ছাড়িয়া দিলেও শুধু মূল মহাভারতখানি খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের যুগে যাহা সতীত্বের অন্তর্গত ছিল, আধুনিক যুগে তাহা অসতীত্বের চরম নিদর্শন। বর্ত্তমান সভ্য জগতে যদিও সমাজের মূল-ভিত্তিই হইতেছে নারীর সতীত্ব, কিন্তু তথাপি এই সতীত্ব ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজে বিভিন্ন নিয়মে প্রবর্ত্তিত দেখা যায়। সার্ব্বজনীনভাবে বা সমগ্র বিশ্বের অনুমোদিত—ইহার কোনও রূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই এবং হওয়াও অসম্ভব! কারণ স্ব স্ব সমাজের প্রয়োজন অনুসারেই সতীত্বের মর্য্যাদা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাহা এক দেশে ও এক সমাজে অসতীত্বের চরম নিদর্শন, ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতিতে হয়ত তাহাই সতীত্বের আদর্শের অন্তর্গত—ইহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন; সুতরাং সতীত্বের স্বরূপতঃ মূল সংজ্ঞা যে কিছু নাই, ইহা বলিলে, আশা করি, অন্ততঃ শিক্ষিত সজ্জনেরা আমাকে গুরুতর অপরাধিনী মনে করিবেন না।

আমি আমাদের হিন্দুসমাজের দিক হইতে 'সতীত্ব' শব্দের অর্থ যাহা করিয়াছি, হিন্দুর পক্ষে তদপেক্ষা উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর সতীত্বের সংজ্ঞা আরও কিছু আছে কি না, আমার জানা নাই। এই প্রবন্ধে যে 'সতীত্ব-সংজ্ঞা' নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র হিন্দুনারী এবং হিন্দু সমাজেরই বৈশিষ্ট্য। অহিন্দু জাতি ও অহিন্দু সমাজে উহা স্বীকৃত না'ও হইতে পারে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, যাহা মনুষ্যত্বের হানি করে, মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব ও সঙ্কুচিত করিয়া আনে, তাহা কখনও উচ্চ আসন লাভ করিবার যোগ্য নহে। কারণ মানব-জীবনে আমি মনুষ্যত্বকেই সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বোচ্চে বরণীয় মনে করি। সতীত্বকে আমি নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ এবং বিশেষভাবে হিন্দুনারীর মেরুদণ্ড বলিয়া বিশ্বাস করি। মনুষ্যত্ব ও নারীত্বকে আরও উজ্জ্বলতর রূপে বিকশিত করিয়া তোলে নারীর সতীত্ব। সুতরাং শুদ্ধ সতীত্ব যে মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক নহে বরং প্রসারক, এই ধারণাই আমি আমার প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

মনুষ্যত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বিকশিত হয় সংযমে, বিবেকের ব্যবহারে ও আত্মপ্রসারণে। যে সকল সতী স্বামীকে ব্রহ্মেরই প্রতীক্ বা ঈশ্বরের সাকার বিগ্রহরূপে বরণ করিয়া একনিষ্ঠ প্রেমে স্বামীর প্রতি অনন্যানুরাগিণী হ'ন—, তাঁহাদের মধ্যে সংযম, বিবেক ও প্রসারতা সমভাবে বিদ্যমান থাকে; কারণ ঐ গুণগুলি ব্যতীত একনিষ্ঠ প্রেম বা অনন্যানুরাগ লাভ করা অসম্ভব। যিনি প্রকৃত সতী, স্বামীর প্রতি যাঁর সুগভীর ঐকান্তিক প্রেম ও অচলা ভক্তি বিশ্বাস সুরক্ষিত,—বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব, দেবত্ব,—সদ্‌গুণ ও আনন্দকর বস্তুর আকর্ষণ সেই সতীকে তাঁহার ইষ্ট হইতে স্খলিতা বা বিচলিতা করিতে সমর্থ হয় না।

হিন্দু দর্শনের কথা তুলিয়া প্রতিবাদকারিণী সর্ব্বশেষে এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে 'অসত্য' 'অশিব' ও 'অসুন্দর' বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিবার বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও উপস্থিত প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধি ভয়ে সামান্য দুই-একটি সহজ ও সরল কথায় আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

যিনি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এই পরিদৃশ্যমান লীলাময় জগৎকে 'অসত্য' ও 'অসুন্দর' বলিয়া জানাইয়াছেন, তাঁহার এটাও জানা উচিত ছিল, যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' প্রভৃতি মহাবাক্যগুলি তত্ত্বদ্রষ্টা ব্রহ্মদর্শী ঋষিদের অনুভূতিজাত সত্য বাক্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে গেলে, জগতে যে আর কিছুই 'অশিব' 'অসুন্দর' ও 'অসত্য' অবশিষ্ট থাকে না! এবং ও-সবের সত্তাই যে তখন অন্তর্হিত হইয়া যায়! আনন্দময় চিদঘন সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই যখন এই চরাচর ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, অথবা তিনিই জগৎরূপে প্রকাশমান, তখন 'অসত্য' 'অশিব' ও 'অসুন্দর' কোথায় থাকিতে পারে? এখানে 'অসত্য' 'অশিব' 'অসুন্দর'কে স্বীকার করিতে গেলে, ব্রহ্ম ব্যতীত আরও একটা কিছু স্বীকার করিতে হয় না কি? স্বরূপতঃ চিন্তা করিলে চরাচরে কুত্রাপিই এই 'অসত্যে'র অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না।*

•

ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

* এ সম্বন্ধে অতঃপর আর কোন আলোচনা প্রকাশিত হইবে না :—'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

নারীর কর্তব্য

মাননীয় শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের লেখার এবং তাঁর অশেষবিধ সমাজ-কল্যাণকর সৎকর্মমালার সংবাদ আমি বহুকাল হতেই পেয়ে এসেছি। চন্দননগরে যাতায়াতের কালে কৃষ্ণভাবিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সুপরিচ্ছন্ন গৃহখানি আমার অনেকবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নৃত্যগোপাল-লাইব্রেরি ভবনের সম্বন্ধেও আমি সংবাদপত্রে ও লোকমুখে সংবাদ পেয়ে মনে মনে তাঁর মাতৃ-পিতৃভক্তির অজস্র প্রশংসা করে এসেছি এবং মনে মনে এই বলে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি যে, 'আপনার দেশের প্রত্যেক অবস্থাপন্ন লোক যেন আপনার এই মহদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করতে পারে; আপনার এই সাত্ত্বিক দানের ফলে যেন এই দানের আদর্শ আমাদের সমাজে দৃষ্টান্তস্থল হয়ে ওঠে। এ দেশের ধনী যেন আপনার মতো দেশহিতব্রতী হয়।'

আজ তাঁর কাছ থেকে আমি যখন নিমন্ত্রণ পেলেম, যোগ্যতা অযোগ্যতার হিসাব খতিয়ে দেখার অবসর আমার হলো না, আমি সাগ্রহে সম্মত হলেম। মনে হলো, মনের মধ্যে যেন এই কর্মবীরের কর্মের সঙ্গে আমার অন্তরের একটি গোপন সংযোগ ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে; আমার কাছে এ নিমন্ত্রণ কিছুই নূতন ঠেকলো না। এসে পৌঁছে গেলেম।

কিন্তু আসাটা যত সহজ, তার পরের কর্তব্যটা ঠিক তেমন সোজা নয়। আপনারা নারীর শিক্ষা বা কর্তব্য সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার জন্য আমায় এখানে আমন্ত্রণ করেছেন; সে সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতার অনুযায়ী কিছু বলবারও ইচ্ছা আছে, কিন্তু বলতে গিয়ে আমি যে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হইনি তা বলতে পারিনে। বলা কওয়া আমার দিনের চাইতে তার আগের দিনে অনেকখানিই যেন সহজ ছিল, আজকের দিনে আর তা নেই। আজকের দিনে আমাদের বলবার কথা যত বেশি হয়ে উঠেছে, বলবার পথ হয়ে যাচ্ছে ততই সঙ্কীর্ণ। এ কথা শুধু আমিই নয়, অনেকেই হয়ত স্বীকার করবেন। কারুকে কিছু বলতে গেলে, লিখতে গেলেই মনে পড়ে যায়—

ভয়ে ভয়ে বলি কি বলিব আর?

আমাদের মনের মধ্যে স্থূল সূক্ষ্ম অনেক তারই ভাবের সুরে ভরা থাকে, একটুখানি আঙুলের ছোঁয়া লাগার অপেক্ষা; কিন্তু সেই আঙুলের স্পর্শ যদি আনাড়ির স্পর্শ হয় তা হলেই সমস্ত সুর বেসুরা হয়ে যায়, শ্রবণে বিরক্তি উৎপাদন করে মাত্র। শ্রবণেচ্ছায় আসে অবসাদ। আমি এই দু'রকমেরই ভয় করছি। প্রথমত, আজকের দিনের সব কথা, আসল কথা, বলার পথ সেই পথের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে, যে পথকে লক্ষ্য করে আমাদের প্রাচীন কালের ঋষিরা লিখে গেছেন, '—দুর্গম-পথস্তৎ—'

এই দুর্গম পথকে 'ক্ষুরস্য ধারা'র সঙ্গে তাঁরাই সমতুলিত করে গেছেন বলে সেই পথের যাত্রী হতে আমার মতো ক্ষুদ্রপ্রাণ মনুষ্যেরা একটুখানি ভয় রাখে। তা না রাখলে, আজকের দিনের মতো দিনে আপনাদেরও আমায় নিমন্ত্রণ করবার সুবিধা হতো না, আর আমারও আপনাদের নিমন্ত্রণ নেবার সুযোগ থাকতো না। এইসব কারণে কোনো কিছু বলতে গেলে ভেবে দেখে হিসাব খতিয়ে বিচারসিদ্ধ করে নিয়ে তা প্রকাশ করতে হবে।

তারপর দেখুন, আমাদের এই চির-বৈচিত্র্যময়ী নৈসর্গিক নিয়মানুসারেই বহু মত ও বহু পথাবলম্বী নানা ধর্মী এবং নানা কর্মীর সমবায়ে বিচিত্রতর-যাদের জন্য আবহমান কাল হইতেই 'ঋজু কুটিল নানাপথ' সুবিস্তৃত রহিয়াছে, সেই ভারতবর্ষীয়দের মধ্যেও আজকালকার মতো দিনে কোনো উপদেশের মতো কথা বলতে যাওয়া আর তেমন সহজ নেই। উপদেষ্টার অভাব কোনো দেশেই ছিল না, আজও নেই; এ দেশেও তাই; কিন্তু পর-মত-সহিষ্ণুতা এ দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও, এ দিনে যে সে বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপেই সংরক্ষিত আছে, তা বলা চলে না। বিশেষত, আমাদের মতো সেকেলেদের মতামত এই নব্য-তান্ত্রিকতার যথেচ্ছাচারের যুগে একান্তই অসহনীয় হয়ে ওঠা কিছুই বিচিত্র নয়। তাই একটু ভয় রাখতে হয় যে আমার কথা হয়ত বা কারু কারু কানে গিয়ে বেসুরা সুর উৎপাদন করে শান্তির বদলে অশান্তি উৎপাদন করবে।

তবে এ-কথাটাও ঠিক যে, যদি আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাই ঘটে, তবে সে দোষ আমার আনাড়ি আঙুলের; মনোবীণার তার আমার উঁচু সুরেই বাঁধা আছে। আমি আপনাদের কাছে যা বলতে চাই তাতে যদি আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকে, থাক, কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছার কিছুমাত্র অভাব ঘটেনি। যাঁর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই তিনিও, যাঁর সঙ্গে আমার মতের মিল আছে তিনিও যেমনি আমার কাছে আজ এসেছেন, আমিও তেমনিই সবিনয়বাক্যে তাঁদের নিবেদন করে বলছি; আমার মতামত যদি আপনাদের মতের সঙ্গে না মেলে —নাই মিলুক, দুঃখিত তাতে যদি আপনারা হন, সেটুকু স্বীকার করেই নেবেন, কিন্তু তার জন্য পরস্পরের মধ্যে যেন আমাদের মনের মিলের অভাব না ঘটে। পরস্পরকে সহ্য করতে যেন আমাদের না বাধে। পরমত-খণ্ডন-চেষ্টা এ দেশে চিরদিনই হয়ে এসেছে। না হলে ষড়্‌দর্শনের সৃষ্টি হতো না এবং এই অসংখ্য মতবাদের স্থান ধর্মে সমাজে সাহিত্যে থাকত না। কিন্তু পরমত খণ্ডন করা এক, আর বিরুদ্ধ মতবাদীদের মধ্যে দল বন্ধন করে বিরোধকে পাকিয়ে তোলা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। পরমত-সহিষ্ণুতা এ দেশের ধর্ম, পরম ধর্ম,—এ দেশ তর্ক দিয়ে মতবাদ স্থাপন করেছে, কুতর্ক দিয়ে নয়। আর কোনো দেশ এমন করে মত-বিরোধের মধ্য দিয়ে পথ খুঁজে নিতে পারেনি। সহস্রটা চোরা গলিকে নিয়ে এসে একটা সরল রাজবর্ত্মে মিলিয়ে দিতে পারেনি, অসংখ্য নদী তড়াগকে বইয়ে এনে এক মহার্ণবে ডুবিয়ে

দিতে পারেনি, বহুকে একের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। সে এ দেশই পেরেছিল, চিরদিনই পারছে ;—ইচ্ছা করলে আজও পারে, এবং চিরভবিষ্যকাল ধরে পারবেও তা।

এখন আমাদের আসল কথায় পৌছানো যাক।—

নারীর কর্তব্য কি? হয়ত আমাদের এই-ই প্রশ্ন? কিন্তু এ প্রশ্ন কেন ওঠে? নারী কি এ-দেশে ছিলেন না? আজই কি তাঁদের এ দেশে এই প্রথম অভ্যুদয় ঘটলো? কিন্তু তা তো নয়, শাস্ত্রবাক্য আমাদের শুনিয়ে দিচ্চেন ;— পরমাত্মা নিজ শরীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগে পুরুষ এবং তার আর এক ভাগে নারীর সৃষ্টি করেছিলেন,—।

এই যদি সত্য হয়, তাহলে নর এবং নারী একই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পরের সহজাতরূপেই সৃষ্ট হয়েছেন, তাঁদের স্রষ্টাও সেই একই ; এবং সৃজন-উপাদানও তাঁদের বিভিন্ন নয়। অতএব আমরা এইটুকু নিশ্চিতরূপেই জেনে রাখলেম যে নরনারী কোনোদিনই অনন্যসহায়রূপে এই বিশ্বজগতের ঊষর বক্ষে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ স্নেহপ্রেমের বুভুক্ষায় শুষ্ককণ্ঠ লইয়া অভ্যুদিত হন নাই। বিশ্বপ্রভাতেই তাঁরা তাঁদের পরস্পরের স্নেহ প্রেম আশা ও বাসনা পরস্পরকে বিনিময় করিয়া দিয়া রিক্ততার গৌরবে গৌরবান্বিত রূপেই দেখা দিয়েছিলেন। জগতের সেই প্রথম প্রভাতেই সুপ্তিমগ্ন জগদ্বাসী জেগে উঠেছিল তাদের জননীর স্নেহে, ভগ্নীর ভালোবাসায়, পত্নীর অনুরাগে এবং দুহিতার অপরিসীম শ্রদ্ধায় পরিপূরিত হইয়া। কিন্তু আমি তারও আগের থেকে একটুখানি বর্ণনা দোবো। প্রভাত যখন হয়নি, বিশ্ব যখন জাগেনি, সৃষ্টিকর্তা যখন নিজেই সৃষ্টিছাড়া হয়ে পড়েছেন, সেই সময়কার সেই ভয়াবহ এবং অসহায় অবস্থাটুকু তাঁর আমি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিতে চাই ;—

প্রলয়ের কালে যখন কারণ জলে ডুবলো ধরা,
তখন পুরুষ হলেন পরুষহারা, বিশ্ব হলো জ্যান্তে মরা,
আবার এ জগৎ উঠলো জেগে আদ্যা নারীর বীণার তানে
তাই নারী যেথায় সম্পূজিতা নারায়ণের বাস সেখানে।

দেখুন, তাহলে, শুধু সৃষ্টির প্রথমে পরমাত্মা নর এবং নারীকে তাঁর দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করেই যে সৃষ্টি করেছেন, তাও না ; তারও একটুখানি আগে, যখন আদ্যাশক্তি তাঁকে ছেড়ে সরে গেছলেন, যখন সেই পরম-পুরুষ নিষ্ক্রিয় হয়ে নির্গুণত্ব লাভ করে কাজের বার হয়ে গেছলেন! অতএব নর এবং নারীর সৃষ্টি যে পরস্পরকে ছেড়ে হয়নি এবং তাঁদের যে পরস্পরকে বাদ দিয়ে পুনঃ-প্রলয়কাল পর্যন্ত চলতে পারা সম্ভব নয়, এটা আমরা অস্বীকার করতে কোনোমতেই আর পারছিনে।—

নরের এবং নারীর সৃষ্টি যদি একত্রই হয়ে থাকে, তাহলে নরের কর্তব্য এবং নারীর কর্তব্য একসঙ্গেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, এ কথাও অবিসম্বাদীরূপে সত্য বলেই

স্বীকার করে নিতে হয়। 'নারীর কর্তব্য' বলে নতুন কোনো প্রশ্ন যে আজকাল কেন জেগে উঠছে এ কথা আমি ভেবেই পাইনে। যখনই এতদ্বিষয়ে কোনোই প্রশ্ন উঠবে, তখন নর এবং নারী দুজনকার সম্পর্কেই ওঠা সঙ্গত, আমার এই মনে হয়। যেহেতু নরনারী পরস্পর পরস্পর হইতে অভিন্ন। সেই হেতু তাদের কর্তব্যও পরস্পরকে বাদ দিয়ে কোনোমতেই নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। এদের একজনকার সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণ করিতে গেলে, আর একজনকার কর্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন আসিয়া পড়িবেই পড়িবে এবং মীমাংসা করিতে হইবে, দুজনকার কর্তব্যকে তেমনই ভাবেই এক করিয়া লইয়া, যেমনভাবে এক ব্রহ্ম নিজেকে তাদের দুজনকার জন্য দ্বিধা-বিভক্তিত করিয়াছিলেন। তাঁদের কর্তব্য তেমনই ভাবেই মূলত এক হইয়াও বাহ্যত দুই প্রকারের—যেমন তাঁরা একই ব্রহ্মের দুই বিভিন্ন প্রকাশ।

বাস্তবিকই নরের কর্তব্য আর নারীর কর্তব্যে মূলত কোনোই প্রভেদ নাই, স্থূলত দুজনকার কর্তব্যই মোটামুটি এক। তার নীতিসূত্রে সেই 'সত্যং বদ'—'ধর্মং চর' —সেই 'অহিংসা পরমোধর্ম—সেই—'নাস্তি জ্ঞানাৎ পরং তপঃ।'—নর এবং নারীর শিক্ষার এই মূল বিষয়ে কোনোই প্রভেদ নাই, প্রভেদ থাকা উচিত নয়, থাকা অসম্ভব ও অসংগত;—কিন্তু যেমন মূল লক্ষ্যে উভয়ের ধর্ম একই, তেমনই আবার এর একটা দিক আছে, সেটা—এর স্থূল দিক নয়, সূক্ষ্ম দিক। যেহেতু ব্রহ্ম তাঁর শরীরকে একলা রেখে দ্বিধা-বিভক্তিত করেছিলেন, সেই দ্বিধা-বিভাজিত দুইয়ের মধ্যের এককে নর এবং অপরকে নারীরূপে পরস্পরে বিভিন্নধর্মীরূপে তৈরি করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই হেতু স্থূল বিষয়ে মুখ্য বিষয়ে যতই একত্ব থাকুক, সূক্ষ্ম বিষয়ে তাঁদের মধ্যে একটুখানি প্রভেদ আছে, এ কথা মানতেই হবে। যতই আমরা মানতে না চাই, তবু সেই শেষকালে তর্কের শেষে মেনে নিতে বাধ্য হবোই যে, হ্যাঁ, তা আছে; নারীর কর্তব্য এবং নরের কর্তব্যে একটুখানি প্রভেদ আছে; এবং নৈসর্গিক নিয়মানুসারেই সেটুকু যেন থেকেই যাবে, যতই আমরা মেয়েরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মরি না কেন, সৃষ্টির শেষ দিনে পর্যন্ত সেটুকু হয়ত নিঃশেষ হয়ে কোনোদিনেই মুছে যাবে না।

'নারীর কর্তব্য' বলে যখন প্রশ্ন ওঠে, তর্ক চলে, মতদ্বৈধ ঘটে, তখন সেইটুকু নিয়েই এ-সব হয়। মূল ধর্ম যে এক এবং অটুট সত্য এবং সনাতন; তার সঙ্গে কারুই কোনো বিবাদ ঘটা সম্ভব নয়। সে ধর্মবলে নর এবং নারী সত্যাচরণ করবেন, ধার্মিক হবেন; জ্ঞানার্জন করাতে দুজনকারই অধিকার আছে। নরের সততা এবং নারীর সতীত্ব কোনোটিই তুচ্ছ নয়, পরন্তু উভয়েরই এ বিষয়ের সাধনা একাগ্র এবং অপ্রতিহত হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু এরপর নারীর সম্বন্ধে একটী সূক্ষ্ম নারীধর্ম আছে, সেইটির সম্বন্ধে দেশভেদে এবং কালভেদে কখনো কখনো একটু-আধটু পরিবর্তন দেখা দেয় এবং বিবর্তন আসে। এ দেশে এই নারীধর্মের যেমন চরম বিকাশ ঘটিয়াছিল, অন্য কোনো দেশে তেমন ঘটিতে পারে নাই। তার একটু অর্থও আছে,—এই

ভারতবর্ষীয় হিন্দুর মতো এমন সুদীর্ঘজীবী জাতি আর কোনো জাতির ভিতর নাই। সকল জাতিরই পতন-অভ্যুদয় একটা নির্দিষ্ট বর্ষ-শতকের মধ্যেই যেন সীমা-নিবদ্ধ। কেবল এই ভারতবর্ষীয় হিন্দুই বহু সহস্র বর্ষজীবী-রূপে ধরাপৃষ্ঠে আজ বর্তমান রয়ে গেছে। দীর্ঘ জীবন যে অভিজ্ঞতার আঁকর, এ বিষয়ে সংশয় করবার উপায় নেই! ভারতবর্ষীয় হিন্দু তার জাতীয় জীবন গঠনের প্রথম প্রভাত থেকে আরম্ভ করে তার অত্যুন্নতির দীপ্ত মধ্যাহ্নে, আবার তার অবনতির জীবন সন্ধ্যায়, সর্বত্রই তার বিরাট সমাজভুক্ত নরনারীর কল্যাণ-কামনাকে একাগ্রচিত্তে পর্যালোচনা করেছিল। 'নেতি নেতি' করে সে তার সমাজগত নারী-পুরুষের কর্তব্যকে একটার পর আর একটা ধাপে তুলে সম্যকরূপেই পরীক্ষা করে গেছে ; তার প্রত্যেকটি পরীক্ষার ফল আমরা প্রাচীনকালের পুঁথিপত্র হতে জানতে পাবি। তাবপর সেই এক্সপেরিমেণ্টাল স্টেজ পার হয়ে এসে সে যখন তার সমাজকে তার সেই সকল পরীক্ষার ফল দিয়ে লব্ধ পূর্ণ অভিজ্ঞতার বলে এক আদর্শ সমাজে গঠিত করে তুলতে পারলে, তখনই তার মাথার উপর গৌরব-ভাস্কর প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। ভারতবর্ষীয় হিন্দুর যা কিছু নিয়ে আজও এই পরাধীন দৈন্যগ্রস্ত জীবনে গর্ব কববার আছে, সে তার সেই একান্ত শুভদিনেরই দান। আজও যদি সেদিনের সেই মহিমাময় গরিমাদীপ্ত যুগের অত্যুচ্চ আদর্শবাদকে আমরা অনুসরণ না করিতাম, তবে ভারতবর্ষীয় হিন্দুর এই সাতশত বর্ষকালব্যাপী পরাধীন জীবনে এমন কি আছে, যার বলে সে জগৎ সমাজের মধ্যে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে ভরসা করে? কি আছে তার, যার জোরে সে তার বহুদিনের হৃতরাষ্ট্র ফিরিয়া পাওয়ার অধিকার চায়? যার বলে সব হারাইয়াও সে নিঃস্ব নয়, ভিখারী হইয়াও রাজা। সে কি? সেই ভারতীয় সভ্যতা—যে সভ্যতার অংশভাগী হইয়াও গ্রীস রোম মিশর কোথায় কবে ধ্বংস হইয়া গেলেও, যে সভ্যতার পূর্ণ রূপকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকার জন্য, ভারতের নারী-পুরুষ এই বহুতর শতাব্দীর ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও উৎপীড়ন অত্যাচার অধঃপাতের তলায় পড়িয়াও পূর্ণরূপে তলাইয়া যায় নাই, আজও মাথা তুলিয়া অটল অচল দাঁড়াইয়া আছে—এ সেই সর্বশক্তিমৎ ভারতীয় সভ্যতা। যা বহুতর সহস্রাব্দির অভিজ্ঞতা-জ্ঞানলব্ধ কমট-কঠোর তপস্যায় অভীষ্ট দেবতার বরপ্রাপ্তিরূপে পাওয়া। যার জোরে ভারতীয় নরনারী পরাধীনতার মধ্যেও স্বাধীন, বিজিত হইয়াও আজও অপরাজেয়।

সেই ভারতীয় সভ্যতা তার সমাজকে যে আদর্শ দিয়ে গঠন করেছিল, তার বাইরে গিয়ে তার চাইতে বড় আদর্শ ভারতবর্ষের নবনারী আর কোথাও থেকে পেতে পারেন না। যেহেতু অন্য দেশের বর্তমান সমস্ত সমাজেই এখনও গঠনক্রিয়া চলছে ; এমন কোনো মানব-সমাজ আজ পৃথিবীতে বর্তমান নেই যা ভারতবর্ষীয় সমাজের সমকালীন। পরিপক্ক-বুদ্ধি, পরিণত-দেহ বৃদ্ধ যদি শিশুর বা বালকের অনুকরণ করতে যায়, তাতে সে কি রস পায় সেই জানে,—অপরের জন্য প্রচুরতর রূপে সৃষ্টি করে সে নিছক হাস্যরস। ভারতবর্ষীয় নরনারীর মধ্যে যে আদর্শবাদ

রয়েছে, তাকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্য সমাজের আধগড়া কোনো নবীনতর সমাজের আপাত-মনোরম কোনো আদর্শকে গ্রহণ করার তার পক্ষে বৃদ্ধ-শিশুর হামা টানার মতোই অপ্রয়োজনীয় পশ্চাদ্‌বর্তন বলেই মনে হবে। ভারতবর্ষীয় সমাজ ও-সব ধাপ পার হয়ে এসেছে। ও-সব ধাপে সে কখনো যে পা দেয়নি তা নয়। ওগুলো সকল সমাজের পক্ষেই ওপরে ওঠবার সিঁড়ি, বাস করবার গৃহ নয়।

তাই আমার মতে 'নারীর কর্তব্য' যা ভারতবর্ষীয় সমাজ তার গৌরবোজ্জ্বল উন্নতি সমুচ্চ যুগে স্থির করে দিয়েছিল, সেই আদর্শই তার পক্ষে শ্রেয়স্কর ও যশস্কর উচ্চাংশ ;—তার থেকে বার হয়ে তার চেয়ে যথেষ্ট হীনতর আদর্শে নেমে যাওয়া তার পক্ষে একটুও সম্মানের নয়। সুবিধারও নয়। ত্যাগ সংযম শ্রদ্ধা বিশ্বাস এ-সব উচ্চতর জীবের জন্য। আরণ্যকের জন্যই অসংযম অশ্রদ্ধা স্বার্থপরতা এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং তার ফলে প্রতি-বিধিৎসার ঘৃণ্য স্পৃহা। ভারতবর্ষীয় হিন্দু মহিলার পক্ষে এই অসংযমের পথ অনুবর্তনীয় নহে। ত্যাগের পথ কঠোর ও বন্ধুর হলেও সেই পথই শ্রেয়ের পথ, শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নাণি হলেও সেই পথই তাঁদের অনুসরণীয়। যে পথে গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, মদালসা এবং এই সেদিনেও বিদ্যাসাগর মাতা, ভূদেব জননী, সার রাজেন্দ্রের, সার আশুতোষের, সার গুরুদাসের, হরিহর শেঠের গর্ভধারিণীগণ অনুবর্তন করে ঐ সকল পুত্ররত্ন লাভ করেছিলেন, এর চেয়ে সমাজ-হিতৈষণা আমাদের মেয়েরা যে আর কি দিয়ে করতে পারবেন তা আমাব মতো সামান্যার বোধগম্য হয় না। জগৎপূজ্যা ভারতীয়া নারী-সমাজে বৈদেশিক অপুষ্ট সমাজের অনুকরণ, যৌথপরিবারপ্রথা নষ্ট করা, বয়স্ক নরনারীর লালসা-প্রণোদিত স্বেচ্ছা-নির্বাসন, বিবাহ-বিচ্ছেদ, অহিন্দু বিবাহ, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি দ্বারা ভারত-সতীর বৈশিষ্ট্য নাশ করায় সমাজ যে কতখানি মঙ্গল লাভ করিবে, বুঝিতে পারি না। যাদের মধ্যে ঐসব ব্যাপার আছে, তারা কি এ দেশের মেয়েদের চেয়ে খুব বেশি সুখী? এ-সব প্রথা কি সমাজের অপরিণততা প্রমাণ করে না? এগুলি কি মানব-সমাজের আদিমাবস্থা, বর্বরতা প্রতিপাদিত করে না? তা যদি না হইত, বন্য এবং অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মধ্যেই এ-সকল প্রথা আমরা দেখিতে পাইতাম না। এগুলি আমাদের সমাজের সর্ব নিম্নস্তরের মধ্যে প্রচুরতর রূপে বর্তমান থাকিত না। এর বিধি-ব্যবস্থা খুঁজিয়া মিলিত কেবলমাত্র ইয়োরোপীয় শিক্ষিত সমাজে মাত্র!

অতএব ভারতবর্ষীয়া নারীর কর্তব্য নয় যে তার সমাজ-সংস্কার জন্য নব্য-তান্ত্রিক ইয়োরোপীয়ের দ্বারস্থ হয়। তার সমাজ-সংস্কার জন্য তার নিজের ঘরের মধ্যে চাহিলেই সে তার বিধিবিধান খুঁজিয়া পাইবে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, 'আমাদের সমস্ত সমাজ যদি প্রাচীন মহৎ স্মৃতি এবং বৃহৎ ভাবের দ্বারায় আদ্যোপান্ত সজীব সচেষ্ট হইয়া ওঠে—নিজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বহু শতাব্দীর জীবনপ্রবাহ অনুভব করিয়া আপনাকে সরল ও

সবল করিয়া তোলে, তবে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও অন্য সকল দুর্গতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে। সমাজের সচেষ্ট স্বাধীনতা অন্য সকল স্বাধীনতা হইতেই বড়।' ('হিন্দুত্ব')

এখন এই যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে, এই সেই সামাজিক স্বাধীনতার রূপ? পর-সমাজের অনুকৃতিকে কোনোমতেই কেহ সামাজিক স্বাধীনতার নাম দিতে পারেন না। স্বাধীন কথার মধ্যেই এই স্বা-ধী-ন-তা শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট হইয়া প্রকট হইতেছে। তাহা স্ব-অধীনতা, স্বেচ্ছাচার নয়!—

ভারতীয়া নারী স্বতন্ত্র, বিলাসিনী, স্বেচ্ছাচারের স্রোতে আত্মনিমজ্জিতা, 'নহ মাতা কন্যা নহ ভগ্নি, শুধুই প্রেয়সী' এই আদর্শে গঠিতা হইবেন না। তিনি কন্যা, ভগ্নি, গৃহিণী এবং জননী; তিনি প্রথমে আদর্শ সতী, তারপর সুপুত্রের মাতা। তিনি স্বামীর সহধর্মিণীরূপে গৃহে এবং বাহিরে, সংসারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে সর্বত্রই তাঁহার অনুবর্তনশীলা হউন, কিন্তু তাঁর স্বাতন্ত্র্য সর্বথা পরিবর্জনীয়। ভারতবর্ষীয় হিন্দুসমাজ পত্নীকে পতির অনুসারিণী করিয়া তাঁর জন্য সতীধর্ম, সহধর্মিণীর পদ নির্দেশ করিয়া দিয়া তাঁকে তো যথেষ্ট এবং যথার্থ উচ্চাধিকারই প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যদি ভারতীয় পুরুষ তাঁর নিজের আদর্শে সুস্থির থাকিতেন, তবে আজ ভারতীয় নারীর কর্তব্য বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতেই পারিত না। ভারত-সতীর একমাত্র কর্তব্য তার স্বামীর ধর্মের সহায়তা করা; কিন্তু তাঁর অধর্মেরও অনুবর্তন করা ইহা সতীধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। এইখানে অনেকেই ভ্রম করিয়া থাকেন; স্বামীর অধর্মকে তিনি অনুসরণ করিতে বাধ্য নহেন, যেহেতু স্ত্রী স্বামীর সহ-ধর্মিণী! তাঁর সংশ্রব তাঁর ধর্মজীবনের সঙ্গে; অধর্ম-জীবনে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিতা!*

অনুরূপা দেবী

ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩৯

* চন্দননগর পুস্তকাগারের উদ্যোগে নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে ১লা মে তারিখের বিশেষ সভায় পঠিত।

নারীর কর্তব্য

(প্রতিবাদ)

১৩৩৯ সালের শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষে' নারীর কর্তব্য শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পড়লাম। প্রবন্ধ লেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী এ-দেশের পাঠক পাঠিকাদের কাছে সুপরিচিতা। নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, তা যদি বেশ সুনির্দিষ্ট ও সুসম্বদ্ধ হতো তাহলে বলবার কিছু থাকত না। কারণ ভিন্নপন্থী বা ভিন্ন মতবাদীদের আপন আপন আদর্শে অবহিত হয়ে থাকা দোষের নয়, বরং তাঁদের সেই স্বমত-নিষ্ঠা শ্রদ্ধারই যোগ্য। কিন্তু মুসলমান-শাসনের মধ্যযুগে তদানীন্তন দেশকালের প্রয়োজন বোধে স্মার্ত রঘুনন্দনের নবপ্রবর্তিত সামাজিক বিধিব্যবস্থাকে যদি কেউ প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগের সনাতন শাস্ত্রীয় বিধান বলে প্রচার করতে শুরু করেন, তাহলে শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেরই অতি অবশ্য তার প্রতিবাদ করা উচিত। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে সেই চেষ্টাই করা হয়েছে দেখে এ-সম্বন্ধে কিছু বলতে বাধ্য হলেম।

প্রথমেই প্রবন্ধের ভাষা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয়া লেখিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অবশ্য তাঁর ভাষার ভুল ধরবার ধৃষ্টতা আমি রাখি না, তবে প্রবন্ধটি পড়তে গিয়ে পার্বত্য প্রদেশের অসমতল জমিতে হাঁটার মতো ক্রমাগত ঠোক্কর খেতে হয়েছে বলেই ভাষা সম্বন্ধে তাঁর অসতর্কতার বিষয় অল্প একটু উল্লেখ না করে পারলেম না।

প্রবন্ধারম্ভে তিনি লিখেছেন :— 'মনে হলো মনের মধ্যে যেন এই কর্মবীরের কর্মের সঙ্গে আমার অন্তরের একটি গোপন সংযোগ ইতিমধ্যেই ঘটে গ্যাছে; আমার কাছে ঐ নিমন্ত্রণ কিছুই নূতন ঠেকলো না। এসে পৌঁছে গেলেম। কিন্তু আসাটা যত সহজ, তার পরের কর্তব্যটা ঠিক তেমন সোজা নয়। আপনারা নারীর শিক্ষা বা কর্তব্য সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার জন্য আমায় এখানে আমন্ত্রণ করেছেন; সে সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কিছু বলবারও ইচ্ছা আছে, কিন্তু বলতে গিয়ে আমি যে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হইনি তা বলতে পারিনে। বলা-কওয়া আমার দিনের চাইতে তার আগের দিনে অনেকখানিই যেন সহজ ছিল, আজকের দিনে আর তা নেই। আজকের দিনে আমাদের বলবার কথা যত বেশি হয়ে উঠেছে, বলবার পথ হয়ে যাচ্ছে ততই সঙ্কীর্ণ। এ কথা শুধু আমিই নয়, অনেকেই হয়তো স্বীকার করবেন। কারুকে কিছু বলতে গেলে, লিখতে গেলেই মনে পড়ে যায়—

—ভয়ে ভয়ে বলি কি বলিব আর?'

প্রবন্ধ শেষে তিনি লিখেছেন :—'ভারতীয়া নারী স্বতন্ত্রা, বিলাসিনী, স্বেচ্ছাচারের স্রোতে আত্মনিমজ্জিতা, "নহ মাতা নহ কন্যা নহ ভগ্নি, শুধুই প্রেয়সী" এই আদর্শে গঠিতা হইবেন না। তিনি কন্যা, ভগ্নি, গৃহিণী এবং জননী; তিনি প্রথমে আদর্শ সতী, তারপর সুপুত্রের মাতা। তিনি স্বামীর সহধর্মিণীরূপে গৃহে এবং বাহিরে, সংসারে

সমাজে এবং রাষ্ট্রে সর্বত্রই তাঁহার অনুবর্তনশীলা হউন, কিন্তু তাঁর স্বাতন্ত্র্য সর্বথা পরিবর্জনীয়। ভারতবর্ষীয় হিন্দুসমাজ পত্নীকে পতির অনুসারিণী করিয়া, তাঁর জন্য সতীধর্ম সহধর্মিণীর পদ নির্দেশ করিয়া দিয়া তাঁকে তো যথেষ্ট এবং যথার্থ উচ্চাধিকারই প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যদি ভারতীয় পুরুষ তাঁর নিজের আদর্শে সুস্থির থাকিতেন তবে আজ ভারতীয় নারীর কর্তব্য বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতেই পারিত না। ভারতসতীর একমাত্র কর্তব্য তাঁর স্বামীর ধর্মের সহায়তা করা। কিন্তু তাঁর অধর্মেরও অনুবর্তন করা, ইহা সতীধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী।'

সমস্ত প্রবন্ধটির ভাষা এইরকম পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন ভঙ্গিতে কণ্টকিত। স্থানে স্থানে তাঁর রচনায় একটি সুদীর্ঘ বাক্যবিন্যাসের মধ্যেই ভাষার একাধিক বৈষম্য যথার্থই পীড়াদায়ক। যেমন :—'তারপর দেখুন আমাদের এই চিরবৈচিত্র্যময়ী নৈসর্গিক নিয়মানুসারেই বহু মত ও বহুপথাবলম্বী নানাধর্মী এবং নানাকর্মীর সমবায়ে বিচিত্রতর যাদের জন্য আবহমান কাল হইতেই ঋজুকুটিল নানা পথ সুবিস্তৃত রহিয়াছে, সেই ভারতবর্ষীয়দের মধ্যেও আজকালকার মতো দিনে কোনো উপদেশের মতো কথা বলতে যাওয়া আর তেমন সহজ নেই।' ইত্যাদি।

এ প্রবন্ধটি তিনি পয়লা মে চন্দননগরের পুস্তাকাগারের উদ্যোগে নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ সভায় পাঠ করেছিলেন। অতএব এটিকে যদি বক্তৃতা বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে অবশ্য ভাষার গোলমালের জন্য বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবার সময় অনেক বড়ো বড়ো বক্তারও ভাবের আবেগে, উচ্ছ্বাসের মুখে ও ঘনঘন সপ্রশংস করতালির শব্দে উত্তেজিত হয়ে ওঠার ফলে ভাষার প্রতি মনোযোগ অব্যাহত থাকে না। কিন্তু লেখিকা সম্ভবতঃ এ প্রবন্ধটি লিখে নিয়ে গিয়েই উক্ত সভায় পয়লা মে পাঠ করেছিলেন এবং তার আড়াই মাস পরে একখানি প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রের শ্রাবণ সংখ্যায় সেটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং প্রবন্ধটির ভাষা সংশোধন করে নেবার যথেষ্ট সুযোগ ও সময় থাকা সত্ত্বেও তাঁর মতো একজন বিশিষ্টা লেখিকার এই অসাবধানতা-জনিত ভাষার ত্রুটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলে মনে করি।

'নারীর কর্তব্য' সম্বন্ধে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী তাঁর প্রবন্ধে যা বলতে চেয়েছেন সেটা প্রধানতঃ নারীর সামাজিক বা পারিবারিক জীবন সম্বন্ধেই। পরিণত বয়সকালে বিবাহ, স্বেচ্ছানির্বাচিত বিবাহ, অসবর্ণ বা অহিন্দু বিবাহ, বিধবা বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ এবং যৌথ পরিবার প্রথা লঙ্ঘন করা—এই কয়টি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর তীব্র অভিমত প্রচার করেছেন। অথচ, যুক্তিস্বরূপ তিনি কেবলমাত্র প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্ম জীবনাদর্শের মাপকাঠি অবলম্বন করেই অগ্রসর হতে চেয়েছেন। তাঁর অলোচ্য উপরোক্ত নিছক সামাজিক প্রথাগুলি কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বের আদর্শকে ভিত্তি করেও কিছুতেই অবিচলিত থাকতে পারে না। কারণ, সামাজিক প্রথা ও পারিবারিক বিধিব্যবস্থা কালের পরিবর্তন ও প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে যুগে যুগেই পরিবর্তনশীল,

কাজেই সেগুলিকে শাশ্বত বিধান বলে মেনে নেওয়া চলে না। কিন্তু, ভারতের তপোবনবাসী ঋষিগণের দীর্ঘসাধনলব্ধ যে অধ্যাত্মতত্ত্ব, তা শাশ্বত সত্য। এ দুয়ের মধ্যে হয়তো সময়োচিত সন্ধি হতে পারে, কিন্তু চির-অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ হতে পারে না। কারণ, এ দুয়ের মধ্যে একের বিকার অনিবার্য এবং অন্যটি চিরনির্বিকার।

'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া দুর্গম পথস্তৎ—' ইত্যাদি উপনিষদোক্ত সতর্কবাণী ব্রহ্মজ্ঞানপিপাসুর তত্ত্বসন্ধানের পথে যাত্রা সম্পর্কেই উচ্চারিত হয়েছিল, তর্ক বা প্রতিবাদ-আশঙ্কিত মতামত প্রচারের পথে যাত্রা সম্পর্কে নয়। সুতরাং বেদান্তের এই উদ্বোধন মন্ত্রটির খণ্ডাংশ লেখিকা যে-স্থলে ও যে-প্রয়োজনে প্রয়োগ করেছেন তা কতটা সুষ্ঠু ও সঙ্গত হয়েছে সেটা বুধগণের বিচার্য।

শাস্ত্রবাক্যের সুসঙ্গত প্রয়োগ যে স্বমতকে প্রতিষ্ঠিত করার সবিশেষ অনুকূল এ-কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সকল সময়ে সে প্রচেষ্টা বোধহয় নিরাপদ নয়, কারণ, শাস্ত্রবাক্যের অপপ্রয়োগ ঘটলে ফল বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। যাই হোক, উপনিষদোক্ত তত্ত্বজ্ঞানমার্গে যাত্রার এই প্রথম সতর্কবাণী উচ্চারণ করে লেখিকা প্রবন্ধারম্ভে আক্ষেপ করেছেন যে—তাঁর এখনকার দিনের চাইতেও আগেকার দিনে মনের কথা বা মতামত খুলে বলার সুবিধা নাকি সহজ ছিল, কিন্তু আজকের দিনে তাঁর বলার কথা যত বেশী হয়ে উঠেছে, বলার পথ হয়ে যাচ্ছে ততই সংকীর্ণ।

লেখিকার এ উক্তি যে যুক্তিসহ নয়, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর এই চন্দননগরে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে আসতে পারাটাই নয় কি?

আজ এক লাইব্রেরীগৃহে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সভায় বহুলোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি যে প্রবন্ধটি স্বয়ং পড়ে আসতে পেরেছেন, আগের দিন হলে সভা তো দূরের কথা, অন্তঃপুরের প্রাচীরসীমার মধ্যেও এ-সকল বিষয় এমনভাবে আলোচনা করবার সুযোগ সুবিধা ও অধিকার তিনি পেতেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আজকের দিনে তিনি যে সকল বিষয় ভাবতে বলতে বা লিখতে পারছেন, সে যে তাঁর এই অতিনিন্দিত এ যুগের কল্যাণেই একথাটা ভুলে যাওয়া বোধ হয় তাঁর মতো একজন অন্তঃপুরচারিণীর পক্ষে আদৌ সমীচীন হয়নি।

লেখিকা আরো বলেছেন যে—'আমাদের মতো সেকেলের মতামত এই নব্যতান্ত্রিকতার যথেচ্ছাচারের যুগে একান্তই অসহনীয় হয়ে ওঠা কিছুই বিচিত্র নয়।' কথাটা একটু ভেবে দেখবার মতো। মতামতদাতা 'সেকেলে' হলেই নব্যতান্ত্রিকদের কাছে সেটা যদি স্বতঃই অসহনীয় হয়ে উঠতো তাহলে লেখিকার চেয়ে অধিকতর সেকেলে অনেকের মতামত তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিতে পারতো কি? শ্রীমৎ রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, কবি রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী এঁদের মতো সেকেলেদের মতামত বা বাণী এই নব্যতান্ত্রিকতার যথেচ্ছাচারের যুগেও জনে-জনের জপমন্ত্র হয়ে উঠেছে কেমন করে?—সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে 'সেকেলে' মাত্রেরই মতামত একেলেদের পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে না। অসহনীয় তখনই

হয়ে ওঠে, যখন সে মতামত শুধু অযৌক্তিক অর্থহীন বা বিচার বিবেচনাশূন্য অন্ধ গোঁড়ামীর আতিশয্যমাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা ভাববার আছে। আজকের দিনে যাঁরা নিজেদের 'সেকেলে' বলে উল্লেখ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান, তাঁরা ভুলে যান যে একদিন তাঁরাও সকলেই তাঁদের অতীতের তদানীন্তন নবীন যুগেই জন্মেছিলেন এবং সেকালের নব্যতান্ত্রিকতার আবহাওয়ার মধ্যেই বর্ধিত হয়ে উঠেছিলেন। সেদিন 'সেকেলে' ছিলেন তাঁদের পিতৃ-পিতামহীরা। তাঁদের সেই পিতৃ-পিতামহীদের কাছে আজকের 'সেকেলে'রাই ছিলেন সেদিনের 'নব্যতান্ত্রিক'দেরই অন্তর্ভুক্ত। সকল মানুষের জীবনেই একদিন যৌবনের নবীন তারুণ্য নবযুগের নূতন আবহাওয়া নিয়ে আসে। সম্মুখের দিকে অগ্রসর হবার গতিবেগ এনে দেয়। কারণ পশ্চাদ্বর্তন বা অচলত্ব যৌবনের ধর্ম নয়। সেদিনের সে তারুণ্যের সেই সর্ববাধা বিধ্বংসী জোয়ার এদিনে যাদের কাছে শুধু অতীতের নিষ্ফল স্মৃতিতে মাত্র পর্যবসিত, তাদেরই কাছে সে হ'য়ে ওঠে নব্যতান্ত্রিকতার যথেচ্ছাচার দোষে অপরাধী!

যুগে যুগে কালে কালেই এই অভিযোগ হয়ে আসছে যৌবনের বিরুদ্ধে বার্দ্ধক্যের। নবীন ও প্রবীণের এ সংঘর্ষ মানব ইতিহাসের চিরন্তন দ্বন্দ্ব। কাল দুর্নিবার বেগে গতিশীল। সে চিরদিন এগিয়েই চলেছে। একদা যে ছিল যৌবনদৃপ্ত নবীন, আজকের তরুণদের মাঝে সে নিস্তেজ বৃদ্ধ। কালের গতি রোধ করে যৌবনের পথ আগলে দাঁড়িয়ে অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকবার পরামর্শ একশ্রেণীর সেকেলেরা বরাবরই দিয়ে থাকেন, কারণ, তাঁদের সেই বিগত অতীতকালেই একদিন তাঁদের প্রত্যেকের জীবন, নবীন যৌবনের ঐশ্বর্যে ও প্রাচুর্যে সার্থক হয়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছিল, তাই তার মায়া তাঁরা ভুলতে পারেন না। কাজেই তাঁদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব জীবনের বিগত বাল্য ও কৈশোর এবং অতীত যৌবনকালের আদর্শকেই সকলকালের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে না ভেবে পারেন না। এ্ দুর্বলতা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু নিত্য নূতন তরুণ জীবন-যাত্রীদের পথ যে তারা দেখে সম্মুখের দিকে প্রসারিত—তাদের পিছু হেঁটে ফিরে যেতে বললে শুনবে কেন তারা? কাজেই, গোল বেধে যায় এইখানে। প্রবীণের সঙ্গে ঘটে নবীনের নিত্যকালের সংঘর্ষ! প্রাচীনদের কাছে যথেচ্ছাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েও নবীনের দল নব্যতান্ত্রিকতার বিজয় পতাকাই কাঁধে তুলে নেয়। অনাগত যুগের আগমনী গেয়ে তারা সম্মুখের পথেই অগ্রসর হয়ে চলে—জীবনের পরম সার্থকতার সন্ধানে। ভয়কুণ্ঠাহীন দুর্নিবার সে গতি। সে নবীন প্রাতের প্রাণবন্ত তরুণ যাত্রীদলকে যাঁরা সেদিন সভয়ে পিছু ডাকেন, সেই পশ্চাদ্বর্তীদের অতীতের প্রতি মোহ বা প্রীতিকে তারা কোনোদিনই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারে না। কারণ বিগতকালের প্রাচীন যুগে ফিরে যাওয়া, বা বর্তমানের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে স্থাণুত্ব লাভ করা কোনোটাই নবীনের জীবনধর্মের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সমস্ত সেকেলে আর একেলেদের জীবনে এই 'ট্র্যাজেডি' চিরকালই ঘটে আসছে

এবং আসবেও। আজকের নব্যতান্ত্রিকরাও আবার ভবিষ্যতে একদিন 'সেকেলে' হ'য়ে নিশ্চয়ই —পিতৃ-পিতামহদের মতোই নিজ নিজ পৌত্র প্রপৌত্রদেরও এই 'নব্যতান্ত্রিকতার যথেচ্ছাচার' অভিযোগেই তীব্র তিরস্কার করবেন। এমনিই হয়ে থাকে।

লেখিকা তাঁর এই প্রবন্ধে বারম্বার সবিনয়ে অনুরোধ করেছেন বটে, যে, কেউ যেন তাঁর এ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করে তাঁকে না অশান্তিতে ফেলেন। এমন কি তিনি ধর্মের দোহাই দিয়েও বলেছেন যে—'পরমত সহিষ্ণুতা এ দেশের ধর্ম—পরম ধর্ম।' একটু পরেই কিন্তু আবার এ-কথাও স্বীকার করেছেন যে :— 'পরমত খণ্ডন চেষ্টা এদেশে চিরদিনই হয়ে এসেছে, তা না হলে ষড়দর্শনের সৃষ্টি হতো না। এবং এই অসংখ্য মতবাদের স্থান ধর্মে সমাজে সাহিত্যে থাকতো না। কিন্তু পরমত খণ্ডন করা এক আর বিরুদ্ধ মতবাদীদের মধ্যে দল বন্ধন করে বিরোধকে পাকিয়ে তোলা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।' তিনি এত কথা বলা সত্ত্বেও তাঁর সেই বহু-আশঙ্কিত প্রতিবাদ লিখতে কেন যে আমি বাধ্য হয়েছি তার কারণ প্রবন্ধের প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছি। তবে দলবন্ধন করে বিরোধকে পাকিয়ে তোলার দুরভিসন্ধি যে আমার কিছুমাত্র নেই এ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

লেখিকা বলেছেন :— 'আর কোনো দেশ এমন করে মত-বিরোধের মধ্য দিয়ে পথ খুঁজে নিতে পারেনি। অসংখ্য নদী তড়াগকে বহিয়ে এনে এক মহার্ণবে ডুবিয়ে দিতে পারেনি। বহুকে একের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। সে দেশই পেরেছিল, চিরদিনই পারছে, ইচ্ছা করলে আজও পারে এবং চির-ভবিষ্যকাল ধরে পারবেও তা।'

লেখিকার এই স্বাজাত্যাভিমানের গর্বিত উক্তি আমাদের কানে বেশ শ্রুতিমধুর লাগে বটে, এর মূলে সত্য কতটুকু আছে সন্ধান করতে গেলেই মুশকিল বাধে এবং সব উৎসাহ কর্পূরের মতো উবে যায়।

এদেশের ইতিহাস এবং জাতির বর্তমান অবস্থা আমাদের বলে, সকল মতবিরোধকে এক পথে এনে এক মহার্ণবে ডুবিয়ে দিতে এদেশই কোনোদিন পারেনি এবং আজও পারছে না! তবে ভবিষ্যৎকালে পারবে কিনা সে কথা জ্যোতির্বিদেরা বলতে পারেন। দেশের দিকে চেয়ে আমরা দেখতে পাই বৈদান্তিকের দল থেকে আরম্ভ করে শৈব শাক্ত গাণপত্য বৈষ্ণবাদি বহুবিধ ধর্মমত এ দেশেই সম্ভব হয়েছে। এমন কি হালের 'আদি', 'সাধারণ' ও 'নববিধান' এবং 'রামকৃষ্ণ', 'বিজয়কৃষ্ণ', 'দয়ানন্দ', 'পাগল হরনাথ' 'সৎসঙ্গ' ইত্যাদি নিয়ে অসংখ্য দল ও অসংখ্য ধর্মমত বর্ষার ভেকছত্রের মতো ভারতবর্ষের বুকে নিয়ত গজিয়ে উঠেছে এবং উঠছে। এক বৈষ্ণবধর্মেরই অসংখ্য শ্রেণী। দক্ষিণভারতে আবার তাদের তিলককাটার ভঙ্গি নিয়েও দলাদলি। 'Y' আর 'U' তিলকধারী বৈষ্ণবদের পরস্পরের মধ্যে দাঙ্গা হতেও দেখেছি। শুধু ধর্মমতেই যে এই বৈষম্য তা নয়, জাতিভেদও এ দেশে অসংখ্য।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র পুরাণের এ চতুর্বর্ণ ক্রমশঃ ভাগ হয়ে হয়ে যে কত চুরাশী লক্ষ হয়ে উঠেছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। এ ছাড়া আছে আবার কায়স্থ, নবশাক, জলাচরণীয়, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ, পঞ্চম আরো কত কি! এক হিন্দু সম্প্রদায়ের ভিতরই কত না বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন বিভেদ। একই প্রদেশের অধিবাসী একই হিন্দু জাতির মধ্যেই নানা সম্প্রদায় শ্রেণী ও জাতিভেদ দেখা যায়। এমন কি সাধারণ নিয়ম নিষেধ সমাজবিধি রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার সকল বিষয়েও এ দেশের সর্বত্র বিষম অনৈক্য!

এইসব শত শত ধর্মমত, শত শত জাতি সম্প্রদায় শ্রেণী বিশেষের আবার ভিন্ন ভিন্ন সমাজবিধি, তাদের প্রত্যেকের আবার কত সহস্র বিভাগ, লক্ষ মত ও লক্ষ পথের কোলাহল মারামারি দাঙ্গার মধ্যে এদেশ এবং এ জাত আজ বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। যে দেশে বেদান্তের ব্রহ্মসূত্র ও ষড়দর্শনের মতো উচ্চ অধ্যাত্মবিদ্যা ব্যাঘাত হয়েছিল সে দেশে অস্পৃশ্যতাবাদের মতো হীন সংকীর্ণতার অস্তিত্ব কি বিস্ময় ও বেদনাকর নয়! ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথা আজ লজ্জাবনমিত শিরে দেশবাসীদের স্বীকার করতেই হবে যে কস্মিনকালেও কোনো বিষয়েই ভারতে আসমুদ্র হিমাচল একমত বা একপথ গড়ে ওঠেনি। এমন কি বৌদ্ধধর্মের সুবর্ণ যুগেও নয়। চিরটাকালই বিভিন্নতর খণ্ডরাষ্ট্র, পরস্পর বিরোধী বিভিন্নতর ধর্মমত, বিভিন্নতর বিপরীত সমাজবিধি ও রীতিনীতির অনুসরণ করে ভারতবাসীরা নিজেদের মধ্যে ক্রমাগত নানা অনৈক্য ও বিরুদ্ধ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শত্রুতার সৃষ্টি করে নিজেদের শতধা-বিভক্ত, দুঃস্থ ও দুর্বল করে ফেলেছে, এবং তারই অনিবার্য পরিণাম পরম্পরায় সে আজ এমন শোচনীয় অধঃপতনের মধ্যে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছে।

'নারীর কর্তব্য' শীর্ষক প্রবন্ধ-লেখিকার প্রগাঢ় স্বদেশ প্রেম যথার্থই প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁর লেখনী ভারতের গৌরব বর্ণনা করতে যতখানি রঙীন কল্পনার আশ্রয় নিয়েছে, ততখানি ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান রাখতে পারেনি। তা যদি পারতো তাহলে এরূপ প্রবন্ধ লেখার জন্য তিনি লজ্জিত হ'য়ে পড়তেন। 'ভারতনারী তথা ভারতসতীকে' তিনি 'জগৎপূজ্যা' আখ্যায় অভিহিত করে আমাদের প্রাণে যথেষ্ট আত্মতৃপ্তি ও আত্মগৌরবের আনন্দ দান করেছেন বটে,—কিন্তু সত্যের মর্যাদা রাখতে হলে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে কোনো কোনো 'ভারতনারী'—'ভারতপূজ্যা' হয়েছিলেন বটে, কিন্তু জগৎপূজ্যা তাঁরা কোনোদিনই হয়ে উঠতে পারেননি। যতবড়ো লজ্জা ও বেদনার কথাই হোক না কেন এটা—তবু এ রূঢ় বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করি কেমন করে? 'ভারতনারী' আজও পর্যন্ত এমন কোনো কাজই করতে পারেননি —যার জন্য সমস্ত জগৎ তাঁকে পূজা দিতে পারে। স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিয়ে সতীর প্রাণত্যাগ আমাদের কাছে হয়তো খুব বড়ো আদর্শ, কিন্তু জগৎ আজও এটাকে মনে করে অমানুষিক বর্বরতা।

'বুদ্ধ' বা 'খৃষ্টের' ন্যায় মহাপুরুষদের যেমন 'জগৎপূজ্য' বলা যেতে পারে

তেমনি তাঁদের সাথে সমানে নাম উচ্চারণ করতে পারা যায় এমন নারী ভারতে কেন পৃথিবীতেই একাধিক জন্মেছেন কিনা আমার জানা নেই। প্রবন্ধ-লেখিকাও কারুর নাম করতে পারেননি। এবং পারবেন কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তিনি সম্ভবতঃ 'দেশপূজ্যা' ও 'জগৎপূজ্যা'য় গোলমাল করে ফেলেছেন। জগৎটা অত্যন্ত বিশাল ও উদার। কাজেই 'জগৎপূজ্যা' হতে হলে প্রাণটা বিশাল হওয়া চাই; এবং অনেকখানি ঔদার্য থাকাও প্রয়োজন। ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার গণ্ডির মধ্যে থেকে তা হওয়া যায় না। জগতের সঙ্গে তাঁর মনের আদানপ্রদান হওয়া দরকার। বিশ্বের সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার নিবিড় যোগ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকাও অত্যাবশ্যক।

সে যাই হোক, লেখিকা এইবার প্রশ্ন করেছেন :— নারীর কর্তব্য কি? হয়তো আমাদের এই-ই প্রশ্ন? কিন্তু এ প্রশ্ন কেন ওঠে? নারী কি এদেশে ছিলেন না? আজই কি তাঁদের এদেশে এই প্রথম অভ্যুদয় ঘটলো?

তারপর আবার অন্যত্র বলেছেন :— 'নারীর কর্তব্য বলে নতুন কোনো প্রশ্ন যে আজকাল কেন জেগে উঠেছে একথা আমি ভেবেই পাইনে। যখনই এতদ্বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উঠবে তখন নর এবং নারী দুজনকার সম্পর্কেই ওঠা সঙ্গত আমার এই মনে হয়।'

এ কথার উত্তরে বলা যেতে পারে—এ প্রশ্ন নূতন নয়। নারী সকল দেশে ও সকল কালেই আছেন এবং থাকবেনও। তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন এবং তার নির্দেশ চিরকালই আছে এবং থাকবেও। 'নারীর কর্তব্য' সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমাদের দেশের অনেক পুঁথি ও সংহিতার আয়তন আরো ক্ষীণ হতে পারতো। সকল দেশেই প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক কালে নর ও নারীর কর্তব্যের প্রশ্ন উঠে আসছে এবং যুগোপযোগী ও দেশকালোপযোগী তার এক একটি মীমাংসা ও নির্দেশও হয়ে আসছে। যতদিন মানবসভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছে, মানুষ যতদিন পরিবার ও গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রাধীন জীবনযাপন করতে শিখেছে, ততকালই এ প্রশ্ন চলে আসছে। এ নূতন কিছু নয়।

তারপর নারীর কর্তব্যের প্রশ্ন উঠলেই যে সঙ্গে সঙ্গে নরেরও কর্তব্যের প্রশ্ন ওঠা সঙ্গত এরূপ মনে করারও কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। নারীর কর্তব্য ও নরের কর্তব্য এ দুয়ের সকল দিক দিয়েই বহু পার্থক্য। জগতের কোনো দেশেই নারী—আজও পর্যন্ত—নরের অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে কোনোদিনই চলতে পারেননি। দুর্গম পথের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক—ধর্মে, রাষ্ট্রে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে, ইতিহাসে, পুরাতত্ত্বে কোথাও কোনো সহজ পথেও নরের পদচিহ্নের পাশাপাশি নারীর পদপল্লবাঙ্ক দেখতে পাওয়া যায় না। নরের কর্তব্যেরই উপর ভিত্তি করে জগতে এই বিরাট মানব সমাজ ও মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছে। নারী কেবলমাত্র নরের জননী, এ ছাড়া আর তার নিজস্ব কোনো গৌরবময় পরিচয় কোনোখানেই খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রবন্ধ লেখিকাও শেষ পর্যন্ত

নারীর এই বিশেষত্বটুকুকেই তাঁর একমাত্র অবলম্বন করে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছেন দেখা গেল। কিন্তু সেখানে এ কথাটা বোধ হয় তিনি ভেবে দেখেননি যে—নারী যে নরের জননী হয়—সে তো প্রকৃতিরই অমোঘ বিধানে! এর মধ্যে তাঁর নিজের কৃতিত্ব কোথায়? এদেশে নারী তার নিজের কর্মজাত, মস্তিষ্কজাত, কল্পনাজাত, শক্তিজাত বা গবেষণা ও অনুসন্ধানজাত কোনো সৃষ্টি, আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের কোনো পরিচয়ই জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। নারীর প্রগতি যেখানে নরের তুলনায় এত বেশী পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছে, সেখান নারীর কর্তব্যের প্রশ্ন উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে নরের কর্তব্যের প্রশ্ন ওঠারও বিশেষ কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না। নরের যা কর্তব্য তা মানবজাতির প্রাথমিক উন্নতি উৎকর্ষ ও সভ্যতার শুরু হতে চিরদিন আপনা আপনিই উঠে চলেছে সারা পৃথিবী জুড়ে। এবং তারই ফলে গড়ে উঠেছে বিধাতার সৃষ্ট এই জগতের বুকে মানবের সৃষ্ট এক নূতন জগৎ! সে জগতে নারী নরেরই শক্তির ছায়ায় নিরাপদে গৃহনীড়ে থেকে পুরুষের পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামবিধান এবং তার সন্তান পালন নিয়েই দীর্ঘ যুগ কাটিয়ে এসেছে। কাজেই, নারীর কর্তব্যের প্রশ্ন ও উত্তর হয়তো এতকাল সামান্যই ছিল; কারণ সর্ববিষয়ে পতির অনুসারিণী হওয়া, সন্তান পালন করা ও গৃহের সৌষ্ঠব সাধন করা —এই তিনটি কাজই ছিল তার জীবনের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু আজ যুগদেবতার দুর্নিবার গতিবেগে দেশকালের প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। পুরুষের জীবনযাত্রার প্রণালীও আজ একেবারে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কাজেই, সেদিন নারীর কর্তব্য যা ছিল আজও যে ঠিক তাই আছে এমন কথা বলা চলে না। সুতরাং নারীর কর্তব্যের প্রশ্ন ওঠা কিছুমাত্র অবান্তর বা অনাবশ্যক নয়। বরং এটা খুবই সময়োচিত এবং স্বাভাবিক। তারপর লেখিকা আমাদের নরনারীর জন্মেতিহাস বা মানবজাতির মূল সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝাবার জন্য লিখেছেন—'শাস্ত্রবাক্য আমাদের শুনিয়ে দিচ্ছেন,—পরমাত্মা নিজ শরীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে একভাগে পুরুষ এবং তার আর এক ভাগে নারীর সৃষ্টি করেছিলেন।'

পরমাত্মা নিজ দেহকে দু'ভাগে বিভক্ত করে নর ও নারী সৃষ্টি করেছিলেন কিনা, অথবা তিনি নিজেকে অবিভক্ত রেখেই 'একোহং বহুষ্যাম্' এই সিসৃক্ষা হতে নিজের একাংশে বিশ্বসৃষ্টি করেছিলেন—সে সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ নর ও নারী না হয়ে প্রথমে ধ্বনি (ওঙ্কার) এবং তারপর ক্ষিত্যপতেজমরুদ্ব্যোম্ এই পঞ্চভূতের একটি হতে অপরটির উদ্ভব হয়েছিল কিনা, প্রাণীসৃষ্টিকালে যথাক্রমে উদ্ভিজ্জ প্রাণী, স্বেদজ প্রাণী, অণ্ডজ প্রাণী ও জরায়ুজ বিবিধ প্রাণী সৃষ্ট হবার পর সর্বশেষ মানবজাতির সৃষ্টি হয়েছিল কিনা—শাস্ত্রীয় সৃষ্টিতত্ত্বের এসব জটিল তর্ক তাঁর সঙ্গে না করেও যদি তাঁর এই অনির্দিষ্ট শাস্ত্রবাক্যটিকে নির্ভুল বলে মেনেও নিই, তবুও কিন্তু অল্প কথায় এ আলোচনা সমাপ্ত করতে পারবো বলে আশা দেখছি না। কারণ, লেখিকা তারপরেই এমন একটি অদ্ভুত ও কাল্পনিক মতবাদ প্রচার করেছেন যা প্রাচ্য কিম্বা

পাশ্চাত্য কোনো দেশের নরনারীর সমাজতত্ত্বে বা মানবজাতির জন্মেতিহাসের কোনো পৃষ্ঠাতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি লিখেছেন :—

'বিশ্ব প্রভাতেই তাঁরা তাঁদের পরস্পরের স্নেহ প্রেম আশা ও বাসনা পরস্পরকে বিনিময় করিয়া দিয়া রিক্ততার গৌরবে গৌরবান্বিত রূপেই দেখা দিয়েছিলেন। জগতের সেই প্রথম প্রভাতেই সুপ্তিমগ্ন জগদ্বাসী জেগে উঠেছিল তাদের জননীর স্নেহে ভগ্নীর ভালোবাসায় পত্নীর অনুরাগে এবং দুহিতার অপরিসীম শ্রদ্ধায় পরিপূরিত হইয়া।'

কিন্তু আদিম মানবের ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের প্রথম অধ্যায়ে আমরা নর ও নারীর যে রূপ দেখতে পাই তাতে পরস্পরের স্নেহ প্রেম আশা ও বাসনা বিনিময় করে দেওয়া দূরে থাক, বরং তার বিপরীত ব্যবহারই চোখে পড়ে। আদিম নর ও নারীর মধ্যে স্নেহ প্রেম প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলি মোটেই তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল ছিল না। সেদিন তাদের হৃদয়বৃত্তি ছিল অনেকটা বন্য পশুরই মতো অথবা তাদের চেয়েও হিংস্র ও স্থূল ছিল। কারণ, সেদিন স্বজাতীয়ের মাংস ভক্ষণেও তাদের কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ হতো না। নারী তখন পুরুষের সম্পত্তিমাত্র রূপে গণ্যা হতো এবং একাধিকবার বলিষ্ঠতর পুরুষের হস্তান্তর হওয়ায় তাদের বিন্দুমাত্র বাধা ছিল না। দৈহিক শক্তিই ছিল তখন মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং পশুর সঙ্গে তার খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। সুতরাং জগতের সেই আদিম প্রভাতেই জগদ্বাসীর পক্ষে তাদের জননীর স্নেহে, ভগ্নীর ভালোবাসায়, পত্নীর অনুরাগ এবং দুহিতার অপরিসীম শ্রদ্ধায় পরিপূরিত হয়ে জেগে ওঠা—একবারেই ঔপন্যাসিকের স্বপ্ন! ঐতিহাসিকের সত্য তা নয়। ইতিহাস বলে—সেদিন তারা তাদের জননী ভগ্নী দুহিতা বা পত্নীকে সব সময় ঠিক চিনতেই পারতো কিনা সন্দেহ! পত্নীর তো কোনো অস্তিত্বই ছিল না তখন। মানবজাতির ইতিহাসে বিবাহবিধির প্রচলন বা পতি-পত্নীর সম্বন্ধ প্রবর্তন তাদের সেই প্রথম প্রভাতে জেগে ওঠার অনেক পরের ঘটনা। মানবসভ্যতা ও সমাজতত্ত্বের ক্রমানুসন্ধান করলে দেখা যায় রক্তসম্পর্কীয়া নারীকেও পত্নীর সম্বন্ধে টেনে নেওয়ায় সেই অসামাজিক মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বাধাই ছিল না। এবং কে কার দুহিতা ও কে কার জননী তা নির্ণয় করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল।

এই প্রসঙ্গে লেখিকা 'একটি ছড়া' উদ্ধৃত করে শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের আরও একটু আগের কথা শুনিয়ে দিতে চেয়েছেন; কিন্তু আমরা শ্রুতির চেয়েও আগেকার কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থের সন্ধান এখনো পাইনি। সেই শ্রুতি বলেন, সৃষ্টির পূর্বে নাকি ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই নির্গুণ, নির্বিশেষ, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়রূপে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর সেই 'একোহং বহুষ্যাম্' এই ইচ্ছাশক্তি থেকেই জগৎ সংসারের উৎপত্তি বা সৃষ্টি হয়েছে। শ্রুতির মতে ব্রহ্ম থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সমস্তরই উৎপত্তি এবং ব্রহ্মেই তাদের স্থিতি ও লয়। সুতরাং—

প্রলয়কালে যখন কারণজলে ডুব্‌লো ধরা।
তখন পুরুষ হলেন পরুষ-হারা
বিশ্ব হলো জ্যান্তে মরা।।
আবার এ জগৎ উঠলো জেগে
আদ্যানারীর বীণার তানে।
তাই, নারী যেথায় সম্পূজিতা
নারায়ণের বাস সেখানে।।

লেখিকার উদ্ধৃত এই শ্লোকটি নির্বিচারে মেনে নেওয়া চলে না। অথচ এই নিয়ে তর্ক করতে বসলে এখনি দ্বৈত-অদ্বৈতবাদের চিরন্তন প্রশ্ন এসে পড়বে, এবং পারমার্থিক সত্য ও ব্যবহারিক সত্য নিয়ে এ বিষয়ে একটা বোঝাপড়া করতে গিয়ে 'উত্তর-মীমাংসা' থেকে 'পূর্ব-মীমাংসা' পর্যন্ত টান পড়বে। তাই আমি এ প্রতিবাদের প্রথমেই বলেছি যে 'নারীর কর্তব্য' শীর্ষক প্রবন্ধে বেদান্তের জ্ঞানকাণ্ড হতে যুক্তি প্রয়োগ কোনোদিক দিয়েই সঙ্গত হতে পারে না। বরং কর্মকাণ্ড হতে এর কিছু কিছু যুক্তিগ্রহণ সুষ্ঠু হলেও হতে পারতো। এ প্রবন্ধে ঐ সকল জটিল দার্শনিক তত্ত্বের অপ্রামাণিক ও ভ্রান্ত মতামত অবতারণা করা শুধু অবান্তরই নয়, 'ধান ভানতে শিবের গীত' গাওয়ার মতোই একান্ত নিরর্থক।

অতএব ওসব অবান্তর ও অনাবশ্যক প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে লেখিকা তাঁর আসল বক্তব্য সম্বন্ধে যা বলেছেন—তাই নিয়েই একটু সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। তিনি 'সত্যং বদ' 'ধর্মং চর' 'নাস্তি জ্ঞানাৎ পরং তপঃ' 'অহিংসা পরমোধর্মঃ' ইত্যাদি কয়েকটি বহুবিশ্রুত সংস্কৃত নীতিবাক্যের ব্যবহার করে বলেছেন—

'নর নারীর কর্তব্যে মূলতঃ কোনোই প্রভেদ নাই, স্থূলতঃ দু'জনকার কর্তব্যই মোটামুটি এক।'

'নর এবং নারীর শিক্ষার মূল বিষয়ে কোনোই প্রভেদ নাই, প্রভেদ থাকা উচিত নয়, থাকা অসম্ভব ও অসঙ্গত।'

এই কথাগুলি পড়ে অনেকেই হয়তো মনে করবেন যে লেখিকার মতে নরের যা কর্তব্য, তাই নারীরও কর্তব্য। কিন্তু তা নয়। লেখিকা তারপরই আবার বলেছেন :— 'কিন্তু যেমন মূল লক্ষ্যে উভয়ের ধর্ম একই, তেমনই আবার এর আর একটা দিক আছে, সেটা—এর স্থূল দিক নয়, সূক্ষ্ম দিক। যেহেতু ব্রহ্ম তাঁর শরীরকে একলা রেখে দ্বিধাবিভক্তিত করেছিলেন, সেই দ্বিধাবিভাজিত দুইয়ের মধ্যে একক নর ও অপরকে নারীরূপে পরস্পরে বিভিন্ন ধর্মীরূপে তৈরি করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই হেতু স্থূল বিষয়ে মুখ্য বিষয়ে যতই একত্ব থাকুক, সূক্ষ্ম বিষয়ে তাঁদের মধ্যে একটুখানি প্রভেদ আছে, একথা মানতেই হবে। যতই আমরা মানতে না চাই, তবু সেই শেষকালে তর্কের শেষে মেনে নিতে বাধ্য হবোই যে, হ্যাঁ, তা আছে; নারীর কর্তব্য এবং নরের কর্তব্যে একটুখানি প্রভেদ আছে; এবং নৈসর্গিক নিয়মানুসারেই সেটুকু

যেন থেকেই যাবে, যতই আমরা মেয়েরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মরি না কেন; সৃষ্টির শেষ দিনে পর্যন্ত সেটুকু হয়তো নিঃশেষ হয়ে কোনোদিনই মুছে যাবে না।'

লেখিকার এই পরস্পর বিরোধী মতের অবিরত সংঘাতে আলোচ্য প্রবন্ধটি আগাগোড়াই দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। তিনি তাঁর বক্তব্য কোথাও সহজ ও সুস্পষ্ট করে তুলতে পারেননি এবং সুনির্দিষ্টও করতে পারেননি।

তিনি একবার বলেছেন নর ও নারীর কর্তব্য একই, যেহেতু তাদের সৃষ্টি এক হতেই হয়েছে। অবশ্য এক হতে সৃষ্টি হলেই যে তাদের কর্তব্যও এক হবে এর মধ্যে কোনো যুক্তি নেই, বরং প্রকৃতিভেদে তাদের মধ্যে কর্তব্যেরও ভেদ থাকাটাই সঙ্গত। সে যাই হোক, একটু পরেই কিন্তু লেখিকা স্বীকার করেছেন যে তাদের মধ্যে প্রভেদ আছে। কিন্তু সেটা মূলতঃ ও স্থূলতঃ কিছু নয়। কেবলমাত্র সূক্ষ্ম বিষয়ে তাদের মধ্যে একটুখানি প্রভেদ মাত্র। অথচ এই 'সূক্ষতঃ' প্রভেদটি যে কী এবং কোথায় তা তিনি ইঙ্গিতেও কোথাও কিছু প্রকাশ করেননি। তাছাড়া তিনি যে 'প্রতিজ্ঞা' অবলম্বনে এখানে তাঁর এই সূক্ষ্ম প্রভেদের অবতারণা করেছেন, সে সম্বন্ধে অনেক কিছু বলবার আছে। তিনি বলেছেন—'যেহেতু ব্রহ্ম তাঁর শরীরকে একলা রেখে দ্বিধাবিভক্ত করেছিলেন, সেই দ্বিধাবিভাজিত দুয়ের মধ্যে এককে নর এবং অপরকে নারীরূপে পরস্পরের বিভিন্ন ধর্মীরূপে তৈরি করতে বাধ্য হয়েছিলেন—' ইত্যাদি।

সৃষ্টিতত্ত্বের এহেন অদ্ভুত বিবৃতি এই শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্না লেখিকা যে কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন সেইটাই সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য ঠেকেছে।

ব্রহ্মা বিশ্বসৃষ্টি ফেলে রেখে আকাশ তেজঃ বায়ু জল মাটি সমস্ত বাদ দিয়ে নিজেকে একলা রেখে দুভাগ করে ফেলে একভাগে নর ও অন্যভাগে নারী সৃষ্টি করতে বাধ্য হলেন—এ শাস্ত্রবাক্য মৌলিক বটে, কিন্তু, দুঃখের বিষয়, প্রামাণ্য নয়।

বেদকে হিন্দুজাতি অপৌরুষেয় বলে থাকে। বেদের চেয়েও প্রাচীনতম শাস্ত্র ভারতে আজও আবিষ্কৃত হয়নি শুনি। সেই বেদের উপনিষদবহুল জ্ঞানকাণ্ডের সমস্ত উপদেশগুলির সামঞ্জস্য বিধান করে আচার্য্য বাদরায়ণ ব্যাস বেদান্তমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেন। এবং আচার্য্য জৈমিনি সেই বেদের কর্মকাণ্ডের একটি সুনির্দিষ্ট মীমাংসা প্রণয়ন করেন যা কর্মমীমাংসা বা পূর্বমীমাংসা নামে পরিচিত। লেখিকার উদ্ধৃত সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে শ্রুতিশাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের কোনোই সাদৃশ্য নেই। পূর্বোক্ত ব্রহ্মসূত্রের বহুবিধ ব্যাখা আমাদের দেশের আচার্য্যেরা করে গিয়েছেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, ভাস্করাচার্য্য, নিম্বার্কাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি বহু পণ্ডিত ও মনীষীগণ সৃষ্টিতত্ত্বের বহু বিভিন্ন ব্যাখা দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু লেখিকার উদ্ধৃত শাস্ত্রবাক্যের সমর্থন—অর্থাৎ কিনা ব্রহ্মের 'নিজের শরীরকে একলা রেখে দুভাগ করে নর ও নারী তৈরি করতে বাধ্য হওয়া' তাঁদের কারুর ব্যাখার মধ্যে কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ে না।

নর-নারীর সহজ সাধারণ সামাজিক জীবনের কর্তব্যাকর্তব্য নির্দেশ করতে বসে যদি কেউ স্মৃতি ও সংহিতা ছেড়ে উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব ধরে এ কাজ করতে চেষ্টা করে দেখি, তাহলেই এই প্রবচনটি মনে পড়ে—'কলৌ বেদান্তিনঃ সর্বে ফাল্গুনে বালকাইব—' ইত্যাদি। অর্থাৎ—'ফাল্গুন মাসে হোলির সময় বালকেরা যেমন অর্থ না বুঝেই যত্রতত্র অশ্লীল হোলির গান গেয়ে বেড়ায়, কলিকালেও তেমনি সাধারণে বেদান্তের সম্যক অর্থ না বুঝেই যত্রতত্র তার অযথা প্রয়োগ করে থাকে।' অবশ্য লেখিকাও যে এইরূপই করেছেন এমন স্পর্ধার কথা আমি বলতে চাইনে।

তিনি বলেছেন—'এ দেশে এই নারীধর্মের যেমন চরম বিকাশ ঘটিয়াছিল, অন্য কোনো দেশে তেমন ঘটিতে পারে নাই।' নারীধর্মের চরম বিকাশ কেন যে অন্য কোনো দেশে ঘটেনি তার প্রমাণ স্বরূপ তিনি অন্য সকল দেশ ও জাতির স্বল্প জীবন এবং হিন্দুজাতির সুদীর্ঘ জীবনকে নির্দেশ করেছেন। তাঁর এ যুক্তি যে কতখানি বিচারসহ তা নিয়ে এখানে বৃথা আলোচনা না করে কেবল এ দেশের কথাটাই একটু তলিয়ে দেখা যাক।

প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য, 'নারীধর্ম' বলতে লেখিকা কী বোঝাতে চেয়েছেন? তিনি তো তাঁর মৌলিক শাস্ত্রবাক্যের দোহাই দিয়ে প্রথমে বলেছেন নরনারীর কর্তব্য অভেদ, কেবল সূক্ষ্ম দিক ছাড়া। সুতরাং, তৎকথিত সেই 'সত্যং বদ' 'ধর্মং চর' ইত্যাদিই কি সেই 'নারীধর্ম' না প্রবন্ধ শেষে উল্লিখিত সুপুত্রের জননী হওয়াই তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ 'নারীধর্ম'?

দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই, 'নারীধর্মের চরম বিকাশটা' কি? কোন্ অবস্থাকে তিনি 'নারীধর্মের চরম বিকাশ' বলে মনে করেন? তাঁর প্রবন্ধে এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তরই খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুমানের উপর নির্ভর করে যদি ধরে নেওয়া যায় যে মাতৃত্বকেই তিনি 'নারীধর্মের চরম বিকাশ' বলতে চেয়েছেন, তাহলে কিন্তু আবার ওই 'নারীধর্ম' বস্তুটা কি সেই প্রশ্ন এসে পড়ে!

লেখিকা বলেছেন :— 'ভারতবর্ষীয় হিন্দু তার জাতীয় জীবন গঠনের প্রথম প্রভাত থেকে আরম্ভ করে তার অভ্যুন্নতির দীপ্ত মধ্যাহ্নে, আবার তার অবনতির জীবন সন্ধ্যায় সর্বত্রই তার বিরাট সমাজভুক্ত নরনারীর কল্যাণ কামনাকে একাগ্রচিত্তে পর্যালোচনা করেছিল। "নেতি নেতি" করে সে তার সমাজগত নারী-পুরুষের কর্তব্যকে একটার পর আর একটা ধাপে তুলে সম্যকরূপেই পরীক্ষা করে গেছে; তার প্রত্যেকটি পরীক্ষার ফল আমরা প্রাচীনকালের পুঁথিপত্র হতে জানতে পারি। তারপর তার সেই "এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজ" পার হয়ে এসে সে যখন তার সমাজকে তার সেই সকল পরীক্ষার ফল দিয়ে লব্ধ পূর্ণ অভিজ্ঞতার বলে এক আদর্শ সমাজে গঠিত করে তুলতে পারলে, তখনই তার মাথার উপর গৌরব ভাস্কর প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো।'

ভারতবর্ষীয় হিন্দু সমাজের ও হিন্দুজাতির জীবন গঠনের প্রথম প্রভাত, দীপ্ত

মধ্যাহ্ন ও অবনতির সন্ধ্যা—কোনোটার সঙ্গেই লেখিকার যদি সম্যক পরিচয় থাকতো তাহলে নিশ্চয় তিনি এরূপ ভাবপ্রবণ হয়ে উঠে তার পুঁথিপত্রে কি আছে সে সম্বন্ধে এরূপ ভ্রান্ত কল্পনা করে নিতে পারতেন না, এবং 'নেতি নেতি' শব্দে একেবারে চার হাজার বছরের 'এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজ' পার হয়ে এসে অবনতির জীবন সন্ধ্যায় প্রবর্তিত স্মার্তযুগের সমাজবিধিকে—'গৌরব ভাস্কর প্রদীপ্ত' বলে ভুল করতেন না।

জিজ্ঞাস্য এই,—ভারতের কোন যুগকে তিনি 'এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজ' এবং কোন যুগকে 'সকল পরীক্ষার ফল দিয়ে লব্ধ পূর্ণ অভিজ্ঞতার বলে গঠিত এক আদর্শ সমাজ গঠনের যুগ' বলে মনে করেন? ভারতের সেই 'অত্যুন্নতির দীপ্ত মধ্যাহ্ন' —অর্থাৎ যখন তার 'মাথার উপর গৌরব ভাস্কর প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো'—তখনকার সেই কালটি যে কোন কাল—ভারতের কোন যুগ সেটি,—তাঁর প্রবন্ধে কোথাও সুস্পষ্ট লেখা নেই। তিনি বলেছেন :— 'ভারতবর্ষীয় হিন্দুর যা কিছু নিয়ে আজও এই পরাধীন দৈন্যগ্রস্ত জীবনে গর্ব করবার আছে, সে তার সেই একান্ত শুভদিনেরই দান। আজও যদি সেদিনের সেই মহিমময় গরিমাদীপ্ত যুগের অত্যুচ্চ আদর্শবাদকে আমরা অনুসরণ না করিতাম, তবে ভারতবর্ষীয় হিন্দুর এই সাতশত বর্ষকাল ব্যাপী পরাধীন জীবনে এমন কি আছে যার বলে সে জগৎ সমাজের মধ্যে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে ভরসা করে? কি আছে তার, যার জোরে সে তার বহুদিনের হৃতরাষ্ট্র ফিরিয়া পাওয়ার অধিকার চায়? যার বলে সব হারাইয়াও সে নিঃস্ব নয়, ভিখারী হইয়াও রাজা। সে কি? সেই ভারতীয় সভ্যতা—যে সভ্যতার অংশভাগী হইয়াও গ্রীস রোম মিশর কোথায় কবে ধ্বংস হইয়া গেলেও, যে সভ্যতার পূর্ণরূপকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকার জন্য ভারতের নারীপুরুষ এই বহুতর শতাব্দীর ঝড় ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও উৎপীড়ন অত্যাচার অধঃপাতের তলায় পড়িয়াও পূর্ণরূপে তলাইয়া যায় নাই, আজও মাথা তুলিয়া অচল অটল দাঁড়াইয়া আছে—এ সেই সর্বশক্তিমৎ ভারতীয় সভ্যতা।'

প্রবন্ধ লেখিকার এই উক্তি থেকে তাঁর বক্ষ্যমাণ কালের কতকটা আন্দাজ করে নেওয়া যেতে পারে। কারণ তিনি এখানে বলেছেন—'ভারতবর্ষীয় হিন্দুর সাতশতবর্ষ কালব্যাপী পরাধীন জীবনে এমন কি আছে যার বলে সে জগৎ সমাজের মধ্যে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে ভরসা করে?' বেশ কথা। এখন অনুমান করে নিতে পারা যাচ্ছে তিনি যে যুগের কথা বলছেন তা এই সাতশত বৎসর পূর্বের স্বাধীন ভারতের কথা। যে সময় ভারতে প্রাচীন সমাজবিধি ও ধর্মনীতিবাদ প্রভৃতি কিছু কিছু বিদ্যমান ছিল—তাকেই হয়তো তিনি 'মহিমময় গরিমাদীপ্ত যুগের অত্যুচ্চ আদর্শবাদ' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে তিনি এই সাতশত বছরের ঠিক অব্যবহিত পূর্বের ভারতের কথা বলছেন না তারও বহু আগের প্রাচীন ভারতের সুদিনের উল্লেখ করছেন?

তিনি লিখেছেন—'যে সভ্যতার অংশভাগী হইয়াও গ্রীস রোম মিশর কোথায় কবে ধ্বংস হইয়া গেল'—ইত্যাদি। অতএব দেখা যাচ্ছে তিনি ভারতের যে গৌরবময়

দীপ্ত যুগের কথা বলছেন সেটা ঠিক সাতশত বছর আগেকারও নয়, সে তার আরো বহু আগের প্রাচীন ভারতের কথা—যে ভারতের তদানীন্তন সভ্যতার গ্রীস রোম মিশর প্রভৃতি অংশভাগী ছিল। লেখিকার মতে—সেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার পূর্ণরূপকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকার জন্য ভারতের নরনারী এই বহুতর শতাব্দীর ঝড় ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও উৎপীড়ন অত্যাচার অধঃপাতের তলায় পড়েও সম্পূর্ণ তলিয়ে না গিয়ে অচল অটলভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। যার জোরে তারা নাকি পরাধীনতার মধ্যেও স্বাধীন—বিজিত হয়েও আজও অপরাজেয়।

হিন্দু আজ মাথা তুলে অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে—কিম্বা অবনতশিরে ভূলুণ্ঠিত, ভারত আজ পরাধীন হয়েও স্বাধীন কিনা এবং বিজিত হয়েও অপরাজেয় কিনা এ নিয়ে আর অসার তর্ক করবার প্রবৃত্তি নেই। ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এ দেশ কোনোদিনই কোনো সভ্যতার পূর্ণরূপকে অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরে বসে ছিল না। সে যুগে যুগেই নব নব পরিবর্তনের ভিতব দিয়ে তাকে স্বীকার ও গ্রহণ করতে করতে এগিয়ে এসেছে। আর্য অনার্যকে নিজের মধ্যে গ্রহণ না করলে এখানে সে টিঁকতেই পাবতো না। হিন্দু বৌদ্ধকে স্বীকার করে নেওয়াতেই তার পক্ষে বেঁচে থাকা আজও সম্ভব হয়েছে। চৈতন্যদেব যদি যবন হরিদাসকে না কোল দিতেন—অস্পৃশ্যদের না বুকে টেনে নিতেন তাহলে সমস্ত বাংলাদেশ আজ মুসলমান হয়ে যেতো। রাজা রামমোহন রায় বিকৃত হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়ে উপনিষদোক্ত ব্রাহ্মধর্ম প্রচার না করলে পাশ্চাত্যসভ্যতার মোহে আকৃষ্ট ইংরাজী শিক্ষিত নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের খৃস্টান হওয়া ছাড়া অন্য পথ থাকতো না। পীড়িত দুর্গত জাতিচ্যুত হিন্দুদের মধ্যে সেদিন খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাব মুসলমান মোল্লাদের চাইতে কোনো অংশে কম ছিল না, কারণ হিন্দুসমাজ তখনো এই প্রবন্ধ লেখিকারই অনুমোদিত অষ্টমে গৌরীদান, নির্জলা একাদশী, স্ত্রী স্বাধীনতা নিরোধ, সমুদ্র যাত্রা নিষেধ প্রভৃতি আরো বহুবিধ বিধি-নিষেধের মিথ্যা গৌরববোধ নিয়ে সর্বপ্রকার সংস্কার ও উন্নতির বিরুদ্ধে লৌহদ্বার রূদ্ধ করে দিয়ে নিজের শুচিতা রক্ষা করতে ব্যস্ত ছিল। সে দ্বার ভেঙে যদি না তাদের যুগ-সংস্কারক ঋষিরা মুক্তির পথে নিয়ে আসতেন তাহলে আজ নিজেদের রুদ্ধ বিবরে মৃত মূষিকের-মতো হিন্দুজাতির অস্তিত্বও লোপ পেয়ে যেতো—এ ধরা-পৃষ্ঠ হতে। যুগে যুগে কালে কালে পরিবর্তনকে সহজভাবে স্বীকার করে নিতে পেরেছিলো যতদিন ততদিনই হিন্দু জাতি যথার্থ মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে পেরেছিলো। কিন্তু এ অতি বেদনা ও লজ্জাকর কথা হলেও একথা স্বীকার না করে উপায় নেই —যে, ভারতবর্ষ আজ চরম অবনতির পথে নেমে এসেছে এবং হিন্দু জাতি বেঁচে থাকলেও তার মাথা আজ আর উঁচু নেই। সাতশ বছরের উপর তার উষ্ণীষহীন মস্তক বিদেশীদের পদানত হয়ে লুটুচ্ছে। শৌর্যে বীর্যে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শিক্ষায় দীক্ষায়, সামাজিক ব্যবহারে, নৈতিক চরিত্রে, ধর্মজীবনে সকল দিক দিয়ে এ জাতির যে অধঃপতন ঘটেছে তাকে

অস্বীকার করা যেমন অজ্ঞানতা, ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতাকে এর জন্য দায়ী করাও তেমনি মূঢ়তার পরিচায়ক। কারণ এ দেশের জাতীয় অবনতি যা ঘটবার তা ইংরেজ এদেশে আসবার অনেক আগেই ঘটেছিলো, নইলে মুষ্টিমেয় ইংরাজ বণিকের পক্ষে বিশাল ভারতবর্ষকে হেলায় পদানত করা বোধহয় কোনোদিনই সম্ভবপর হতো না।

হিন্দুর প্রকৃত অধঃপতন শুরু হয়েছে—যেদিন থেকে সে তার প্রাচীন সভ্যতার বিস্তীর্ণ উদার রাজপথ ছেড়ে দিয়ে,—নীচ সাম্প্রদায়িকতার স্বার্থ-সংকীর্ণ অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকে কাপুরুষের ন্যায় আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে। ভারতীয় সমাজ—ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য—ভারতীয় সভ্যতা ও হিন্দুধর্মের সকল দিক দিয়ে অধঃপতন শুরু হয়েছে তার রাষ্ট্রীয় অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই। ইংরেজ আমলে সে শস্ত্রহীন হয়েছে বটে ; কিন্তু শাস্ত্রহীন হয়েছে সে মুসলিম যুগেই। এই সময়েই, অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী থেকে হিন্দুসমাজে—বিশেষ করে বাংলাদেশে—বয়স্থা শিক্ষিতা কন্যার স্বেচ্ছানির্বাচন প্রথা, উচ্চ স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় বিধি-ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে—বাল্যবিবাহ, অবরোধ প্রথা, স্ত্রীশিক্ষা রোধ প্রভৃতি অনেক কিছু দুর্বিধির সৃষ্টি হয়। তার আগে সেই বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে পৌরাণিক যুগ, বৌদ্ধ যুগ এমন কি নব-ব্রহ্মণ্য যুগ পর্যন্তও বয়স্কা নরনারীর স্বেচ্ছানির্বাচন প্রথা, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি লেখিকা উল্লিখিত ইংরাজী শিক্ষার সমস্ত কুপ্রথাগুলি ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। তবে সে সকল যুগকে লেখিকা যদি ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও শিক্ষার 'এক্‌স্‌পেরিমেন্টাল যুগ' বা 'বর্বর সমাজের অসভ্য যুগ' বলেন—তাহলে প্রশ্ন উঠবে—তবে কি লেখিকার মতে 'সেকাল' বা 'প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগ' বলতে বল্লালী আমলের কৌলীন্যপ্রথার যুগ বা মুসলমান শাসনাধীন ভ্রষ্ট হিন্দুত্বের যুগ অথবা রঘুনন্দন প্রবর্তিত স্মার্ত-শাসনের যুগ বুঝতে হবে? ষোড়শ শতাব্দীই কি লেখিকার মতে ভারতের চরম উন্নতির যুগ? কিন্তু, তাতে মুশকিল বাধে এই নিয়ে—যে, এ যুগের ভারতীয় সভ্যতাকে কোনো প্রবল কল্পনা-শক্তি দিয়েও 'গ্রীস রোম বা মিশর বিজয়ী প্রাচীন আর্যসভ্যতা' বলে প্রমাণ করা চলে না।

সে যাই হোক, 'নারীর কর্তব্য' সম্বন্ধে লেখিকা এইবার বলছেন—'আমার মতে "নারীর কর্তব্য" যা ভারতবর্ষীয় সমাজ তার গৌরবোজ্জ্বল, উন্নতি-সমুচ্চ যুগে স্থির করে দিয়েছিল, সেই আদর্শই তার পক্ষে শ্রেয়স্কর ও যশস্কর উচ্চাংশ ; তার থেকে বার হয়ে তার চেয়ে যথেষ্ট হীনতর আদর্শে নেমে যাওয়া তার পক্ষে একটুও সম্মানের নয়। সুবিধারও নয়।'—তা তো নয়ই! শ্রদ্ধেয়া লেখিকার সঙ্গে এ বিষয়ে আমার এতটুকুও মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু গোল বাধছে তাঁর সঙ্গে ওই 'ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল উন্নতি-সমুচ্চ যুগ' নিয়ে। তিনি যে সব সংকীর্ণ সামাজিক বিধি-বিধানের পক্ষপাতিনী, দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের উন্নতি-সমুচ্চ যুগে সে সকলের কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

তাঁর প্রবন্ধ পড়লে মনে হয় যে লেখিকার ধারণা এই বিংশ শতাব্দীতেই পাশ্চাত্য

সভ্যতা ও ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসেই 'ভারত নারী' তথা 'ভারত সতী' তাদের গৌরবোজ্জ্বল উন্নতি-সমুচ্চ যুগের শ্রেয়স্কর ও যশস্কর উচ্চাদর্শ থেকে যথেষ্ট হীনতর আদর্শে নেমে এসেছেন এবং আসছেন।

লেখিকার এই ধারণা যে হিমালয়ের চেয়েও বড়ো ভুল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর যে কোনো হিন্দু-অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেই। নারী যে সেদিন সেখানে মাত্র গৃহশোভা অথবা আসবাবপত্রের সামিল হয়ে পড়েছে, তার যে আর কিছুমাত্র শিক্ষা, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব নেই সেটা অষ্টাদশ—এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর যে কোনো হিন্দু-ঘরেই দেখতে পাওয়া যাবে। বরং এই বিংশ শতাব্দীতেই আজ দেখা যাচ্ছে মেয়েরা আবার নূতন করে ভারতের সেই গৌরবোজ্জ্বল উন্নতি-সমুচ্চ যুগের সামাজিক ও নৈতিক আদর্শগুলি অন্তরে বাইরে অনুসরণ করতে চেষ্টা করছে। তাদের শিক্ষা স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট, বিস্তৃত ও পরিস্ফুট হয়ে উঠছে! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগের এবং সে যুগের নারীর আদর্শ—কোনোটার সম্বন্ধেই লেখিকার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা না থাকাতে তিনি এই শোচনীয় ভুল করে ফেলেছেন বলে মনে হয়। তারপর লেখিকা বলছেন :—'ত্যাগের পথ কঠোর ও বন্ধুর হলেও সেই পথই শ্রেয়ের পথ, "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" হলেও সেই পথই তাঁদের অনুসরণীয়। যে পথে গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, মদালসা এবং এই সেদিনেও বিদ্যাসাগর মাতা, ভূদেব জননী, স্যার রাজেন্দ্রে-র, স্যার আশুতোষের, স্যার গুরুদাসের, হরিহর শেঠের গর্ভধারিণীগণ অনুবর্তন করে ঐ সকল পুত্ররত্ন লাভ করেছিলেন, এর চেয়ে সমাজ-হিতৈষণা আমাদের মেয়েরা যে আর কি দিয়ে করবেন, আমার মতো সামান্যার বোধগম্য হয় না।'

লেখিকা বৈদিক যুগ থেকে একেবারে এই অতি নিন্দিত ইংরাজ যুগ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ভারত-ইতিহাসের অনেকগুলি আদর্শ নারীর নাম একত্রে একই পর্যায়ে উল্লেখ করে তাদের সকলকে একই পথে ঠেলে নিয়ে গেছেন। ভারতের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন অবস্থার এইসব খ্যাতনামা মহিলার চরিত্র ও জীবনী অনুশীলন করে দেখলে যে কোনো লোকের চোখেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এঁরা পরস্পরে কেউ কারুর পথেরই অনুবর্তিনী নন। গার্গী বা মৈত্রেয়ীর আদর্শের পথে সীতা সাবিত্রী বা দময়ন্তী এঁরা কেউই অনুবর্তিনী হননি এবং বিদ্যাসাগর মাতা বা স্যার রাজেন্দ্র জননী এঁরাও কেউ গার্গী মৈত্রেয়ীর ন্যায় ব্রহ্মবাদিনী ঋষিরমণী ছিলেন না। তাঁদের পথ ও এঁদের পথও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর মতো এঁরা স্বেচ্ছানির্বাচিত পতিকে বিবাহ করেননি। কাজেই তাঁদের পথের অনুবর্তিনী হওয়া এঁদের পক্ষে সম্ভব বা সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এঁরা কেউ স্বাধীন চিন্তাশীলা উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বাভিজ্ঞা বা ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন কিনা তাও জানি না।

হাজার হাজার বছরের ভারতীয় সভ্যতার সাগর ছেঁচে যে কটি উল্লেখযোগ্য মেয়ের নাম আমরা পাই তাঁদের আঙুলে গোনা যায়। যখন তখন আমরা তাঁদের

নিয়েই নাড়াচাড়া করি, কারণ ওই কজনই আমাদের যুগ-যুগান্তের আদর্শ নারীর পুঁজি। লেখিকাও এখানে তাই করতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যাঁদের নাম করেছেন তাঁরা কেউই তাঁর আদর্শ নারীর ছাঁচে ঢালা ছিলেন না।

কুমারী গার্গী ছিলেন ঋষি বাচক্লুর বিদুষী কন্যা। তিনি তাঁর সুগভীর জ্ঞান, নির্ভীক তেজস্বী প্রকৃতি ও অপরাজেয় তর্কশক্তির জন্য নারী সমাজে বরণীয়া ও চিরস্মরণীয়া হয়ে আছেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ী দেবী সংসারের অসার বিষয়বস্তুর চেয়ে অমৃতত্ত্বকেই জীবনের সমধিক কাম্য বলে গ্রহণ করতে পারায় আজও ভারত নারীর অগ্রগণ্যা ও নমস্যা হয়ে আছেন; কিন্তু সীতা সাবিত্রীর আদর্শ ছিল ভিন্ন। অটুট পতিভক্তি ও অসীম দুঃখসহিষ্ণুতাই সীতা চরিত্রের বিশেষত্ব। বয়স্থা কুমারী শ্রীমতী দময়ন্তী দেবী নলরাজকে হংসদূত সাহায্যে প্রণয়লিপি পাঠিয়েই যা কিছু বিদ্যার পরিচয় দিয়েছিলেন। অন্য কোনো সূত্রে তাঁর অগাধ পতিপ্রেম ছাড়া আর কোনো উচ্চ বিদ্যাবত্তা বা জ্ঞান-অনুশীলনের প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বিদুষী সাবিত্রী প্রাপ্তযৌবনা হয়ে স্বয়ং মনোমত পতি নির্বাচনে দেশান্তরে যাত্রা করেছিলেন এবং যমরাজকে প্রীত করে মৃত পতির পুনর্জীবন আদায় করেছিলেন। যমরাজের কাছে তিনি মোক্ষ প্রার্থনা করেননি, অমৃততত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেননি, ব্রহ্মজ্ঞানেরও বর চেয়ে নেননি। তিনি চেয়েছিলেন পুত্রহীন পিতার পুত্র, রাজ্যভ্রষ্ট অন্ধ শ্বশুরের দৃষ্টিশক্তি ও সিংহাসন এবং নিজের শতপুত্র বর। তাঁরও আদর্শ গার্হস্থ্য ও পাতিব্রত্য। তত্ত্বদর্শন নয়। পুরাণে গন্ধর্বরাজ তনয়া পতি-সোহাগিনী মদালসার সুখময় দাম্পত্য জীবনের উল্লেখ ছাড়া আর কোনো বিশেষত্ব দেখা যায় না। তবে নাগরাজ তনয়া মদালসাকে স্বীয় পুত্রদের দুর্লভ ব্রহ্মবিদ্যা ও দুরূহ রাজনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে দেখি। তারপর এদেশে বৌদ্ধযুগ ছিল, নব ব্রহ্মণ্য যুগ ছিল, ঐতিহাসিক ক্ষাত্র যুগ ছিল, মোসলেম যুগ ছিল, কিন্তু লেখিকা সে সমস্তই বাদ দিয়ে একেবারে পৌরাণিক সীতা সাবিত্রীর পাশেই হাল ইংরাজী আমলের 'ভূদেব জননী' প্রভৃতিকে এনে ফেলেছেন। এঁদের সম্বন্ধে প্রথম কথা বলা চলে এই যে—লেখিকা পূর্বে যাঁদের নাম করেছেন তাঁরা সকলেই স্বনামখ্যাতা মহিয়সী মহিলা। 'অমুকের জননী' বলে তাঁদের কারুর পরিচয় দিতে হয় না। কিন্তু এঁদের সেরূপ নিজস্ব কোনো পরিচয় নেই। আমাদের বাংলা দেশে একটা গ্রাম্য প্রবচন আছে—'পো'র নামে পোয়াতি বর্তায়।' এ যেন অনেকটা সেই শ্রেণীর। দ্বিতীয় কথা—পূর্বোক্ত মহিলারা সকলেই বিদুষী, চিন্তাশীলা ও স্বাধীনা নারী ছিলেন। তাঁরা প্রায় সকলেই লেখিকার নিন্দিত 'বয়স্থা নরনারীর স্বেচ্ছানির্বাচন' প্রথায় বিবাহিতা, তবে সে স্বেচ্ছানির্বাচন 'লালসা-প্রণোদিত' কিম্বা 'বৈরাগ্য-প্রণোদিত' তা লালসা-বিজ্ঞান বিশারদেরা বলতে পারেন।

গার্গী মৈত্রেয়ী ছিলেন বেদের উত্তরমীমাংসা সংশ্লিষ্ট উপনিষদোক্ত আদর্শের অনুসারিণী, সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী ছিলেন পূর্বমীমাংসাজাত সংহিতার পথাবলম্বিনী, আর ইংরাজী আমলের অখ্যাতনাম্নীরা ছিলেন স্মার্ত রঘুনন্দনের অনুশাসনে বন্দিনী।

সুতরাং এঁরা সকলেই যে একই পথ অনুবর্তন করেছিলেন এমন কথা বলা চলে না। তা ছাড়া, কৃতী সন্তানের গর্ভধারিণী বলে তিনি 'ভূদেব জননী' প্রমুখ যে কজন ইংরাজী আমলের বঙ্গনারীর পক্ষ হতে 'সমাজ হিতৈষণার' গৌরব দাবি করেছেন; এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কৃতী-সন্তানের জননী হওয়ার সৌভাগ্য সেকালের মায়েদের কারুরই স্বোপার্জিত গৌরব নয়। ওটা তাঁদের পক্ষে ছিল তখন একেবারেই ভাগ্য-নিয়ন্ত্রিত ঘটনা। কারণ, ভারত তখন তার সেই প্রাচীন সভ্যতার উদার আদর্শ ও বৃহত্তর সমাজবিধি বর্জন করে অধঃপতিত পরাধীন জীবনের হীন দুর্বল ও সংকীর্ণ মনোবৃত্তিপ্রসূত যে অনুদার ও অহিন্দু বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করেছিল তার মধ্যে নারীর স্থান নির্দিষ্ট করেছিল সর্বনিম্নে। এদেশের নারী ছিল তখন সর্বপ্রকার বন্ধনে আড়ষ্ট পরাধীন, সকলপ্রকার উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ হতে বঞ্চিতা, কৈশোর উত্তীর্ণ হবার আগেই অবগুণ্ঠিতা হয়ে গৃহপ্রাচীরের চতুঃসীমার মধ্যে চির-বন্দিনী। সেদিনের মায়েরা শুধু সন্তানপ্রসবকারিণী মাত্র ছিলেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন ও চরিত্র গঠন করে তোলবার অধিকার ও যোগ্যতা কোনোটাই ছিল না তাঁদের। আজও খাঁটি বাংলার অদূর পল্লীসমাজের—যে কোনো অশিক্ষিতা জননীর দিকে চাইলে এ কথার জীবন্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে।

আর একটা কথাও বলবার আছে এখানে। লেখিকা যেসব সামাজিক প্রথাকে নিন্দনীয় ও জাতীয় কল্যাণের পরিপন্থী বলে মনে করেন এরূপ একাধিক অন্যায়-কার্যই উক্ত জননীদের কৃতী সন্তানেরা তাঁদের মাতাঠাকুরাণীদের জীবিতকালেই করে গেছেন। বিদ্যাসাগব ও স্যার আশুতোষ বিধবা-বিবাহ শুধু সমর্থন ও প্রচার নয়, কার্যত নিজ পরিবারের মধ্যে দিতেও সাহস করেছিলেন। স্যার রাজেন্দ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার শুধু পক্ষপাতীই নন; নিজ জীবনে তার সম্পূর্ণ অনুসরণ করে আজ একজন শ্রেষ্ঠ ধনী ও ব্যবসায়ী হয়ে উঠতে পেরেছেন। এই সকল কারণে যৌথ পরিবার প্রথা মেনে চলাও এঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। সুতরাং লেখিকার আদর্শ মানতে হলে এঁদের জননীদের তো কুপুত্রের গর্ভধারিণী বলেই অভিহিত করতে হয়! তাছাড়া, কেবলমাত্র সুপুত্রের জননী হতে পারলেই যদি নারীর পক্ষে 'সমাজ হিতৈষণার চরম কর্তব্য' সম্পাদনা করা হয়ে যায়, তাহলে 'নারীর কর্তব্য' যে কেবলমাত্র গর্ভধারণেই পর্যবসিত হয়ে পড়ে। এবং তাই যদি মেনে নেওয়া সম্ভাব্য তাহলে তাঁর উক্ত গর্ভধারিণীদের সঙ্গে সার হরিশঙ্কর পালের জননী, সার র কল্যাণে ...ায়, গোয়েঙ্কার জননী, সার ওঙ্কারমল জেটিয়ার জননী, সার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদের জননী —এঁদেরও আদর্শ সমাজহিতৈষিণী নারীর তালিকায় নামোল্লেখ করলে কী দোষ হতো?

রাজা রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ, সার প্রফুল্লচন্দ্র, সার জগদীশচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এঁদের জননীদের নাম বাদ পড়ার না হয় একটা শুচিগ্রস্ত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় যে, তাঁদের পুত্রেরা কেউ সংকীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ বা গোঁড়া হিন্দু নন, কিন্তু কৃতী ও ধনকুবের মাড়ওয়ারী জননীরাও সকলেই খাঁটি নিষ্ঠাবান পরম হিন্দুর মাতা!

তারপর লেখিকা ব'লেছেন—

'জগৎপূজ্যা ভারতীয় নারীসমাজে বৈদেশিক অপুষ্ট সমাজের অনুকরণ, যৌথ পরিবার প্রথা নষ্ট করা, বয়স্ক নরনারীর লালসা-প্রণোদিত স্বেচ্ছা-নির্বাচন, বিবাহ-বিচ্ছেদ, অহিন্দু বিবাহ, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদির দ্বারা ভারতসতীর বৈশিষ্ট্য নাশ করায় সমাজ যে কতখানি মঙ্গল লাভ করিবে বুঝিতে পারি না। যাদের মধ্যে এইসব ব্যাপার আছে, তারা কি এ দেশের মেয়েদের চেয়ে খুব বেশি সুখী? এসব কি সমাজের অপরিণততা প্রমাণ করে না?'—ইত্যাদি।

ভারতনারী 'জগৎপূজ্যা' কি না—এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করেছি। লেখিকা বর্তমান হিন্দু সমাজের যে সকল সংস্কার প্রচেষ্টাকে বৈদেশিক অপুষ্ট সমাজের অনুকরণ বলে ভুল করেছেন সেগুলি পুষ্ট বা অপুষ্ট কোনো বৈদেশিক সমাজেরই অনুকরণ নয়। তা এই ভারতবর্ষেরই নিজস্ব বস্তু। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার যুগে এদেশে মেয়েদের আত্মোন্নতির যেসব সুযোগ ও সুবিধা ছিল, বর্তমান সভ্যসমাজের একাধিক বিধি-নিয়মের সঙ্গে তার হুবহু সৌসাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ, বয়স্থা কন্যার স্বেচ্ছানির্বাচিত বিবাহ, চিরকুমারী থাকা, নৃত্য গীত বাদ্য ক্রীড়া কৌতুক আমোদ প্রমোদ, ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, রথচালনা, শস্ত্রবিদ্যা, শাস্ত্রবিদ্যা, শিল্পকার্য ও চিত্রকলা ইত্যাদি—সকল বিষয়েই প্রাচীন ভারতে—মেয়েদের জ্ঞানলাভের অধিকার ও সুযোগ দেওয়া হতো। অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা বিবাহও বৈদেশিক আমদানি নয়, প্রাচীন ভারতেরই উদারবিধি মাত্র! আজ পতিত ভারতের সংকীর্ণ সমাজ-সংরক্ষকদের কাছে এসব পাশ্চাত্যের অনুকৃতি বলে ভ্রম হচ্ছে, এমনিই আত্মবিস্মৃত হতভাগ্য আমরা। পরাশর সংহিতায় আছে—

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চ স্বাপৎসু নারীনাং পতিরণ্যোবিধিয়তে।।'

বিবাহ-বিচ্ছেদের এই বিধানের সঙ্গে পাশ্চাত্যের 'ডাইভোর্স' আইনের ধারাগুলির একাধিক সৌসাদৃশ্য পাওয়া যায় না কি?

ভারতের অধঃপতিত যুগেই নারীকে জীবনের সকল ঔৎকর্ষ লাভ থেকে বঞ্চিত করে কেবলমাত্র নির্বিচারে মূক বধির ও অন্ধ পাতিব্রত্য বিধান দেওয়া হয়েছে। পতির সঙ্গে পরিচয়ের কোনো সুযোগ না ঘটলেও বালবিধবা ও স্বামী-পরিত্যক্তা নেই।। বধূকে কাল্পনিক পতির ধ্যানে পাতিব্রত্য পালন করে চিরজীবন কাটাতে হবে। [illegible]দের সেই না-জানা অচেনা স্বামীর উদ্দেশে তাদের পতিভক্তি যদি উদ্বেলিত হয়ে না উঠে তাহলেই তারা অসতী বলে গণ্যা হবে। যে-কোনোরকমের অবস্থাই উপস্থিত হোক না কেন—স্ত্রীলোককে সকল অবস্থাতেই অচ্ছেদ্য বিবাহ-বন্ধনে শৃঙ্খলিত করে রেখে তথাকথিত সতী তৈরি করবার যে কৃত্রিম বিধি নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা সকল সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। যে 'সতীধর্ম' সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত, কোনো বিধি-নিষেধের চাপে যা বাধ্যকরী নয়, যা নারীর স্বভাবজাত অন্তরের

বস্তু—ভারতের প্রাচীন যুগের সেই সতীত্বই প্রকৃত সতীধর্মের গৌরব ও আদর্শ-স্বরূপ।

'অহিন্দু-বিবাহ' যে লেখিকা কোন বিবাহ বিধিকে লক্ষ্য করে বলেছেন তা অনুমান করা কঠিন। কারণ, প্রাচীন ভারতের হিন্দু বিবাহ শাস্ত্রমতে অষ্টবিধ। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, অসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। যে হিন্দু সমাজে রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহকেও বিবাহ বলে স্বীকার করে নিয়ে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, সেখানে 'অহিন্দু-বিবাহ' বলে লেখিকা আমাদের কী বোঝাতে চান জানি না। তবে তাঁর মতামত পড়ে কতকটা অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে হয়তো তিনি অন্যান্য অনেক কিছু ভুল ধারণার মতো 'আন্তর্জাতিক বিবাহ' এবং 'অসবর্ণ বিবাহ'কেই অহিন্দু-বিবাহ বলে মনে করেন। কিন্তু এই ভারতেরই অত্যুন্নত দীপ্ত মধ্যাহ্নে যে অবাধে অসবর্ণ বিবাহ এবং আন্তর্জাতিক বিবাহ চলত এটা তিনি আর কিছু নয়, শুধু মহাভারতের পাতাগুলো আর একবার ওলটালেই একাধিক প্রমাণ পাবেন। সুতরাং একেও তিনি বৈদেশিক অনুকরণ না বলে বরং প্রাচীন ভারতের উদার বিধির অনুসরণ বলতে পারেন।

তারপর 'বিধবা বিবাহ'। এ নিয়ে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত বহু তর্ক আলোচনা হয়ে গেছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণ হিন্দুশাস্ত্র সম্মত। সে সকলের পুনরুল্লেখ ও পুনরুক্তি নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি। সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে আজ আর একথা কাউকে দুবার বলবার আবশ্যকও করে না যে 'বিধবা বিবাহ' বৈদেশিক অনুকরণ নয়, এটা হিন্দু-শাস্ত্রান্তর্গত ভারতীয় বিধিই।

'যৌথ পরিবার প্রথা ভঙ্গ' সম্বন্ধে লেখিকা যদি ভেবে দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন—এর মূল কারণ—পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ নয়, এর মূল কারণ সমস্ত জগৎব্যাপী উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত কঠিন অর্থনৈতিক সমস্যা। এখানে জীবিকার্জনের পথ দিনের দিন যতই সংকীর্ণ ও দুরতিক্রমণীয় হয়ে উঠছে, যৌথ পরিবার ততই আপনা আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে। এর জন্য কোনো বিদেশী শিক্ষা ও সমাজকে দায়ী করা ভুল। বর্তমান জগতের আর্থিক অবস্থায় কোনো দেশের কোনো সমাজের গৃহস্থ পরিবারের মধ্যেই প্রাচীন যৌথ সংসারের আদর্শ চির-অব্যাহত থাকতে পারে না। আগের দিনে এদেশের সাধারণ গৃহস্থেরা কেউ চাকুরিজীবী ছিলেন না, কৃষিজীবী ও বাণিজ্যজীবী ছিলেন। সেদিন দূর দূরান্তরের পথ আজকের মতো বিজ্ঞানের কল্যাণে এমন সহজগম্য হয়নি। হিন্দুরা তখন এক একটি স্থানে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে গ্রাম সীমানার মধ্যেই প্রায় জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। জমিজমা চাষবাসের কাজ যৌথ-পরিবারভুক্ত সকল ভাই, ভাইপো ও ছেলেরা একত্রে মিলেমিশে সম্পন্ন করতো, কারণ তাদের প্রত্যেকের স্বার্থ তাতে সমান ছিল। পরিবারের জ্যেষ্ঠের হাতে সমস্ত আয়, ব্যয় ও বিধিব্যবস্থার ভার থাকা তাই সহজ ও সুবিধার ছিল।

আজকার দিনে কোনো পরিবারে একটি ভাই হয়তো ব্যারিস্টার, একটি ভাই

ডাক্তার, একটি ভাই স্কুল মাস্টার, একটি ভাই কেরাণী। প্রত্যেকের উপার্জন বিভিন্ন এবং পদমর্যাদা অনুযায়ী ব্যয়ও বিভিন্নতর। একান্নবর্তী পরিবারের সমান ভাগ-বাঁটোয়ারা এদের মধ্যে সম্ভবপরও নয়, সমীচীনও নয়। ধরুন, ব্যারিস্টারের বসবার ঘর অথবা ডাক্তারের চেম্বারের জন্য যেসব আসবাবপত্র ও আড়ম্বরের প্রয়োজন আছে, ইস্কুল মাস্টার বা কেরাণীর তা নেই। এদের মোটরগাড়ি না হলেও চলবে, কিন্তু ওদের একদিনও চলবে না। এদের ধুতি-পিরানই যথেষ্ট, কিন্তু ওদের ভালো ভালো 'স্যুট' পরা চাই। কোনো সাধারণ প্রতিষ্ঠান ক্লাব লজ প্রভৃতির সভ্য হতেই হয় ওদের, এদেব দরকার নেই। পাড়ায় বারোয়ারী, লাইব্রেরী বা কোনো চ্যারিটি ফণ্ডে ওদের মোটা চাঁদা না দিলে মান থাকে না, এদের না দিলেও চলে। তেমনি অন্তঃপুরেও মেয়েদের মধ্যে স্বামীর অবস্থা ও পদমর্যাদা অনুযায়ী উৎসব, ক্রিয়াকর্ম, নিমন্ত্রণে মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কার ব্যবহার করা প্রয়োজন। অন্যান্য দৈনন্দিন ছোটখাটো ব্যাপারেও পরিবারেব মধ্যে তাঁরাই সংসারে কতকগুলো বিশেষ সুখসুবিধা ভোগ করতে পান যা অল্প-উপার্জনক্ষম ভায়েদের পত্নীরা পান না। এর ফলে সংসারে নিয়ত একটা বিরোধ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। কাজেই, যৌথ পরিবাবের আটচালা ভেঙে পড়তে বেশিদিন সময় লাগে না।

একালে উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে স্বার্থপরতা নাকি একান্তভাবে বেড়ে উঠেছে এমন একটা অভিযোগও প্রায়ই শোনা যায়। আজকালকার দিনে লোকে নাকি নিজের নিজের স্ত্রী পুত্র নিয়ে আলাদা সংসার করে থাকাটাই পছন্দ করে বেশি। কিন্তু সেকালে এমন ছিল না। তখন সকলে এক জায়গায় মিলেমিশে থাকতেই ভালোবাসতো! কথাটা ঠিক। কিন্তু, কেন ভালোবাসতো সে কথাটা যদি ভেবে দেখা যায় তাহলে আর এটা বুঝতে কারো দেরি হবে না যে,—সেও সম্পূর্ণ স্বার্থের খাতিরেই। কারণ, সেকালে একজন লোকের পক্ষে কেবলমাত্র নিজের স্ত্রী পুত্র নিয়ে একা একটি ক্ষুদ্র সংসাব রচনা করে থাকা মোটেই সহজ ও সুবিধাজনক ছিল না। জমিজমা ও চাষবাসই ছিল সে সময়ে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র ভরসা, সেদিন বৃহৎ পরিবারের সকলে একত্রে মিলেমিশে থাকার মধ্যেই ছিল সবচেয়ে বেশি সুবিধা ও সেইটেই ছিল সকলের স্বার্থের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল। কাজেই যৌথ পরিবার প্রথাটাই ছিল সেদিন সচল ও বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ সামাজিক আদর্শ হিসাবে শ্রেয় ও প্রেয়। কারণ দশগাছা কঞ্চির একটা আঁটির জোরই ছিল সেদিন তার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন।

বর্তমানে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকা অর্জনের উপায়ান্তর ঘটায় বহু আত্মীয় কুটুম্ব নিয়ে একত্র এক বৃহৎ সংসার পেতে থাকা কোনো দিক দিয়েই সুখ শান্তি ও সুবিধার হচ্ছে না। অর্থসমস্যার চাপে (economic pressure) যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙে যাওয়া ও ভিন্ন-পরিবার প্রথা গড়ে ওঠা ক্রমশই সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। আজকের দিনে যেখানে চারভাই-ই চাকুরিজীবী; কিন্তু কেউ

হয়তো কাজ করেন এখানে, কেউ কাজ করেন ঢাকায়, কারুর কর্মস্থল কানপুর, কারুর বা মীরাট কি বর্মা—সেখানে 'যৌথ পরিবার' টিঁকে থাকা সম্ভব নয় এবং সেজন্য দুঃখ করবারও কিছু নেই। সেদিন যৌথ পরিবার মানুষের নিজের স্বার্থের জন্যই প্রয়োজন ছিল, কাজেই সে টিঁকেছে। কিন্তু আজ যৌথ পরিবার তার স্বার্থের বিরোধী, সুতরাং তার অস্তিত্ব লোপ পাওয়া তো অবশ্যম্ভাবী!

তাবপর লেখিকা বলেছেন :– 'ভারতবর্ষীয়া নারীর কর্তব্য নয় যে তার সমাজ সংস্কার জন্য নব্যতান্ত্রিক ইয়োরোপীয়ের দ্বারস্থ হওয়া। তার সমাজ সংস্কার জন্য তার নিজেব ঘরের মধ্যে চাহিলেই সে তার বিধি বিধান খুঁজিয়া পাইবে।'

এ বিষয়ে লেখিকার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র মতদ্বৈধ নেই। ভারতবর্ষ তার সমাজ সংস্কারের জন্য নিজের ঘবের দিকে চেয়ে দেখলেই যে উপযুক্ত বিধি বিধান খুঁজে পাবে এ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। তবে কিনা সে অনুসন্ধানীর দৃষ্টি একটু দূর-প্রসাবী হওয়া চাই। পবাধীন শক্তিহীন পতিত ভারতের গত কয়েক শতাব্দীর সংকীর্ণ সামাজিক বিধি ব্যবস্থাব অনুদার প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে থেমে গেলেই চলবে না। সে লজ্জাকর কাবাপ্রাচীব পার হয়ে, স্বাধীন শক্তিশালী উন্নত ভারতের উদার অঙ্গনে গিয়ে পৌছতে হবে। সেইখানে সে তার মুক্তিব পথ খুঁজে পাবে নিশ্চয়।

আজকের দিনে জগতে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে হলে হয়তো অনেক কিছুর জন্যই এই সর্বহারা জাতিকে বাধ্য হয়ে ওই বিজ্ঞানোন্নত বৈদেশিক জাতিরই দ্বারস্থ হতে হবে। যেমন চীন, জাপান, তুরস্ককে হতে হয়েছে এবং ইরাক পারস্য ও আফগানিস্থানকে হতে হচ্ছে, কিন্তু সমাজ সংস্কারের জন্য সে যদি তার স্মার্ত গোঁড়ামীর ধোঁয়াটে চশমা খুলে ফেলে গৃহদ্বার হতে ছুঁৎমার্গের পর্দা তুলে তার গৌরবময় অতীতের দিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ফিরে চায়, তাহলে এই শোচনীয় সামাজিক অবস্থা থেকে উদ্ধারের সহজ উপায় সে দেখতে পাবেই।

লেখিকা তাঁর বক্তব্য সমর্থনের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দুত্ব' প্রবন্ধের যে অংশ উদ্ধৃত করেছেন, বিশ্বকবির সে বাণী কিন্তু লেখিকার মতের মোটেই অনুকূল নয়। কবি অধঃপতিত ভারতের সংকীর্ণ অনুদার হীন সমাজ বিধি ব্যবস্থাকে মূঢ়ের মতো আঁকড়ে থাকতে উপদেশ দেননি। সে বাণী জাতিকে গতিহীন ও পঙ্গু হয়ে পড়ে থেকে তিলে তিলে মৃত্যুর অন্ধকারে তলিয়ে যেতে বলেনি। সে বাণী এই আত্মবিস্মৃত অবনত জাতিকে ডেকে বলেছে তার দেশের প্রাচীন মহৎ স্মৃতি ও বৃহৎ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গোঁড়ামীর জড়তা পরিহার করে আদ্যোপান্ত সজীব ও সচেষ্ট হয়ে উঠতে। সে বাণী আমাদের অচলায়তনের মাটি আঁকড়ে স্থাণুর মতো পড়ে থাকতে উপদেশ দেয়নি। আমাদের সচেষ্ট স্বাধীন হতে ও জীবনপ্রবাহে পূর্ণ হতে বলেছে।

তারপর লেখিকা বলেছেন :– 'এখন এই যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে, এই সেই সামাজিক স্বাধীনতার রূপ? পর সমাজের অনুকৃতিকে

কোনোমতেই কেহ সামাজিক স্বাধীনতার নাম দিতে পারেন না। স্বাধীন—এই কথার মধ্যেই এই স্বা-ধী-ন-তা শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট হইয়া প্রকট হইতেছে। তাহা স্ব-অধীনতা, স্বেচ্ছাচার নয়।'

স্বাধীনতার অর্থ যে স্ব-অধীনতা এটা যদি এদেশের মেয়েরা বুঝত তাহলে এমন নির্বিবাদে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মনুষ্যত্ব-সঙ্কোচক বিধিবিধান মেনে চলতে পারতো না। বিশ্বসভায় নিজেদের স্থান করে নেবার জন্য অগ্রসর হয়ে যেতো। স্থাবর সম্পত্তির মতো এমন জড় ও অচল হয়ে পড়ে থাকতো না। সর্ববিষয়ে এমন পরমুখাপেক্ষিণী অসহায়া হয়ে ধিক্কৃত অপমানিত জীবন যাপন করতে পারতো না। যারা সংস্কারকে ভয় করে তাদের সে গোঁড়ামী দাস মনোভাবেরই পরিচায়ক। এবং এই মনোভাব থেকেই তারা স্বাধীন দেশের স্বাধীনা মেয়েদের স্বেচ্ছাচারিণী অথবা স্বৈরিণী বলতেও লজ্জাবোধ করে না। লেখিকা উপদেশ দিয়েছেন—

'ভারতীয়া নারী স্বতন্ত্রা, বিলাসিনী, স্বেচ্ছাচারের স্রোতে আত্মনিমজ্জিতা, "নহ মাতা নহ কন্যা নহ ভগ্নী শুধুই প্রেয়সী" এই আদর্শে গঠিতা হইবেন না। তিনি কন্যা ভগ্নী গৃহিণী এবং জননী। তিনি প্রথমে আদর্শ সতী, তারপর সুপুত্রের মাতা। তিনি স্বামীর সহধর্মিণীরূপে গৃহে এবং বাহিরে, সংসারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে সর্বত্রই তাঁহার অনুবর্তনশীলা হউন, কিন্তু তাঁর স্বাতন্ত্র্য সর্বথা পরিবর্জনীয়।

দুঃখের বিষয় যে একজন প্রবীণা নারীকে একথা আজ স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে যে একমাত্র রূপোপজীবিনী ভিন্ন কোনো দেশের কোনো সমাজের নারীই 'নহ মাতা নহ কন্যা নহ ভগ্নী শুধুই প্রেয়সী' এই আদর্শে গঠিতা নন এবং হতেও পারেন না। সকল দেশের সকল সমাজের সকল ভদ্র পরিবারের দুহিতারাই যথাক্রমে কন্যা ভগিনী গৃহিণী ও জননীই হয়ে থাকেন। আর 'আদর্শ সতী' শাস্ত্রের কারখানায় তৈরি হয় না বা 'অর্ডার' দিয়েও গহনার মতো বা গৃহের আসবাবের মতো গড়িয়ে নেওয়া চলে না। 'আদর্শ সতী' তাঁরাই হতে পারেন যাঁরা আদর্শ পতির পুণ্য প্রেমলাভে ধন্যা ও সৌভাগ্যবতী। সতীত্ব সেখানে নারীর মুক্তমনের স্বভাব সুলভ ও প্রকৃতিজাত গুণ হয়ে ওঠে। নইলে বাধ্যতামূলক যে সতীত্ববৃত্তি তা যেমনি কৃত্রিম তেমনি অশ্রদ্ধেয়। সে মিথ্যা-সতীত্বের কোনো মর্যাদাই থাকতে পারে না, থাকা উচিতও নয়।

সুপুত্রের জননীও কেবলমাত্র সেই সকল নারীর পক্ষেই হওয়া সম্ভব যাঁরা নিজেরা সকল রকম শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান ও বিদ্যায় উৎকর্ষলাভ করে, সন্তানের জীবন ও চরিত্র গঠনের গুরুভার ও দায়িত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ সমর্থ। নচেৎ অশিক্ষিতা যাঁরা বা অসম্পূর্ণ জ্ঞান যাঁদের—সে সকল নারী শুধু পুত্রের গর্ভধারিণী মাত্র হতে পারেন। সে পুত্র 'সু' বা 'কু' হওয়া সম্পূর্ণ তাঁদের ভাগ্যের উপরই নির্ভর করে। তাঁদের কৃতিত্ব তাতে বিন্দুমাত্র নেই।

'ঘরে বাইরে সংসারে সমাজে রাষ্ট্রে সর্বত্রই সহধর্মিণীরূপে স্বামীর অনুবর্তনশীলা' হতে হলেও সে স্ত্রীকে আগে সকল দিক দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করে যোগ্য স্বামীর

উপযুক্তা স্ত্রী হবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু লেখিকা যখন অপ্রাপ্ত-বয়স্কা ও অপরিণত-বুদ্ধি বালিকা বিবাহেরই পক্ষপাতিনী তখন এ উপদেশ তাঁর মুখে নিতান্তই নিরর্থক ও হাস্যকর শোনায় না কি? তার উপর,—'কিন্তু তাঁর স্বাতন্ত্র্য সর্বথা পরিবর্জনীয়' এই বলে তিনি যে রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা দিয়েছেন তা পড়ে কেবলই মনে হচ্ছে আমাদের বর্তমান শাসনকর্তাদের সেই Safe-guard রেখে ভারতকে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়ার কথা। তাঁর এই নারীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে সর্বপ্রকারে বিলোপ করে দিয়ে তার মাথায় বাধ্যতামূলক সতীত্বের গৌরবহীন মুকুট পরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব আমরা কোনোমতেই সুযুক্তি বলে অনুমোদন করতে পারলেম না। তিনি হয়তো জানেন না যে .আইন-কানুন বা বাঁধা-ধরা একটা কিছু জবরদস্ত বিধান করে কোনো মানুষের অন্তরাত্মাকে আয়ত্ত করা যায় না। কেবলমাত্র ভারতীয় নারী কেন, যে কোনো দেশের যে কোনো সমাজের নারীই তার নিজের অক্ষুণ্ন স্বাতন্ত্র্য নিয়েও স্বামীর গভীর প্রেম ও অনুরাগের প্রভাবে আপন অন্তরের বিবেক-বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে এবং সুশিক্ষার গুণে ও কর্তব্যবোধে স্বেচ্ছায় স্বামীকে নিঃশেষে আত্মোৎসর্গ করে দিয়ে নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করে!

সে যাই হোক, 'নারীর স্বাতন্ত্র্য সর্বথা পরিবর্জনীয়' এই মূল্যবান উপদেশ দেবার পরক্ষণেই লেখিকা কিন্তু আবার নারীদের জন্য বিপরীত ব্যবস্থাও নির্দেশ করেছেন :—

'ভারত সতীর একমাত্র কর্তব্য তার স্বামীর ধর্মের সহায়তা করা, কিন্তু তাঁর অধর্মেরও অনুবর্তন করা, ইহা সতীধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। এইখানে অনেকেই ভ্রম করিয়া থাকেন, স্বামীর অধর্মকে তিনি অনুসরণ করিতে বাধ্য নহেন; যেহেতু স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিণী! তাঁর সংস্রব তাঁর ধর্মজীবনের সঙ্গে; অধর্ম জীবনে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিতা।'

ভারত নারীকে যদি 'সর্বথাই স্বাতন্ত্র্য পরিবর্জনে'র উপদেশ দেওয়া হলো, এবং প্রথমেই তাকে আদর্শ সতী হতে হবে বলা হলো, আর সর্ব বিষয়ে সকল অবস্থায় স্বামীর ধর্মের সহায়তা করাই যদি তার 'একমাত্র কর্তব্য' বলে নির্দেশ করা হলো, তাহলে 'পতি পরম গুরুর' অন্যায় বা অধর্মের বিচার করতে বসবে সে কোন অধিকারে? এবং অধার্মিক স্বামীর সংস্রব ত্যাগ করে তার সম্পূর্ণ অপরিচিতা হয়ে সে দাঁড়াবেই বা কার আশ্রয়ে? আর যদিই বা দাঁড়াতে পারে, তাহলে তার 'আদর্শ সতীধর্ম' অক্ষুণ্ন থাকে কেমন করে? এখানে যে নারীর সর্বথা নিষিদ্ধ সেই 'স্বাতন্ত্র্য' দোষ এসে পড়বে। এবং 'বৈদেশিকদের অনুকরণে' 'সেপারেশন' দোষও ঘটে যাবে! ভারতীয়া নারী এবং আদর্শ সতী হয়ে কি এ স্পর্ধা তার কখনো হতে পারে? 'লক্ষহীরা' প্রভৃতি 'আদর্শ সতীর' উপাখ্যান তাহলে রচিত হতো না। ঘোর অধার্মিক পাষণ্ড ব্যভিচারী লম্পট ও কুৎসিত রোগগ্রস্ত স্বামীর প্রতিই বিশেষভাবে প্রেম ও ভক্তি-সম্পন্না হতে পারাই যে লেখিকা-উল্লিখিত ভারতীয়া নারীর আদর্শ সতীত্বের

চরম নিদর্শন। সর্বথা স্বাতন্ত্র্য পরিবর্জন মানেই তো 'নির্বিচার পাতিব্রত্য'! ভারত নারী যদি পতির কার্যের সমালোচনা করে তার মধ্যে অধর্ম নিরূপণ করতে বসে এবং স্বামীর যা কিছু আদেশ বা ইচ্ছা তা পালন না করে, অর্থাৎ, পতির কোনো অধর্মের সহায়তা না করে নিজের বিবেক ও বিচারবুদ্ধিতে পতির অবাধ্য হয়ে অপরিচিতের ন্যায় দূরে সরে দাঁড়ায়, তাহলে লেখিকার বিবৃত 'ভারত সতী'ব বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে কেমন করে?

অতএব, 'নারীর কর্তব্য' সম্বন্ধে কেন যে প্রশ্ন ওঠে আশা করি প্রবন্ধ-লেখিকা এইবার তা বুঝতে পারবেন। এবং ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে উপদেশ দেবার সময় এমন করে আর প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগ নিয়ে প্রমাদের সৃষ্টি, বর্তমান সমস্যাকে অবজ্ঞা ও দেশকালের প্রভাবকে নিশ্চয়ই তিনি অবহেলা করবেন না বলে মনে হয়।

রাধারাণী দেবী

ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

সংযোজন

কবি দম্পতি

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

তখনো বাড়িখানা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় নাই। তবে সমন জারী হইয়াছে, বিবেকানন্দ রোড সম্প্রসারণের জন্য বাড়িখানাকে আত্মদান করিতেই হইবে। কিন্তু দুর্ভাবনা বৃথা। সমস্ত জানিয়া পূর্বাহ্ণেই প্রতিকারের পথ দেখিয়াছেন গৃহস্বামী। স্বনামধন্য কর্মবীর গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের কৃতী পুত্র হরিদাস ঐ বাড়িরই অনতিদক্ষিণে জমি কিনিয়া নূতন বাড়ির পত্তন করিয়াছেন, বাড়ি দিনে দিনে বাড়িতেছে। এদিকে বই-এর দোকান ও ভারতবর্ষ কার্যালয় পুরানো বাড়িতেই। কাজ চলিতেছে। আমি ২০১ সংখ্যক কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়িটির কথাই বলিতেছি।

সে সময় স্বনামধন্য জলধর সেন ভারতবর্ষের সম্পাদক। যথাসময়ে যথানিয়মে দ্বিতলের একটি ঘরে আসিয়া বসেন। আমি সেখানেই গিয়া দেখা করিতাম। ঐ কুঠরীতেই একদিন শরচ্চন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলাম। সেদিন দেখি একজন প্রিয়দর্শন যুবক বসিয়া আছেন। উজ্জ্বল গায়ের রং, সুডৌল গড়ন, সর্বাগ্রে নজরে পড়ে তাঁহার টিকলো নাসার নিচে সুবিন্যস্ত সুদৃশ্য একজোড়া গোঁফ, যুবকদলে সেকালেও প্রায় বিরলদর্শন। সুন্দর গুম্ফের জন্য মানুষটিকে একবার দেখিলে আর চিনিতে ভুল হইত না। জলধরদা—সার্বজনীন দাদা ছিলেন তিনি, এমন কি রবিবাসরের এক অধিবেশনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও তাঁহাকে দাদা সম্বোধন করিয়াছিলেন; —পরিচয় করাইয়া দিলেন, কবি নরেন দেব। আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, বীরভূমের হরেকেষ্ট। আমি পূর্বেই নরেন দেবের অনেক কবিতা পড়িয়াছিলাম। কবিকে সাক্ষাতে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। নরেন দেব বলিলেন, মোরব্বার দেশের মানুষ। আমার অন্য পরিচয় কিছু ছিল না। জলধরদা অবশ্য সংক্ষেপে বীরভূম-অনুসন্ধান সমিতি এবং বীরভূমের কাহিনী সংগ্রহের কথা শুনাইয়া দিলেন। বলিলেন, হরেকেষ্টই কাজটার ভার নিয়েছে। খুব খাটছে। সেই প্রথম পরিচয়, আজ প্রায় তিপান্ন বৎসর পূর্বের কথা।

পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। একটা নির্দিষ্ট সময়ে ঠনঠনে কালীমন্দিরের দক্ষিণের একটি বাড়িতে গেলেই তাহার দেখা পাইতাম। সঙ্গ ভাল লাগিত, সাহিত্যের নানারকম আলোচনা হইত। এই সময়টায় প্রকৃতপক্ষে নরেনই, ভারতবর্ষ সম্পাদনা করিত। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রবন্ধ কবিতা গল্প আদি নির্বাচনে নরেনই পরিশ্রম করিত খুব বেশী। সমস্ত গুছাইয়া জলধরদাকে দেখাইত এবং তাঁহার অনুমোদন লইত। হরিদাস তাহাকে অনুজের মতই ভালবাসিতেন। নরেনের মেঘদূত অনুবাদ প্রকাশ করিয়া হরিদাস এই ভালবাসার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। আমা

অপেক্ষা বয়সে কয়েক বৎসরের বড় ছিল নরেন। আমরা দুজনে দুজনের নাম ধরিয়াই ডাকিতাম, এখনো সেই ডাক চালু আছে।

নরেনের বিবাহ হইয়া গেল। রাধারাণী দেবী সুন্দরী, শিক্ষিতা, পরিমার্জিতরুচি, তাহার উপর জাতকবি, সুন্দর কবিতা লেখেন। সুতরাং মিলনটা রাজযোটক হইয়াছিল। কলিকাতার বাড়ি তখনো তৈরি হয় নাই। তাই কবি দম্পতি কিছুদিন লিলুয়ায় বাসা বাঁধিয়াছিলেন। আমি মাঝে মাঝে লিলুয়াতেও যাইতাম, সেখানেই রাধারাণী দেবীর সঙ্গে পরিচয় হয়।

কবি দম্পতি কলিকাতার "ভালবাসা"য় উঠিয়া আসিলেন। আমি তখন প্রায়ই বন্ধুবর ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়া উঠিতাম। দশ-পনের দিন, একমাস, দেড়মাস একাদিক্রমে থাকিতাম। হিন্দুস্থান পার্কের চাটুজ্জেবাড়ি হইতে ভালবাসার দূরত্ব অতি অল্প। চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী স্বর্গগতা কমলা দেবীর সঙ্গে রাধারাণীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। চাটুজ্জেবাড়ির যে কোন উৎসবে রাধারাণী আসিতেন। বিবাহের তত্ত্বতাবাসে কমলা দেবী রাধারাণীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সেই পরামর্শ সভায় কখনো কখনো চাটুজ্জে মহাশয়ের সঙ্গে আমিও উপস্থিত থাকিতাম। কখনো কখনো ভালবাসায় গিয়া নরেন ও রাধারাণীর সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতাম। অকস্মাৎ কমলা দেবী আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। আজ বারবার তাঁহার কথা স্মরণ করিতেছি।

নরেন দেব কার্যত ভারতবর্ষের সহ-সম্পাদক। কবিওয়ালাদের বিষয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে চাই ভারতবর্ষে। নরেন দেবকে গিয়া বলিলাম। নরেন বলিল, ওহে, এজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। যে বলবার সেই অযাচিত ভাবে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—কে এমন সহৃদয়! নরেন উত্তর দিল—ডঃ সুশীল দে। তুমি কি তার কাছে গিয়েছিলে! আমি স্বীকার করিলাম—প্রবন্ধগুলি শুনাইতে গিয়াছিলাম। তিনিই বলিলেন, প্রবাসীতে সুবিধে হবে না। ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিন। আমি একটু ইতস্তত করায় তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আমি হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে পত্র লিখে দিচ্ছি।

নরেনকেই প্রবন্ধগুলি দিয়া আসিয়াছিলাম। লেখাগুলি কয়েক সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেক সময় জলধরদাও প্রবন্ধ চাহিয়া লইতেন। মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জনের নামে কোন প্রবন্ধ দিতে গেলে বলিতেন—ওটা পরে ছাপবো। তোমারটা কই। জলধরদার কথা আমি 'জলধর সম্বর্ধনা' গ্রন্থে বলিয়াছি। পরবর্তী সম্পাদক ভারতবর্ষের—শ্রীমান ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও আমাকে শ্রদ্ধা করেন। শ্রীমান শৈলেন চট্টোপাধ্যায়ের নিকটও প্রচুর শ্রদ্ধা পাইয়াছি। এই সঙ্গে নরেন দেবের বন্ধুত্বের কথা, তাহার অকপট ভালবাসার কথা আমি অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গেই স্মরণ করিতেছি।

রাধারাণী কবিতা লেখেন। নরেনও কবিতা লেখে। দুইজনের কবিতাই পড়ি। করুণানিধান, শ্রীকুমুদরঞ্জন, শ্রীকালিদাস, যতীন বাগচী—ইহাদের সঙ্গে নরেনের তুলনা

করি। বন্ধুগোষ্ঠীতে আলোচনা হয়, আলোচ্য নরেনের কবিতা। কিন্তু রাধারাণীর একটি জুটি খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। এ কবিতার সঙ্গে কাহার তুলনা করিব! অকস্মাৎ অপরাজিতা দেবী আসিয়া আসরে দেখা দিলেন। আর যায় কোথায়? একেবারে হুলস্থূল কাণ্ড। কে এই অপরাজিতা? অপরাজিতাই তো। আসিয়াই আসর মাত, জনচিত্ত জয় করিয়া বসিলেন। কি কলমের জোর, কি লেখার ধার রে বাবা। যেমন ছন্দ, তেমনই ভাষা, আর তেমনই কি বলার সাবলীল ভঙ্গী! শ্লেষ-ব্যঙ্গ ক্ষুরধাব, প্রেমের কথায় দুর্নিবার। পাঠক মহলে সাড়া পড়িয়া গেল। সাহিত্যিক মহলে খোঁজ খোঁজ রব। অনেক অনুসন্ধানের পর জনরবেব সহস্র রসনা রটাইয়া দিল—রাধারাণীই অপরাজিতা। আমি অবশ্য অনেক পূর্বেই, দুই একটি কবিতা প্রকাশের পরই জানিয়াছিলাম অপরাজিতা রাধারাণী।

বলিতে সঙ্কোচ নাই, নরেনের কবিতা অপেক্ষা রাধাবাণীর কবিতা আমার ভাল লাগিত। রাধারাণীর কবিতার জাতই ছিল আলাদা। কিন্তু অপরাজিতার কবিতার তুলনা হয় না। উচ্ছল-প্রাণের আলোড়নে উদ্বেল সে যেন একটা স্বতঃ-উৎসারিত রসপ্রপাত, একটা স্বচ্ছন্দধারা! কৃত্রিম অববাহিকার সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য সন্ধানে গেলেই ঠকিতে হইবে।

আজিকালকার দলপ্রিয়তার, দলানুগত্যের দিনে নরেনই বোধ হয় নিরপেক্ষ মানুষ, যাহার কোন দল নাই। নরেনের কোন শত্রু আছে কিনা জানি না। আমি আজ পর্যন্ত কাহারো মুখে নরেনের নিন্দা শুনি নাই। এই সদাহাস্যময় সদানন্দ পুরুষ সহধর্মিণীকে লইয়া আনন্দেই আছেন। উভয়েরই দীর্ঘজীবন এবং নিরবচ্ছিন্ন শান্তি কামনা করি। কবি দম্পতির আদরিণী কন্যা শ্রীমতী নবনীতাকে আশীর্বাদ জানাইলাম। কথাসাহিত্যের শুভ প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করিতেছি।

ভালবাসার যুগল বাসা

আশাপূর্ণা দেবী

দুর্গোৎসব একজনের, অঞ্জলি শতেক জনের। মণ্ডপদ্বার উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উৎসব আর একার থাকে না, সকলের হয়ে যায়।

'কথাসাহিত্য' কর্তৃপক্ষ বৎসরে একবার করে যে 'দুর্গোৎসব'টির আয়োজন করেন, বড় ভালো কাজ করেন। এই সম্বর্ধনা সংখ্যার মারফৎ অনেকের সুবিধে করে দেন। এই সূত্রে বন্ধুচিত্ত প্রিয়চিত্ত ভক্তচিত্ত তার ভালবাসার অর্ঘ্যটি নিবেদন করবার সুযোগ পায়।...আর এই সংখ্যার উপলক্ষেই তো সম্পাদক মহাশয়ও উদার আহ্বানে ডাক দিতে পারেন, 'এসো হে আর্য এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান, এসো এসো আজ, তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান,—'

অতএব সবাই এসে হাজির হয়, এবং 'সবার পরশে পবিত্র' হয়ে ওঠে 'কথাসাহিত্যের পৃষ্ঠা'।

গুণীব্যক্তির মরবার পর চিতায় মঠ দেবার চিরাচরিত রীতি থেকে সরে এসে তাঁর জীবিতকালেই নৈবেদ্য সাজানোর প্রথা প্রবর্তনের আরো একটি সুফল, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি নিজের চক্ষেই এই প্রীতির প্রকাশ দেখে যেতে পারেন।...বেঁচেবর্তে থাকলে বোধ করি সকলেই আমরা একবার করে দেখে যেতে পারবো 'কার হৃদয়ে আমার জন্যে কতটুকু জায়গা'। এমন একটা উপলক্ষ ব্যতীত যেটা হয়তো দেখা সম্ভব হতো না।

'কথাসাহিত্য' এবারে যে কবিযুগলের নাম করে ডাক দিয়েছেন, বাংলা দেশের সকল কবি-সাহিত্যিকের হৃদয়ে তাঁদের নাম সোনার অক্ষরে লেখা একথা বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না। বর্তমানের নবীন প্রবীণ এমন কোন কবি কোন সাহিত্যিক আছেন যিনি এই দেব-দম্পতির কাছে স্নেহঋণে ঋণী নেই? সে ঋণশোধের অবকাশ না থাকলেও, ঋণবোধটা তো থাকবেই?

আসল কথা, আমাদের নিত্যদিনের যে জগৎ, সে যেন এক কড়া জমিদারের নির্লজ্জ নায়েব, তার প্রাপ্য খাজনার কড়াক্রান্তিটি পর্যন্ত সে আদায় না করে ছাড়ে না। সেই খাজনা যোগাতে যোগাতে আমরা মনে রাখতে ভুলে যাই—এই নিত্যদিনের ঊর্ধ্বে আরো যে একটি জগৎ আমাদের আছে, তার প্রাপ্য খাজনাটা বাকির পর বাকিই পড়ে থাকছে। সে ঋণ শোধ করবার ক্ষমতা যদি নাও থাকে, স্বীকার করবার সৌজন্যটুকু যেন থাকে। ঋণ স্বীকারের মধ্য দিয়েই তো আমরা নিজেরা পরিশুদ্ধ হই, পরিচিত হই। অবহিত হই আমাদের বনেদের মাটিটা কোথায়।

প্রথমে শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর কথাই বলি।

শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর কাছে আমাদের অজস্র ঋণ, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে কতটুকু কী বলতে পারবো জানি না। বিশেষ শ্রদ্ধেয়, প্রিয়জন বা একান্ত আপনজনের বিষয় কিছু বলা কঠিন কাজ। বলতে গেলে মনে হয় বুঝি ঠিকমতো বলা হলো না, যেমনভাবে বলবার ইচ্ছে ছিল তেমনভাবে বলতে পারলাম না। আবার এও মনে হয়, কথার মালা গেঁথে প্রশস্তি গাইতে গিয়ে বুঝি দূরে সরে এলাম। আজ সেই অসুবিধের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি।

তবু একটু দূরকালের স্মৃতি নিয়েই চেষ্টা করছি।

'আধুনিক' শব্দটি যে একটি বিশেষ অর্থ বহন করে, সেই অর্থে 'আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে' রাধারাণী দেবী একটি উজ্জ্বল নাম, একটি আশ্চর্য আবির্ভাব।

এ আবির্ভাবের কাল প্রায় চল্লিশ (স্মৃতির উপর নির্ভর করেই বলছি) পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। সে সময়ে, বা তৎপূর্বের যে মহিলাকবিদের নাম আমরা দেখতে পাই, তাঁদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জানিয়েই বলবো, শ্রীমতী রাধারাণী দেবী তাঁদের থেকে স্বতন্ত্র।

রাধারাণী দেবীর কবিতার সুর আলাদা, জাত আলাদা, ভঙ্গী আলাদা। সে একটি স্বকীয়তায় ভাস্বর। তাঁর লেখনী যেন গতানুগতিকতাব গণ্ডি অতিক্রম করে যাত্রা করেছে নতুন দিগন্তের অভিসারে।

'আধুনিক বাংলা কবিতার' বনেদের ইতিহাসে রাধারাণী দেবীর অবদান অনেকখানি। কারণ আজকের দিনে আঙ্গিক এবং প্রতীক নিয়ে যেভাবেই কেন না 'আধুনিক কবিতা'র সংজ্ঞা নির্ণয় হোক, অথবা বোধ্য-দুর্বোধ্যের ধোঁয়ায় অনির্ণীত থাকুক, 'আধুনিক' শব্দটির যে একটি চিরন্তন সংজ্ঞা আছে, রাধারাণী দেবী সেই চিরন্তন সংজ্ঞায় আধুনিক। তিনি নিজে, এবং তাঁর কলম!

তাঁর কলম অনেক বেড়া ভেঙে সংস্কারমুক্ত আত্মপ্রত্যয়ে আপন বেগে অগ্রসর হয়ে পরবর্তীকালের জন্য নতুন পথ কেটেছে।

এই কবিকর্মকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পরিয়ে দিয়েছিলেন স্বীকৃতির জয়মাল্য। জানাকে, এবং অজানাকে। রাধারাণী দেবীকে, এবং অপরাজিতা দেবীকে।

রাধারাণীর 'আর এক নাম' এখন সকলেরই জানা, কিন্তু তখন তা ছিল না। তাঁর একান্ত 'কাছের মানুষ' হয়েও রবীন্দ্রনাথেরও না।

কবি সেই জানা-অজানার আলোছায়াকেই উদ্দেশ করে বলেছেন, 'তোমার লেখনীর একটি স্বকীয় চেহারা আছে, তার ছবি আঁকা চলে।... পাহাড়ের ছোট নদীতে নতুন বর্ষার বান নামলে, নুড়ি ঠেলে ঠেলে জলের ধারা যেমন কলকল টগবগ করে ছোটে, তেমনি তার কলভাষা, তার উচ্চহাসি, তার প্রাণের উদ্বেলতা।'...বলেছেন, 'মেয়েদের সংসারেব উপরিতলে যে আলোর ঝলক খেলে, যে সব ছায়ার আভাস ভেসে চলে যায়, তার ধ্বনি ও ছবি আশ্চর্য সহজ নৈপুণ্যে তোমার রচনায় লীলায়িত

হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে এই রঙ্গিমা, এই ভঙ্গিমা অপূর্ব।...তোমার যে ভঙ্গী, যে কটাক্ষ, হাসির যে কলকল্লোল, ভাষার যে বিচিত্র নাট্যলীলা, বাংলা সাহিত্যে আর কারো কলমে সেটা এমন চঞ্চল হয়ে ওঠে নি। দুষ্ট ঘোড়ার মতো ওর অবারিত চাল, অথচ খানা-ডোবাগুলো পার হয়ে যায় এক এক লাফে। কারো বলার জো নেই, তোমার হাসি আর কারো মত, তোমার গলার সুর আর কারো সুরে সাধা।'

এ প্রশংসাবাণী অনেকটাই রাধারাণী দেবীর আর এক নাম অপরাজিতা দেবীর জন্য। 'বে-ঠিকানা যার আলাপ শব্দভেদী—', কবির মৌনতাকে ছেদন করে আর পুলকিত করে তুলে কবিতা আদায় করে ছেড়েছে।

রাধারাণী দেবী আর অপরাজিতা দেবী দুই ভিন্ন নামে অভিন্ন এই শক্তিময়ী কবির রহস্যলীলা আশ্চর্য সুন্দর বিপরীত দুই সুরে ঝঙ্কার তুলেছে বাংলা কাব্যের অঙ্গনে।

এই দুজনের একজন গান গেয়েছেন এক অমৃতময় উপলব্ধির গভীর স্তর থেকে, আর অপরজন গান শুনিয়েছেন আলো-ঠিকরে-ওঠা ঝর্ণাজলের চঞ্চল আবেগ থেকে। একজন জীবন আর জীবনদেবতাকে দেখেছিল যেন মহাসমুদ্রের স্থির দর্পণে, অন্যজন দেখেছেন যেন ঘাসের ডগার শিশিরবিন্দুটির স্বচ্ছ আয়নায়।

একজন গভীর সুরে গেয়েছেন—

ওগো মোর অপ্রকাশ প্রকাশিত হও জ্যোতিসহ,
ওঠো ওঠো হে প্রত্যূষ, মৌন রাত্রি হয়েছে দুর্বহ।
... ...
তমসার গর্ভ হতে জাগো সূর্য্য কোটি রশ্মিপাতে,
আমার কানন ব্যগ্র, আলোকের তীব্র প্রত্যাশাতে।
... ...
বন্ধনের বেদনায় বিধুনিছে পক্ষ থাকি থাকি,
সংকীর্ণ পিঞ্জর মাঝে শৃঙ্খলিত নিরুপায় পাখি।

শিল্পী-আত্মার এই তীব্র আকুতির পাশে পাশেই কিন্তু অপর কলকণ্ঠ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে—

এবারের ছুটিতে, তুমি নাকি উটিতে
যাচ্ছো বেড়াতে? হ্যাঁগো সত্যি কি?
বলো না।
আমি বলি তার চে—
এপ্রিল মার্চে,
কাশ্মীরে এ বছর যাই কেন চলো না।
... ...

অথবা—

আঃ কী যে করো, ভারী অসভ্য!
রাস্তা ছাড়ো—
শুনছো? ওখানে ডাকছেন মা যে—
'বৌমা' বলে।
খামোকা কেন যে গালে টোকা মারো,
ঘোমটা কাড়ো?
পায়ে পড়ি পথ ছেড়ে দাও, যাই—
ওধারে চলে।

এমন অনেক উদাহরণের লোভ দুর্দমনীয় হয়ে উঠলেও, কথাসাহিত্যের পরিসর ভেবে সে লোভ সম্বরণ করতে হচ্ছে। এমন অনেক দুঃসাহসিক প্রগল্‌ভতার পরিচয় পাওয়া যায় অপরাজিতা দেবীর কবিতার ছত্রে ছত্রে। এ যেন নিজের সঙ্গে নিজের খেলা। আপন গাম্ভীর্যকে আপনিই কৌতুকের তীরে বিদীর্ণ করা।

সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এই উভয় সত্তাকে লালন করেছেন কবি কী অনায়াসলীলায়।

রাধারাণীর 'অপরাজিতা দেবী' নাম গ্রহণের ইতিহাস আজ অল্পবিস্তর সকলেরই জানা, কাজেই সে প্রসঙ্গের উল্লেখ বাহুল্য, শুধু এই কথাই বলবো, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বের বাংলা দেশে একটি অন্তঃপুরচারিণীর লেখনীতে এ দুঃসাহস চমকপ্রদ, বিস্ময়কর। বলতে কি প্রায় অবিশ্বাস্য। তাই সেদিন সেই অ-দৃশ্যালোকবাসিনী অপরাজিতা দেবীকে ঘিরে কত না মন্তব্য, কত না বাদবিতণ্ডা, কত না কল্পনা!

সেই তিন যুগ আগে আর এক অন্তঃপুরবাসিনীর পরিমণ্ডল বিস্তৃত ছিল না, জানার জগৎ ছিল অপরিসর, বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল অকিঞ্চিৎকর, তবু সবজান্তাদের নানা মন্তব্য তার কানে আসতো।

কেউ ঘোষণা করতেন, অপরাজিতা দেবী এক বিখ্যাত পুরুষকবির ছদ্মনাম, কেউ ঘোষণা করতেন, তিনি এক অসূর্যম্পশ্যা লজ্জাবতী বধূ—নাম প্রকাশ করলেও, নিজে প্রকাশিত হবেন না, আবার কয়েকজন ঘোষণা করতেন—অপরাজিতা দেবী হচ্ছেন বাংলার বাইরের কোনো দূরলোকের কোনো এক স্কুলের হেডমিস্ট্রেস, ইত্যাদি ইত্যাদি। সকলেই অবশ্য ভালরকম জানার দাবি নিয়েই জানাতেন।

কিন্তু মুগ্ধ রসাস্বাদকের কাছে ওইসব তথ্যের চাইতে অনেক মূল্যবান ছিল সেইসব আশ্চর্য দুঃসাহসিক উদ্দামচপল কবিতাগুলি, যা বেজে উঠেছে 'বুকের বীণা'য়, ছড়িয়ে পড়েছে 'আঙিনার-ফুল' হয়ে, ফুটে উঠেছে 'বিচিত্ররূপিণী'র রূপসজ্জায়।

দুঃসাহসিকা শুধু অপরাজিতা দেবীই নয়, রাধারাণী দেবীও। তাঁর আগে এদেশে আর কোন্ মহিলাকবির লেখনী থেকে এমন স্পষ্ট বলিষ্ঠ বেগবান প্রেমের কবিতা উৎসারিত হয়েছে?

বস্তুতঃ বাংলা দেশে তখনো—'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না'র যুগ। তাই মহিলাকবিদের লেখনীতে প্রধানতঃ ফুটে উঠতে দেখা যেত সংসার জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতা, প্রকৃতি-প্রেম, ঈশ্বরপ্রেম, বড় জোর পতিপ্রেম, তাছাড়া সুনীতি, সদাচার শিক্ষা, আদর্শ, ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটকথা, বিষয়বস্তু কিছু থাকবেই।

কেবলমাত্র কবিতার জন্যই কবিতা লেখা, হৃদয়ের এক অনাস্বাদিত অনুভূতির ঝঙ্কারে স্পন্দিত হয়ে বেজে ওঠা, চিরন্তন বিরহমিলনেব বিষাদঘন আনন্দস্বাদকে বিচিত্র মহিমায় বিকশিত করে তোলা, মহিলাকবির কাছ থেকে এটা নতুন। একেই বলা যায় আবির্ভাব। বিনা দ্বিধায় বলা যায় বাংলা সাহিত্যের ভূমিতে শ্রীমতী রাধারাণী দেবীই প্রথম 'বঙ্গনারী'র গুণ্ঠন মোচন করে অনায়াস মহিমায় রাজপথে পদার্পণ করেছেন।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের পরম দুর্ভাগ্য যে, দ্বৈত ভূমিকায় উজ্জ্বল এই লীলাময়ী কবি আজ সেই আলোকোজ্জ্বল মঞ্চের উপর যবনিকা টেনে দিয়ে স্থির হয়ে বসে আছেন, সাহিত্যিক জগতের 'বৌদি' হয়ে।

কেন তাঁর সাহিত্যজগৎ থেকে এই স্বেচ্ছাপসারণ, তা কারো জানা নেই, এতে তাঁর নিজের কী লাভ হয়েছে জানি না, তবে বাংলা সাহিত্যের যে অনেকখানি লোকসান ঘটেছে, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর অন্তরের গভীর রসবোধ, স্বচ্ছ জীবনবোধ, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ, বলিষ্ঠ সত্যনিষ্ঠা ও পরিশীলিত রুচি, এবং সর্বোপরি তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি, সাহিত্যে এখনো পর্যন্ত যা দিয়ে চলতে পারতো, তা থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যকে বঞ্চিত করেছেন।

রাধারাণী দেবীর প্রতিভার যথার্থ আলোচনা করতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার নেই, সে স্পর্ধাও নেই, আমি শুধু ওই 'নামের' মধ্যে আমার একদার তরুণ মন যে মোহময় স্বাদ পেয়েছিল, তার কিছুটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করলাম মাত্র।

তখনও তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমার কাছে সে নাম তখন দূর আকাশের তারা। তখন শুধু রোমাঞ্চিত হয়েছি কবি রাধারাণী দেবী ও কবি নরেন্দ্র দেবের মধ্যেকার কাব্যময় প্রেমের সংবাদ পরিক্রমায়, পত্রিকার পৃষ্ঠায় কবিতার ছন্দে সে প্রেমের মধুর প্রকাশে। রোমাঞ্চিত হয়েছি এই দুই রোমাণ্টিক কবির সংস্কারমুক্ত অভিযানে, আর রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্য তাঁদের পরিণয়বার্তায়।

তারপর—অনেকদিনের পর এলো দেখার সৌভাগ্য। সাল তারিখ ঠিক বলতে পারবো না, ওটা কখনোই মনে থাকে না আমার, মনে আছে শুধু উপলক্ষটি।

'ক্যালকাটা কেমিকেল' আয়োজিত একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার (কথাশিল্প) সূত্রে প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার অনুরোধ নিয়ে আমার বাসাবাড়িতে পদধূলি দিলেন কবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব।

কাইজার-সদৃশ পাক দেওয়া গুম্ফশোভিত মুখ, মধ্যযুগীয় জমিদারতুল্য সেই

দীর্ঘ উন্নত বিশাল মানুষটিকে পত্রিকার পৃষ্ঠার ছবির থেকে সশরীরে আমার ক্ষুদ্র বাসাবাড়িতে এসে দাঁড়াতে দেখে রীতিমত অভিভূতই হয়ে গিয়েছিলাম।

কোথায় বসাই এই রাজার মতো অতিথিকে! কোন্ কথাই বা বলি তাঁকে!

তখন একেবারেই ঘরের কোণায় থাকি, জানিও না আমার লেখা গল্প কেউ পড়ে কিনা, আদৌ কারো চোখেই পড়ে কিনা, অথচ ওই প্রতিযোগিতা সব খ্যাতনামা লেখকদের সঙ্গে।...মনে আছে কুণ্ঠিত চিত্তে বলেছিলাম, 'এতো সব ভালো ভালো লেখকদের সঙ্গে আমি কেন?'

কবি প্রাণখোলা গলায় উত্তর দিয়ে উঠেছিলেন, 'আপনিও ভালো লেখেন বলে!'

না, এই সুযোগে নিজের একটু পাবলিসিটি দিয়ে নিচ্ছি না, কথাটার উল্লেখ করছি শুধু, নিতান্ত সাধারণের প্রতিও তাঁর যে মূল্যবোধ, সামান্যকেও স্বীকৃতি দেবার যে উদারতা, আর উচ্চকে এবং তুচ্ছকে সমদৃষ্টিতে দেখবার যে স্বচ্ছ দৃষ্টি—সেইটি বোঝাবার জন্যে। এ জিনিস সুলভ নয়।

তথাপি আমার কুণ্ঠা দূর হচ্ছে না দেখে বলেছিলেন, 'প্রতিযোগিতা মানে তো আর প্রত্যেকেরই পুরস্কার পাওয়া নয়? পেলে পাবেন, না পেলে না পাবেন, যোগ দিতে দোষ কি? না পাওয়াটাকে স্পোর্টিং স্পিরিটে নেবেন।'

কথাটি আজও মনে আছে, জীবনের বহু ক্ষেত্রে মনে রাখি। পাওয়া এবং না-পাওয়ার মধ্যে তফাৎ যে শুধু একটু মনোভঙ্গির তফাৎ, একথা তার আগে আর কেউ এমনভাবে বলেনি। সেদিন হঠাৎ মনে হলো কোথায় যেন একটি বিশাল উদার আশ্রয় পেলাম।

আজও সেই আশ্রয়ে আছি।

মনে হয় এমন হৃদয়কেই বুঝি বলে সমুদ্র-হৃদয়। এঁর জন্যেই লেখা যায়—

তোমার প্রাণ উদার মাঠ,
তোমার প্রাণ বিশাল হাট,
তোমার প্রাণ দরদালান,
সেথায় পায় সবাই স্থান।
তোমার স্নেহ বটের ছায়,
হাজার জন এসে দাঁড়ায়
শান্তি পায়, শক্তি পায়,
হয় না কারো অকুলান।
সকলের তিনি নরেনদা।
সকলের তিন ভরসাস্থল।

তাঁর কবিসত্তার চাইতেও বুঝি অনেক বড় 'হৃদয়'-সত্তা। যদিও সুদীর্ঘকালের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'নরেন্দ্র দেব' একটি অবিচ্ছিন্ন উপস্থিতি, একটি সদাজাগ্রত নাম। গদ্যসাহিত্য কাব্যসাহিত্য শিশুসাহিত্য—সর্বত্র তাঁর অবাধ সঞ্চরণ।

আজও তাঁর কলম সক্রিয়, আজও তাঁর কবিচিত্ত সরস সতেজ। ব্যাধি তাঁকে কাবু করে উঠতে পারে না, জরা তাঁকে গ্রাস করতে এসে লজ্জা পায়, 'বয়স' তাঁর কাছে হার মেনে ফিরে যায়।

সরস সদালাপী সর্বদা কৌতুকভাষণে তীক্ষ্ণ এই 'আশী বছরের তরুণটি'র আজও সাহিত্যসভায় সমান আগ্রহ, গানের জলসায় সমান আকর্ষণ, যে কোনো ব্যাপারেই সমান উৎসাহ। উৎসাহে নরেনদা তরুণদের কাছে বিস্ময়, বৃদ্ধদের ঈর্ষার স্থল। 'বয়স বলেই বুড়ো হয়ে যারা মরে, বড় কৃপা তাঁর, সে অভাগাদের পরে।'

শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকেও প্রথম দেখেছিলাম সেই 'কথাশিল্প' উপলক্ষেই আয়োজিত প্রীতি সম্মেলনে, ক্যালকাটা কেমিকেলের দোতলায়। সেই একবারের দেখাতেই সহসা পেয়ে গেলাম একটি স্নেহ আর আশ্বাসে ভরা হৃদয়ের স্বাদ। যে হৃদয় এই সুদীর্ঘকাল অফুরন্ত স্নেহে আমাকে তাঁর 'পরিবারের একজন' করে নিয়ে সুখে দুঃখে পরম একটি আশ্রয় দিয়ে রেখেছে।

কেমন করে যে সেই একবারের দেখাতেই দেব-দম্পতির 'ভাল-বাসা'র বাসাটিতে আমার একটি পাকা জায়গা হয়ে গেল, সে-কথা বলা শক্ত, আর এও বলা শক্ত কখন কোন্ ফাঁকে 'কবি নরেন্দ্র দেব, ও কবি রাধারাণী দেবী'র অনেক ঊর্ধ্বে আসন পেতে বসলেন দাদা বৌদি। সমস্ত সাহিত্যিকগোষ্ঠীরই তাঁরা দাদা বৌদি, সকলের জন্যেই তাঁদের ভালবাসার দ্বার উন্মুক্ত, তবু মনে হয় বুঝি বিশেষ করে 'আমার জন্যেই সেখানে অনেকখানি ঠাঁই'। হয়তো সকলেরই এমন মনে হয়। বিশালের স্পর্শের স্বাদই এইরকম, একই গঙ্গায় সবাই অবগাহন স্নান করে স্নিগ্ধ হতে পারে।

আমার সাহিত্যজীবনে এই দরদী দম্পতির দান কতখানি, সে কথা এখন বলতে বসবো না, হয়তো তাতে নিজের কথাই সাতকাহন হয় দাঁড়াবে। শুধু এইটুকুই বলবো, সে দান অপরিসীম।

নরেনদা হচ্ছেন ছেলে বুড়ো সকলের সমবয়সী, বৌদির মধ্যে আছে একটি 'গুরুজনে'র ভূমিকা। এই ভূমিকা তাঁর সহজাত। এইটিই তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সরস বাক্‌পটু কৌতুকপ্রিয় 'বৌদি'র ভূমিকার মধ্যে থেকেও সহজেই তিনি অনেক বয়স্কের 'গুরুজন'। এই তাঁর চরিত্রের আভিজাত্য।

'ভাল-বাসা'য় অবাধ প্রবেশের অধিকারে বৌদি রাধারাণী দেবীকে দেখেছি অতি সান্নিধ্যের নানাক্ষণে, দেখেছি উচ্ছল আনন্দময় উৎসবের পরিবেশে, দেখেছি সংসারজীবনের নানা জটিল পরিস্থিতিতে, দেখেছি বহু অভ্যাগতের কলকল্লোলে মুখরিত কক্ষে, দেখেছি নিতান্ত নির্জন ঘরে একা, এই 'দেখা'র মধ্যে থেকেই উপলব্ধি করেছি, দুই নামের দ্বিতীয় নামটিই তাঁর আসল নাম।

সেই নামটি একটি শ্যামল কোমল ফুলের নাম নয়, সে হচ্ছে পরাজয় না মানবার প্রতিজ্ঞার নাম।

কোনো স্বার্থবুদ্ধি, কোনো সুযোগচিন্তা, কোনো লাভক্ষতির হিসেবই (অহরহই চারদিকে যা দেখতে দেখতে চিত্ত ক্লান্ত) তাঁকে তাঁর বিশ্বাসের পথ থেকে, আদর্শের পথ থেকে, রুচির পথ থেকে, নিজস্ব মতবাদের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। অসুন্দর আর অরুচিকরের সঙ্গে তাঁর আপসহীন মনোভাব।

এই মনোভঙ্গিই রাধারাণী দেবীকে দীপ্ত, দৃপ্ত, আর 'অহঙ্কারী' করে রেখেছে।

হ্যাঁ, 'অহঙ্কারী' শব্দটিই ব্যবহার করলাম আমি, তেজস্বিনী রাধারাণী দেবীর চরিত্রে স্পষ্ট প্রখর একটি অহঙ্কার আছে, যে অহঙ্কারের আসল নাম মর্যাদাবোধ। যা ব্যক্তিত্বে প্রখর, এবং 'অ-পরাজিতা' নামে সম্পূর্ণ।

লেখবার কথা অনেক আছে, অজস্র আছে, তবু কবি নরেন্দ্র দেব সম্পর্কে হয়তো কিছুই লেখা হল না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি একটি বিরাট অধ্যায়। জ্ঞানের উন্মেষ থেকেই 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠায় তাঁর লেখা পড়ে আসছি। তাঁর 'পাঠশালা'র পড়ুয়ারা আজ এক-একজন কর্তাব্যক্তি মানুষ। তবু আজও তাঁর কলম প্রার্থীকে বিমুখ করে না। এখনো সে কলম সরস কৌতুকে ঝলসে ওঠে। কবি নরেন্দ্র দেবের সাহিত্য-কর্ম সম্পর্কে অনেকেই অনেক কথা বলবেন, আমি শুধু 'মানুষ নরেনদা'র কথাই বললাম।

নরেনদা, রাধারাণীবৌদি, ভালবাসার এই যুগল বাসায় আমাদের সকলের জায়গা আছে, বাংলা সাহিত্য এবং সাহিত্যিকগোষ্ঠীর এ এক তীর্থভূমি। নরেনদার জন্মমাসের এই পুণ্যক্ষণে নতুন করে একবার তীর্থ প্রণাম করে ধন্য হলাম।

ঈশ্বরের কাছে তাঁদের সুস্থ স্বাস্থ্যময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

শান্তা দেবী

আমার বিবাহের পূর্বে আমরা যখন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে বিচিত্রা অনুষ্ঠানে যেতাম তখন রাধারাণী দেবীর নরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে বিবাহ হয় নি। তিনি প্রায়ই একলা বিচিত্রায় আসতেন দেখতাম। আমার সঙ্গে পরিচয়ও তখন ছিল না।•কোথায় এবং কবে যে পরিচয় হয়েছিল তা এখন মনে পড়ছে না। তবে সেকালে রাধারাণী দেবীকে দেখে মনে হত উনি বুঝি কথাবার্তা বেশী বলেন না। ওঁর লেখা কবিতা মাঝে মাঝে পড়তাম। আমি সংস্কৃত শব্দবহুল কবিতা ভালবাসি। রাধারাণীর কবিতার সেই গুণটি আমার ভাল লাগত। তাছাড়া কবিতার যে মাধুর্য সেটিও প্রচুর থাকত।

যখন ওঁর সঙ্গে আলাপ হয় একথা ওঁকে বোধ হয় বলেছিলাম। দেখলাম উনিও আমার লেখার অনেক প্রশংসা করলেন। তখন আমি "চিরন্তনী" কিম্বা "জীবনদোলা" উপন্যাস লিখতাম। হঠাৎ একদিন তাঁর বিবাহের খবর পেলাম। নরেন্দ্রবাবুর কথা স্বর্গত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কিছু কিছু শুনতাম। রাধারাণীর সঙ্গে কি সূত্রে জানি না আমার ভাগিনেয় জগদ্বন্ধু মিত্রের সৌহার্দ্য হয়। রাধারাণীকে তিনি দিদি বলতেন। জগদ্বন্ধুর বিবাহের সময় রাধারাণী দেবী বৌ-তোলা দেখতে এসেছিলেন। সেদিন তাঁর সঙ্গে আমার অনেক গল্প হয়। সচরাচর এত কথা বলবার সুযোগ হত না। নিমন্ত্রণবাড়িতে দেখা-সাক্ষাৎ কতক্ষণের জন্যই বা! তখন অন্যত্র দেখা বড় হত না।

পুরাকালে আমাদের একটা PEN Club ছিল। সে Club বোম্বাই-এর অধীন ছিল না। মণীন্দ্রলাল বসু প্রভৃতি অনেকেই তা চাইতেন না। সেই পুরোনো PEN Club-এ রাধারাণী দেবী কখনও আসতেন বলে মনে পড়ছে না। কিছুদিন পরে বোম্বাই-এর সঙ্গে মতে না মেলাতে ঐ Club উঠে গেল। নতুন যে PEN Club অনেকদিন পরে হল তাতে আমার নাম ছিল না। তাছাড়া আমি বাইরে তখন বেশী যেতামও না। কিন্তু অন্য জায়গায় দেখা সাক্ষাৎ হত। একবার রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে রাধারাণী দেবী সারাপথ বহু যত্ন করে ফুলের মালা নিয়ে আসছিলেন। শেষে যথাস্থানে পৌঁছে দেখলেন মালাগুলি ফেলে এসেছেন। তখন তাঁর যা আপসোস সে আজও আমার মনে আছে!

ওঁরা দেশবিদেশে খুব বেড়িয়েছেন। কাগজে তার বিবরণ পড়তাম। তাঁদের ছোট্ট মেয়েটিও সঙ্গে থাকত এবং ছোটদের কাগজে কবিতা পাঠাত মনে হচ্ছে। তার বিবাহে নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছি।

ঘাটশিলাতে রাধারাণী দেবী মাঝে মাঝে যেতেন। সেখানে আমাদেরও একটা

ছোট আস্তানা আছে। আমার বাবা যখন জীবিত ছিলেন তখন ঘাটশিলা যেতে খুব ভালবাসতেন। রাধারাণী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দুই একবার এসেছিলেন। আমার কলকাতার বাড়ীতেও একদিন এসেছিলেন তাঁরা, তখন আমরা সবে এ-পাড়ায় এসেছি। আগে থাকতাম পার্ক সার্কাসে।

রাধারাণী দেবী একসময় অপরাজিতা দেবী নামে লিখতেন। তার বিষয় উনি নিজেই পরে লিখেছেন। প্রবাসীতে অনেক আগে রাধারাণী দেবীর গল্পও দুই একটি বেরিয়েছিল। যতদূর মনে পড়ছে একটা গল্প সমুদ্র-স্নান বিষয়ে। স্মৃতিকথা লেখাও বড় মুশকিলের। কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোকের স্মৃতিকথাতে ২।৪টি কথা পড়েছি যা তিনি ভুল করেছেন বলে আমার মনে হয়। আমরা সবাই অনেক কথাই ভুলে যাই; সেই ভয়ে বেশী লিখতে সাহস হয় না। সকলেই লিখতে বলেন; কিন্তু কার ধড় কার মাথার সঙ্গে জুড়ে বসবে এই ভেবে ইতস্তত করি।

রাধারাণী দেবীর সাজপোশাকে এবং গৃহরচনায় সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পেয়ে খুশি হয়েছি। তাঁর ছোট্ট বাড়িটিতে একবার গিয়েছিলাম। কত যত্ন করেই করেছেন।

আমার পিতৃদেবের শতবার্ষিকীর সময় রাধারাণী তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে এসেছিলেন মনে আছে। মহিলাদের মধ্যে আর কাউকে বলতে দেখেছি মনে পড়ছে না। উনি শতবার্ষিকী কমিটিতেও ছিলেন।

হাতের কাছে ওঁর লেখা কোনো বই পেলাম না। না হলে কিছু উদ্ধৃত করতাম। আষাঢ় মাস ত শুরু হয়ে গিয়েছে, কাজেই আর দেরি করে পাঠালে আমার লেখার স্থান হয়ত কথাসাহিত্যে হবে না। দেবদম্পতিকে নমস্কার জানিয়ে শেষ করি। বাইরে কম বেরোই বলে লেখা ছোটই হল।

পত্রাবলী : রাধারাণী/অপরাজিতা দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

চীন জাপান ঘুরে মহাসাগরে দু বার পাড়ি দিয়ে তোমার চিঠিখানি আমার হাতে এসে পৌঁছল। এবার আমার জন্মদিন এসেছিল সমুদ্রপথে পথিকের খেয়া তরীতে —জাপানের ঘাট ছিল দুদিনের রাস্তার তফাতে। চিরদিন দেখচি আমার চলতি পথের জীবন যাত্রা। এক একটা ছেদ পড়ে তখন লম্বা কেদারায় ঠেসান দিয়ে মনে করি এইবার পান্থলীলা সাঙ্গ হোলো। দু দিন না যেতেই আরাম কেদারার মায়া আবার ছিন্ন হয়, যাত্রা আবার সুরু হয়, অচেনাদের ঘরে আসন পড়ে—তারাও বলে খুসি হলুম, আমিও বলি ধন্য আমি। পৃথিবী ঘুরেছি অনেক—চেনা লোক অচেনাদের মধ্যেই বেশি দেখা গেল—তারা বলে, তুমি আমাদেরই, বসে বসে ভাবি, এতবড়ো কথাটা কেন বললে। আত্মীয়রা কেবলি যাচাই করে, খুঁৎখুৎ করে, হিসেব মিলিয়ে বলতে থাকে তারা ঠকেছে, দাম ফিরিয়ে নিতে চায় সুদসুদ্ধ। তখন মনে এই কথাটা আসে, নিজের জন্মভূমি ঠিক কোথায় সেটা খুঁজে বের করতে হয়। জন্মমুহূর্তে আমাকে নির্বিচারে অভ্যর্থনা করে নিয়েছে আমার পরিবারের লোক। সেটা চরম নয় তো। তার পরে সময় আসে বিচার করে অভ্যর্থনা করে নেবার। সেই অভ্যর্থনার ক্ষেত্রেই অন্তরের জন্মভূমি। আমি ত মনে করি আমার অভাবনীয় সৌভাগ্য এই যে, দেশের বাইরে আমার জন্মভূমি প্রশস্ত। সেখানে এত কাঁটার বেড়া নেই। তাতে ক্ষতি নেই। বিধাতার স্বহস্তে চিত্তলোকে যা পেয়েছি তার থেকে বাইরের কোনো মনিব বা মোড়ল এক কড়াও জরিমানা আদায় করতে পারবে না। যিনি দানের কর্ত্তা তিনি কৃপণতা করেন নি।

ইতি ১৭ শ্রাবণ ১৩৩৩ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রেলপথে

কল্যাণীয়াসু

সেদিন তোমার কথাগুলি শুনে বড় আনন্দ পেয়েছি এইটুকু জানাবার জন্য তোমাকে একখানি চিঠি লেখবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এতদিন এতটুকুও অবসর পাই নি। আজ আমার আত্মীয়ার বিবাহ উপলক্ষ্যে কলকাতায় চলবার পথে রেলগাড়ি

কোনো কারণে তার চলায় ঢিলে দিয়েচে দেখে তোমাকে এই সুযোগে আমার আশীর্বাদ জানাবার ইচ্ছা হল। সেদিন তোমার কাছ থেকে আমি যেন সমস্ত বাংলা দেশের মেয়েদের হাতের অর্ঘ্য পেয়েছি —এ আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেচে।

বাল্যকাল থেকে দীর্ঘ দুর্গম পথ বেয়ে চলেচি সাহিত্য-অমরাবতী লক্ষ্য করে। বন্ধুর পথে অনেক কাঁটা ফুটেচে—আবার ফুলেরও অভাব ঘটে নি—এই ফুলের অনেক অংশই আমার দেশের মেয়েদের কাছ থেকেই পেয়েছি। সরস্বতী আমাকে তাঁর বরমাল্য পাঠাতে ত্রুটি করেন নি— কিন্তু তার প্রথম ডালি তোমরাই বহন করে এনেছিলে। এখন পর্য্যন্ত সে মালা নবীন আছে এই কথাটাই তোমার কাছ থেকে সেদিন জানা গেল। ইতি ৩ ফাল্গুন ১৩৩৩

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুব

Uplands
Shillong

6 Dwarkanath Tagore Street
Calcutta

কল্যাণীয়াসু

খুসি হলুম তোমার চিঠি পেয়ে। জন্মদিনটাকে বড় বিশেষ খাতির করি নে —কতকাল আগেকার কথা, প্রায় পুরাতত্ত্বের আমলে। প্রত্যেক যুগ তার যুবকদের জন্যে, আমাদের বয়সী লোকেরা পরবাসী, কর্ত্তা প্রতিদিনই জিজ্ঞাসা করেন আর কতদিন থাক্‌বে? লজ্জিত হয়ে মাথা চুলকে বলতে হয় এই আজকালের মধ্যেই যাব। তাই তোমরা জন্মদিনের তত্ত্ব নিতে এলে সঙ্কোচ বোধ হয়। যা দেবার তা দিয়ে চুকিয়েছি—এখন যা ভোগ জুটচে তার দাম পুরো দেবার মত তহবিল নয়। যা পারি চেষ্টা করি, লোকে বলে আগেকার মত হচ্চে না। হবার কথা হয়। এখন যারা নতুন এসেচে তাদের সঙ্গে পাল্লা দেব কি করে? পূর্ব্বে থেকে বাঁধা বরাদ্দ আছে বলেই সম্মান পাই কিন্তু নতুন যাচাই করে যদি দেনাপাওনার হিসেব করতে হয় তাহলে আমার ভাগে অনেক কম পড়বে। তাই ধুমধাম করে জন্মদিন করবার ইচ্ছে নেই—দুদিন আগেই পালিয়ে এলুম। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Srabasti
Colombo

কল্যাণীয়াসু

তোমরা আমাকে বোধহয় প্রসন্ন মনে বিদায় দেওনি—তাই এইটুকু পথে আসতে দু-তিনবার আমাকে থেমে যেতে হোলো। অবশেষে এই লঙ্কাদ্বীপে এসে বোঝা গেল এর পরে আর আমার পাড়ি জম্‌বে না—সেই সারিগানের লাইনটা মনে পড়চে,

"মাঝি তোর বৈঠা নেরে—
আমি আর বাইতে পারলাম না।"

চলেছি আবার আমার কোণের দিকে ফিরে। মনে সঙ্কল্প আছে কিছুকাল সম্পূর্ণ নির্জন বাস আশ্রয় করব। গোলমালের তুফানে ভাসাবার মতো নৌকা আমার নয়।

ফলাও করে চিঠিপত্র লেখবার মতো অবস্থা আমার নয়। এখন তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে কলম বন্ধ করি। তার পরে বাড়ি গিয়ে আমার সোফায়। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, ক্ষণে ক্ষণে ভিজে হাওয়া পিঠের দিক থেকে টেবিলের উপর এসে প'ড়ে আমার লেখা ও অলেখা কাগজপত্র নিয়ে যা খুসি তাই করচে—ইতি

৫ জুন ১৯২৮ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বার্লিন

কল্যাণীয়াসু

আজ এইমাত্র তোমার চিঠিখানি পেয়ে মনে বেদনা বোধ করচি। এবারে বিদেশে এসে আমাকে যেরকম নিরন্তর ঘুরতে হয়েচে এমন আর কোনোবার হয়নি। অথচ শরীর ক্লান্ত—প্রতিদিন বুঝতে পারি পথিগ্‌ বৃত্তি করবার বয়স এখন আমার নেই। কুষ্ঠি মিলিয়ে দেখলে ধরা পড়ে আমার বয়স প্রায় সত্তর হয়েচে—কিন্তু তবু সেটা ক্ষণেক্ষণে আবিষ্কার করবার দরকার হয়। অন্যমনস্ক হয়ে ভুলে যাই যে সেই তিরিশের ওপারে পদ্মার চরে যে ছন্দকল্লোলমুখর দিনগুলো ফেলে রেখে এসেচি এখনো বুঝি তাদের নাগালের মধ্যেই আছি, এমন সময় হঠাৎ চমকে উঠে বুঝতে পারি অনতিদূর থেকে বৈতরণীর স্রোতের আওয়াজ আসচে। এখন দেশে বিদেশে পথে ঘাটে ভিড় ঠেলে বেড়াবার সময় আমার আর নেই। যাই হোক এই ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ে তোমাকে লিখতে ভুলে গেছি সে কথা কবুল করতে হোলো।...তোমার সে খাতাখানি পেয়েছি। কিন্তু এবারকার প্রবাসে আমার পাঁজিতে বাংলাকবিতার তিথি

মিলল না। হিবার্ট লেকচার ট্রাষ্টিদের খাতিরে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে একখানা ইংরেজি বই লিখতে হয়েচে। এতদিন তারই পাকের মধ্যে মনটা ক্রমাগত চক্কর দিয়েচে। অল্পদিন হোলো খালাস পেয়ে চলে গিয়েছিলুম রাশিয়ায়। সেখান থেকে দিন দুয়েক হোলো ফিরেচি, আবার কালই যাত্রা করচি আমেরিকায়। আমার সমস্ত মনকে এখন রাশিয়ায় পেয়েছে। তাছাড়া আরেক উপসর্গ আছে সে হোলো আমার চিত্রকলা। দিন অবসানের সময় তার সঙ্গে আমার হঠাৎ মিলন—অর্থাৎ গোধূলিলগ্নে। প্রভাতে যে কাব্যকলার সঙ্গে শুভদৃষ্টি হয়েছিল সে এনেছিল বাণী—আর সূর্যাস্তের মুহূর্তে এনেছে বর্ণ। এর মুখে নেই কথা কিন্তু ঘোমটায় আছে রঙের ভাষা। পশ্চিমতীরের দিগন্তেই হয়েচে এর বাসকসজ্জা। এ আমাকে অবকাশ দিচ্চে না। এর রূপের খ্যাতি এখানে ছড়িয়ে পড়েচে কিন্তু একথা তোমাদের পাড়ার লোক বিশ্বাস করবে না।

দেশের দিকে আমার মন ধাবমান, কিন্তু ভাগ্য আমাকে চালাচ্চে একেবারে উল্টোপথে। কবে সেই "তমালতালী বনরাজিনীলা" তটভূমি দেখা দেবে জানিনে। বর্ষা চলে গেল, এখন শরৎ এসেচে, আমার কাছ থেকে তাদের বার্ষিকী যা প্রাপ্য ছিল এবার তা বাদ পড়ে গেল—কদমও ফুটেছিল শিউলিও ঝরচে কিন্তু গান জমল না। যতদিনের মেয়াদে গানের বায়না নিয়ে আসরে নেমেছিলুম সে যে ফুরিয়ে এল। ইতি ১লা অক্টোবর ১৯৩০

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Asantuli
Darjeeling

কল্যাণীয়াসু

এখানে এসে রোগের জড়তা দূর হয়েচে। দেহ থেকে জ্বর তার যে বাসা ছেড়েচে, সেই খালি বাসাটা জুড়ে বসেচে কুঁড়েমি এসে।

তোমার আত্মীয় বন্ধুরা তোমাকে যে-অবস্থায় যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত তার পরিবর্তন সহ্য করতে পারচে না। তারা তোমাকে দেখেচে রেশমের গুটির মধ্যে —সেটা ছিন্ন করে তুমি পাখা মেলতে চাও এটা তাদের কাছে স্পর্ধা বলেই বোধ হয়। কিন্তু, জীবনের পরিপূর্ণতা লাভে দীর্ঘকাল তুমি বঞ্চিত আছ বলেই যে সেই অধিকার দাবী করায় তোমার অপরাধ আছে এমন নিষ্ঠুর কথা যারা বলে তাদের কথা শ্রদ্ধার যোগ্য নয়। নিন্দা অপমানের দুর্গম পথ দিয়ে তোমার নূতন জীবনে তুমি প্রবেশ করচ,--যে কঠিন মূল্য তোমাকে দিতে হোলো, সেই মূল্যের উপযুক্ত সার্থকতা লাভ কর এই আশীর্বাদ করি। নিন্দার বহু উর্ধ্বে তোমাদের উঠতে হবে

এই একটি অনুশাসন তোমাদের পরে রইল, এ কম কথা নয়। এখন থেকে তোমাদের জীবন সহজ হল না বলেই স্বতই সেটা সাধনার জীবন হবে—এই সাধনায় তোমাদের গৌরব দিক।...ইতি ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Gouripur Lodge
Kalimpong

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুশি হলুম। এত কাল তোমাদের নূতনেরই বাণী শুনিয়ে এসেছি—আজ হঠাৎ পুরাতনের বাণী শোনাতেই সেটা তোমাদের নতুন ঠেকচে। আমিও যে পুরাতন হয়েছি কিছুদিন থেকে সেটা আমারই কাছে নতুন ঠেকচে—এত নতুন, ছোটো শিশু যেমন নতুন।

তোমাদের ইচ্ছার দ্বারা শতায়ু করতে পারবে না জেনেই নিশ্চিন্ত আছি। ভাঙ্গন ধরা বাসায় প্রত্যহই ইঁটকাঠ স্খলনের অগ্রগতি এই প্রগতির যুগে সম্মান আশা করতে পারে না। আমার অতিথিশালায় তোমাদের নিমন্ত্রণের ফর্দ ছেঁটে ছেঁটে শেষকালে কি থালাঘটিবাটি বিকিয়ে দিয়ে বিদায় নেব। পাব্লিক মহারাজ নিত্য বরাদ্দের দাবী করে, অতীতের জন্যে তার কৃতজ্ঞতা নেই। ইতি ২৬শে বৈশাখ ১৩৪৫

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার কবিতাগুলি পড়ে দেখলুম। ভালো লাগল। তোমার রচনার ভাষা ও ভঙ্গী তোমার স্বকীয় পন্থা অবলম্বন করেছে, অথচ তার স্খলন হয়নি। আমার কেবল একটি কথা বলবার আছে। এই রকম কবিতাকে ইংরেজিতে বলে সোসাএটি ভার্সেস্। এদের নৈপুণ্য যতই থাক স্থায়িত্ব অল্প। চলমান স্রোতের উপর যে রঙীন ছায়া আকাশের চলমান মেঘের অনুর্বতন করে ভেসে চলে যায়, কোনো চিহ্ন রাখে না এবং তলায় গিয়ে পৌঁছয় না—এও সেই রকম। নিকুঞ্জে পাখীও আছে, রঙীন পাখার পতঙ্গমও আছে—কিন্তু যদি কেবলি পতঙ্গম থাকে, পাখী না থাকে তাহলে অভাব থেকে যায়। তোমার কাব্যে প্রজাপতি দেখা দিয়েছে, তাদের পাখার লীলা

দেখলুম, কিন্তু পাখীর গানও শুনতে চাই। যারা তোমার কবিতাকে অশ্লীলতার অপবাদ দিয়েছে তাদের কথায় কাণ দিও না। তাদের মন অশুচি।

কাব্য রচনা থেকে নিবৃত্ত হবার মতো কোনো অপরাধ তুমি করোনি, লেখবার যে সহজ শক্তি তোমার আছে তা নিয়ে তুমি গৌরব করতে পারো।

অত্যন্ত ব্যস্ত ও ক্লান্ত বলেই তোমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হোলো। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীকে লিখিত

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার মনে পড়চে তোমার বইখানি যখন প্রথম আমার হাতে এল, তখন সংযত সতর্ক ভাষায় প্রশংসার একটুখানি আভাস মাত্র দিয়েছিলেম। যারা বিজ্ঞলোক তারা হাতে রেখে কথা বলে। যদি সব কথা পুরোপরি বলতুম তাহলে তোমার অহঙ্কার হোত। তুমি আমার সমব্যবসায়ী, সেইজন্য তোমাকে প্রশ্রয় দিতে সাহস হোলো না। কী জানি কোন্ দিন হয়তো বলে বসবে যে—থাক্ সে কথা।

আমার বলবার ইচ্ছে ছিল তোমার লেখায় যে ভঙ্গী, যে রঙ্গ, যে কটাক্ষ, হাসির যে কলকল্লোল, ভাষার যে বিচিত্র নাট্যলীলা, বাংলাসাহিত্যে আর কারো কলমে সেটা এমন করে চঞ্চল হয়ে ওঠেনি। দুষ্টু ঘোড়ার মতো ওর অবারিত চাল, অথচ খানা ডোবাগুলো পার হয়ে যায় এক এক লাফে। কারো বলবার জো নেই তোমার হাসি আর কারো হাসির মতো, তোমার গলার সুর আর কারো সুরে সাধা। থাক্ আর বেশি বলে কাজ নেই, এই যথেষ্ট হয়েচে।

লম্বা চিঠি লেখবার মতো যে রাঙা রঙ্করা লম্বা অবকাশের কথা তোমার পত্রে উল্লেখ করেছ, তোমার ফরমাসমতো সে অবস্থা আমার এ বয়সে শীঘ্র জুটবে না। যে কলম চালাতে হয় সেটা স্প্রিংবিহীন গোরুর গাড়ির মতো, তার উপরে বস্তা বস্তা ক্লান্তির বোঝাই। অতএব যদি কখনো সাক্ষাৎ দেখা হয় তাহলে মোকাবিলায় কথাবার্ত্তা চুকিয়ে নেব,—যদি না হয় তাহলে মাঝে মাঝে তোমার লেখনীর কারুকার্য্য কিছু পাঠিয়ে দিয়ো, কিন্তু প্রতিদান আশা কোরো না। ইতি ১৮ কার্ত্তিক ১৩৩৯

স্নেহরত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীকে লিখিত

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বাংলাদেশে আমাকে গাল দিতে কেউ সঙ্কোচ করে না আর আমাকে তোমার বই উৎসর্গ কবতে এত সঙ্কোচ কেন? খুসি হব তাতে সন্দেহ কোরো না। তোমার লেখা অর্ঘ্য রূপে ব্যবহার করা চলে, তাকে অনাদর করব এত বড় গোঁয়ার আমি নই। বয়স হয়েছে কিন্তু অহঙ্কার জয় করতে পারিনি, আমার প্রতি কোনো ব্যবহারে তোমার যদি শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় সেটাতে আমার মন প্রফুল্ল হবে, একথা তুমি ধরে নিতে পাবো। সমাদর যতই পাই তৃপ্তির শেষ হয় না, এর থেকেই বুঝতে পারবে শেষ বয়সে ঋষি তপস্বী হয়ে ওঠবার কোনো আশঙ্কা নেই, কবিজনোচিত অকৃত্রিম দাম্ভিকতা নিয়েই বঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থান করব। অতএব বইটা উৎসর্গ করতে ভুলো না। ইতি ১ শ্রাবণ ১৩৪০

স্নেহাশীর্ব্বাদক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী অপবাজিতা দেবীকে লিখিত

ওঁ

া্তানকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার বইখানি পড়ে তোমার লেখনীকে যেন মূর্তিমতী করে দেখতে পেলুম। অত্যন্ত সজীব এবং সহাস্য, মুখরা সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই মুখরতা না থাকলে এই বাদলার বেলা জমত না।

তোমার লেখনীর একটি স্বকীয় চেহারা আছে, তার ছবি আঁকা চলে। মনে পড়চে একটি ঠাট্টার সম্পর্কের মেয়ে, ঠাট্টার জবাব দিতে কখনো তার বাধে না। —পাহাড়ে ছোটো নদীতে নতুন বর্ষার বাণ নামলে নুড়ি ঠেলে ঠেলে জলের ধারা যেমন কলকল করে টগবগ করে ছোটে, তেমনি তার কলভাষা, তার উচ্চহাসি, তার প্রাণের উদ্বেলতা।

তোমার বাণীতে তোমার নিজের কণ্ঠস্বর খুব সুস্পষ্ট। বেশি কিছু বলব না

—আমাকে তোমার বই উৎসর্গ করেছ, লোকে ভাবতে পারে তারি ঋণ শোধ করতে বসেচি। প্রশংসায় যদি কম পড়ে থাকে আশীর্ব্বাদে তা পূরণ করে দিলুম। আজ বিজয়াদশমী। ১৩৪০

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীকে লিখিত

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার কবিতাটি যখন আমার হাতে এসে পৌঁছল তখন আমি দার্জ্জিলিঙে এবং তখন আমার শরীর একেবারেই ভালো ছিল না। তাই মনের মতো করে তোমাকে জবাব দিতে পারিনি। তোমার লেখাটিতে তুমি যেমন হেসে নিয়েছ, আমার জবাবে আমি তার পাল্টা হাসি হাসব এইটেই উচিত ছিল। আমি স্বভাবত হাসতে ভালোই বাসি। কিন্তু তার উচ্ছ্বাস আজকাল মরে আসচে বুঝি বা। তা না হলে তোমার কাছে হার মানতুম না।

আশঙ্কা আছে তুমি ভাবচ আমি রাগ করেচি। রাগী মেজাজ আমার একেবারেই নয়। তাছাড়া রাগ করবার কোনো উপলক্ষ্য ঘটেনি। তোমার লেখাটির রস আমি উপভোগ করেছি তাতে মনে সন্দেহ রেখো না। রাধারাণীকে বোলো, সে আমার জীবনী লিখবে বলে শাসিয়ে গেছে কিন্তু সে যেন কল্পনা না করে যে আমি আপন গাম্ভীর্য্য রক্ষা করবার উপলক্ষ্যে হাসবার বেলায় হাসি চেপে রাখি। তোমার চিঠি পড়ে রাগ যেন না করি আমাকে সে এই অনুরোধ করেছিল। তার থেকে মনে হয় আমাকে সে যাত্রার দলের ঋষি তপস্বীর শ্রেণীতে গণ্য করে থাকে। ইতি ৪ জুলাই ১৯৩৩

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী অপবাজিতা দেবীকে লিখিত

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

তোমরা নতুন দুখানি বই পেলুম। মেয়েদের সংসারের উপরিতলে যে আলোর ঝলক চমক খেলে, যে সব ছায়ার আভাস ভেসে চলে যায় তারি ধ্বনি ও ছবি

আশ্চর্য সহজ নৈপুণ্যে তোমার রচনার মধ্যে লীলায়িত হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে এই রঙ্গিমা ও ভঙ্গিমা অপূর্ব্ব। তোমার ভাষার সঙ্গে তোমার লেখনীর পরিহাসকুশল সখীত্ব দেখে বিস্ময় লাগে।

খাপছাড়া নাম দিয়ে আমি গোটাকতক ছড়া লিখেছি। তার কোনো মানেমোদ্দা নেই। যেমন তেমন আঁচড় কাটা গোটাকতক ছবি দিয়েছি ঐ সঙ্গে জুড়ে। জরৎকারুর ছেলেমানুষী-কারুকার্যে অসঙ্গতির জন্যেই হয়তো মজা লাগতে পারে। তাই তোমাকে ও তোমার সখীকে এক এক খণ্ড পাঠিয়ে দিলুম। তোমরা গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ নও বলেই সাহস হচ্চে। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ৩০.৩.৩৭

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীকে লিখিত

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী *

ওঁ

পোস্টমার্ক—২৬.৫.৩৩ কমলালয়, বালিগঞ্জ, ২৫শে

কল্যাণীয়াসু

কালই ন কাকিমাকে আমাদের পূর্বকথা মত লিখে জিজ্ঞেস করেছি কোন্‌দিন কোন্ সময়ে তোমার সঙ্গে দেখা ও কথা হবার সুবিধে হবে আর আজই তোমার চিঠিতে জানলুম যে অবনদার মারফৎ তাঁর সঙ্গে দেখা ও কথা হয়েছে। ভালই হয়েছে। বিশেষতঃ যখন তা'তে কিছু ফলও পেয়েছ। দাইয়ের নামের সঙ্গে যদিও কবিপ্রতিভার কোন যোগাযোগ থাকা সম্ভব নয়, তবে তার দুধের সঙ্গে কবিস্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকারই সম্ভব, আর সে হিসেবে তার কর্মফলের নিন্দেও করা যায় না। সুতরাং তার নামও অমর হয়ে থাক।

---

*পত্র-লেখিকা—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

ন কাকীমা—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতা। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের জীবনী লেখবার তথ্য সংগ্রহের জন্য রাধারাণী দেবী বলেন্দ্রনাথের মাতার কাছে যেতেন।

দাইয়ের নাম—দিগম্বরী (দিগ্‌মী) দাই। এঁরই দুধ খেয়ে রবীন্দ্রনাথ মানুষ হন। কবির দুঃখ ছিল —জীবনে মাতৃস্তন্য পান করা হয়নি। অনেকে রসিকতা করতেন, কে সে দাই, যার স্তন্যপানে এত বড় প্রতিভার বিকাশ হয়।

বর্ণপিসিমা—বর্ণকুমারী দেবী। কবির ভগ্নী। প্রায় সমবয়সী হওয়ার জন্য কবির বাল্যকালের কথা তাঁর জানা থাকার সম্ভাবনা ছিল।

বাবা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর একদিন তুমি ন কাকিমার ওখানে গেলেও আমার এতদূর থেকে ঠেলে যাবার দরকার নেই; বিশেষতঃ সন্ধ্যাবেলা গাড়িরও সুবিধে হয় না। তোমার যদি রমার সঙ্গে আলাপ থাকে, বা যাকে বলবে সে-ই ন কাকিমার ঘরে তোমাকে নিয়ে যাবে, নইলে একলা সেই বাড়ীর ভিতরের গোলকধাঁধায় পথ হারাবার ভয় আছে।—

পরশু শনিবার ৬টা সন্ধ্যায় এলেই আমার সুবিধে হবে। তার মধ্যে বর্ণপিসিমাকে আনিয়ে রাখবার চেষ্টা করব।

প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ
বিঘ্নে পুনঃরপি প্রতিহন্যমানাঃ
প্রারব্ধমুত্তমজনা ন পরিত্যজন্তি।।

উক্ত সংস্কৃত শ্লোকটি বাবার মুখে অনেকবার শুনেছি, এ স্থলে মনে পড়ে গেল। তুমি অতি দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছ, উক্ত শ্লোককে মূলমন্ত্র করে উত্তমজনের সিদ্ধিলাভে সক্ষম হও, এই আশীর্বাদ করি।—শ্রী ইঃ

প্রমথ চৌধুরী

2/1 Bright Street
Baliganj
21/4/37

কল্যাণীয়াসু

তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর এ কদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি, কোন খবরও নিতে কিংবা দিতে পারি নি। এর প্রধান কারণ, গত শুক্রবারে আমার ভ্রাতা সুহৃদ চৌধুরীর স্ত্রী নলিনী দেবী হঠাৎ মারা গিয়েছেন। নলিনীকে সম্ভবতঃ জানো, তিনি ছিলেন দিনুঠাকুরের ভগ্নী। এ মৃত্যুতে আমাদের পরিবারের মনে একটা প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। নলিনী বারো বৎসর বয়সে বিয়ে হয়ে আমাদের পরিবারে আসে, তার ৪১ বৎসর আমাদের সঙ্গেই ছিল। ৫৩ বৎসর বয়সে মারা গিয়েছে। বুঝতেই পারছ এ অবস্থায় আমাদের কারুর মন ভাল নেই। তার উপর আমি বাড়ীতেই Interned আছি। আমার গাড়ী আছে কিন্তু তার চালক নেই। মাখম —আমার Driver বোধহয় পরশু আসবে। সে ফিরে এলে, আমার গল্পটা তোমাকে দিয়ে আস্‌ব। তুমি সেটি "ভারতবর্ষে" পাঠিয়ে দিয়ো। পরিবারে এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা না ঘটলে আমি সমস্ত লেখাটা বসে বসে কপি করতুম। কিন্তু তা করা আর হল না। যেমন আছে তেমনি তোমার হাতে দিয়ে আস্‌ব। তার পর গোটা দুই Proof পেলে যাতে নির্ভুল ছাপা হয় তার দিকে নজর রাখ্‌ব। এ লেখাটির উপর আমার একটু মায়া আছে। কারণ, এটি যত্ন করে লিখেছি। আমি Economy of Words-এর ভক্ত। লিখতে বসলেই মনের মধ্যে কথা ভীড় করে আসে। সে

ভীড়ের ভিতর কথা ছাঁটতে হয়, দু'একটি বেছে নিতে হয়। আমি হয়ত ঠিক কথাটা বাছতে পারি নে, কিন্তু চেষ্টা করি। এর জন্যে মনকে খাটাতে হয়।

আমি হয় আস্ছে শনি কিম্বা রবিবারে তোমার ওখানে যাব। আর মুখে দু চার কথা বলে আস্‌ব। এ গরমে—এই চিঠি লেখাই কষ্ট—বড় লেখা ত একরকম অসম্ভব। আমি যদি বিলেতে জন্মাতুম ত বড় লেখক হতুম Temperature এর গুণে। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

(প্রমথ চৌধুরীর পত্র)

Santiniketan
Birbhum.
22//11/43

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি পেলুম,—মাসখানেক পরে। তুমি যে পণ্ডিচারিতে গিয়েছিলে এবং তারপর দক্ষিণাপথ ভ্রমণ করতে, সে খবরও পেলুম। দক্ষিণাপথ দেখে যে মুগ্ধ হয়েছ তা শুনলুম। পণ্ডিচারির বিষয় কিছু লেখোনি। বোধহয় ওটি প্রক্ষিপ্ত আশ্রম—এককথায় Anglo Indian-আশ্রম। অপরাজিতার অজ্ঞাতবাস* যে শেষ হল, শুনে খুসী হলুম। বিশ্বভারতীর সঙ্গে আমার এখন কোনও সম্পর্ক নেই; নইলে উক্ত পত্রিকা মারফৎ খবরটা প্রকাশ করতুম। এখন আমি সাহিত্যসমাজে বিশ্রাম করছি। তুমি বোধহয় ও-পত্রিকা পাও না। আমি গত বৎসর এ পত্রিকায় দুটি গল্প লিখি। মন্দ হয়নি। তোমার চোখে পড়লে নিশ্চই তার তারিফ্ করতে। বাঙলার এখন ভীষণ অবস্থা। এ সময়ে কিছু লিখতে ইচ্ছা করে না। এখানে এখন দিনে গরম, রাত্তিরে শীত।

প্রমথ চৌধুরী

---

* 'লীলাকমলে'র কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুব বেশী ছিল। তবে কোন কোন কবি সমালোচক মোহিতলাল, হেমচন্দ্র প্রভৃতি বলেন, কতকগুলি কবিতায় যথেষ্ট স্বকীয়তা আছে। প্রমথ চৌধুরী উৎসাহ দিয়ে বলেন, মেয়েরা কেন নিজস্ব ভঙ্গীতে লিখবেন না। তাই রাধারাণী দেবী স্থির করেন, সমস্ত সুর বদলে একেবারে আধুনিক ভঙ্গীতে কবিতা লিখবেন এবং এইজন্যেই ঐ কবিতাগুলি অপরাজিতা দেবী নামে লিখবেন স্থির করেন। সেই সময়ে মনস্থ করেন, বারো বৎসর অজ্ঞাতবাস করার পর আসল কবির নাম প্রকাশ করবেন।

(ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর পত্র)

তোমার গত চিঠির একভাগ যে আমার, সেটা বুঝতে কিছু সময় লাগল,...আমিও এই দীর্ঘজীবনে ভেবেচিন্তে দেখলুম স্বাস্থ্য ছাড়া শিক্ষা দীক্ষা সুখসৌভাগ্য কিছুই কিছু নয়; বিশেষ বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে। তবু, মন দিয়ে ভাঙ্গাশরীরও যে কত কাজে লাগানো যায় তুমি তার দৃষ্টান্ত। আর সুস্থ শরীর নিয়েও কত সুযোগ হারানো যায়, বোধহয় আমি তার দৃষ্টান্ত। এই দেখ না, তোমার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ পড়ে' মনে হয় আমারও নিজের দেশ দেখবার ঐরকম আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু, যে-কারণেই হোক্ —হল না। আর এখন হবেও না। যা হোক, গতস্য শোচনা নাস্তি। আমরা ভালই আছি। প্রতিমা রথীরা দীর্ঘ হাওয়াবদল সত্ত্বেও বিশেষ উন্নতি করতে পেরেছে বোধ হল না। তবে ওদেরও ঐ ভাঙ্গা জুড়িটি চলে কম নয়। এখানে ৭ই পৌষেব উদ্যোগপর্ব চলছে। এবার মহর্ষির দীক্ষাব শতবার্ষিকী। তোমার কুশল প্রার্থনা করি। আশীর্বাদ জানাই

শ্রীইন্দিরা—

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

১০৪ বকুলবাগান রোড
ভবানীপুর
৭।৪।৩১

শ্রদ্ধাস্পদাসু

রবীন্দ্র পরিষদে পঠিত প্রবন্ধগুলির মধ্য হইতে বাছাই করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে আগামী ১৫ই বৈশাখ মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছি। কবির জন্মদিনে ঐ গ্রন্থ তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইবে। কবি ঐ গ্রন্থের নাম দিয়াছেন "করিপরিচিতি"। মুখবন্ধরূপে কবি একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইবেন। ঐ গ্রন্থে আপনার "ঘরে বাহিরে" প্রবন্ধটি প্রকাশ করতে চাই। আশা করি আপনি সত্বর আপনার অনুমতি জ্ঞাপন করিয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী আপনাকে তাঁহার প্রীতিসম্ভাষণ জানাইতেছে। আমি এখন আর প্রেসিডেন্সী কলেজে নাই। সংস্কৃত কলেজের Principal এর পদে ১লা এপ্রিল হইতে যোগ দিয়াছি। আপনার কাছে

রবীন্দ্র পরিষদের আর একটি প্রবন্ধ পাওনা আছে। সে প্রবন্ধটি পড়িয়া কবে আপনি প্রতিশ্রুতিমুক্ত হইবেন জানাইবেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

Oriental Med. Hall
Bhatta Bazar
Purnia
28.7.31

কল্যাণীয়াসু

আজও আমার দুর্বুদ্ধিগুলো যায়নি, আর কবে যাবে? অনেক অপরাধই সঙ্গে নিয়ে রওনা হতে হবে। হালেরটাই বলি,—যার কৈফিয়ৎ নেই।

পূর্ণিয়াটা নেপালের ঠিক উপকণ্ঠে না হলেও—সান্নিধ্যে। শুনলুম—নেপাল-বর্ডারে বর্ষার শোভা নাকি অনির্বচনীয়। থরে থরে মেঘ, স্তরে স্তরে পাহাড়, স্তবকে স্তবকে বৃক্ষরাজি, গুরুগর্জনে বিদ্যুতের খেলা; প্লাবন অভিযানে শ্রাবণের মুখরধারায়—ভীষণ ও মধুর লীলা,—দেখতে বেরিয়ে পড়ি। তারপর ফেরবার পথ আর পাই না। মাঠ ঘাট পথ—সব একাকার। কোনো প্রকারে ভিজে পাটের গাঁটের মত গড়াতে গড়াতে ডেরায় ফিরে, অনেকগুলি পত্র পেলুম।

চা খেয়ে চাঙ্গা হতে দু'দিন গেল। আমার দুর্গতি 'গৃহসতী'কে খুসিই করেছিল। বিনয়ভাষণ হিসেবে নিজের দুর্বুদ্ধির জন্যে যেই বলেছি—"দৃশ্যটা খুব উপভোগ্য হলেও —এ বয়সের উপযুক্ত খেয়াল তো নয়", আর এগুতে হল না। তিনি বেশ সহজভাবেই বাধা দিয়ে বললেন,—"কেন নয়? মহাভারত ত তা সমর্থন করেন। এ স্থানটাই তো বিরাটের গো-গৃহ ছিল। তবে আর তোমার দুঃখের কারণ কোথায়?" শুনে ভাবলুম—সত্যিই তো বটে!

যাক,—পত্রগুচ্ছের মধ্যে একখানি ছিল বিশেষ জরুরি, সেখানির জবাব সর্বাগ্রেই দিতে হল,—যেহেতু তিনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষাই করেছেন। অর্থাৎ—অনভ্যাসে আমার লেখা না খারাপ হয়ে যায়, তাই বিষম তাড়া দিয়ে লেখা চেয়েছেন। তাঁকে সত্যকথাই জানালুম,—বর্ষার তোড়ে আমার লেখার রেখা পর্যন্ত ধুয়ে ফর্সা হয়ে গেছে। দিন কতক ময়লা জমতে দিন্; ইত্যাদি।

তারপর তোমার পত্রখানি। বারবার পড়লুম। বাঃ, রাধারাণীর কোথাও তো এতটুকুও লৌকিকতার সুর নেই; সহজ সুন্দর পরম আত্মীয়ার পত্র।

তোমার স্বতঃস্ফূর্ত বেগবান ছন্দের মধ্যে তোমার পরিচয় পেয়েছিলুম। পরে বছর দেড়েক পূর্বে 'উত্তরা'র শ্রীমান সুরেশের মুখে, তোমার অকুণ্ঠ, সহজ প্রকৃতির কথা শুনে খুবই আনন্দ পাই,—যেহেতু এমন সুন্দর মেয়েটি, দেশকে নূতন কিছু দেবার প্রয়াস পাচ্ছে। কিন্তু, সে আনন্দের পশ্চাতে যে কী গভীর বেদনাও ছিল—যার ব্যথা হ'তে আজ আমি মুক্ত। সেই রাধারাণীকে পত্রের মধ্যে দেখতে পেয়ে, তার সহজ সরল দাবীতে আমি মুগ্ধ।

তুমি,—ধীর, অচপল, বিবেচক, একনিষ্ঠ, বিনম্র নরেন ভায়ার জীবনকে—সজীব করবার অধিকার নিয়েছ; তার মধ্যে যে-সব আশা আকাঙ্ক্ষা—একের চেষ্টায় ঈপ্সিত স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছিল না, এবার তা সুপুষ্ট ও সরস হয়ে দেখা দেবে,—এই আশাই করি, এবং প্রার্থনা করি উভয়ে সুখে শান্তিতে বিচিত্রছন্দে আনন্দ সৃষ্টি করে চলো।

তোমার মত দেশপ্রিয় বিদুষী মেয়ে যে আমার 'দেবীমাহাত্ম্য' পড়ে' তার হালুয়ার কঠোর মিষ্টতাটুকু মনে করে রেখেছ,—তাতে লেখককেই অভিনন্দিত করা হয়েছে;—লেখাটা সার্থক হয়েছে। ওর মধ্যে আমাদের লজ্জাই লুকিয়ে আছে। তাই বোধহয় মনে আছে,—না? কলকেতায় যদি যাই 'দেবালয়ে' যাব বইকি, তবে ও অভিশপ্ত হালুয়া খাব না—চা খাইও।

নরেন ভায়াকে আজ আর স্বতন্ত্র পত্র দিলুম না। তিনি তোমার 'মার্ফৎ'টা নিশ্চয়ই মাথা পেতে নেবেন। ফল কথা, শরীর আর সামর্থ্য দুই আমার প্রতিকূল। বাণী আর সেবা নেবেন না, তিনি আমার অবস্থা দেখছেন তো! মায়ের প্রাণ! কবিরাজ মহাশয়েরও বাপ মার চেয়ে দয়া বেশী, তিনি লিখতে পড়তে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া আজ মোহনবাগানের Semifinal. প্রীতিভাজন নাতীরা সেই আলোচনায় শতমুখ। তাই লেখা বন্ধ হ'ল।

আজ তবে উভয়কেই ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানালুম। সুখী হও।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কামিনী রায়

৪২এ হাজরা রোড
বালীগঞ্জ, কলিকাতা
৯ই জুন, ১৯৩০

মান্যবরেষু

আমার নবপ্রকাশিত 'জীবনপথে' নামক কবিতা পুস্তক অনেকদিন হইতেই আপনাকে পাঠাইব মনে করিতেছিলাম। নানাকারণে পাঠাইতে বিলম্ব ঘটিল। আমার 'দীপ ও ধূপ' আপনাকে পাঠাইয়া কোনও সাড়া পাই নাই। অথচ পাঠাইয়াছিলাম আপনাকেই সকলের আগে। বইখানা আপনার হাতে পৌঁছিয়াছিল কিনা জানিতেও পারি নাই।

সম্প্রতি একটি মুসলমান ভদ্রলোক 'জীবনপথে' পড়িয়া অযাচিত ভাবে তাহার এক সমালোচনা লিখিয়া আমাকে দেখাইয়া গিয়াছিলেন এবং ইহা কোন মাসিকপত্রে প্রকাশ করিতে আমার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। আমার আপত্তি নাই জানাইলে তিনি উহা আবার আমারই কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কোন মাসিকপত্রিকা সম্পাদকের পরিচয় নাই; তাঁহার অনুরোধ আমি ইহা কোন সম্পাদকের নিকট পাঠাই। তাঁহার ইচ্ছা ও অনুরোধক্রমে আমি তাঁহার প্রবন্ধটি আপনাকে পাঠাইলাম। যোগ্য বিবেচিত হইলে উহা ভারতবর্ষে প্রকাশ করিবেন। আমি পীড়িত থাকায় ইহা পাঠাইতে বিলম্ব ঘটিয়াছে। নতুবা আষাঢ়ের সংখ্যায় বাহির হইতে পারিত।

লেখকের লেখার মধ্যে ইংরাজী শব্দ কিছু বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সম্পাদক রূপে যাহা করিবার করিবেন।

আশা করি আপনি শারীরিক কুশলে আছেন। ডাক্তারের আদেশে আমাকে কিছুদিনের জন্য অন্যত্র যাইতে হইতেছে।

আমার বিনীত অভিবাদন গ্রহণ করুন। ইতি

শ্রীকামিনী রায়

পুনশ্চ : প্রবন্ধলেখকের নাম S. N. Q. Zulfaqar Ali. B. A.

ইনি আমাদের কাছে মিঃ আলী নামে পরিচিত। কিন্তু প্রবন্ধাদিতে 'নম্রু' নাম ব্যবহার করেন।

পত্রটি শ্রীনরেন্দ্র দেবকে লিখিত।

২

৪২ এ হাজরা রোড
বালীগঞ্জ, কলিকাতা,
৮ই মে, ১৯৩০

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পাইয়া সুখী হইয়াছি। তোমার বইখানি উপহার পাইয়া তোমাকে আমার বই ও চিঠি দেওয়ার পর এই পরিবারের উপর দিয়া আর একটা শোকের ঝটিকা বহিয়া গেল।

তোমার 'লীলাকমল' পড়িয়াছি। ভালই লাগিয়াছে। ভিতর ও বাহির দুইই সুন্দর হইয়াছে। উভয়ত্রই তারুণ্যের উজ্জ্বল পরিচয়। যে এক মূল কেন্দ্রের চারিদিকে তোমার কমলের দলগুলিকে সাজাইয়াছ, তাহা আমি বুঝিলাম সুন্দরের পূজা, বোধাতীত অথচ বোধ্য, লভনীয় অথচ অলব্ধ বাঞ্ছিতের উদ্দেশে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে সহজ কথায় এবং রূপকের ভিতর দিয়া, হৃদয়ের ব্যাকুলতা নিবেদন।

তোমার কবিতাগুলির মধ্যে গীতিরূপ উপাদানটি (lyric element) বেশী ফুটিয়াছে মনে হয়। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের স্কুলের ভাষা ও ভাব, ছন্দ ও সুর তোমার আয়ত্ত হইয়াছে। চল্লিশ বৎসর পূর্বে কবি হেমচন্দ্র 'আলো ও ছায়া' সম্বন্ধে যে লিখিয়াছিলেন—"কবিতাগুলি আজকালের ছাঁচে ঢালা—" আমিও তোমার কবিতা পড়িয়া সেই কথাই মনে মনে বলিয়াছি। ইহা নিন্দাচ্ছলে বলি নাই। গদ্যে পদ্যে রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয় এবং বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের গুরু। তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করা সহজ নহে। তবে অনুকরণ বিষয়ে সাবধান থাকিলে নিজের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় না। তিনি অসম ও বিষম ছন্দ সকল প্রচলন করিতেছেন। তুমি সেদিকে তাঁহাকেও অতিক্রম করিয়াছ, মনে হয়। ভাষা এবং ভাবের ত্রুটি না থাকিলেও বরফির আকৃতির কবিতাগুলির, প্রাচীনা আমার কাছে একটু ছেলেমানষি খেয়াল বলিয়া বোধ হয়। Artএর দিক হইতে না হউক heartএর দিক হইতে সেগুলি যেন একটু কৃত্রিম ও অগভীর।

'পথপাশী কেয়া'য় 'পাশী' টুকু...আমার চোখে একটু অশুদ্ধ ঠেকে। তবে নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ। অনেক স্বেচ্ছাচার ক্রমশঃ আচার ও শাস্ত্রীয় বিধানে পরিণত হয়।

সে যাহা হউক, তোমার প্রায় সবগুলি কবিতাই আমার মিষ্ট লাগিয়াছে। নবশক্তির সমালোচনা আমি পড়ি নাই।

তোমার লিখিবার শক্তি আছে। এই শক্তি দিন দিন চিন্তা ও ভাবের গভীরতা, প্রকাশের স্বচ্ছতা এবং বিষয়বস্তুর উচ্চতা ও ব্যাপকতা লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুক।

আমার বই দু-খানা তোমার ভাল লাগিয়াছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। অনেকগুলির তারিখ দেখিয়া বুঝিবে সেগুলি বহুকাল পূর্বের রচনা। আমি লিখিব বলিয়া

লিখিতে বসি না—অবসরও ঘটে না। লেখার অভ্যাস রাখি নাই, কবিত্বের সাধনা করি নাই। দুঃখের আঘাতে মাঝে মাঝে বেদনা ছন্দোবদ্ধ হইয়া দেখা দিয়াছে। আর মাঝে মাঝে পত্রিকা সম্পাদকদের অনুরোধে দুই একটি বাহির হইয়াছে। সাময়িক ঘটনাও মাঝে মাঝে মনকে নাড়া দিয়া কখনও ফুল কখনও শুষ্কপাতা ঝরাইয়াছে। কল্পনাবিলাস এবং কলানুশীলন সেই জন্য আমার লেখায় কমই পাইবে। যাহা দেখিয়াছি এবং সমস্ত মন দিয়া অনুভব করিয়াছি তাহাই সহজ ভাষায় অতি সহজ পুরাতন ছন্দে বাহির হইয়াছে। ইহাতে কৃতিত্ব বিশেষ নাই। অন্যের রচনায় শিল্পচাতুর্য ছন্দোবিচিত্রতা দেখিয়া সুখী হই। কিন্তু অনুকরণের ইচ্ছা কখন হয় নাই। বাল্যশিক্ষা প্রভাবে আধুনিক চলিত ভাষায় গদ্যও লিখিতে বাধা পাই। আমি নিতান্তই 'সেকেলে'।

দীপ ও ধূপের মধ্যে ভিন্ন মূল্যের কবিতা একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা জানি, ইচ্ছাপূর্বকই ইহা করা গিয়াছে। সত্যসত্যই শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। যাহা কিছু কবিতাকারে লিখা আছে, বা ছাপা হইলেও, পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই, তাহা মুদ্রিত করিয়া রাখিয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম। কোনটা ভাল কোনটা নয়, কোনটা প্রথমশ্রেণীর, কোনটা তৃতীয় শ্রেণীর, তাহা লেখক সকল সময় নির্ধারণ করিতে অক্ষম। সবগুলিই তাহার মানস সন্তান। বাড়িতে অতিথি আসিলে মা সুন্দর ছেলে কয়টিকে সম্মুখে আনিয়া যেটি রূপহীন তাহাকে লুকাইয়া রাখেন না; তাঁহার কাছে সব কটিই সমান স্নেহের এবং গর্বের। আমার নিজের কবিতা সম্বন্ধে কতকটা সেই ভাব। বাছিয়া ছাপাইতে হইলে অন্যকে দিয়া তাহা করাইতে হয়। সেরকম বিচারক কেহ কাছে ছিল না। তবু সবকিছু ছাপাইতে দিই নাই। হাল্‌কা রকমের আরও কবিতা আছে এবং ব্যক্তিগত বিষয়েও কিছু কিছু অপ্রকাশিত রহিল।

তোমার মতে 'দীপ ও ধূপে' যেগুলি উৎকৃষ্ট তাহার তালিকা দিলে আনন্দিত ও বাধিত হইব।

দীর্ঘ চিঠি লিখিলাম। দেশের এক বিপ্লবের যুগের সূচনা হইল। এ সময়ে অনেক চিন্তাই আসে, কিন্তু শারীরিক এবং মানসিক শক্তি এখন ক্ষয়োন্মুখ।—লিখিতে লিখিতে হঠাৎ মনে হইল 'জীবনপথে'র মধ্যে অনেক ভুল আছে। অন্যমনস্কতা ও স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতা বশতঃ original হইতে copy করিবার সময় আমি নিজেই ভুল তুলিয়াছি।—

৫ পৃষ্ঠায় দশমছত্রে 'তরুশাখে' স্থানে 'তরুদেহে' হইয়াছে—'শাখে' পড়িও। উহার শেষছত্রে 'হৃদয়' স্থানে 'হিয়ায়'।

৮ পৃষ্ঠায় ১০ম ছত্রে 'নাহি পড়ে মনে' হইবে 'রহে না স্মরণে'। শেষছত্রের শেষ 'তবু রবে মনে'।

১৬ পৃষ্ঠায় ১৩ ছত্রে 'অশ্রুবারি' হইবে 'অশ্রুজল'। ৪৫ পৃষ্ঠায় একটা কাটা ছত্র ছাপা হইয়াছে এবং ত্রয়োদশছত্র তোলা হয় নাই।

নবশক্তির সমালোচনা পড়িয়া ভুলগুলির দিকে দৃষ্টি পড়িল। তোমার বইখানাতে ভুলগুলি সংশোধন করিয়া লইও।

আমার স্নেহশীর্বাদ লও। আশা করি ও প্রার্থনা করি সুস্থ সবল হইয়া নীচে আসিতে পার। শিলং সুন্দর স্থান।

আশীর্বাদিকা
শ্রীকামিনী রায়

অনিন্দিতা দেবী

Aruni
Seaside, Puri
20.4.37

কল্যাণীয়াসু

নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ ও একান্ত শুভকামনা ও স্নেহাশীর্ব্বাদ।

চিঠিখানি কয়েকদিন হইলই পাইয়াছি। আমারও ঐ একই কারণে উত্তর দিতে দেরী হইয়া গেল। এমন কি কলিকাতায় যাওয়ার সমস্তই স্থির হইয়া অবশেষে তাহাও ছাড়িয়াই দিতে হইল। এখনও আমার ভাল অবস্থায়ও আসিতে পারি নাই।

মনে আমি কিছুই করি নাই। তবে চিঠি ও কুশল সংবাদের প্রতীক্ষা অবশ্য করিতেছিলাম। তোমার সহিত আলাপ পরিচয়ে আমিও যে কতটা তৃপ্তি পাইয়াছি বলাই বাহুল্য। আশা করি আবার কখন আসা হইলেও এ সুযোগে বঞ্চিত হইব না। আর সময় ও সুবিধামত এমনি চিঠিপত্রও মধ্যে মধ্যে পাইব। হৈমন্তী ও খুকী কয়েকদিন হইল এখানে আসিয়াছে। অমিয় অক্সফোর্ডের Doctorate পাইয়াছে। তাহারও শীঘ্রই ফিরিবার কথা।

দিলীপকুমার ত সম্প্রতি আবার আসিয়া কলিকাতাবাসীকে সঙ্গীতে মুগ্ধ করিতেছেন। এই 'কারাপুরী'তে (তোমার সংজ্ঞা ঠিকই হইয়াছে) রুদ্ধ হইয়া আমিই সমস্ত হইতে বঞ্চিত। তোমাদের কাছ হইতেই যা কিছুর আস্বাদ পাইতে পারি।

আশা করি আপাততঃ একটু সুস্থ হইতে পারিয়াছ এবং আর সবও মঙ্গল।

আঃ
অনিন্দিতা

Aruni
Seaside, Puri
23.10.37

মঙ্গলাস্পদাসু

আমার বিজয়ার ঐকান্তিক প্রীতি ভালবাসা ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিও। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবকেও আমার বিজয়ার নমস্কারাশীর্ব্বাদ এই সঙ্গেই জানাইতেছি।

পত্র পাইয়া কত যে সুখী হইয়াছি বলিবার নয়। এখনও যে মনে রাখিয়াছ ইহাতে এতই কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ বোধ হইয়াছে। কিন্তু অসুস্থতার কথায় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলাম। আমিও সম্প্রতি অসুখের কবলে ভালরকমই পড়িয়াছিলাম। এখনও সম্পূর্ণ মুক্তি ঘটে নাই। দুর্ব্বলতাও অত্যধিক।

না, আমার কলিকাতায় যাওয়াও আর হইয়া উঠে নাই। গেলে কোনরূপে সম্ভব হইলেই অবশ্য দেখা শোনার চেষ্টাও করিতাম।

"সোনারকাঠি" খানি ইতিমধ্যে সম্প্রতি নাতিদের জন্য আনিয়া অসুখের মধ্যে নিজেও অনেকখানিই পড়া হইয়া গেল। এটী কিন্তু বইখানির কম সাফল্যের কথা নয়। কারণ বড়দের গল্পও আমার পড়িবার ধৈর্য্য ও অভ্যাস নাই বলিলেই হয়।

আশা করি আবার শীঘ্র দেখিতে পাইব। শীতেব কলিকাতা খুবই সরগরম হইলেও আমাদের মত রোগীর পক্ষে পুরীর বালুকাই ত ভাল বোধ হয়।

মধ্যে মধ্যে এইরকম মনে করিলে ও সংবাদ পাইলে এই নির্ব্বাসনে বলাবাহুল্য খুবই আনন্দ দিবে। সম্প্রতি ইনি অবসর গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। কাজেই আগের মত একেবারে একা অবশ্য নাই।

আশা করি সব কুশল। অমিয় ফিরিবার পর কয়েকদিন সপরিবারে এখানে থাকিয়া লাহোরে কার্য্যে যোগদান করিয়াছে। চিঠি লিখিতে কলিকাতার খবর, দেশের খবর মেয়েদের খবরও পাইলে সুখী হইব।

শুভার্থিনী
অনিন্দিতা

Aruni
Seaside, Puri
3.2.38

মঙ্গলাস্পদাসু

শ্রীমতী নবনীতার শুভাগমনে সাদর ও সানন্দ সম্ভাষণ। কন্যারত্ন লাভের জন্য তোমাদেরও ইহার সহিত অভিনন্দন জানাই। শুভসংবাদ কাগজে দেখিয়াবধিই লিখিব মনে করিয়াও অসুস্থতার জন্য এ পর্য্যন্ত আর ঘটিয়াই উঠে নাই। ইতিমধ্যে তাই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকেই আমার হইয়া আনন্দ ও শুভকামনা জানাইতে বলিয়াছিলাম।

কিন্তু তোমার যে শরীর তাহাতে কন্যালাভের পর কেমন আছ জানিতে উদ্বিগ্নও আছি। আশা করি নূতন খুকীটীকে লইয়া এখন ভালই আছ।

শরৎচন্দ্রের অকালবিয়োগ বড়ই দুঃখের বিষয় হইয়াছে। তোমাদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহার পারিবারিক ও বৈষয়িক ব্যবস্থা এখন কি হইতেছে জানিতে ইচ্ছা করে। আমার শরীর এখনও খুবই খারাপ ও দুর্ব্বল। হাঁপানীর সহিত অন্য নানা অসুখও

ক্রমেই জড়িত হইয়া পড়িতেছে।

নবকন্যাসহ সস্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবকেও বলিবে।

শুভার্থিনী
অনিন্দিতা

জ্যোতির্ময়ী দেবী

হাতিবাগান
১৪ই মাঘ'৪৪

স্নেহের রাণি

একটি কন্যারত্ন লাভ কবেছ জেনে বড়ই আনন্দ হ'ল। আশাকবি নিজে ভাল আছ? —আর তোমার নবনীতাও।—আমার ভালবাসা নিও। —অনেক আশীর্ব্বাদ খুকুটাকে। আর নমস্কার নরেনবাবুকে।

ইতি দিদি।

অমৃতসব
১১।১০।৩৭
সপ্তমী, শারদীয়া

স্নেহের রাণি

'সোনার কাঠি' পেলাম। বেশ ভাল হয়েছে—না? তোমাদের পাঠশালার জন্য একটা 'লালুশা' পাঠাচ্ছি। অবশ্য কিছুদিন পরে। সম্ভবতঃ তোমরাও বিদেশে বেরিয়েছ।

কেমন আছ?— আশাকরি নরেনবাবু ভাল।

ভালবাসা ও প্রীতি সম্ভাষণ নিও। পূজার। বিজয়াও এসে পড়ল। —সেও আগে থাকতেই জানিয়ে রাখলাম।

ইতি দিদি।

পুঃ— এইমাত্র ১০৲ পেলাম। জানতাম আমার লেখা 'অমূল্য'! আজকে দেখছি তোমার

ব্যবস্থায় তা মূল্যবান হয়েছে।—ভালো। অতঃপর লেখাতে আলস্য কমে উৎসাহ বাড়বে মনে হচ্ছে।

জলধর সেন

শিউড়ি —বীরভূম

পোস্টমার্ক—৩০.৫.৩৮ সোমবার

মা রাধা

আমিই যেন স্থাবর হয়েছি, তোমরা তো তা হও নাই। তবুও কোনো সংবাদ লও না কেন? আমার দাদী* কেমন আছে? তোমার শরীর কেমন, শ্রীমান নরেন্দ্র কেমন আছে লিখিও, আমি বেশ সুখে আছি; সেবার ত্রুটি নেই। এই সপ্তাহের শেষেই একবার কলিকাতায় যেতে হবে। ছেলেদের কলেজের ব্যবস্থা এবং দরিদ্র সংসারের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করতে হবে তো! সেই সময় দেখা হবে। তোমরা আমার আশীর্বাদ লইও।

আশীর্বাদক—জলধর

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

স্বসৃকল্পা শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

"ইলাবাস"
হিন্দুস্থান পার্ক
বালিগঞ্জ, কলিকাতা
২৫.৬.৪১

কল্যাণীয়াসু

লেখাটি পাঠাইলাম; তোমার লেখার সঙ্গে যথাসম্ভব সত্বর ইহা রামানন্দবাবুর কাছে পাঠাইয়া দিবে। শুনিলাম, কতকগুলি লেখা ইতিমধ্যেই তিনি পরবর্তী সংখ্যার জন্য দিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আর দেরী হইলে আগামী সংখ্যায় যাওয়া হয়তো কঠিন হইবে।

আর এক কথা, আমার একটি নবীন বন্ধুর একটি কবিতা এই সঙ্গে প্রবাসীর জন্য পাঠাইলাম। লেখাটি আমার ভালই লাগিয়াছে। প্রসাদগুণ ও সরলতার জন্য ইহার বেশ একটু বৈশিষ্ট্য আছে। সম্ভবতঃ তোমারও ভাল লাগিবে। যদি লাগে, তবে ইহা একটু

* দাদী—কবি দম্পতির কন্যা নবনীতা।

recommended করিয়া পাঠাইতে পারিলে ভাল হয়। ভদ্রলোক আমাকে ধরিয়াছেন, কিন্তু আমার অপেক্ষা যোগ্যতর হস্তেই সে ভার দিতে চাই। ইনি বেশ বড় Scholar, M.Sc., Bengal Chemical-এর Research Chemist. সর্বোপরি ভদ্রলোক অতিশয় সজ্জন ও অমায়িক প্রকৃতির। এ উপকারটুকু যদি করিতে পার, খুসী হই।

আশা করি, তোমার শরীরটা ভালই আছে এবং মেয়েটিও ভাল। আমার কোমরের ব্যথা কম বটে, তবে এখনও প্রায় চলৎশক্তিহীন। ইতি

আঃ
তোমার দাদাবাবু
যতীন্দ্রমোহন

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১ উড স্ট্রীট
১লা জুন ১৯৪১

কল্যাণীয়াসু

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের ও তোমার লেখা দুটি ছাপব। কিন্তু তাঁকে ও তোমাকে একটি অনুরোধ জানাচ্ছি। দুটির গোড়ায় ও শেষে কিম্বা মাঝখানে, কোথাও রচনা দুটিতে বক্তৃতার আকার থাকলে তাকে রূপান্তরিত করে বা তা বাদ দিয়ে লেখা দুটিকে প্রবন্ধের আকার দিতে হবে। এই অনুরোধের কারণ বলি। নানান জায়গায় রবীন্দ্রজয়ন্তী হয়েছে, পরেও হবে। তাতে প্রবন্ধ বা বক্তৃতা অনেক পঠিত হয়েছে ও হবে। ছাপাবার জন্যে ইতিমধ্যেই আসছে, কবিতাও আসছে। ছেপে ওঠা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য। সেই জন্যে, একটিও যে ছাপছি তা আমি লোককে জানাতে চাই না।

যতীন্দ্রবাবুর ও তোমার লেখা দুটি আষাঢ় সংখ্যায় ছাপাতে পারব না। পরে ছাপব। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৪৬।৫বি, বালিগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা ১৯
৩.১২.৫৪

কল্যাণীয়াসু

বউমা, আপনাদের গৃহে আমার উষ্ট্রিকাযোগ পড়বার ভার পড়ায় আনন্দিত হয়েছি। সাহিত্য যে-গৃহে দাম্পত্য আকারে রূপায়িত সাহিত্যিকের পক্ষে সে গৃহ তীর্থভূমি।

একটি অনুরোধ করছি। আমার চোখের দৃষ্টিশক্তির প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমার পড়বার জন্যে যদি টেবিলল্যাম্পের ব্যবস্থা সম্ভব হয় তা হলে উপকৃত হই। টেবিলল্যাম্প্ চাইছি বলে টেবিল নিশ্চয়ই চাচ্ছিনে। টেবিলল্যাম্পের মতো কাছের আলো চাচ্ছি।

নরেনভায়ার কবিতাটি আমাদের সকলের বিশেষ ভাল লেগেছে। কথাসাহিত্যের মাধ্যমেই একটা উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অলস মানুষ, ক্রমশঃ দেরী হয়ে যাচ্ছে! সেদিন কবি অথবা কবিপত্নীর মুখে কবিতাটি শোনবার একটু লোভ হচ্ছে! ভাল হবে কি ?

আশা করি সকলে ভাল আছেন। সকলে আমার সপ্রীতি আশীর্বাদ জানবেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রদ্ধার্ঘ্য

ইন্দিরা দেবী

সবিনয় নিবেদন,

কিছুদিন আগে সাহিত্যসেবীদের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীর সম্বর্ধনার কথা উঠেছিল। ঘরের অঙ্গন পার হয়ে বৃহত্তর সমাজের কানে কথাটা যেতেই দেখা গেল সকলেই একবাক্যে প্রস্তাবটিকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন।

সতীর্থদের আদেশে প্রস্তুতিপর্বের সূচনা আমাকেই করতে হলো—সঙ্গী ছিলেন একান্ত প্রীতিভাজন মাসিক বসুমতীর সম্পাদক ও সুলেখক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক।

রাধারাণী দেবীর প্রতি এমনি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আর প্রীতি পোষণ করে এসেছি বরাবর —তাই গভীর নিষ্ঠা নিয়েই কাজে নেমেছিলাম। অনেকের কাছে থেকেই পেলাম অকৃপণ সহযোগিতা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অযাচিত সাহায্য, প্রতিদিন অসংখ্য চিঠি ও টেলিফোন।

ভয় ছিল যাঁকে কেন্দ্র করে এই আয়োজন—তাঁকে। কিন্তু তাঁকেও শেষ পর্যন্ত রাজী করালেন স্বর্গতঃ সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়।

উদ্যোগপর্ব এগিয়ে চললো, কিন্তু পৌঁছতে পারলো না সমাধান পর্ব খণ্ডে।

এই অসাফল্যের দায়িত্ব কার সে প্রশ্ন এখন অবান্তর। তবে পরিকল্পনার তাগাদা যাদের মাথায় এসেছিল—দুঃখ বোধের পরিমাণ যে তাদের হবে সব চেয়ে বেশী, সে কথা মনেপ্রাণে বুঝি।

পরিকল্পিত রাধারাণী সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে যাঁরা সেদিন রচনার মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের লেখা কথাসাহিত্যের হাতে তুলে দিলাম। তাঁদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ, আর কামনা করি রাধারাণী দেবী বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে আসনটি অবলীলাক্রমে দখল করেছেন সেখানে থাকুন তিনি অপরাজিতা।

যে বয়সে রাধারাণী দত্তর রচনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তখন আমার দৃষ্টি বিচারসহ হওয়ার সীমা পর্যন্ত পৌঁছয়নি। কিন্তু ভালো লাগার স্বাধীনতা তো জন্মগত। সেই অধিকারেই তাঁর রচনা ভালো লাগতো—আরো ভালো লাগতো অপরাজিতাকে—তাঁর অনেক কবিতাই কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন কি জানতাম রাধারাণী আর অপরাজিতা অভিন্ন। যখন জানলাম তখন ভালো লাগার সঙ্গে মিশেছে অপার বিস্ময়। বাংলা সাহিত্যের জগতে অপরাজিতা আমদানী করলেন এক অনাস্বাদিতপূর্ব ভাব ও রচনা শৈলী। প্রতি ছত্রে, ছন্দে বিদ্রোহ-উদ্বেল মনের প্রতিফলন। দুঃসাহসী গতি চঞ্চল ভাবের স্বচ্ছন্দ পরিক্রমা।

রাধারাণী দেবীর সাহিত্যকীর্তির চেয়ে—তিনি আরো সার্থক—তাঁর কাছে গেলে সে কথা অনুভব করেছি অনুভূতিশীল স্নেহপ্রধান একটি অন্তরের স্পর্শ। তাঁর অন্তরের এই ধারাটি পূর্ণসলিল হয়েছে স্বভাবকোমল সকলের প্রিয় 'নরেনদা'র সান্নিধ্য লাভ করে।

কবি রাধারাণী আমার মনে সৃষ্টি করেছেন বিস্ময়, আর কবিজায়া বৌদি রাধারাণী আমার মনের গভীরে যে স্থানটি স্পর্শ করেছেন, সেখানে বিস্ময় বোধের স্থান নেই—সবটুকু জায়গা জুড়ে রয়েছে—পরম শ্রদ্ধা প্রীতি আর ভালোবাসা।

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

জ্যোতির্ময়ী দেবী

আমাব বিশেষ স্নেহের পাত্রী সহৃদয় সাহিত্য বন্ধু রাধারাণীকে সাক্ষাৎচেনার অনেক আগে ১৩২৮।২৯ সালের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর নামটি লেখায় চেনা হয়েছিল। তিনি তখন কিশোরী মেয়ে। কুড়ির নিচে বয়স। তখনকার আধুনিকা।

কিন্তু রক্ষণশীল বাড়ির অন্তঃপুরিকা। আমিও তাই।

সে সময়ে বাংলা সাহিত্যে তখন 'কল্লোল' যুগের উদ্দাম কল্লোল জেগেছে নতুন লেখকদের নিয়ে।

তার কিছু পরে ১৩৩৩ সালে দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন হয় পৌষ মাসে। তাতে শ্রীযুক্ত অমল হোম "অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য" নামে একটি রচনা পাঠ করেন ঐ সময়ের নূতন লেখকদের লেখা নিয়ে। যদিও শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর লেখাই তাঁর বিশেষ আলোচ্য ছিল। কিন্তু অন্য লেখকরাও বাদ যাননি। সেবারে দিল্লী সম্মিলনে সভাপতি ছিলেন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। প্রবন্ধটি পড়া হ'ল। আলোচনাও হ'ল। সহৃদয় সভাপতি মহাশয় তাঁর নিরপেক্ষ চমৎকার মতামতও জানালেন। শেষদিনের ভাষণে বললেন, 'প্রাণবান সাহিত্যেও বন্যার জলের মত বহু বিষয় আসে...পরে দেখা যায় যা থাকবার তা রয়ে যায়, বাকি সব যা ভেসে যায়।'

কিন্তু কলকাতায় তার জের পৌঁছেচে।

১৩৩৩।৩৪-এর কোন্ মাস মনে পড়ে না, জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রা ভবনে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করে আধুনিক ও অনাধুনিক লেখক দল সমবেত হলেন।

ছিলেন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। অবনীন্দ্রনাথও ছিলেন মনে হয়। যাঁরা দু'দলের

মধ্যস্থ। আর সজনীবাবু অমল হোম প্রমুখ প্রতিপক্ষ দল এবং আধুনিক তরুণ কিশোর যুবক লেখক দল।

তখন অবগুণ্ঠনের যুগ। প্রায় কাউকেই চিনি না। মুখও চিনি না। তবু কেমন করে গিয়ে পড়েছিলাম। মেয়েদের মধ্যে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা ছাড়া—চেনা ছিলেন উমা দেবী (গুপ্ত)।

দেখলাম তরুণী ছেলেমানুষ ২২।২৩ বছরের মেয়ে রাধারাণী এলেন। আধুনিকদের দিকেই বসলেন।

কবি সকলকেই দেখ্‌লেন। মনে হ'ল সকলকেই চিন্‌তেনও।

আলোচনা শুরু হ'ল। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর একটি গল্প নিয়ে—নাম 'রজনী হ'ল উতলা'। শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য সেনের 'বেদে' প্রসঙ্গও হ'ল মনে হয়। আর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের কিছু লেখা নিয়ে। সব কথা এতদিন পরে আর মনে নেই।

যাই হোক, যাঁদের নিয়ে আলোচনা তাঁরা বড় একটা কথা বলেননি।

বিপক্ষদের মধ্যে সজনীবাবুর 'মণিমুক্তা' নামে আলোচনার কথাও উঠল (শনিবারের চিঠি)। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ঐ সাহসিকা তরুণী মেয়েটি দু একবার কি বললেন ও বলতে চাইলেন। আবার আরক্ত মুখে থেমেও গেলেন দলের ইঙ্গিতে।

তারপর কবি তাঁর কালের তাঁর আধুনিকতার সমালোচকদেব (কাব্যবিশারদ সমাজপতি মহাশয়) মনে করিয়ে দু'চারটি কথা বললেন। যার প্রতিপাদ্য ছিল প্রতি কালেই একটি করে 'একাল ও সেকাল' মুখোমুখী দাঁড়ায়। চৌধুরী মহাশয় 'অতি আধুনিক'দের প্রাণধর্মী সাহিত্য সমর্থন জানালেন। অবনীন্দ্রনাথও স্মিত হাস্যে তাঁকে সমর্থন করলেন।

তার পরদিনও সভা ছিল।

কবি শেষ অবধি সবদিকের সব রথীদের নিয়ে কি মতামত বা রায় দিলেন ঠিক জানি না। তবে আলোচনার জের শরৎচন্দ্র নরেশচন্দ্রতেও পৌছেছিল সবাই জানেন 'বিচিত্রা' পত্রিকার পাতায়।

সেই ঐ সাহসিকা তরুণী রাধারাণীকে প্রথম দেখি। আশ্চর্যও হয়েছিলাম, কুণো আমরা তাঁর ঐ বিরাট এবং সব রকমের মানুষের সভায় কথা বলার ভরসা দেখে।

পরে বোঝা গেল ঐ সাহসই তাঁর অপরাজিতা সত্তায় অপরাজিত পরিচয়।

তারপর তাঁর দেখা পেয়েছি মুগ্ধ কবিতায় 'লীলাকমল' হাতে। কিন্তু সে হ'ল তাঁর অন্যদিকে পরিচয়। ভাব মোহ বিহ্বল সাধারণ কবি-মনের পরিচয়।

যে সাহসিকা মেয়েটিকে দেখেছিলাম তার পরিচয় পেলাম ক্রমে 'বিজলী' ও 'বিচিত্রা', 'ভারতবর্ষ' ও নানা ছোটবড় পত্রিকায়।

এবারে অপরাজিতা দেবী নাম।

'অপরাজিতা' নামকরণটা খুবই ঠিক হয়েছিল। মেনে নিতেই হবে। কেননা ওই

ধরনের 'বেপরোয়া' সাবলীল উচ্ছল কৌতুকে উদ্ভাসিত সরস কবিতা 'অপরাজিতা'র আগে বা পরে কোনো মেয়ের কলমের মুখে জাগেনি। ফুটে ওঠেনি কোনো 'অপরাজিত' রচনা।

আমার মনে হয় রাধারাণী ওই লেখাগুলি যে সময়ে, যে পরিবেশে, যে বয়সে লিখেছিলেন ঠিক সেই সময়টির সন্ধিক্ষণটুকু লজ্জাবশে যদি তিনি ছেড়ে দিতেন, সঙ্কোচ বোধ করতেন, কে কি ভাববে মনে করতেন, তাহলে আর ঐ আশ্চর্য বেপরোয়া ভাবগুলিকে অমন স্বচ্ছন্দ ভাষায় রূপ দিতে পারতেন না।

আরো মনে হয়—ঠিক ঐ কটি কারণেই যে তিনি ছদ্মনাম নিয়েছিলেন তাও ভারি সমীচীন ও সার্থক হয়েছিল।

এইটাই রাধারাণীর বিশেষত্ব। তাঁর নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর নিজ সত্তাকে জানা ও চেনা। এবং এও সত্য রাধারাণী আর কখনো ওরকম কবিতা লিখতে পারবেন না বা বসবেন না জানি। কিন্তু এও জানি তিনি 'অপরাজিতা'।

এই নিজেকে চেনা—একি মেয়েদের নেই ? আছে। কিন্তু তাঁদের নিজ ব্যক্তিসত্তাকে 'স্ব'ভাবে প্রকাশ করতে যে বিষম সঙ্কোচ ও লজ্জা আছে তাকে তাঁরা কোনোদিন অতিক্রম করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

এবং ঠিক এই কারণেই হয়ত রাধারাণী পরে আর ও-ধরনের কবিতা রচনা করেননি। কেননা সে মাহেন্দ্রক্ষণ আর ফিরে আসে না। মহাকবিদের কাছেও আসে না।

রাধারাণীর লেখা গল্পও কিছু ছিল। প্রবন্ধও আছে। কবিতাও অন্যরকম অনেক আছে।

সবই প্রায় আমাদের পড়া। সেগুলিরও একটি বিশিষ্ট ও প্রাপ্য ক্ষেত্র আছে সাহিত্যে। নারী-রচিত সাহিত্যে।

সেগুলি জড়ো করে পাশাপাশি রাখলে এক লেখিকার দুই সত্তার পরিচয় স্পষ্ট হবে। আর বোঝা যাবে জীবনের সত্যদর্শন তাঁর কতভাবে হয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আমি চিনি 'শরৎ বন্দনা'র দিনে। সেই আমার তাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়।

তিনি রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন। কিন্তু সর্বসাধারণ লেখক-লেখিকাদেরও তিনি খুব আপনার জন। সহৃদয়তা সৌজন্য স্বভাবমাধুর্যে গুণগ্রাহিতায় রাধারাণী সকলের মন জয় করেন।

প্রতিমা দেবী

"উত্তরায়ণ"
পোঃ—শান্তিনিকেতন
(জেলা—বীরভূম)
ওয়েষ্ট বেঙ্গল
৯.৫.৬৮

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী সুচরিতাসু

আপনার পত্রোত্তরে জানাই কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী কবি শ্রীমতী রাধারাণী দেবী উভয়েই আমার পরিচিত। এঁদের দুজনকেই আমার শ্বশুর মহাশয় যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং উভয়েরই কবি-প্রতিভার প্রশংসা করিতেন।

আপনারা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে সম্বর্ধনা দ্বারা সম্মানিত করিবেন জানিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি। ইতি—

প্রতিমা দেবী।

আমার বৌদি

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মানুষের জীবনে অনেক ঘটনার মাঝখানে এমন এক-একটা ঘটনা ঘটে মানুষ যাকে কোনোদিন ভুলতে পারে না।

আমার সাহিত্য-জীবনের প্রথম দিকে এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল।

সে-কথাটি বলতে হলে অনেকখানি পিছু হাঁটতে হয়।

কয়লাখনির দেশ থেকে এসেছি কলকাতায়। ঝোঁক সাহিত্যের দিকে। কলকাতার বাইরে থেকে যাঁদের শুধু নাম শুনেছি, লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি, ভেবেছিলাম কলকাতায় গিয়ে তাঁদের চোখে দেখবো। কথা বলতে না পারি, অন্তত একটি প্রণাম করে আসবো। কিন্তু কলকাতায় এসে দেখি— কোথায় রবীন্দ্রনাথ ? কোথায শরৎচন্দ্র ? আকাশের সূর্য-চন্দ্রের মতই তাঁরা আমার নাগালের বাইরে।

থাকি তখন সুকিয়া স্ট্রীটে (এখন কৈলাশ বোস স্ট্রীট)। বাড়ির সুমুখে কান্তিক প্রেস। 'ভারতী' পত্রিকার আপিস। সেখানে রোজ দেখি—আমাদের অগ্রজ কবি-সাহিত্যিকেরা আসেন, বসেন, গল্প করেন, চা খান আবার কখনও-বা একা একা—কখনও-বা দল বেঁধে বেরিয়ে যান।

পায়ে হেঁটে কথা বলতে বলতে পেরিয়ে যান আমাদেরই বাড়ির সুমুখ দিয়ে।

চিনে ফেলেছি সবাইকে। অথচ আমাকে চেনেন না কেউ।

কলকাতা ছেড়ে আবার চলে গেলাম কয়লাকুঠির দেশে। আবার সেই বীরভূমের গ্রাম আর সাঁওতাল পরগণার জঙ্গল। সেইখানে বসেই লিখলাম কয়লাকুঠির গল্প। একটি গল্প পাঠিয়ে দিলাম প্রবাসীতে, একটি গল্প পাঠালাম বসুমতীতে, আর একটি পাঠালাম ভারতবর্ষে।

ভেবেছিলাম গল্পগুলি ফেরত যাবে। কিন্তু একটিও ফেরত গেল না। সবগুলি ছাপা হয়েছে। চিঠি পেলাম প্রবাসী-সম্পাদক চারুবাবুর কাছ থেকে, চিঠি পেলাম বসুমতীর সতীশ মুখুজ্যের কাছ থেকে। আর একখানি চিঠি লিখেছেন—ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেন। লিখেছেন—"দেখেছো ভায়া আমি কিরকম good boy। গল্পটি সঙ্গে সঙ্গে ছাপিয়েছি। আরও গল্প পাঠাও। কলকাতায় এলে দেখা কোরো।"

অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য!

ফিরে এলাম কলকাতায়। ভারতবর্ষ-আপিস বাড়ির কাছেই। গেলাম জলধর সেনের সঙ্গে দেখা করতে। ঢুকে পড়েছিলাম ছাপাখানায়। এক ভদ্রলোক দেখিয়ে দিলেন কোণের দরজা। বলে দিলেন—দোতলায় উঠে যাবেন।

কোণের দরজায় ঢুকে দেখি সুমুখে দু'জন ভদ্রলোক বসে। পাশে বইএর আলমারি। মেঝের ওপর থাকে থাকে সাজানো বই। কোন্‌দিকে সিঁড়ি, কোথায় দোতলা কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না। এবারও বোধ হয় ভুল জায়গায় এসে পড়েছি ভেবে থম্‌কে দাঁড়িয়ে আছি, দেখলাম সেই বইএর ব্যূহ ভেদ করে একজন এগিয়ে আসছেন আমার দিকে। ভারতী-আপিসের লেখকদের আমি তখন চিনে ফেলেছি। ইনি কবি নরেন্দ্র দেব।

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই?

আমার হাতে ছিল জলধর সেনের চিঠি। চিঠিখানি তাঁর হাতে তুলে দিলাম। চিঠিখানি পড়লেন। উলটে পাল্‌টে দেখলেন। আমার নামটি পড়ে একবার হাসলেন। হেসে আমাকে বললেন, এসো। দাদা আজ আসবেন না। দাদার মিটিং আছে।

সুমুখে যে-দু'জন বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যিনি বড়-জন, তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন, বোসো।

সুমুখে চেয়ারের মত কাঠের তৈরি লম্বা বেঞ্চি। তার ওপর বসলাম আমরা দু'জন।

নরেনদা বললেন, তখন যার কথা হচ্ছিল ইনিই তিনি।

যাঁকে বললেন, তিনি হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। সেই বিরাট প্রকাশন সংস্থার মালিক। পাশে বসে আছেন তাঁর ভাই। দু'জনেই দেখলাম কথা কম বলেন। অসম্ভবরকম গম্ভীর। সেদিন ভয়-ভয় করছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় যখন আমার ঘনিষ্ঠ হলো, তখন দেখলাম সে কপট গাম্ভীর্য তাঁদের বাইরের আবরণ।

সে যাই হোক্‌, তাঁরা দু'ভাই সেদিন আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলেননি। আমার দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু সে দুঃখ নরেনদা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোমার নাম কি শৈলজা মুখোপাধ্যায়? নামটা কি সত্যি নাম না ছদ্মনাম? আজকাল মেয়েদের নাম দিয়ে অনেকে লেখা পাঠায়। ভাবে বুঝি মেয়েদের নামে পাঠালে তাড়াতাড়ি ছাপা হবে। আমরা তো 'শৈলজা' নামটা দেখে ভেবেছিলাম তুমি মেয়ে। দাদা (জলধরদা) শুধু বলেছেন এর লেখা পড়ে বুঝতে পারছি—এ মেয়ে হতে পারে না। এ ছেলে।

বললাম, উনি ঠিকই বলেছেন। এ আমার ছদ্মনাম নয়, এই আমার আসল নাম।

নরেনদা বললেন, তা কখনও হতে পারে না। শৈলজার পরে একটা নাথ কিংবা কুমার-টুমার কিছু ছিল নিশ্চয়ই।

বললাম, ছিল 'শৈলজা'র পর 'নন্দ' ছিল, আমি কেটে ছোট করে দিয়েছি।

অন্যায় করেছো। নরেনদা বললেন, এবার থেকে নন্দ যোগ করে দেবে। শৈলজানন্দ লিখবে।

তাই লিখবো। বলে সম্মতি দিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

সাহিত্যের সংসারে প্রবেশ করবার মুখেই একটি দাদা পেলাম।

পরে যখন আমার অগ্রজ সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, যাঁরাই বয়সে বড়, তাঁদের দাদা বলে ডেকেছি, কিন্তু নরেনদার মত এমন দাদা একটিও পাইনি। এমন সহৃদয়

আত্মীয়তার স্পর্শ আর কোথাও পেয়েছি বলে মনে হয় না।

শুনেছিলাম নরেনদা অবিবাহিত।

এই কথাটা শুনেই আমি কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছিলাম।

পুরো দুটি মাস কলকাতায় আসিনি।

এমনি পালিয়ে পালিয়ে যাওয়া তখন আমার স্বভাব ছিল।

সাঁওতাল পরগণার বনে-জঙ্গলে, কয়লার কুঠিতে আর লোহার কারখানায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম আর যেখানে বসতাম সেইখান থেকেই গল্প লিখে পাঠাতাম কলকাতার মাসিকে সাপ্তাহিকে। ছাপা হতো কিনা কোনও খবরও পেতাম না।

কলকাতায় ফিরেই দেখা করতে গেলাম নজরুলের সঙ্গে।

নজরুলের তখন খুব নাম। ঝাঁক্ড়া ঝাঁকড়া মাথার চুল, চওড়া বুকের ছাতি, বড় বড় চোখ আর হো হো করে প্রাণখোলা হাসি। 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে নাম হয়েছে বিদ্রোহী কবি।

লোকজন যেখানে-সেখানে তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান গাওয়াচ্ছে আর হৈ হৈ করছে। অথচ কেমন করে কি কষ্টে যে তার দিন চলছে সে খবর কেউ রাখছে না।

আমি যেতেই নজরুলের সেই নিরুদ্ধ অভিমান! অভিমানের কারণ আমার তখন অনেকগুলি কয়লাকুঠির গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, এবং তখনও হচ্ছে। অথচ কোনোদিন সে-কথা আমি নিজের মুখে নজরুলকে জানাইনি। সব চেয়ে দুঃখিত হয়েছে সেইদিন—যেদিন কবি মোহিতলাল মজুমদার একখানি প্রবাসী পত্রিকা নিয়ে গিয়ে আমার 'বলিদান' গল্পটি তাকে পড়ে শুনিয়েছে। বলেছে, 'তোমারও তো বাড়ি এই কয়লাকুঠির দেশে। শৈলজা মুখোপাধ্যায় নামে এই লেখকটিকে তুমি চেনো?'

দুঃখ হবারই কথা।

শুধু মোহিতলাল নয়, ভারতী গ্রুপের আমাদের অগ্রজ সাহিত্যিকেরা অনেকেই তাকে বলেছে আমার কথা। অথচ আমি তখনও তাঁদের কাউকেই চিনি না।

কথায় কথায় বললাম, আমার পরিচয় হয়েছে শুধু নরেনদার সঙ্গে।

বললাম, জানো, নরেনদা এখনও বিয়ে করেননি।

নজরুল বললে, তুমি ছাই জানো! কলকাতা থেকে পালিয়ে পালিয়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াবে, জানবে কেমন করে?

সেই দিন নজরুলের মুখে শুনলাম, রাধারাণী দেবী নামে যে-মেয়েটি কবিতা লেখে নরেনদা তাকেই বিয়ে করেছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কবি। মিলেছে ভাল।

নজরুল বললে, অপরাজিতা দেবীর কবিতা পড়েছো?

শুধু পড়েছি বললে ঠিক বলা হয় না, বললাম, অপরাজিতা দেবীর কবিতা পড়বার জন্যে প্রতি মাসে আমি ভারতবর্ষের পাতা ওল্টাই।

নজরুল বললে, রাধারানী দেবী আর অপরাজিতা দেবী—এক মেয়ে। কালই জিজ্ঞাসা করবো নরেনদাকে!

আমি তখন সুকিয়া স্ট্রীট ছেড়ে দিয়ে চলে গেছি ভবানীপুরের একটা মেসে। ভবানীপুর থেকে গেলাম ভারতবর্ষ-আপিসে। গিয়ে শুনি নরেনদা রোজ আসেন না। কবে আসবেন কখন আসবেন কেউ বলতে পারলেন না।

তিন-চারদিন পরে হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা।

নরেনদা ভারতবর্ষ-আপিস থেকে বেরোচ্ছেন, আমি যাচ্ছি সেইদিকে।

যত সহজে কথাটা জিজ্ঞাসা করবো ভেবেছিলাম, কাজের সময় দেখলাম বিয়ের কথাটা জিজ্ঞাসা করা অত সহজ নয়।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, তাঁর কাছে এগিয়ে যেতেই নরেনদা আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, তুমি কি এখানে ছিলে না?

বললাম, না।

নরেনদা বললেন, পরশু তোমাকে যেতে হবে এক জায়গায়।

—কোথায়?

নরেনদা বললেন, লিলুয়ায়। হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে চড়বে। লিলুয়ায় নামবে। স্টেশনের কাছেই আমার বাড়ি। তোমার বৌদি নেমন্তন্ন করেছে। খেয়ে আসতে হবে।

গিয়েছিলাম লিলুয়ায়। খেয়েও এসেছিলাম।

খাওয়াটা বড় কথা নয়। বৌদিকে দেখে এসেছিলাম। পরিচয় হয়েছিল রাধারাণী দেবীর সঙ্গে।

কবি রাধারাণী দেবী নয়—বৌদি রাধারাণী দেবীর সঙ্গে।

আমার নিজের সংসারে দাদাও নেই, বৌদিও নেই। কিন্তু সাহিত্যের সংসারে এই যে দাদা আর বৌদি পেলাম এ যে কত বড় পাওয়া—যারা না পেয়েছে তারা বুঝবে না।

লৌকিক পরিচয়ের মৌখিক আপ্যায়নের কথা মানুষ দুদিনে ভুলে যায়, কিন্তু জীবনের কোনও দুর্লভ শুভ মুহূর্তে একটি হৃদয়ের অলোকসুন্দর স্নেহ ও প্রীতি যখন আর একটি হৃদয়কে স্পর্শ করে, তখন গ্রহীতার কাছে তা হয়ে থাকে অবিস্মরণীয়।

আমার সাহিত্য-সংসারের এই বৌদিদিটির বেলাও হয়েছে তাই। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো—আমার এই বৌদির অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা আমার কাছে হয়ে থাকবে পরম সম্পদ।

তারপর অনেকদিন পার হয়ে গেছে। হিন্দুস্থান পার্কে বৌদি বাড়ি করেছেন। বাড়ির নাম—'ভালো-বাসা'। বৌদির একটি মেয়ে হয়েছে। মেয়ে এম-এ পাস করেছে। বিয়ে হয়ে গেছে। মেয়েও কবি হয়েছে মায়ের মত।

কবিতা যেমন করে রচনা করতে হয়, বৌদি তাঁর নিজের জীবনটিকেও তেমনি সযত্নে রচনা করেছেন। সংসারে—এনেছেন স্বর্গের সুষমা।

এই আমার বৌদি। এই আমার গর্ব। এই আমার অহঙ্কার।

অপরাজিতা

ডঃ অশোক মিত্র

একেবারে বালকবয়সে ফিরে যেতে হয়। বাড়িতে বহু বছরের বাঁধানো 'ভারতবর্ষ' ছিল, হীরে-মণি-মুক্তার চেয়েও লোভনীয়, অনেক নিভৃত দুপুরের রুদ্ধশ্বাস আবিষ্কার সেই 'ভারতবর্ষ'গুলির সঙ্গে জড়ানো। দিলীপকুমার রায়ের 'ভ্রাম্যমাণের জল্পনা', নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'অভয়ের বিয়ে' ও 'তারপর', নরেন্দ্র দেবের 'পুতুল খেলা', মণীন্দ্রলাল বসুর স্বপ্ন-মাখানো গল্প 'মায়ের দিন', সুবোধ বসুর সম-অপরূপ আরেক গল্প 'রানুর দিদি', চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সালঙ্কার কঙ্কাল', সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নাটক 'লাখ টাকা', উপন্যাস 'লজ্জাবতী', গল্প 'বিষ্যুৎবারের বারবেলায়'। আরো পরে, প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর সঙ্গমে', এমনকি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'ইতি'—এবং বুদ্ধদেব বসুর 'যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন'।

তাছাড়া, প্রথমে রাধারাণী দত্ত-র, পরে রাধারাণী দেবীর, অজস্র কবিতা এবং একটি-দুটি আশ্চর্য বিষণ্ণ-বিধুর গল্প, এত অন্তর্বেদনায়-উপচে আসা যে তখনো, সেই বালক বয়সেই, সন্দেহ হতো হয়তো আত্মকাহিনী পড়ছি। গল্পগুলির নাম এখন আর মনে আনতে পারছি না, কিন্তু নিহিত কান্নার সুর এই প্রায়-পঁয়ত্রিশ বছর বাদেও পরিষ্কার অনুভব করতে পারছি।

অথচ সেই সঙ্গে উল্লিখিত কান্নার একেবারে প্রতীপ, সেই 'ভারতবর্ষে'র পাতাতেই, অপরাজিতা দেবী-র রাশি-রাশি কবিতা। রাধারাণী দেবী-র কোনো কবিতাই এখন আর বিশেষ মনে নেই: রবীন্দ্রনাথের সম্মোহনের খুব কাছাকাছি, স্তবকের পরে স্তবক, এবার-পবিত্র-হয়ে-ব'সে-কবিতা উচ্চারণ করছি অনেকটাই এই-গোছের সমারোহ। মধ্যবয়সে হঠাৎ এক সময়ে স্মৃতিতে ঢল নামে, সুতরাং লজ্জাবোধ ক'রেই বা কী হবে, রাধারাণী দেবীর কাব্য আমার এখন আদৌ মনে পড়ে না, কোনো পংক্তিই হঠাৎ ঝলক দিয়ে উঠে প্রেমে পোড়ায় না। কিন্তু অপরাজিত দেবী-র কবিতার স্মৃতি এখনো সমান উজ্জ্বলতা নিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে ফেরে। হায়, কোথায় গেলো সে-সব ঝকঝকে কৌতুকে-ঠিকরোনো

উচ্ছল পংক্তিগুলি ? একটা-দুটো কবিতার কথা মনে হয়, হঠাৎ তিন-চার দশক আগেকার পৃথিবীর সঙ্গে মেলানো কোনো চিত্রকল্প তৈরি হয়ে আসে, কিন্তু হাজার চেষ্টাতেও হয়তো শেষ অনুচ্ছেদে আর পৌঁছুতে পারি না, এই আক্ষেপের কোনো তুলনা নেই। সেই 'ভারতবর্ষে'র বাঁধানো খণ্ডগুলি বহুদিন হারিয়ে গেছে, অপরাজিতা দেবী-র বইগুলিও বাজারে খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন শুধু থেমে-থেমে, থেকে-থেকে স্মৃতিচারণ: একটি-দুটি পংক্তি, যা-যা মনে আনতে পারি, জিভের ডগায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চাখা, কৌতুকের ঈষৎ-ক্ষিপ্র কণিকার নির্ভরে আরো একবার শৈশবের স্বর্গরাজ্যে ফিরে যাওয়া।

অপরাজিতা দেবী অমন করে মন কেড়েছিলেন তার বড় কারণ, ছন্দের ঝিকিমিকি বাদ দিলেও, ভঙ্গির সারল্য। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু ক'রে অন্য যে-কারো কবিতায়–অর্থ না বুঝেও স্রেফ শব্দের সম্মোহনে যে-সব কবিতা আগাগোড়া মুখস্থ ছিল তখন, মাইলের পর মাইল হেঁটে গিয়েও যে-সব কবিতার স্তবক-পংক্তি ফুরিয়ে আসতো না —মস্ত আর্য ভাব, মায় রাধারাণী দেবী-র কবিতায় পর্যন্ত। গম্ভীর নির্ঘোষ, কবিতায় প্রবেশ করলেই যেন হঠাৎ সুদূরে উঠে যাওয়া, যেন কেউ শূন্যে উপস্থাপন ক'রে দিলেন। প্রকৃতির পরিবর্তন, পরিবেশের কেমন অন্যরকম, সংস্কৃত-সংস্কৃত হয়ে যাওয়া: এমনকি, অন্যদের প্রেমের কবিতাতেও পর্যন্ত এই গাম্ভীর্যের বাণী। ঐ বালকবয়সে যা সম্ভ্রম উদ্রেক করতো, কিন্তু কাছে টেনে নিয়ে যা অন্তরঙ্গ আলাপ জমাতে পারতো না।

অপরাজিতা দেবী একেবারে আলাদা। ঘরোয়া কথাবার্তা, সাদামাঠা শব্দচয়ন, তাছাড়া পয়ারের মাপ মেনে নিয়েও ছড়ার ছন্দের ঝিলিক। প্রবহমাণতার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ছেলে-ভুলোনো ছড়ার উচ্ছলতাও, বাংলা কাব্য ব্যাকরণের নিগড়ও অনুপস্থিত নয়। একেবারে সাহজিকতায় নেমে আসা, আমাদের সংসারের দৈনন্দিনতার মধ্যে যে-হাসি-আনন্দকৌতুকের ফুলঝুরি, সেই ফুলঝুরিকে পদ্যে সাজানো। বাঙালি কৌতুক, কিন্তু নাগরিক। দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী বাংলাদেশ, কলকাতা শহর, কল্পনা করুন যেন ভবানীপুর পাড়া, টাউনসেণ্ড রোড কিংবা ঐ ধরনের কোনো রাস্তা, দুপুরে যেখানে স্তব্ধতা নামে, ট্রামলাইন থেকে দূরে, একটা-দুটো রিকশার টুংটাং, অপরিমিত মধ্যবিত্ত উচ্চমধ্যবিত্ত শান্তি। অপরাজিতা দেবী-র কবিতার পরিমণ্ডল সচ্ছলতা-জড়ানো, গার্হস্থ্যের পরিতৃপ্তি প্রায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এমন-এক পৃথিবী যেখানে শুধুই ক্ষণিক অভিমানহেতু গালে সামান্য টোল পড়ে, কিন্তু পরমুহূর্তেই মেঘ কেটে যায়, আনন্দ উপচে ওঠে। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে ঠিক অনুরূপ পরিমণ্ডল ছিল; ব্যঙ্গের মধ্যে কোনো হুল নেই, একে-ওকে-তাকে নিয়ে যদিও বা রঙ্গ করা, সেই রঙ্গের শেষে মুঠো-মুঠো পবিত্র আনন্দ উপভোগ।

মানছি, অপরাজিতা দেবী-র সেই খণ্ডিত, সীমিত পৃথিবীতে অনেক ফাঁক ছিল না। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স ঠিক যখন একটার পর একটা অপরাজিতা দেবী-র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন, তখন পাট-ধানের দাম হু-হু ক'রে পতনশীল,

বাংলাদেশের চাষীদের মধ্যে হাহাকার, জগৎ জুড়ে অর্থনৈতিক সংকট। যে-মধ্যবিত্ত উচ্চমধ্যবিত্তদের ঘরোয়া সমস্যাদির হাল্কা দিক নিয়ে অপরাজিতা দেবী পদ্য ফেঁদে যাচ্ছিলেন, সেরকম অনেক পরিবারের ছেলেমেয়েরা তখন বাংলাদেশে সন্ত্রাসে দীক্ষা নিয়েছে, নতুন সমাজের স্বপ্ন, অস্পষ্ট বিভাসে হ'লেও দেখতে শুরু করেছে, ইতিমধ্যেই ইতস্তত অনেক গোলাবারুদ পিস্তলের শব্দ; আইন অমান্য আন্দোলনের উতরোল ঢেউ; আন্দামানে ক্রমবর্ধমান রাজবন্দীদের সংখ্যা। অপরাজিতা দেবী-র কাব্যে বাইরের এই উথালপাথাল ঝড়বাদলের অবশ্যই এমনকি পরোক্ষ ছায়া নেই।

মানছি, কিন্তু এই আপাতস্খলন আমাকে বিচলিত করে না, গত পঁয়তিরিশ বছর ধরে আহৃত জ্ঞানের ভারাতুরতা সত্ত্বেও করে না। কেউ-কেউ হয়তো গাল পাড়বেন, পলাতকধর্মী কবিতা, মিষ্টি-মিষ্টি, রিনিরিনি, চটুল কবিতা, ঠুনকো, শ্রেণীদেশদুষ্ট, টেঁকবার নয়। এই শেষের ব্যাপারটা নিয়ে আমার আপাতত কোনো মাথাব্যথা নেই, কারণ যে-আনন্দ সেই কিশোরবয়সে পেয়েছিলাম তার তুলনা নেই, সেই আনন্দের স্মৃতিচারণ এখনো এক অভিভূত শিহরণ। একপেশে রচনা, এই তিনযুগ বাদে সেরকম অভিযোগ করারও বিশেষ অর্থ নেই। যাঁর যা বিশ্বাসের, অভিজ্ঞতার স্থলভূমি, তাঁকে তা সর্বাগ্রে মঞ্জুর ক'রে দিতে হয়। পরবর্তীকালে সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়রা বিপ্লবকে সোচ্চার ঘোষণা ক'রে কবিতা লিখেছেন, অথবা অপরাজিতা দেবী-র আগে রবীন্দ্রনাথ বের্গসীয় দর্শনে নিজেকে সম্পৃক্ত ক'রে নিয়ে প্রগাঢ়-গম্ভীর কাব্য সঞ্চার করেছেন, এই উভবিধ তথ্যই অপরাজিতা দেবী-র ক্ষেত্রে উহ্য। নিজের পৃথিবীর পরিধির মধ্যে স্থিত থেকে পরিপার্শ্বকে ভালো-লাগা, ভালোবাসা: কেউ যদি শ্রেফ এইটুকুই শুধু করেন, প্রতিভাকে শুধু ওই খণ্ডিত, সীমিত পৃথিবীর কলকাকলির অনুলিপিতেই শুধু নিয়োগ করেন, আমি বলবো তা-ও সমান নিখাদ, সমান শিব। যত দক্ষতার সঙ্গে অপরাজিতা দেবী তা করতে পেরেছিলেন, তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকেই পারেননি।

এবার আরো-একটু স্পর্ধিত উক্তি করছি। কবিত্ব আসলে কল্পনাকে আঁকিবুকি খেলতে শেখানো। দেশোদ্ধার, সমাজবিপ্লবের ব্রতধারণ, এ সমস্তও কল্পনারই উৎকীর্ণ প্রকাশ। যাঁরা সমাজের—দেশের কাজ করেন, তাঁদের সাহসী হ'তে হয়; কবিকেও সাহসী হ'তে হয়। এবং সাহসটা আসে কল্পনাকে বিস্ফারিত করবার প্রতিভা থেকে, যে-প্রতিভা অনেকটাই ঐশী। কারো-কারো মধ্যে প্রতিভাটি লুকিয়ে থাকে, কারো-কারো ক্ষেত্রে তা দীপ্তিতে উদ্ভাসিত-বিচ্ছুরিত। স্থান-কাল-পরিবেশের প্রভাবে, অপরাজিতা দেবী-র কাব্যে যে-বিশেষ বিষয়ের ছায়া পড়েছিল, আমাদের হালের চিন্তা পরিপার্শ্বের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি না ব'লে তাকে তাই দুয়ো দেবো না, শুধু বলবো আজ আমাদের সমস্যা অন্য, কবিতার সমস্যাও অন্য, এমনকি প্রেমের কবিতার সমস্যাও।

কিন্তু তাই ব'লে আমার শৈশবের-কৈশোরের ভালো-লাগাকে আমি অস্বীকার করবো না, অস্বীকার করা মানেই নিজের সত্তার খানিকটা কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া। আজ আমি

যেখানেই পৌঁছুই, এটা কী ক'রে ভুলি, একদা, কল্পনার প্রথম উন্মেষে, অপরাজিতা দেবীর কবিতার দোলায় উন্মথিত হয়েছিলাম ? যে-কোনো বাঙালি ছেলে ইস্কুলের কয়েক বছর কবিতা মক্সো ক'রে থাকে, কী ক'রে ভুলি আমার প্রথম মক্সো-করা কবিতা, রবীন্দ্রনাথের উপর দাগা-বুলোনো নয়, সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুলের প্রায়-অনুলিখনও নয়, আমার মক্সো-করা আদি কবিতা অপরাজিতা দেবীর ঢঙ নকল ক'রে ?

মূঢ় ছিলাম তখন, জানতুম না রাধারাণী দেবীর সঙ্গে অপরাজিতা দেবীর কী সম্পর্ক ; অ-প-রা-জি-তা এই পাঁচবর্ণের আড়ালে পাঁচ-পাঁচটি অন্য নামের আসল কবি কেউ-কেউ লুকিয়ে আছেন কিনা তা নিয়েও তখন অনেক অলস গবেষণা চলেছে। পরে জেনেছি পুরো জিনিসটাই উজ্জ্বল কৌতুক : এই কৌতুকবিতরণকারিণীকে এই এত বছর বাদে সন্নত, সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানাবার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থবোধ করছি।